মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ

সংস্কৃতির রূপান্তর

আবদুল মওদুদ

ইতিহাসবিদ আবদুল মওদুদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর' বাঙালি পাঠকের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে তথ্য-অনুসন্ধানী ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের কাছে এটি একটি অমূল্য গ্রন্থ। বাঙালি জাতির হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় মানুষের নানামুখী চরিত্র বিশ্লেষণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ব্রিটিশ আমলে এদেশের বাঙালিসমাজের উত্থান, শিক্ষার্জন, জ্ঞানসাধনা এবং সংস্কৃতির রূপান্তর নিয়ে চমৎকার তথ্য তুলে ধরেছেন লেখক। প্রচুর বই ও পত্র-পত্রিকা পড়েছেন তিনি এবং যুক্তিপূর্ণভাবে

এ-গ্রন্থটি রচনায় তাঁর জ্ঞানের প্রধান পরিচয়টি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা জানি, সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই যেমন ওপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমিন শিল্প-সংস্কৃতি-রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে তার একটা সাধনা থাকে। এ-সাধনা দেশপ্রেমের উৎস।

মধ্যবিত্ত সমাজের হাতেই থাকে নিয়ম নীতি ও সমাজ উন্নয়নের চেতনা। এই সমাজের দায়িত্ব অনেক। আমরা আশা করব, নতুনভাবে প্রকাশিত এ-গ্রন্থটি আগের মতো পাঠক-সমাদৃত হবে।

এ-গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত হল।

ISBN 984 70156 0190 4

আবদুল মওদুদ ১ জুন ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর গ্রামের বাড়ি বর্ধমান জেলার খণ্ডকোষ থানার ওয়ারী গ্রামে। শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়েও শুধুমাত্র নিজের আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তায় গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে লেখাপড়া করে আই.এ. পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বিএ (অনার্স) ও এমএ পাশ করেন। ১৯৩৩ সালে আইন পাশ করেন। ১৯৩৬ সালে বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিচারক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি কলকাতায় আলীপুর কোর্টের বিচারক ছিলেন। এ-সময় তিনি অপশন দিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং পাকিস্তান সরকারের বিচার বিভাগে চাকরি করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা জেলা দায়রা জজ হিসেবে কাজ করার সময় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার বিভাগ আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়ে করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করেন। এ-সময় তিনি সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে জেনেভা ও নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। অবসরগ্রহণের পর তিনি কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং নজরুল একাডেমীর সভাপতি হন। তিনি ইতিহাস পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

ছোটবেলা থেকে বই কেনা ও পড়ার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে মেধা ও মননের চর্চা তাঁকে আরও সমৃদ্ধ করেছে দেশ, মানুষ ও সমাজ নিয়ে ভাবতে। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, ইংরেজি ভাষা শিখে ঐ ভাষার বইও পড়তেন। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত এবং ইত্তেহাদ পত্রিকায়।

ঢাকার সবগুলো দৈনিক ও মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাঁর বিচার বিভাগের অভিজ্ঞতায় লেখা গল্প 'ক্রিমিনাল' সমকাল সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা হলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। একজন সুবক্তা, গবেষক, চিন্তাবিদ ও ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৭০ সালের ২১ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : কামেল নবী (১৯৪৪ কলকাতা), ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে, ভারতে ওহাবী আন্দোলন (১৯৬৯), মুসলিম মনীষা (১৯৫৫), হযরত ওমর (১৯৬৫), ক্রিমিনাল, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই (১৯৬৪), মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর (১৯৭০) এবং উইলিয়াম হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান'-এর অনুবাদ (১৯৬৮), আর্নল্ড টয়েনবির 'পৃথিবী ও পাশ্চাত্য'-এর অনুবাদ।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ
সংস্কৃতির রূপান্তর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ
সংস্কৃতির রূপান্তর

আবদুল মওদুদ

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

মাওলা ব্রাদার্স প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৬৯

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net
Web : www.mowlabrothersbooks.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0190 4

MADHYABITTYA SAMAJER BIKASH: SANSKRITIR RUPANTAR (Growth of the Middle Class: Reformation of Culture) by Abdul Moudud. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Four Hundred Fifty only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইতিহাস-বিজ্ঞানী বহু ভাষাবিদ স্ত্য-সন্ধানী

সালাহ্ উদ্দীন খুদা বখশ

এম. এ. (অক্সন্), বি. সি. এল., বার-এ্যাট-ল
যাঁর পদপ্রান্তে একদিন ইতিহাসের পাঠগ্রহণ করেছি
তাঁরই পূণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বর্তমান যুগের সামাজিক বিবর্তনের চরম ফলশ্রুতি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। এই বিকাশ চলছে অপ্রতিহত গতিতে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে, আর্থিক জগতে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। এ যুগে পৃথিবীর বুক থেকে যেমন রাজতন্ত্র ও একনায়কত্ব ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করছে এবং সে স্থলে দেশে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনাধিকারের অভিষেক চলছে, তেমনই এ অভিষেকে মধ্যবিত্ত সন্তানের রাষ্ট্রনায়ক অথবা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীরূপে রাজগিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বস্তুত, এ যুগের সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীই রাষ্ট্র বিষয়ক সবকিছুই কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

চৌদ্দ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও সামাজিক তথা শ্রমসম্পর্কিত পৃথক ব্যবস্থার উদ্ভব হওয়ার ফলেই সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশ যতই নাগরিক রূপায়ণের দিকে অগ্রগতি লাভ করতে থাকে, ততই নাগরিক অধিকার সম্পর্কে এ শ্রেণী আত্মসচেতন হতে থাকে। এই নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতনতা ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবিতে উদ্বুদ্ধ করে। তার ফলে দেশ শুধু বাণিজ্য-শিল্পায়নের দিকেই অগ্রগতি লাভ করেনি, নিয়মতান্ত্রিক শাসনাধিকারের দাবিতেও জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এভাবে পাশ্চাত্য জগতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তার দুটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজেদের পেশাগত স্বার্থের তাগিদে এক সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে এবং তাদের জীবনধারা, মূল্যবোধ ও আচরণের প্যাটার্নও একীভূত হয়। দ্বিতীয়ত, এ শ্রেণী কতকগুলো উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক জীবনধারার মূল্যায়নে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্মক্ষেত্রে সেসব নব মূল্যায়ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালক্রমে অর্থ, শিক্ষা ও শক্তিতে বলিয়ান হয়ে এ নতুন সমাজশ্রেণী রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করতে সক্ষম হয় এবং রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত সন্তান রাষ্ট্রীয় শাসনও গ্রাস করে।

www.pathagar.com

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের পাশ্চাত্য জাতির পূর্বে ঠিক সে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, যা অধুনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে চিহ্নিত হয়। অবশ্য মুসলিম শাসন আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপাদানসমূহের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সে উপাদানসমূহ তখন সুগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। সতেরো শ সাতান্নর পর ইংরেজ জাতি যখন এদেশের মালিক-মোক্তার হয়ে ওঠে, তখন ইংরেজরা সাম্রাজ্যিক গরজে এদেশীয় বশংবদ বর্ণহিন্দুদের নিয়ে নতুন ভূস্বামী, নতুন বণিক শ্রেণী ও নতুন বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে, এবং তারাই মধ্যবিত্তসমাজ হিসেবে ব্রিটিশের অনুগ্রহে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে। স্মরণীয় যে, স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় পুরাতন সমাজদেহের মধ্য হতে পাশ্চাত্য জগতের মতো ভারতীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ঘটেনি। এজন্যই সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট এদেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুকারীর ভূমিকাই পালন করেছে, জীবনের কোনো নতুন মূল্য বা পদ্ধতির সৃষ্টিক্ষম হয়নি (The Indian Middle Classes, Misra, p. 11)। এদেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যবসায় বা শিল্পকর্মে অনীহার দরুন হিন্দু মধ্যবিত্ত সন্তান বাণিজ্য-শিল্পের চেয়ে শিক্ষালাভের দিকেই ঝুঁকেছে বেশি এবং তার দরুন সরকারি আমলা ও শিক্ষাগত পেশার ক্ষেত্রে যেমন উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদিতেই ভিড় করেছে বেশি। এভাবে এখানে পরমুখাপেক্ষী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাবলম্বী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেয়ে বহুগুণে বেশি। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব হয়েছিল বেশি করেই এবং তার দরুন শিক্ষিত স্বাধীন পেশাধারী উকিল ও ডাক্তাররাই আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের পাল্টা শক্তিব্যূহ হিসেবে বেশি কার্যকর হয়েছে। কালক্রমে এ শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম ঘোষণা করে ও পরিণামে এদেশের স্বাধীনতাও অর্জন করে। হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের এ ক্রমবিকাশের ধারাটি তথ্যনির্ভর হিসেবে বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব শুরু হয় ১৮৭০ সালের পর—হিন্দুর চেয়ে এক শ বছরেরও অনেক পর। আরও লক্ষণীয় যে, মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই আপন সমাজদেহের মধ্য থেকে এবং নিচে থেকেও। কিন্তু মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের অগ্রগতি হয় অভাবনীয় রূপে এবং মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই তারা শুধু নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগই সৃষ্টি করেনি, এটিকে উপমহাদেশীয় মুসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই পরিণত করে এবং নতুন জাতীয়তা জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদের নেতৃত্বে ও আপ্রাণ সাধনায় মুসলিম লীগ নেহরুর দাবি (ভারতে দুটি মাত্র পক্ষ) অযৌক্তিক হিসেবে নস্যাৎ করে নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করে : তৃতীয় পক্ষ মুসলিম লীগ ব্যতীত

www.pathagar.com

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমাধান অসম্ভব। বস্তুত পাকিস্তান পরিকল্পনার সৃষ্টি এবং পাকিস্তান লাভের নেশায় সমগ্র মুসলিম জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা ও সর্বশেষে দুটি প্রধান বিপক্ষ হিন্দু ও ইংরেজকে পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা—সমস্তই মুসলমান মধ্যবিত্ত সন্তানের অক্লান্ত সাধনার ফল। মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের এ ভূমিকাটি সমসাময়িক ঘটনা পরম্পরায় তথ্যনির্ভরভাবেই আলোচিত হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থের প্রথমেই আলোচিত হয়েছে এ উপমহাদেশে মুসলমানের আগমন ও সংখ্যাবৃদ্ধির বহু বিতর্কিত কারণ সম্পর্কে ও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে। কালক্রমে এ উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান শতকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বেশি চিহ্নিত করে তুলেছিল, সে বিষয়েও যথেষ্ট আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইংরেজ কেবলমাত্র বশংবদ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই জন্ম দেয়নি, এ শ্রেণীকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় আশ্রিত ও ইংরেজি ভাষাভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিও দান করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় একটি বিজিত জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর এতখানি প্রভাব বিস্তার আর কখনো হয়নি। এভাবে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা আশ্রিত যে নতুন সাহিত্য সংস্কৃতির বোধন বাংলাদেশে হয়েছিল খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগ্রহে ও কল্যাণে, সে বাংলা ভাষা ছিল একান্তই সংস্কৃতিভিত্তিক—মধ্যযুগের হিন্দু অনূদিত রামায়ণ মহাভারত বা হিন্দু রচিত বিজয়কাব্য বা মঙ্গলকাব্যসমূহের কিংবা বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে তার কোনোই মিল ছিল না। আর মুসলমানের অমিশ্র বা মিশ্রধারায় রচিত সামঞ্জস্য ছিল না। ইংরেজ সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিক্রমাকালে আমরা এটিকে 'বাবু কালচার' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আর আমরা এটিকে বাবু কালচার বলেছি এ হেতুতে যে, এ কালচার ছিল একান্তভাবে শহরকেন্দ্রিক—আরও সঠিক হবে বলা কলকাতাকেন্দ্রিক। কারণ নব্যশিক্ষিত বাবু শ্রেণী ব্যতীত এ কালচারের অন্যত্র গতি ও বিস্তৃতি ছিল না। উনিশ শতকে নবজাগরণ মুসলমান সমাজকে বাদ দিতে হয়েছিল আর হিন্দু সমাজের অতি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকায় হিন্দু সাধারণ সমাজও তার সমর্থক ছিল না। তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বাংলায় গদ্যসাহিত্যের অচিন্তনীয় সমৃদ্ধি হয়েছে উনিশ শতকেই—উপন্যাসে, ছোটগল্পে, ইতিহাসে, প্রবন্ধ রচনায়, নাটকে প্রভৃতিতে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের এ গতি-প্রকৃতি ও সমৃদ্ধির কথা ঐতিহাসিক তথ্যমূলে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

বেদনার কথা হলেও এখানে অবশ্যই স্বীকার্য যে, উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গীর্ণ করা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসেও তার তুলনা নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, উনিশ শতকি নব্যভারতীয় কালচার একটি সুপরিকল্পিত নিজস্ব সীমিত বৃত্ত রচনা করল এবং

www.pathagar.com

মুসলিম প্রভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবেই সে বৃত্তের বাইরে নিক্ষেপ করল। তার সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধটা দাঁড়ালো 'একস্টার্নাল প্রলেতারিয়েত'-এর মতো বাইরে অবস্থান; মুসলমান যদি হিন্দুর এ জগতে প্রবেশের স্পর্ধা করত তাহলে তাকে ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে আসতে হতো। কিন্তু তবুও বাংলার মুসলমান হতোদ্যম হয় নি। আপন মাতৃভাষা বলেই নব্যরীতির বাংলা সাহিত্যকে বাংলার মুসলমান বর্জন করতে পারে নি এবং অনাহুতভাবেই নব্যরীতির বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে এসেছে, যদিও অবশ্যই তার ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশনকে সে বর্জন না করে তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যেরই পুষ্টি সাধন করেছে। এদিক দিয়ে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাঙালি মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ্‌র অপূর্ব নিয়ামতস্বরূপ। কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামি মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের আমদানিকরণ নজরুল ইসলামের অবদান অনন্যসাধারণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক গতি-প্রকৃতি আলোচনাকালে এসব বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে।

আমি এ প্রত্যয়ে সুদৃঢ় যে, উপমহাদেশের কোনো কালে 'এক ভারতীয় সংস্কৃতি' বা 'এক বাঙালি সংস্কৃতির' অস্তিত্ব ছিল না। বহির্বিশ্ব হতে বৈদিক হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায় ও পরে পাশ্চাত্য জাতির এ উপমহাদেশে আবির্ভাবের ফলে এদেশের সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে নতুনরূপে বিকশিত হয়েছে। প্রতিটি চক্রে এ সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা কৌতুককর ও শিক্ষাপ্রদ; ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলে এ সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বৈচিত্র্যের ধারাটি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থখানির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, উদ্ধৃতির প্রাচুর্য। এর উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : গ্রন্থমধ্যে আলোচ্য প্রসঙ্গগুলোকে যথাসম্ভব তথ্যনির্ভর করা এবং আমার প্রকাশিত মতামতসমূহের পোষকতায় প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নজির উপস্থিত করা। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থমধ্যে এরূপ বহু বিষয় ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা করা হয়েছে, যাদের কেন্দ্র করে সাধারণ মনে বহু মিথের সৃষ্টি হয়েছে, অথবা অন্ধ আবেগসঞ্জাত অযৌক্তিক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অপ্রীতিকরভাবে রূঢ় হলেও সেসব বিষয়ের গুরুত্ব বা ব্যক্তিত্বের বিরাটত্বে কিছুমাত্র অভিভূত না হয়ে গ্রন্থমধ্যে সত্যের পরিচ্ছন্ন আলোকে বিষয়টির বা ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে কোনো শঙ্কা বোধ করি নি। গ্রন্থমধ্যে যেসব মতামত ব্যক্ত হয়েছে সেসবই অভ্রান্ত, এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি আমার কখনো নেই। তবে আমি এ বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান যে, প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা আছে, এবং এটিও সুনীতি ও সুরুচিগ্রাহ্য যে, পাঠক, সাহিত্যিক ও সুধীমহল সেসব মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

এ গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমার পুত্রকন্যারা এবং সাহিত্যিক ও অধ্যাপক বন্ধুরা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমার অক্লান্তভাবে সাহায্য করেছেন; অনেকেই বহু প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশ করে আমায় উপকৃত করেছেন, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

www.pathagar.com

তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্যগুলো যথাযোগ্য বিবেচনার দ্বারা গৃহীত হয়েছে। বাংলা একাডেমী ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালকদ্বয় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিক বহু গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে ও গ্রন্থগুলো বহুকাল ধরে আমার ব্যবহারের জন্য সুযোগ দিয়ে বিশেষ উপকার করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

তথ্যপঞ্জিতে কেবলমাত্র সেসব পুস্তক-পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব আমার নিজের পড়বার ও পরীক্ষা করবার সৌভাগ্য হয়েছে।

ঝিলিমিলি
২২০ ধানমন্ডি, ঢাকা।

আবদুল মওদুদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রাক-ব্রিটিশ আমল ১৫—৫২

ভারতীয় উপমহাদেশের মানবগোষ্ঠী ১৭
হিন্দু ও মুসলমান ১৯
ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান ২০
মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণ ২১
ইসলাম বিস্তারের কারণসমূহ ২৫
হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি সংঘাত ২৮
আর্থিক অবস্থা ৩৩
বণিক শ্রেণী ৩৮
কারিগর শ্রেণী ৪০
ভূম্যাধিকারী উচ্চ শ্রেণী ৪৪

কোম্পানি আমল ৫৩—১১২

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা ৫৫
কোম্পানি আমলে শোষণের খতিয়ান ৫৯
ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৬২
শিল্পানুসারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৭১
ভারতীয় উপমহাদেশে বিলাতী মূলধন ৭৫
ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৭৮
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী : পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ৮৪
শিক্ষিত মধ্যাবিত্ত শ্রেণী : বুদ্ধিজীবিদের পেশাসমূহ ৯৩
ধর্ম ও সমাজ জীবনে সরকারি নীতি : ব্রাহ্মমত ও নববিধান ৯৯
মুসলমান জাতি : তথাকথিত ওহাবি আন্দোল ১০৪

www.pathagar.com

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক আমল ১১৩—২৩৮

আর্থিক উন্নয়ন ১১৫
ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ১২১
শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি ১২৫
পেশাধারী শ্রেণীসমূহ ১৩০
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত ১৪০
মুসলিম সমাজ : বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত ১৭৪
মুসলমান সমাজ : বঙ্গভঙ্গ থেকে পাকিস্তান ১৯০
হিন্দুজাতীয়তা জ্ঞানের স্বরূপ ২০৬
মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ জনমত ২১৭

সাংস্কৃতিক রূপান্তর ২৩৯—৩৫৮

ইংরেজের আচার-ব্যবহার : ইন্ডিয়ান নেবব্‌স ২৪১
বাবু শ্রেণীর উদ্ভব ২৪৩
হিন্দুর ধর্ম সংস্কৃতি ২৪৬
হিন্দুর শিক্ষা বিস্তার : স্ত্রীশিক্ষা ২৫২
মুসলিম ধর্মসংস্কার ২৫৪
মুসলমান শিক্ষা বিস্তার ২৬২
বাবু কালচার : বাংলা গদ্যের জন্ম : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ২৬৭
পুঁথিসাহিত্য ২৭৭
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাধনা : সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ২৮৫
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাধনা : নজরুল ২৯৬
বাবু কালচারের গতি-প্রকৃতি : সংস্কৃতির সংকট ৩১৩
মনন সংকট ৩২০
হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : সাংস্কৃতিক বিভেদ ৩২৬
সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বৈচিত্র্য ৩৩৮

তথ্যপঞ্জি ৩৫৯

Bilbiography ৩৬২

নির্ঘণ্ট ৩৬৭

www.pathagar.com

প্রাক-ব্রিটিশ আমল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতীয় উপমহাদেশের মানবগোষ্ঠী

কত বিচিত্র মানুষের ধারা এসে মিশেছে ভারতীয় উপমহাদেশের জীবনস্রোতে। কত বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর চরণচিহ্নিত, বিভিন্ন ভাষার কলরবমুখরিত আর বহু ধর্মের উদাত্ত রবে প্রতিধ্বনিত এই বিশাল ভূখণ্ড।

সৃষ্টির আদিযুগে এদেশ অধ্যুষিত ছিল আদিবাসীদের দ্বারা—যারা পরবর্তী কালে 'অনার্য' নামে চিহ্নিত এবং বর্তমানকালে কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতাল নামে সমতলক্ষেত্রে এবং মোঙ্গলীয় বর্ণ ও আকৃতির গুর্খা ভুটিয়া-খাসিয়া নামে হিমালয়ের ও আসামের পার্বত্য সানুদেশে আজও নিজেদের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এরা 'নিওলিথিক' মানবগোষ্ঠীর বংশধর হিসেবে সুপরিচিত; শত সহস্র শতাব্দীর পরেও সভ্যতার কৃত্রিমতা ও ঔজ্জ্বল্য যাদের জীবনধারায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনয়ন করতে সক্ষম হয় নি।

তারপর অভ্যুদয় হয়েছে 'দ্রাবিড়' মানবগোষ্ঠীর, যারা এখন এ উপমহাদেশের দক্ষিণ উপদ্বীপের অধিবাসী তামিল, তেলেগু, কানারিজ, মালয়ালাম ভাষাভাষী হিসেবে সুপরিচিত।

তারপর পনেরো থেকে পাঁচ খ্রিষ্টপূর্ব শতকে এদেশে হানা দিল এবং আধিপত্য বিস্তার করল আর্য বা ভারতীয়-আর্য মানবগোষ্ঠী। তারা ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির নবরূপায়ণ করল, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে এদেশের ওপর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করল বহু শতাব্দী ধরে। বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় এদেরই বংশধর ও ঐতিহ্যধারী।

৩২৬ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার গিরিপথ বেয়ে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করলেন; এবং তারপর ৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত একটা 'ব্যাকট্রিয়ান' রাজ্যের অভ্যুত্থানও হয়েছিল এ অঞ্চলসমূহে। এখানকার বিদেশিরা সংক্ষেপে শক নামে চিহ্নিত হতো। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে ইয়েহ-চি মানবগোষ্ঠী—যাদের প্রধান গোত্র ছিল কুশান—উত্তর ভারতের সমতলক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ইরানি আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি। শক ও ইয়েহ-চিদের অভ্যুত্থানের ফলে ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীতে বহুল পরিমাণে রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটে যায়।

www.pathagar.com

খ্রিষ্টীয় পাঁচ ও ছয় শতকে মধ্য এশিয়ার অনুর্বর প্রান্তর অধ্যুষিত একটি হিংস্র স্বভাবের মানবগোষ্ঠী ভারতের উত্তরাংশে আধিপত্য স্থাপন করে স্থায়ীভাবে। তারা ভারতীয় হুনদল নামে চিহ্নিত। জাঠ গুজর প্রভৃতি রাজপুত গোত্র এসব হুনদলের উত্তরপুরুষ।

কবির কথায় শক, হুন, কুশান প্রভৃতি মানবগোষ্ঠী আর্য তথা হিন্দু সমাজদেহে লীন হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের পৃথক অস্তিত্ব কিছুমাত্র নেই।

খ্রিষ্টীয় আট শতকের প্রথমেই আরব ও দশ শতকের শেষের দিকে তুর্কি ইরানি ও আফগানি প্রভৃতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানবগোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পথে আগমন করতে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে তারা সমগ্র উপমহাদেশটিতে ছড়িয়ে পড়ে সিলেট থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত। তারা শুধু স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই নিশ্চেষ্ট থাকে নি, এ উপমহাদেশের মহাশক্তিধর শাসক হিসেবে একছত্র শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছে প্রায় সাত শতাব্দী ধরে এবং একটা গৌরবমণ্ডিত মানবগোষ্ঠী হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে বিস্মরণীয় স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' রূপে বন্দিত হয়েছে এই বৃহৎ মানবগোষ্ঠী।

সবার শেষে এসেছে পনেরো শতকের শেষ পাদে ইউরোপীয় পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ, দিনেমার মানবগোষ্ঠী। তারা এসেছিল স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বাণিজ্য ব্যাপদেশে। কিন্তু কালের বিবর্তনে আঠারো শতকের মধ্যভাগে এসব বণিকজাতির মধ্যে ইংরেজরা বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করে ফেলেছিল পলাশীর প্রান্তরে সতেরো শ সাতান্ন খ্রিষ্টাব্দে এবং সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকা নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশকে উপনিবেশের মতো শাসন ও শোষণ করেছে উনিশ শ সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত। তারপর এ দেশটা পরিত্যাগ করে চলে গেছে চিরদিনের জন্য। এদেশের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে কখনো এসব ইউরোপীয় জাতির একাত্মবোধ জন্মে নি, এজন্য বিদেশি প্রচণ্ড শাসকের আঁচড়-কামড় ব্যতীত আর কোনো চিহ্ন নেই তাদের।

ফরাসি, ইহুদি, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি বিদেশি সম্প্রদায় বা ধর্মানুসারীদের ছিটেফোঁটা যদিও দেখা যায় এ উপমহাদেশের এখানে-সেখানে, তবুও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ নেই এবং কোনো তরঙ্গাভিঘাত দেখা যায় নি তাদের অস্তিত্বে বা উপস্থিতিতে।

কালের প্রবাহে প্রবাহে এ বৃহৎ মানবগোষ্ঠী উপমহাদেশটিকে কলরবে মুখরিত করেছে শতাধিকের উপর ভাষায়। তাদের মধ্যে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি অধুনা কথ্য বা রাজভাষার মর্যাদা হারিয়েছে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বা ধর্মের অঙ্গ হিসেবেই বর্তমানে চর্চিত হয়ে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশের জীবন্ত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উর্দু, হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নানা জাতির ও বহু ধর্মের সমাবেশে ও ঘাত-প্রতিঘাতে এসব ভাষাও হয়েছে সম্পৃক্ত এবং সংশোধিত, মার্জিত। এসব ভাষাশ্রিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিও হয়েছে আবর্তিত-বিবর্তিত, সুস্পষ্ট ছাপে চিহ্নিত ও সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

হিন্দু ও মুসলমান

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্র থেকে দুটি লক্ষণ পরিচ্ছন্ন। এক. এসব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আর্য বা.বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলমান সম্প্রদায় বহিরাগত হয়েও এদেশে স্থায়ী বসবাস করে দেশটিকে আপন করে ফেলেছে এবং এদেশের মাটির সঙ্গে তিলে-তণ্ডুলে মিশে গেছে। "রণ ধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত" এ দুটি মানবগোষ্ঠী স্থানীয় বাসিন্দাদের পরাজিত করে তাদের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করলেও আদি উৎসমূল থেকে একেবারে উৎসাদিত হয়েই এদেশে বাসা বেঁধেছে মাতৃভূমি করে নিয়ে। তাদের অন্য কোনোখানে 'হোম' ছিল না, বা ফিরে যাওয়ার স্বপ্নও ছিল না।

দুই. আর্যরা প্রাচীন যুগে, মুসলমানরা মধ্যযুগে ও ইংরেজরা বর্তমান যুগে আধিপত্য বিস্তার ও শাসনদণ্ড চালনা করলেও প্রথম দুটি সম্প্রদায়ই এদেশের বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত; অন্য সব মানবগোষ্ঠী হয় হিন্দুদেহে লীন হয়ে গেছে, না হয় আপন গৃহবাসে ফিরে গেছে। কালবিবর্তনে বৌদ্ধ, জৈন এমনকি বর্তমান যুগের প্রগতিবাদী বুদ্ধির মুক্তিমন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ও হিন্দুদেহ থেকে উদ্ভূত ও ছিটকে পড়লেও কালপ্রবাহে পুনরায় হিন্দুদেহে লীন হয়ে গেছে আর তাদের পৃথক সত্ত্বা নেই। অতএব একথাটা তর্কাতীত যে, এ-উপমহাদেশের সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু ও মুসলমান এবং বিদেশি ইংরেজরা এদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময় বহুলাংশে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের সমন্বয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাকি অংশে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে গেছে। আর এ বিভাগ ও দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে চূড়ান্তভাবে—শান্তি ও শৃঙ্খলার, কল্যাণের ও মঙ্গলের শুভবুদ্ধির ভিত্তিমূলে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম মুঘল বাদশাহির অবসানপর্বে এ দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় হয়তো নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম-সংঘাতের পরিণতিতেও এ বিভাগ ও এ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের কল্যাণপথ খুঁজে পেত, একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছতে সক্ষম হতো। কিন্তু তখন তা সম্ভব হয় নি, বিদেশি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়তে থাকে, তখন মুঘল উত্তরাধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় অবস্থা এমন হয়ে যায়, যেন হিন্দু মারাঠাশক্তি এই লুটের মালে সিংহের ভাগই অধিকার করবে এবং 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহি' প্রতিষ্ঠা করবে; ভারতীয় কবির স্বপ্নাদর্শে 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত' বেঁধে ফেলবে। কিন্তু এদেশে মুসলিমরাজ থেকে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রয়াসটা ব্যর্থ হয়ে যায়, ১৯৬১ সালে আহমদ শাহ আবদালী ও ভারতীয় উপমহাদেশের সম্মিলিত মুসলমান শক্তিসমূহের নিকট মারাঠাশক্তির শোচনীয়

www.pathagar.com

পরাজয়ে। আর দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো আপস-মীমাংসামূলে তখন প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অধিকার ও প্রতিষ্ঠা স্থাপনের সম্ভাবনাও দেখা দেয় নি তৃতীয় পক্ষ শক্তিশালী ইংরেজদের হস্তক্ষেপে ও অশুভ অভ্যুদয়ে। মাঝখানে প্রায় দু শ বছরের পরাধীনতার লাঞ্ছনা ছিল তাদের ভাগ্যলিপি। দুঃস্বপ্নের মতো এ-অমানিশার বিস্তার ছিল এক শ নব্বই বছর। এ যুগে যারা ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করত, কালপ্রবাহে তাদেরও মোহমুক্তি ঘটে গেল। পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে আগত যে ভাবধারার অবগাহনে তাদের চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল, কালক্রমে সে সবকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ঘটাল শৃঙ্খলমুক্তি। ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় বিটিশ শৃঙ্খল ভেঙে ফেলল পাশ্চাত্য শিক্ষার হাতুড়ির ব্যবহার করেই। এখন ইংরেজ শাসন ও 'রুল ব্রিট্যানিয়া' হুংকার স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে-সাম্রাজ্যলীলাও দৃশ্যপটে বিরাজ করছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান

ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব কোনো আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর অবস্থিত এবং এই সংকীর্ণ জলভাগ অতিক্রম করলে পশ্চিম পার্শ্বে আরব-উপদ্বীপের সাক্ষাৎ মেলে। পুরাকালে এই জলভাগের বিস্তার খুব বেশি ছিল না এবং এই জলপথ বেয়ে আরব ও ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। হযরত মুহম্মদের একটি উক্তিতে ভারতের উল্লেখ আছে ও জনৈক হিন্দের কথাও আছে। তাঁর ওফাতের পর স্বল্পকালের মধ্যেই ইরান থেকে স্পেন পর্যন্ত ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে ও বিদ্যুৎগতিতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সওদাগরদের মারফত ইসলামের নাম ভারতীয় উপমহাদেশেও শ্রুত হয় স্বল্পকালের মধ্যেই। এমনকি এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, দ্বিতীয় পুলকেশিনের শাসনকালে বোম্বাইয়ের নিকট থানায় একদল আরব সৈন্য হানা দিয়েছিল (৬৩৭ খ্রিঃ) হযরত উমরের খেলাফত আমলে। ঐতিহাসিক বালাজুরির কথা সত্য হলে ধরতে হয়, উমরের আমলে সিন্ধু ও ভারতের দ্বারদেশ পর্যন্ত ইলাম বিস্তৃত হয়েছিল। হাল্লাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন-কাসিম দাহিরকে রাওরের নিকট পরাজিত ও নিহত করে মুলতান পর্যন্ত অধিকার করেন (৭১২ খ্রিঃ)। ভারতীয় শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে মুসলিম অভিযান বিস্তৃত হয়েছিল সিন্ধু, কচ্ছ, সুরাষ্ট্র বা কাথিয়ার, চম্পা, মালব, ব্রোচ এলাকায়। আরব অভিযান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, এটা ভারতের ও ইসলামের এক চমকপ্রদ ঘটনা, তবে এ বিজয়ে রাজনৈতিক ফলাফল বেশি হয় নি। কিন্তু এর ফলে ভারতের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে যায় এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভারতীয় দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা, লোককাহিনী আরবের মারফত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মাসুদি

www.pathagar.com

ও ইবন হাওকলের মতে, আরবরা ভারতে বাস করে এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। আবু মা'শার নামক জনৈক আরব বেনারসে দশ বছর বাস করে সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিষ বিদ্যালাভ করেছিলেন।

তারপর চলে গজনবি অভিযান ও অধিকার সারা উত্তর ভারতের বুকে। তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে শুধু বড় বড় ফাটলই ধরে নি এসব অভিযানের ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাও সহজেই প্রকট হয়ে পড়ে। তার দরুন গাঙ্গেয় উপত্যকার রাজ্যগুলো মুসলমানদের পদানত হয়ে পড়ার পথও পরিষ্কার হয়ে যায়।

অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমরাজ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরও পৌনে দু শ বছর পরে দ্বাদশ শতকের শেষপাদে। সুলতান মুহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে রায় পৃথ্বীরাজের লাখ লাখ সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাঁকে ও তাঁর ভ্রাতাকে নিহত করেন (১১৯২ খ্রিঃ)। এটা উপমহাদেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকালীন ঘটনা। অতঃপর বাহাদুর শাহের নির্বাসন দণ্ড পর্যন্ত (১৮৫৭ খ্রিঃ) ছয় শ পঁয়ষট্টি বছর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন মুসলমান সুলতান-বাদশাহরা—সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সার্বভৌম শাসনশক্তি ও তার যাদুকরী প্রভাব স্বীকৃত ও কীর্তিত হয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

তার ঠিক দশ বছর পরেই আর একটি ক্রান্তিকালীন ঘটনা ঘটে গেল বাংলার বুকে। বখতিয়ার খিলজি মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহীর এক অতি ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতৃত্বে বিচিত্র কৌশলে নদীয়ার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশ জয় করেন এবং লখনৌতি বা গৌড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর পাঁচ শ পঞ্চান্ন বছর যুক্তবাংলায় মুসলিম শাসন অবিচ্ছিন্নভাবেই স্থায়ী ছিল পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলার শাসন ছিনিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত। ভারতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা মুসলিম শাসন আমল রাহুগ্রস্ত হয়েছিল পলাশীর প্রান্তরেই; বাকি এক শ বছর ধরে সারা উপমহাদেশে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃতির পালা চলেছিল।

এই দীর্ঘ অর্ধ-সহস্র বছরেরও উর্ধ্বকাল যে জাতি এই বিশাল ভূখণ্ডের কোটি কোটি নর-নারীর ভাগ্যবিধায়ক ছিল, সেই মুসলমানদের এদেশে বিস্তৃতি, সমাজ সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির সংগঠন ও উন্নয়ন এবং অপর বৃহৎ সমাজগোষ্ঠী হিন্দু জাতির সঙ্গে আদানপ্রদান ও ঘাত-প্রতিঘাতের ধারা অনুসরণ এখানে শিক্ষাপ্রদ।

মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণ

প্রথমে বিবেচ্য : কীভাবে এদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সম্ভব হয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমার এ আলোচনা প্রধানত বিভাগপূর্ব বাংলা সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা কীভাবে দ্বিতীয় বৃহৎ সম্প্রদায়ে এবং বাংলা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে রূপায়িত হলো, এটি একটি বহু বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা মোটামুটিভাবে একমত যে, মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত তিনটি কারণে—বহিরাগত মুসলমানদের আগমন ও এদেশে স্থায়ীভাবে বাস; ধর্মান্তরকরণ ও জন্মহারবৃদ্ধি। ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে কিছুটা মুসলমান শাসকদের প্রভাবে, প্রলোভনে ও সরকারে প্রতিপত্তি তথা মর্যাদালাভের আকর্ষণে; কিন্তু প্রধানত মুসলিম সুফি দরবেশ ও ধর্মনেতাদের প্রচার কার্যে। মুসলিম সুলতান-বাদশাহদের গোঁড়ামি ও হিন্দুবিদ্বেষ তথা মন্দির-দেউল ধ্বংসের কথা বলেছেন কোনো কোনো অমুসলিম ঐতিহাসিক; কিন্তু কোনো সুলতান ববাদশাহ ব্যাপক হারে কোথাও ধর্মান্তর কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তার কোনো উল্লেখ নেই। এমনকি সোমনাথের মন্দির ধ্বংসকারী সুলতান মাহমুদ কিংবা অতি বড় গোঁড়া হিসেবে চিত্রিত বাদশাহ আওরঙ্গজেবও এ অপবাদমুক্ত। বস্তুত কোরানের মহৎ শিক্ষা 'লা ইকরাহা ফিদদীন'—ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই—প্রত্যেক মুসলমান বিজেতা শাসক নীতিগতভাবেই পালন করেছেন; ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কারণে কোথাও ব্যতিক্রম দেখা গেলেও কখনো ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ ঘটে নি।

বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলমানদের উত্তরণের কারণ নির্ণয়ে দেওয়ান ফযলে রাব্বী ও ডক্টর জেমস ওয়াইজ থেকে আজ পর্যন্ত বহু পণ্ডিত-অপণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও ইতিহাসানভিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব মতামতের প্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক 'ভারততত্ত্ব ভাস্বর' রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তিটি এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য :

> প্রথম যুগে তুর্কী সেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়া বাংলার মুসলমান সমাজ গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।...বোখারা সমরকন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হইতে পলাতকেরা দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরে তাহাদের অনেকে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে ...পরবর্তীকালে দিল্লীতে বিভিন্ন তুর্কী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক তুর্কী সম্ভ্রান্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজকর্মচারীরূপেও বাংলায় আসিতেন। ... এইরূপে কালক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন। ... সুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের ...চেষ্টায়ই বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। ... খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র—শহরে ও গ্রামে—সুফীরা দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ... প্রত্যেক সুফীরই বহু শিষ্য ছিল ... এই শিষ্যেরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নতুন নতুন শিষ্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। ... অমুসলমানকে দীক্ষা দেওয়া মুসলমান শাস্ত্রমতে পুণ্য কার্য

www.pathagar.com

> ...সুফীরা এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। ...তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ...আবার পীর ও দরবেশ সুফীরা অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্যও যুদ্ধ করিতেন ...ধর্ম প্রচার ও শস্ত্র চালনা—এই দুই উপায়ে বাংলায় মুসলমান রাজ্য ও ইসলাম ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা সহায়তা করিতেন।[১]

এসব সুচিন্তিত মতামত প্রণিধানযোগ্য। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলমান বিজেতার বেশে কখন ও কার দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশ কিংবা বাংলাদেশ প্রথম কম্পিত ও নির্জিত হয়েছিল, সেসব মোটামুটিভাবে নির্ণীত হয়ে গেছে। কিন্তু কবে, কোনখানে, কোন শুভ অরুণোদয়ে ও কার উদাত্তকণ্ঠে এই কাঁসরঘন্টা নিনাদিত বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে কিংবা বাংলার বুকে ইসলামের তৌহিদ বাণী প্রথম ঝংকৃত হয়েছিল, সেসব প্রশ্নের আজও সদুত্তর মেলে নি। কিন্তু একথায় সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরা এসেছে বিজেতার বেশে শস্ত্রপাণি হয়েই নয়, শাস্ত্রবাণী মুখে নিয়ে এবং পণ্যবাহী সওদাগর হয়েও। কিন্তু কোন বেশে ও কোন ভূমিকায় মুসলমানের প্রথম প্রবেশ, তাও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

বাংলায় মুসলমান এসেছে তুর্কি ও আরবি ঘোড়সওয়ার হয়ে বিজেতার বেশে উত্তর-পশ্চিম থেকে, আর সওদাগর বেশে ভারত সাগর বেয়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী তীরসমূহে। সুফি দরবেশদের আগমন ঘটেছে উভয় দিক থেকেই। অনুমান হয়, সাগর পথেই হয়েছে বাংলায় মুসলমানের প্রথম আবির্ভাব। খ্রিষ্টীয় আট শতকের মাঝামাঝি বাগদাদে আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে ইরানি প্রাধান্য রাজশক্তিকে অক্টোপাসের মতো গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু খাঁটি আরবরা ছিল দুর্ধর্ষ স্বাধীনচেতা ও অভিযান প্রয়াসী। তারা খেলাফতের চারপাশে ইরানি প্রাধান্য সহজে মেনে নিতে অক্ষম হয়ে নতুন দিগন্তের সন্ধানে মেতে উঠল এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের উভয় কূলে, মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাদেরই অনেকে চাটিগাঁওয়ে বাণিজ্যোপলক্ষে আগমন করত এবং অনেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বাস করত। তারা বাণিজ্য করত, ইসলাম প্রচার করত এবং এদেশেই বিবাহাদি করে বংশবিস্তার করত। এর স্বপক্ষে নজির হিসেবে বলা যায়, চাটগাঁবাসীদের কথ্যভাষায় বিকৃত-অবিকৃত বহু আরবি শব্দের উপস্থিতি ও উচ্চারণে আরবি টান।

> পাহাড়পুরে আট শতকের খলিফা হারুন-অল-রশীদের আমলের মুদ্রা মিলেছে। আরব বণিকরা সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বঙ্গ-কামরূপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতেন, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। ড. এনামল হকের মতে, সুলতান চট্টগ্রামের আরব বণিক শাসক।[২]

---

১. বাঙলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : ২৪৫—৪৭ পৃ.।

২. চট্টগ্রামের ইতিকথা—আহমদ শরীফ (ইতিহাস : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা : প্রথমবর্ষ, ২য় সংখ্যা : ১৭৭ পৃ.)

www.pathagar.com

ড. আরনল্ড বলেন, ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই, আর এজন্যেই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বলপ্রয়োগের কারণ ছিল না, শান্তিপ্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করেছি, ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময়ে ও সেসব ক্ষেত্রে, যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল ও যেখানে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হয় নি যেমন দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব বাংলায়। বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা সর্বাপেক্ষা বেশি সফলকাম হয়েছিলেন, ধর্মান্তরিতের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারক্ষেত্রে কোনো সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অন্য ধর্মের মোকাবিলায় পড়ে নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে; কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমান ধর্মপ্রচারককে দুবাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল জাতিত্বের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায়, এমনকি সাদর আহ্বানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে।

> এখানের ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চবর্ণ হিন্দুর উৎপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানুষিক ব্যবহারে উত্ত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করল ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে; একটা মহৎ ঐশীবাদেরও সন্ধান পেয়েছিল, একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নয়া সমাজব্যবস্থারও সাক্ষাৎ লাভ করেছিল।[৩]

বহু মুসলিম সুফি ও দরবেশ এদেশে এসেছেন এবং গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ পূর্বক স্থায়ী বসতি নির্দিষ্ট করে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং আচরণও করেছেন। তাঁদের পরে এসেছে পাঠান ও তুর্কিরা, আফগানরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বিজেতার বেশে এবং এ দেশকেই আপন করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করেছে। এভাবে যাঁরা এসেছেন শাস্ত্রবাণী মুখে নিয়ে, তাঁরা খানকা ও দরগাহ স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন জনগণের মধ্যে এবং ইসলাম প্রচার ও আচরণ করে সেখানেই দেহরক্ষা করেছেন। যাঁরা এসেছেন বিজেতার বেশে শস্ত্রপাণি হয়ে, তাঁরাও সৈন্যবাহিনীসহ এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন এবং দুর্গাদি নির্মাণ করে নিজের নিরাপত্তা ও ক্ষাত্রশক্তির নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। আর যাঁরা এসেছেন পণ্যবাহী হয়ে সওদাগরের বেশে, তাঁরা এদেশে বিবাহাদি করেছেন, বংশবিস্তার করেছেন এবং বহুক্ষেত্রে এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে দেহরক্ষা করেছেন। তাছাড়া এই পাঁচ-ছয় শতকের মধ্যে সহস্র সহস্র মুসলমান মোঙ্গল ও তাতারদের কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কিংবা ভাগ্যান্বেষী হয়ে বহির্ভারত থেকে এদেশে আশ্রয় নিয়েছে স্বধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে রুজি-রোজগারের তাগিদে। লক্ষণীয় যে, রাজশক্তির

৩. Preaching of Islam; ch. ix;

www.pathagar.com

প্রতীক দুর্গ-দরবারের চেয়ে মানবতার সেবাধর্মী খানকা-দরগাহসমূহেই স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় জমাত বেশি; কারণ শক্তির জোরের চেয়ে হৃদয়ের জোরেই মানুষ সহজে আপন হয়ে যায়। এজন্য স্থানীয় বাসিন্দা জনগণের মধ্যে ইসলামের বিস্তৃতি বহুলাংশেই হয়েছিল সুফি, দরবেশ ও আলেম সমাজের কল্যাণে; রাজশক্তির প্রভাবে যা হয়েছিল তা নগণ্য মাত্র এভাবে বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা কয়েক শতক ধরে অন্তরঙ্গভাবে বাস করার দরুন বাংলার মাটির সঙ্গে এভাবে তিলে-তণ্ডুলে মিলেমিশে গেছে যে, তাদের কত শতাংশ ইরান-তুরান, হিযাজ-সিরিয়া থেকে আগত মুসলমানের বংশধর তার সূত্র সন্ধান করা যেমন হাস্যকর, তেমনি তাদের কত শতাংশ ধর্মান্তরিত তা নির্ণয় করা অসম্ভব ও পণ্ডশ্রম মাত্র। এরা সকলেই বাংলার সন্তান এবং তাদের পরিচয় 'বাঙালি মুসলমান' হিসেবেই।

মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি কারণ, হিন্দুর তুলনায় তাদের জন্মের হার ছিল অত্যন্ত বেশি। একথার প্রমাণ মিলবে উনিশ শতকের দুটি 'সেন্সাস রিপোর্ট' থেকে। তখন তারা ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু ১৯০১ সালের আদমশুমারির পর প্রথম দেখা গেল, মুসলমানরা বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কালীন রাষ্ট্রীয় অবস্থা এমন ছিল, যখন ধর্মান্তরকরণ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাহির থেকেও মুসলমানদের আগমন উৎস রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। অতএব জন্মহারের বৃদ্ধিটা মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির একটি বৃহৎ কারণ, এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইসলাম বিস্তারের কারণসমূহ

ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সংঘাতকালে ইসলাম কোন গুণে প্রাধান্য লাভ করেছিল, কী কী আদর্শের জোরে গণমানুষের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিল; কোন নতুন বাণী শুনিয়ে কোন ধারায় ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে প্রবাহিত করেছিল, এখানে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমে স্বীকার করা ভালো, ভারতে যারা ইলামের বার্তাবহরূপে এসেছিল, তাদের মধ্যে ইসলামের আদি সজীবতা, উদারতা ও নিষ্ঠা ছিল না; ইসলামের আঁদর্শিক শিক্ষার মহিমা আদি উজ্জ্বলতায় ভারতে বিকীর্ণ হয় নি। পাঁচ শ বছরের পর বহু জাতির ও ধর্মের সঙ্গে সংঘাতের দরুন তার নব রূপায়ণ ঘটেছে, বাহিরের আবরণে অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে। কাজী ইমদাদুল হক বলেছেন, ভারতবর্ষে মুসলমানরা যখন আসিয়াছিল, তখন তাহার গৌরব প্রদীপের তৈলটুকু নিঃশেষ হইয়া শেষ বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

www.pathagar.com

> যে জ্ঞানশক্তির প্রভাবে প্রতীচ্য পৃথিবী আলোকিত হইয়াছিল, সে শক্তি ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়ে কখনো ছিল না, ছিল কেবল তাহাদের পূর্বপিতামহগণের অন্তরস্থ জ্যোতির একটি ক্ষীণ রশ্মি মাত্র।[৪]

কিন্তু তবুও মুসলমানদের আচরণে, স্বভাবে ও কর্মধারায় ছিল এমন একটা নতুন ভঙ্গি, অভিনব আন্তরিকতা ও হার্দিক ভাব এবং কণ্ঠে ছিল একটা নতুন প্রাণস্পর্শী সুর, যা সহজেই সমকালীন সাধারণ হিন্দুমনে রেখাপাত করে এবং ইসলামের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের মধ্যে তারা এমন নবজীবনের সন্ধানে পেয়েছিল, যার টানে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে ও মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থায় আশ্রয়লাভ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

প্রধানত উল্লেখ্য, ইসলাম সামাজিক সাম্যের আদর্শ। সামাজিক সমানাধিকারের এই মহৎ আদর্শ এবং শ্রেণী, বংশ ও রক্তগত কৌলিন্যের অস্বীকৃতি ও অনুপস্থিতিই জাতিভেদ ও বর্ণসংস্কার জর্জরিত ভারতের ওপর ইসলামের বিজয়াভিযানের বিশিষ্ট কারণ। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য জাতিগুলো উচ্চবর্ণসমূহের নিকট মনুষ্য পদবাচ্য ছিল না। কিন্তু 'কুল্লো মুসলিমিন এখওয়াতুন'—মুসলিম মাত্রই ভাই ভাই, অতএব ইসলামি সমাজে সকলেরই সমানাধিকার—এ শিক্ষাই বিভিন্ন উৎপীড়িত মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণরূপে কাজ করেছে। যারা শূদ্র ও অস্পৃশ্য হিসেবে সমাজের বাইরে অবস্থান করত, এক কলেমা উচ্চারণের ফলে তারা একই সমতলে উন্নীত হয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে মুক্ত মানুষের বড় অধিকার ও মানবতার মহান স্বীকৃতি আর হতে পারে না। এইটাই ছিল হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির ওপর সর্বাপেক্ষা প্রগতিবাদী বিপ্লবী আদর্শ, আর সেজন্য ইসলামের বিজয় ও বিস্তার হয়েছে অপ্রতিহত। বর্ণপ্রথায় জর্জরিত ও বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই সামাজিক চিন্তাধারায় উদারতা ও সমানাধিকারের আদর্শ ছিল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, মানবতার স্বীকৃতিই ছিল মহান শিক্ষা। এ সম্পর্কে হ্যাভেল বলেছেন,

> মুহম্মদের সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে সমান আত্মিক মর্যাদা দান করেছে, ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজনীতি মিলনভূমি করেছে, আর এই মৌল অধিকারের উপর ন্যস্ত করেছে সমাজ শাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসেবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধ দর্শন এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার গোঁড়ামি যখন সমগ্র উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, সেই সংকটকালে ইসলাম তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে।[৫]

বস্তুত সাধারণ মানুষের মানবতার স্বীকৃতিই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বহুল বিস্তার ও বিজয় লাভের মুখ্য কারণ।

---

৪. কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী—১ম খণ্ড : ধর্ম ও শিক্ষা—৪১৩ পৃ.।

৫. Aryan Rule in India—Havell,

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, ইসলাম তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের ধর্মীয় আদর্শ। প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি ও হৃদয়ানুভূতির মধ্যে যে ঐক্য বিরাজমান, সে চেতনা থেকে সৃষ্টিকর্তার একক ও অভিন্ন আদর্শ বিকশিত হওয়া এবং মানুষের সংস্পর্শজাত ব্যবহারিক বিষয়-চেতনা থেকে এই জ্ঞানের জন্মলাভ করা— একেশ্বরবাদের আদর্শকে বিবেকবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার এর চেয়ে প্রবল যুক্তি হতে পারে না। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগশূন্য হওয়ায় ভারতের এ আদর্শিক শিক্ষা ছিল না। তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব ছিল ভারতে, আর তার দরুন আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় শোচনীয় বিশৃঙ্খলা ও সংশয়া বিরাজ করত। কিন্তু ইসলামের দ্ব্যর্থহীন একেশ্বরবাদ ভারতের চিন্তাজগতে প্রবল তরঙ্গাভিঘাত তুলেছে, যুক্তিবাদের প্রশস্ত পথে ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার ফলে বহু ভগবানের আদর্শ ও পৌত্তলিকতার অটুট বিশ্বাস চরম আঘাত পেয়েছে, অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে ধর্মচিন্তা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পথও প্রশস্ত হয়েছে। এই সঙ্গেও হয়েছে পৌরহিত্য প্রথার ওপর কঠিন আঘাত। কারণ ইসলামে পৌরহিত্য প্রথা বলে কিছু নেই।

তৃতীয়ত, অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ। এ আদর্শ শুধু 'Plain living and high thinking' নামক অলস ও অপৌরুষেয় অন্তঃসারশূন্য জীবনাদর্শ নয়। বাস্তবভাবে অনাড়ম্বর ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন। আরবদের জাতীয় জীবন থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতা নির্মূল হয়েছিল প্রথম খলিফাদের আমলে এবং যদিও জীবনচারণের এই অনাড়ম্বর ঔদার্য মুসলিম অভিযানকারীদের মাধ্যমে আসে নি, তবু তা আদর্শিকভাবেই এসেছে মুসলিম সুফি-দরবেশের জীবনের মাধ্যমে। এসব আল্লাহভক্তদের সাধুতা, সারল্য, নিষ্ঠা ও অসূয়াশূন্য নির্লিপ্ত জীবন ভারতের শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে এবং ভ্রাতৃত্বের প্রীতিরসে নতুন সমাজ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আলোক বিকিরণ করেছে।

এসব ছাড়াও বহু মানুষের মেলামেশা ও পারস্পরিক আদানপ্রদান থেকে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ হয়, তার ফলে বহুর সঙ্গে অসংকোচ মিলনের পথও প্রশস্ত হয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, ভারতে ইসলাম বিজয়ের বহুবিধ সুফলের অন্যতম সুফল হলো, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপন এবং ভারতের নৌ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন।

> এর ফলে ভারতের আত্মনির্ভর অহমিকা ও সংকীর্ণতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং দেশবিদেশের বিচিত্র মানুষের সমবায়ে ভারতে নতুন মানবতার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচিত হয়।[৬]

৬. মানবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগ—অরবিন্দ পোদ্দার : ৬৮ পৃ.

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি সংঘাত

ধর্ম ও ভাবজগতে মুসলমানরা বৈপ্লবিক আদর্শ আনয়ন করলেও এ কথাটা এখানে পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত যে, মধ্যযুগেও ছিল ধর্মকলহ, বিরোধ চলেছিল সমাজ-জীবনে; আর প্রায়শই তা রূপ পরিগ্রহ করত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের।

> আমীর-ওমরাহের যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে ধর্মবিরোধের প্রভাব তুলনায় নগণ্য বা অল্প না, ছিল অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ।[৭]

ভারতে সনাতন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির যে সংঘাত দেখা দেয় সে সংগ্রামে ইসলাম জয়ী হয়েছে, কারণ তৎকালীন ভারতে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের তুলনায় ইসলামের আদর্শ ছিল প্রাগ্রসর। তবু ইসলামের বিজয় সুগম ও সহজ হয় নি, পদে পদে বাধা পেয়েছে এবং এর দরুন দুটি সমাজ পৃথকভাবেই স্ব স্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। চৈতন্যদেবের আমলে এবং পরবর্তীকালেও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংঘাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলেছিল। এ সংঘাতের বাস্তব চিত্র পাই চৈতন্য পূর্ববর্তী বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতায়'; আর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে।' মুসলমান অভিযান হিন্দু সমাজের ওপর প্রবল আক্রমণের সূত্রপাত করেছে, এ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু সমাজপতিরা নানা প্রকার মেলবন্ধনীর দ্বারা যেমন সমাজে স্থিতিস্থাপকতা আনয়নের চেষ্টা করেছে, সেই রকম মুসলমান সংস্পর্শ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকার বিধান দিয়ে বিভেদের প্রাচীর আরও সবল ও কঠিন করে তুলেছে। তারা মানসজগতের আভিজাত্য, সংস্কৃতের আভিজাত্য এবং সংস্কার-সংস্কৃতির আভিজাত্য সংরক্ষণের অন্ধ মোহে সুস্থ নীতিবোধ ও কল্যাণ বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্বের অচলায়তন আরও দুর্ভেদ্য করেছে এবং মুসলমানকে এ অচলায়তনের জাতশত্রু ভেবে কোনো সমঝোতা বা মিলনের কথা চিন্তাও করে নি।

> আল-বিরুনী সমকালীন হিন্দুদের বিকৃত বুদ্ধি, অহংকার, জাত্যাভিমান, ভিনদেশাগত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা দেখে যে বেদনা অনুভব করেছিলেন,[৮] সে বেদনা প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মুসলমানের অন্তর্বেদনা।

এবং আজও তার উপশম হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি।

বস্তুত একটি বহু বিতর্কিত প্রশ্নই হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। বর্তমানে একটা বহুল প্রচারিত মত হচ্ছে : এ বিরোধ তৃতীয় পক্ষের (অর্থাৎ ইংরেজদের) রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি; আসলে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এক-ভারতীয় তথা এক-বাঙালি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে—যা হিন্দুসংস্কৃতি নয়, মুসলমান-সংস্কৃতি নয়। এ মতটি শ্রুতিমধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু কঠোর সত্য যে, ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে এমন কোনো মায়াবাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

---

৭ ঐ : পৃ. ৬২।
৮. আল-বিরুনী : ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, ২৩-২৪ পৃ.

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। স্যার জন মার্শাল বলেন,

> মানবে ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নি যে, দুটি বিপরীতধর্মী সংস্কৃতি এরূপ বিরাট পার্থক্য ও বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও পাশাপাশি অবস্থান করেছে, অথচ একটি অপরটিকে গ্রাস করতে পারে নি। এ দুটি হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলমান-সংস্কৃতি। তাদের মধ্যে বিপরীত মেরুর ব্যবধান, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে—ইতিহাসের এ এক মহৎ শিক্ষা।[৯]

ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেন,

> হিন্দু ধর্ম ইসলামকে পূর্ণভাবে গ্রাস করতে পারে নি; তার বদলে দু'দিকে প্রভাবিত হয়েছে। একদিকে ইসলামের প্রচারধর্মিতায় গোঁড়া হিন্দুদের রক্ষণশীলতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং ইসলামধর্ম বিস্তারের পথ রুদ্ধ করার মানসে জাতিভেদের নিয়মাবলি আরও কঠোর করেছে, স্মৃতিশাস্ত্রে এ উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিধির সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে ইসলামের সাম্য ও উদারনীতিগুলোর আলোকে নিজেদের ধর্মীয় ও সমাজব্যবস্থার সংস্কারসাধন করেছে। এবং কয়েকজন সন্ত-প্রচারকের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে উদার মতবাদের প্রচারণা বেড়েছে। তাঁরা ভক্তি মার্গের মাধ্যমে অশিক্ষিত জনগণকে হিন্দুত্বের নতুন শিক্ষায় দীক্ষিত করেছেন।[১০]

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন,

> মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্থলবিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎসর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতোই আছে। ...অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে মুসলমানেরা যখন সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল, সহস্র বর্ষের পরেও এক ভাষার পার্থক্য ছাড়া ঠিক সেইরূপই ছিল। ...বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নতুন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতি নহে ইসলামীয় সংস্কৃতি নহে–ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন ...করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নতুন মতের প্রবর্তক ও সমর্থক।...১২০০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম যাহা ছিল, আর ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল, এই দুয়ের তুলনা করিলেই সত্যতা প্রমাণিত হইবে।[১১]

উল্লেখযোগ্য যে, ড. মজুমদার এই মতবাদে সুদৃঢ় হন আরও বহু পূর্বে। ১৯৫৭ সালে লসনে ঐতিহাসিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন,

---

৯. Quoted in "An Advanced History of India"—P. 403.
১০. An Advanced History of India—P. 403.
১১. বাঙলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : পৃ. ২৪২—৪৩ ও ৩৩৪—৫০।

www.pathagar.com

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে একটি অতি আধুনিক আদর্শ। ইহাকে সমর্থনের জন্য ভারতের ইতিহাসকে নূতনরূপে সাজানো হইতেছে। বলা হইতেছে যে, ভারতের ইতিহাসে কোনো হিন্দু বা মুসলমান সংস্কৃতি কোনোকালে ছিল না। একটি মাত্র সংস্কৃতি ছিল—ভারতীয় সংস্কৃতি। বিভিন্ন সম্প্রদায় ইহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি বিকাশে হয়তো এ ধারণা মূল্যবান। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা সত্য নহে। ইতিহাসে বরাবরই হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি দুইটি পৃথক সত্তা-রূপে ছিল। ইসলামিক সংস্কৃতিই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

এ মতবাদে সুদৃঢ় হওয়ার কারণ হিসেবে শ্রী মজুমদার বলেন,

এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত...হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, মুসলমানেরা পায় আরবী ফারসী হইতে। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল।...হিন্দুরা যাহাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাইতে না পারে, তাহার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[১২]

কে. এম. পান্নিকর বলেছেন,

ভারতে একটি ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রবর্তনের প্রধান সামাজিক ফল দাঁড়ালো, সমাজদেহকে খাড়াভাবে দুভাগে বিভক্তকরণ। তেরো শতকের পূর্বে হিন্দুসমাজে যেসব বিভাগ দেখা দিয়েছিল, সেগুলোর প্রকৃতি ছিল কতকটা আনুভূতিক; তখন বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্ম সমাজদেহে তেমন সর্বাঙ্গীণ বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারে নি। হিন্দুত্বের পক্ষে এসব উপধর্মকে আত্মস্থ করে নেওয়া সম্ভব ছিল, এবং কালক্রমে এরা হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যেই যার যার আঞ্চলিক আবাস গড়ে নিয়েছিল। অপরপক্ষে ইসলাম ভারতীয় সমাজকে আপাদমস্তক স্পষ্ট দু ভাগে বিভক্ত করে ফেলে এবং আজকের দিনের ভাষায় আমাদের নিকট যা দুই-জাতিতত্ত্ব বলে পরিচিত হয়েছে, তা সেই প্রথম দিনেই জন্মগ্রহণ করে। এরপর থেকে একই ভিত্তিভূমির উপর দুটি সমান্তরাল সমাজ খাড়াভাবে বিভক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটি সমাজ আলাদা হয়ে গেল, এবং আলাদা-আলাদা রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এ দুয়ের মধ্যে কোনোরকম সামাজিক সংশ্রব বা জীবনের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান থাকল না। অবশ্য হিন্দুত্ব থেকে ইসলাম ধর্মান্তরকরণ অবিরামভাবে চলতে থাকল; কিন্তু সঙ্গে নতুন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তার মনোভাব উদ্দীপনের ফলে হিন্দু সমাজদেহ উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়।[১৩]

প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকদের এরূপ পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠার পর আর কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। বলাবাহুল্য, এরূপ রূঢ় সত্যভাষণ ও কঠোর ঐতিহাসিক সত্যের উদ্‌ঘাটন হিন্দুস্তানের 'জাতীয়তাবাদী' নেতৃবর্গের

১২. বাঙলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : পৃ. ২৪২-৪৩ ও ৩৩৪-৫০।
১৩. Survey of Indian History.

www.pathagar.com

মনঃপূত হয় নি। এজন্য শ্রীমজুমদার দুঃখ করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন, রাজনৈতিক দলের বাহিরে অনেকে তাঁহার সমর্থন করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করেন না।

আমাদের আশঙ্কা হয়, পূর্ব পাকিস্তানেও যাঁরা এখনও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিশ্বাসী এবং উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের নামোচ্চারণে ভক্তি গদগদ হন, তাঁদেরও এ রূঢ় সত্যটি মনঃপূত হবে না। কিন্তু সত্য সত্যই। বহু বহু শতাব্দী হিন্দু-মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বাস করেছে এবং একই আকাশের তলে একই মাটির ফলসে ও পানিতে এবং পানির জীব মৎস্যে উদরপূর্তি করে জীবনধারণ করেছে, কিন্তু কখনো তাদের মধ্যে হাঁড়ির ও নাড়ির সম্পর্ক জন্মায় নি। অথচ জৈবিক নীতি অনুসারে এ দুটির মাধ্যমেই হার্দিক সম্পর্ক সহজেই স্থাপিত হয়; আর এ দুটিই হলো সমাজবিজ্ঞানীর চোখে সামাজিক একত্ব স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

> 'সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না,।[১৪]

মুসলমানদের পূর্বে গ্রিক, শক, পহ্লব, কুশান, হুণ প্রভৃতি বহু বিদেশি জাতি ভারতের বুকে হানা দিয়ে এদেশে বাস করেছে এবং কালপ্রবাহে বিরাট হিন্দু সমাজদেহে লীন হয়ে গেছে। আজ তাদের একটিরও পৃথক সত্তার চিহ্নমাত্র নেই। তার কারণ এই যে, এসব বহিরাগত জাতির না ছিল বলিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস, না ছিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরাট ঐশ্বর্য। কিন্তু মুসলমানরা যখন এদেশে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, তখন সঙ্গে নিয়ে এলো পৃথক একটি বলিষ্ঠ ও প্রাণ-সঞ্জীবনী ধর্মবিশ্বাস এবং একটি জীবন্ত আত্মচেতনালব্ধ পৃথক সংস্কৃতি ও সমাজের ঐতিহ্য। অতএব হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র নিয়েই পাশাপাশি অবস্থান করেছে—দুটির সংঘাতের ফলে একে অপরকে কিছু দান করেছে, কিছু গ্রহণ করেছে; কিন্তু কখনো দুটিতে সঙ্গম ঘটে নি, সমন্বয় হয় নি—বরাবরই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে স্ব স্ব পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে দুটি সমান্তরাল রেখার মতো।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্র বা সঙ্গমস্থলের মায়াকাননে যাঁরা বিশ্বাসী, কিংবা রাজনীতিক বাঁধাবুলিতে যাঁরা তৃপ্তি খোঁজেন, তাঁদের অবগতির জন্য পূর্বপাকিস্তানের সন্তান কিন্তু হিন্দুস্তানের নাগরিক ও কৃতী সাহিত্যিক-পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে; এখানে সাহিত্যিকের মানসিক অনুভূতিও এই রূঢ় সত্যটির সমর্থন করে :

---

১৪. রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ ;) ১৩শ খণ্ড; পৃ. ৩০৮ কালান্তর-সমস্যা, পৃ. ১৯২।

www.pathagar.com

ষড়দর্শননির্মাতা আর্যমনীষীগণের ঐতিহ্য গর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর শত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় শত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিয়প্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী বুআলীসিনা, আল-গাজ্জালী, আবু-রুশদ ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হলো, তার কোনো সন্ধানই পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানাও কম গাফিলতি করলেন না—তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে।...শ্রীচৈতন্য নাকি ইসলামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন...কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাওয়ার।...মুসলমান যে জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য উজাড় করে দিলেন, তার থেকে এদেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দার্শনিকেরা কণামাত্র লাভবান হন নি...হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।[১৫]

ফলত দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম না হলো ইসলামে বিলীন, না পারল ইসলামকে বিলীন করে মুসলমানদের গ্রাস করতে। বরং লৌহবর্মের আবরণ এঁটে মুসলমানদের থেকে পৃথক থাকাতেই নিজেদের নিরাপত্তা সন্ধান করল। ইসলামের সর্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষায় ব্যগ্র হলো। এভাবে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও সাংস্কৃতিক সংঘাত ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে শত শত বছর ধরে পৃথক করে রেখেছে।

অবশ্য ভারতের এখানে-সেখানে ধর্মসমন্বয় ও ঐক্যের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগে যুগে রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস, বল্লভাচার্য প্রমুখ সাধক-প্রচারকদের আবির্ভাবে। কিন্তু তাঁদের শিক্ষায় যে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের বিকাশ দেখা যায়, সেসব প্রত্যক্ষ মুসলিম প্রভাব প্রসূত। *এমনকি শঙ্করাচার্যের আপসহীন অদ্বৈতবাদ নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয়রূপ*[১৬] *এবং চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মও মুসলিম প্রভাবজ বলে একরকম স্বীকৃত*[১৭] । ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, তখন হিন্দু ধর্মাশ্রিত এসব সাধক প্রচারকরা ইসলামের প্রসার রোধ মানসেই এসব শিক্ষাকে মূলধন করে ধর্ম সমন্বয়

---

১৫. বড় বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলি।

১৬. বাঙলার নব জাগৃতি—বিনয় ঘোষ : ১২৩ পৃ.।

১৭. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন (৩য় সং) ঃ ২৪৫ পৃ। এ বিষয়ে বিনয় ঘোষ কৃত বাঙলার নব জাগৃতি; উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত 'ভারতদর্শন সার' ও Tarachand's Influence of Islam on Indian Culture দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ও ঐক্যের আন্দোলনে অগ্রসর হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্য সার্থক হয়েছিল, কারণ সত্য সত্যই ইসলামের গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কোনো নতুন শিক্ষা না থাকায় মুসলমানরা এ আন্দোলনে প্রায় সাড়া দেয় নি; আর হিন্দুয়ানির রেশ থাকতে এরা জাতি অর্থে হিন্দুই রয়ে গেল। এই আন্দোলনগুলো অবশ্য বিশ শতকের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধায় আসে এবং 'জাতীয়তাবাদী' নামাঙ্কিত করে হিন্দু রাজনীতিকেরাই এক ভারতীয় সংস্কৃতির ধূয়া তোলে। তাছাড়া অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দণ্ডধর মুসলিমশক্তিকে বাধা দেওয়ার ও সম্ভব হলে বিতাড়িত করার সক্রিয় প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে উঠে। তখন তাদের রাজনীতিক ভূমিকা ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে এসব সমন্বয় সাধনার বুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

> শিখ বা বৈষ্ণব আন্দোলনে যে এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—তার বহু প্রমাণ আছে। রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে বাদশাহ্ আকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্তও সমন্বয় সাধনার পথ অব্যাহত ছিল। এ পথে গান্ধীর 'রামধুন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে'।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল সর্বগ্রাসলোভী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের অভিনব প্রয়াস—এ পথেই অজগরের মতো ইসলামকে লীন করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে এই ধর্মসমন্বয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের মহামন্ত্র অতীতে উদ্‌গীত হয়েছিল এবং এখনও হয়ে থাকে।

আর্থিক অবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশে অধ্যুষিত এই দুটি বৃহৎ জাতির—হিন্দু ও মুসলমান—মানস গঠন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভাব, পারস্পরিক সম্বন্ধ ও রাষ্ট্রিক যোগাযোগ বিশেষভাবে স্মরণ করে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হতে পারে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এ দেশটা ছিল সম্পদে ও প্রাচুর্যে ভরা, এ কথাটি বহু বিদেশি পর্যটক ও এদেশীয় সমকালীন ঐতিহাসিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বাংলার সম্পদের কথা প্রবাদ বাক্যের মতো মধ্যযুগে কীর্তিত হতো বহির্বিশ্বে এবং বহু জ্ঞানী বিশ্বপথিক ও উৎসাহী বণিক এদেশে এসে এর ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু বিদেশি এদেশে হানা দিয়েছেন লুঠের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আলেকজান্ডার, সুলতান মাহমুদ, চেঙ্গিস, তৈমুর, আহমদ শাহ্ আবদালী ও ইংরেজ জাত এদেশে এসেছেন শুধু লুণ্ঠন করে ধনসম্ভার স্বদেশে নিয়ে যেতে। এদেশের মসলিন, গন্ধদ্রব্য, এদেশের তখত-ই তাউস, এদেশের কোহিনূর বিদেশির লোলুপদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং যুগে যুগে তারা এসব লুণ্ঠন করে নিয়ে

১৮. মুসলিম পদ-সাহিত্য—আহমদ শরীফ (সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৭); ১৪২ পৃ.।

www.pathagar.com

গেছে। এদেশেরই অর্থসম্পদ পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব, অর্থবিপ্লব এবং বিজ্ঞান-কারিগরি বিপ্লব ঘটিয়েছে। এদেশেরই লুণ্ঠিত অর্থসম্পদে পুষ্ট হয়ে ও শক্তিসঞ্চয় করে অনুর্বর গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীরা সারা পৃথিবীতে নৌবলে শ্রেষ্ঠস্থান অর্জন করে এবং উনিশ শতকে পৃথিবীর সর্ব অঞ্চলে হানা দিয়ে এমন আধিপত্য স্থাপন করে যে, 'ইংরেজ রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না' বলে খ্যাতি অর্জন করে।

বস্তুত বিদেশি পরিব্রাজকদের বর্ণনায় এদেশের যে চিত্র পাই তা দেখে যে-কেউ সহজেই ধারণা করবেন, সতেরো শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল *'আর্কেডিয়ান' সুখশান্তির দেশ।*[১৯] 'মাসালিক-উল-আবসারের' বর্ণনায় 'সকল দেশের সার্থবাহ খাঁটি সোনা নিয়ে ভারতে ক্রমাগত আসছে ও বিনিময়ে সুগন্ধি, বস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে যাচ্ছে।' এডওয়ার্ড টেরি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় ভারত ভ্রমণ করে বলেছেন, *'নদীসমূহ যেমন সাগরে ছোটে, তেমনি রৌপ্য সকল দেশ থেকে এ রাজ্যে ছুটে আসে'।*[২০] ফ্রান্সিস বার্নেয়ার আরও তিন দশক পরে এ দেশ ভ্রমণ করে বলেছেন,

> 'সোনা পৃথিবীর সব দেশ ঘুরে হিন্দুস্তানে এসে গ্রাস হয়ে যায়। ভারতের খ্যাতি কেবল চাউল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্যের জন্য নয়, রেশম, তুলা, নীল প্রভৃতি পণ্যের অপর্যাপ্ত সম্ভারের জন্যও বটে।'[২১]

আর বাংলার ধনসম্পদের ও সুখসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন আবুল ফযল একটি শব্দে 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা স্বর্গরাজ্য বলে। বার্থিমা ১৫০৩-০৮ খ্রিষ্টাব্দে সফর করে লিখে গেছেন, 'বাংলা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী; আর তুলা রেশম প্রভৃতির বস্ত্র, আদা, চিনি, খাদ্যশস্য, মাংস সব কিছু দিয়ে সবচেয়ে প্রাচুর্যময়।' তাছাড়া মৌহন, বার্বোসা প্রমুখর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা তো আছেই।

দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য তো ছিল সর্বত্রগামী ও সবরকম পণ্যবাহী। কিন্তু বহির্বিশ্বে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য বিস্তার ছিল সে যুগের যে কোনো দেশের চেয়ে অত্যধিক ও ঈর্ষাময়। জলপথে সুদূর ইউরোপে, মালয় দ্বীপপুঞ্জে, চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত অন্যান্য দেশসমূহে এবং স্থলপথে মধ্যএশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সার্থবাহ পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিকিকিনি করত। বার্নেয়ার বলেন, 'ভারতীয় নৌবহর পণ্য নিয়ে পেরু, তেনাসারি, সায়েম, সিংহল, আচেম, মাকাসার, মালদ্বীপ, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে দেশে সফর করত এবং বিনিময়ে মূল্যবান প্রভূত ধাতুদ্রব্য আমদানি করত।' মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। জাপান থেকে ডাচজাতি যে সোনারূপা আনত, তার মোটা অংশ ভারতে বিনিময় করে পণ্য সংগ্রহ করত। বার্নেয়ার

---

১৯. From Akbar to Aurangzeb—W. H. Mereland, p 145. উল্লেখযোগ্য যে, আর্কেডিয়া ছিল প্রাচীন গ্রিসের একটা 'গানেভরা প্রাণেভরা ও সুখেভরা' ক্লাসিকাল নগরী।

২০. A Voyage to India (1665) pp 118-19.

২১. Travels in Mughal Empire (1891) p 202.

www.pathagar.com

বলেন, বাংলার বিপুল পরিমাণ মসলিন বস্ত্র পারস্য, তুরস্ক, মসকোভি, পোল্যান্ড, আরব, মিসর, ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হতো। তাঁর পূর্বে সিবাস্তিন মানরিক এদেশে ভ্রমণ করে মুঘল সম্রাটের সোনা ও মণিমাণিক্য সম্ভার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন; তিনি আমীর-ওমরাহ ও 'সওদাগরদের'. ধনৈশ্বর্য দেখেও বিস্ময় মেনেছেন। সে আমলের পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ভারতেশ্বর বাদশাহরাই স্বর্ণ- রৌপ্যভারে জন্মদিবসে তৌলিত হতেন।

কিন্তু একটি রূঢ় সত্য এখানে স্বীকার করা উচিত। এত প্রাচুর্যভরা এত ধানে-ভরা, গানে-ভরা স্বপ্নদেশ হিসেবে কীর্তিত হলেও পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় যে দৈন্যের চিত্র মেলে, তা যেমন রোমহর্ষক তেমনি বেদনাদায়ক। সে চিত্র অনুধাবন করলে স্বীকার করতেই হয়, গণজীবন সুখের ছিল না। মধ্যযুগের বাজারে শুধু পণ্যের বিকিকিনি হতো না, মানুষ-পণ্যেরও ব্যবসা চলত। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা বাংলায় এসে একটি পরমাসুন্দরী তরুণী ক্রয় করেছিলেন এক সুবর্ণ দিনারে, আর তাঁর বন্ধু একটি সুশ্রী কিশোরী ক্রয় করেছিলেন দুই দিনারে। বার্বোসা বলেছেন, 'মুসলমান বণিকেরা দেশের ভিতরে গিয়া অনেক বালক-বালিকা ক্রয় করে; পিতামাতা বা শিশু-চোরেরা তাদের বিক্রয় করে। ক্রেতারা তাদের আনিয়া খোজা করিয়া দেয়, কেহ কেহ মারা যায়, যাহারা বাঁচিয়া উঠে তাহাদিগকে ২০।৩০ ডুকাটে পারসিকদের নিকট বিক্রয় করে।' র‍্যালফ ফিচ, বুকানন প্রমুখ পর্যটকরা পল্লী-বাংলার দৈন্যদশার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে বুকানন লক্ষ করেছেন অর্ধ-উলঙ্গ দরিদ্রের সংসার, যেখানে গৃহস্থালি আসবাব কয়েকটি মাটির বাসন, দা-বটি-ঘটি ও কাঁথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আবুল ফয়ল বর্ণিত পণ্যমূল্যের তালিকায় একখানা সুতি কাপড়ের দাম মাত্র আট আনা ও একখানা কম্বল চার আনা দেখি। তবু দরিদ্র চাষিরা নেংটি পরে ও কাঁথা গায়ে দিনযাপন করত। *সোনা দিয়ে ঘরের 'মাথা' মুড়ানো, সোনার পাতে ছানি এবং রুপাতে ঠুনি দেওয়ার গল্প, 'টুয়ের মধ্যে অলঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায়, সাগর বহিয়া যায়' কাহিনী প্রচলিত থাকলেও*[২২] *গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত চিত্র এসব নয়।* এ সোনার বাংলা ভদ্র ও অবস্থাপন্নের, সাধারণ মানুষের নয়। সেকালে টাকায় পাঁচ মণের কম চাউল কোনো কালেই বিক্রয় হয় নি, কখনো কখনো টাকায় সাত মণ বিক্রি হয়েছে, যেমন নওয়াব শায়েস্তা খান (১৬৮৬ খ্রি.) নওয়াব সরফরাজ খানের আমলে (১৭৩৯ খ্রি.), *কিন্তু বিস্মৃত হলে চলবে না, সেকালে সাধারণ শ্রমজীবীর দৈনিক মজুরি ছিল চার পয়সারও কম।*[২৩] সুতরাং তাদের পক্ষে অন্নবস্ত্রের সমস্যা এখনকার চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না।

এই দৈন্যদুর্দশা চরমে উঠত দুর্ভিক্ষের সময়। ১৫৫৬-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা ও বিয়ানার নিকটবর্তী অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হলে বাদাউনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'মানুষ

২২. পূর্বপাকিস্তানের 'ভেলুয়াগীতি'।
২৩. মধ্যযুগের বাঙলা—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

স্বজাতিকে ভক্ষণ করছে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালগুলোর বীভৎস রূপে দেশ ভরে গেছে। সারা দেশ জনশূন্য হয়ে গেছে এবং একজনও কৃষক নেই কৃষিকর্ম করতে'। ১৬৭২-৭৪ সালে গুজরাটের মতো ধনধান্য ভরা দেশে এমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, ধনী দরিদ্র সকলেই দেশত্যাগ করে। ১৫৯৫ থেকে ১৫৯৮ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তখন মানুষ মানুষ খেয়েছে, পথঘাট মৃতের স্তূপে ভরে গেছে, সংকারের জন্য কেউ ছিল না। ১৬৩০-৩২ সালে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, আবদুল হামিদ লাহোরী বলেন, 'মানুষ পরস্পরকে ভক্ষণ করতে লাগল এবং পিতার নিকট পুত্রের শরীরটাই স্নেহের চেয়ে বেশি কাম্য হয়ে উঠল।' তখন একজন ডাচ বণিক লিখেছেন,

> "যারা পথে অর্ধমৃত অবস্থায় পতিত হতো, তাদের কর্তন করে অন্যেরা ভক্ষণ করত। এভাবে পথে প্রান্তরে মানুষ বের হতো না, খাদ্য হিসেবে অন্যের শিকার হওয়ার ভয়ে।"[২৪]

মধ্যযুগের শেষ পাদে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় অবস্থা কার্ল মার্কস বর্ণিত একটি বাক্যে বলা যায়—*When all were struggling against all—যখন সবাই সবার সঙ্গে দ্বন্দ্বে মেতেছিল।*[২৫] তখন শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রায় অনুপস্থিত; মধ্যযুগের শেষ অঙ্কে আকাশ ঘন তমসাবৃত। এই অন্ধকার আকাশে সিংহাসনলিপ্স ক্রূরচক্রী ভুঁইফোঁড় ব্যক্তি, লোভী সামন্ত-নেতা এবং লুণ্ঠনপ্রিয় বর্গীরা ও মানুষ পণ্যের ব্যবসায়ী ফিরিঙ্গি ও মগরা ফিরেছে প্রেতাত্মার মতো দেশের জনজীবনকে শিকার করতে, ধ্বংস করতে। এদের বিভিন্নমুখী লালসার আগুন থেকে দেশের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার শান্তিবারি খুঁজে ফিরেছে অসহায়ের মতো। কিন্তু তা মেলে নি। তাদের আতঙ্ক ও ত্রাস কী পরিমাণে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে শামসুদ্দীন তালিস লিখিত একটি বর্ণনা থেকে। তিনি লিখেছেন :

> আকবরের সময় থেকে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়কাল পর্যন্ত আরাকানের মগরা ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা (পূর্ব) বাংলা লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড় সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং একজনের উপর আর একজনকে চাপাইয়া জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। লোকে যেমন পাখিকে আহার দেয়, সেইরূপ তাহারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়া দিত।...মগেরা বহুকাল ধরিয়া দস্যুতা করার ফলে তাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে ও তাহারা সংখ্যায় বাড়িয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রমেই জনশূন্য হইয়াছে এবং দস্যুদিগকে বাধা দিবার শক্তিও কমিয়া আসিতেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যুদলের যাতায়াতের নদীগুলির উভয় পার্শ্বে একজন গৃহস্থও রহিল না। তাহাদের যাতায়াতের পথে বাকলা অঞ্চল এবং বাঙ্গালার অন্যান্য অংশ পূর্বে

---

২৪. An Advanced History of India—pp 571-72.
২৫. Karl Marx—Articles on India.

www.pathagar.com

> শস্যশালী এবং গৃহস্থের পল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। প্রতি বর্ষে এই প্রদেশ হইতে বহু পরিমাণ সুপারির কর আদায় হইয়া রাজকোষ পূর্ণ করিত। কিন্তু এই দস্যুদল লুণ্ঠন, নরনারী হরণ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তথায় একখানিও বসতবাটি নাই, অথবা একটি প্রদীপ জ্বালাইবার লোকও নাই।[২৬]

এই দস্যুতার দাপট ও ক্রূরতার হিংস্র প্রকাশ ভারতীয় উপমহাদেশেরই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলেও কী ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিল, তার চিত্র মেলে মারাঠা-বর্গীর লুণ্ঠন বৃত্তিতে। এই লুণ্ঠন পর্ব চলেছিল প্রধানত বিহার ও পশ্চিম বাংলার ওপর ১৭৪২ সাল থেকে প্রায় আট বছর। সারা দেশের উপর মারাঠা দস্যুদল নি ঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করত ধ্বংস ও বীভৎস অত্যাচারের মূর্তিমান প্রেতমূর্তির মতো। কুখ্যাত 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনীর নায়ক হলওয়েল লিখেছেন :

> তারা ভীষণতম ধ্বংসলীলা ও ক্রূরতম হিংসাত্মক কার্যে আনন্দ লাভ করত। তারা তুঁতগাছের বাগানে ঘোড়া চরিয়ে রেশম উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে দেয়। দেশের সর্বত্র বিভীষিকার ছায়া পড়েছে। গৃহস্থ, কৃষক ও তাঁতীরা সকলেই গৃহত্যাগ করে পলায়ন করেছে। আড়ংগুলি পরিত্যক্ত, চাষের জমি অকর্ষিত ...খাদ্যশস্য একেবারে অন্তর্হিত, ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে উৎপীড়নের চাপে।[২৭]

গঙ্গারাম নামক জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আরও মর্মন্তুদ :

> বর্গীরা সহসা উদিত হয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলে, তখন সকল শ্রেণীর মানুষ যে যা পারে অস্থাবর মালপত্র নিয়ে পলায়ন করে। বর্গীরা সবকিছু ফেলে দিয়ে কেবল সোনা-রূপা কেড়ে নেয়। তারা কারো হস্ত কর্তন করে, কারো কর্তন করে কর্ণ-নাসিকা, কাউকে একেবারে হত্যা করে। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই টেনে নিয়ে যায়...তারপর বর্গীরা তার উপর অকথ্য পাপাচার করে পরিত্যাগ করে যায়। লুণ্ঠন শেষে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। প্রদেশের সর্বত্র এরূপ বীভৎস লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালায় ...তারা কেবল চিৎকার করে 'টাকা দাও, টাকা দাও, টাকা দাও।' টাকা না পেলে তারা হতভাগ্য মানুষের নাকে পানি ঢুকিয়ে কিংবা পুষ্করিণীতে ডুবিয়ে হত্যা করে...ভাগীরথী পার হয়ে অপর তীরে গেলে তাদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি মিলে।

বর্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার লিখেছেন :

> শাহু রাজার সৈন্যরা দয়ামায়াহীন। তারা গর্ভবতী নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে,...ভয়াল তাদের মূর্তি, সর্বপ্রকার লুণ্ঠন কর্মে সুপটু এবং সব রকম পাপাচরণে দক্ষ।[২৮]

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, যে মারাঠা বর্গীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও দানবীয় লুণ্ঠনকর্মে বাংলাদেশের আপামর বাসিন্দা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, সেই মারাঠা জাতির স্রষ্টা শিবাজীর উদ্দেশ্যে 'শিবাজি-উৎসব' কবিতা লিখে বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি স্মৃতিতর্পণ করেছিলেন :

---

২৬. Studies in Mughal India—J. N. Sarkar ও মধ্যযুগে বাঙ্গলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৭. Interesting Hist; Events—Holwell (1766) part I, pp 121-151.

২৮. History of Bengal, vol II, pp 457-458.

www.pathagar.com

তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইব আজ।

নব্য 'জাতীয়তাবাদের' উগ্রপূজারী কবি সেদিন বিস্মৃত হয়েছিলেন, এই 'শিবাজী মহারাজের' চেলাচামুণ্ডারা তাঁর পিতৃপিতামহের সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা ও কলঙ্কের মসিলেপন করে 'খাজনা' আদায় করে নিয়েছিল এবং সে বিভীষিকার স্মৃতি সোয়া দু শ বছর পরে আজও প্রতিটি বঙ্গমাতা স্মরণ করে আতঙ্কে শিহরিত হয়ে শিশুকর্ণে গুঞ্জন তোলে :

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে!

বণিক শ্রেণী

ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বণিক শ্রেণীর আধিপত্য ছিল। তারা শাসক থেকে শুরু করে সাধারণকে ঋণদান করত, এমনকি বিদেশি বণিকদেরও ঋণদান করত। বীরজী বোহরা ছিলেন সুরাটের বণিকরাজ, তিনি বন্দরের আমদানি ও রপ্তানিকৃত সকল পণ্যের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চালাতেন। কালিকটে তাঁর মশলার পরিবর্তে আফিম ও তুলা বিনিময়ের ব্যবসায় ছিল, আহমেদাবাদ, আগ্রা, বোরহানপুর, গোলকুণ্ডায় তাঁর শাখা অফিস ছিল। তাঁর প্রভাব এত বেশি ছিল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও তাঁকে রীতিমতো সমীহ করে চলত। দক্ষিণ ভারতে মলয় চেট্টি ছিলেন বীরজীর সমকক্ষ। ১৬৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠ চিনন চেট্টি ব্যবসায়ের মালিক হন। জাহাজে মাল প্রেরণে ও সাধারণ অফিসগুলোকে ঋণদানে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। মসলিপট্টমে সারঘাইলরা সমগ্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করত, বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ঋণ দিত।

উত্তর ভারতের ক্ষেত্রীরা ছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, তারা সবরকমের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করত। ম্যানরিখ বলেন, *"তাদের গৃহে এত মুদ্রা সঞ্চিত থাকত যে, সাধারণ চোখে শস্যের পাহাড়ের মতো ভ্রম হতো।"*[২৯] তাদের অনেকে বাংলাদেশে আগমন করে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তারা রাজধানী গৌড়ে ও হুগলির সাতগাঁয়ে ব্যবসায় করত; বিদেশি পর্তুগিজ ও পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাদের লেনদেন বেশি ছিল। জগৎশেঠের বিখ্যাত বংশ এই শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত। হীরানন্দ শা নামে এই বংশের আদি পুরুষ রাজপুতানার নাগাউর থেকে সতেরো শতকের মাঝামাঝি ঘটিমাত্র সম্বল করে পাটনায় আসেন এবং সেখানে কিছুদিন ব্যবসায় করে মুর্শিদাবাদে স্থায়ীভাবে বাস করেন। তাঁরই বংশধর ফতেহচাঁদকে মুহম্মদ শাহ জগৎশেঠ (পৃথিবীর ব্যাংকার) উপাধি দান করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজ বণিকদের বিশিষ্ট বন্ধু ও সমকালীন শ্রেষ্ঠতম শেঠ।

---

২৯. Travels (1927) II. p. 156.

www.pathagar.com

তৎকালীন ব্যবসায়ীরা কয়েকটি বিখ্যাত বংশে সীমিত থাকত এবং ব্যবসায়, ঋণদান ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল কার্যনির্বাহ করত। তাদের মূলধন, বিনিময়, মালের নিরাপত্তা প্রভৃতিতে বাজারে সুনাম খুব বেশি ছিল, এজন্য লোকে অবাধে তাদের নিকট কড়ি ও মাল গচ্ছিত রাখত এবং অগ্রিম দানও গ্রহণ করত। হুন্ডি কেটেই তারা ব্যবসায়ের লেনদেনে বহুলাংশে নির্বাহ করত। 'হুন্ডি' কথাটির উৎপত্তি মুসলমান শাসকদের হিন্দু ব্যবসায়ীর নিকট অগ্রিম নেওয়ার প্রতিশ্রুতিপত্র থেকে। তখন সর্বত্রই হুন্ডি চলত, এজন্য হিন্দু মহাজন বা শরফরা পল্লীগ্রাম থেকেও অর্থবিনিময় করত। টাভের্নিয়ার বলেন, 'এমন কোনো গণ্ডগ্রাম নেই যেখানে শরফ বা মহাজন নেই; তার কাজই হলো কড়ি বিনিময় করা, হুন্ডি কাটা এবং বাট্টা মুনাফা অর্জন করা।' তাদের 'পোদ্দার' অর্থাৎ মুদ্রা-পরীক্ষকও বলা হতো। এই শ্রেণীর অর্থসংক্রান্ত কর্মে তাদের দক্ষতা সুবিদিত এবং টাভের্নিয়ারের মতে ইহুদিরা শরফ পোদ্দারদের তুলনায় নাবালক মাত্র।

> 'অটোম্যান সাম্রাজ্যে ইহুদিরাই অর্থ ও মুদ্রা সংক্রান্ত সকল কর্মে পারদর্শী হিসেবে খ্যাত, কিন্তু ভারতীয় শরফ-পোদ্দারদের নিকট তারা বড়জোর শিক্ষানবীশ হতে পারে।'[৩০]

ব্যবসায়ক্ষেত্র ছিল হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া। গ্রাম্য ক্ষুদ্র মুদি থেকে রাজধানীর শেঠ পর্যন্ত সকলেই হিন্দু ছিল। অবশ্য শরফ বা পোদ্দাররা ছিল বেশি ধনী। এজন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট জাতি 'বৈশ্য' বর্ণ থেকে উদ্ভূত হতো এবং বংশানুক্রমে তারাই ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তম সকল রকম ব্যবসায় ও আর্থিক লেনদেন কর্ম করত। বার্নেয়ার বলেন, এই শ্রেণী সোনার তাল গভীর মাটির নিচে লুক্কায়িত রাখত এবং প্রভূত অর্থের মালিক হয়েও দরিদ্রের বেশে জীবন কাটাত।

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যবসায়ী সমাজ স্থানীয় শাসকের তাঁবেদার থাকত, ইংল্যান্ডের মতো শাসকের বিরুদ্ধে যাওয়া বা শক্তি সঞ্চয়ের স্পর্ধা তাদের ছিল না। তাদের কোনো স্বাধীনতার চার্টার, কোনো পৌর অধিকার ছিল না; কোনো পুলিশ বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও সাহায্য ছিল না। বণিক-সংঘ ছিল, কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষমতা ছিল না দেশের শাসন বা অন্য কোনো বিভাগের ওপর। ম্যাকস ওয়েবার বলেন, শাসক এবং তাঁর আমলাদের হুকুমের অধীন ছিল বণিক সমাজ। অবশ্য মালাবার উপকূলের হিন্দু ও মুসলিম বণিক সমাজের কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। তারা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে বাস করত, নিজেদের সম্পত্তি সম্বন্ধে আইন মেনে চলত এবং সরকারের ভয় না রেখে সমুদ্র পথের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করত। গুজরাটের বোহরা মুসলমানের কথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। এ ছাড়া গুজরাটে ফরাসি নামক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল। তারা আট শতকে পারস্য থেকে এসে এখানে বসতি করে ও একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাতে পরিণত হয়। হ্যামিলটন বলেন,

---

৩০. Tavernier, ii 28 29.

www.pathagar.com

পারশীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে দিও থেকে বোম্বাই পর্যন্ত প্রতিটি শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র ব্যবসায় জগৎ অধিকার করে বসে। তারা বহু দূর দেশে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও আপন গণ্ডির বাইরে বাস করে না। তাদের সংখ্যা দেড় লক্ষ পরিবারের মতো।

মাড়োয়ারিরা ভারতীয় উপমহাদেশের আর একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাত এবং বিভাগোত্তর কালেও পূর্বপাকিস্তানে এবং হিন্দুস্তানে তাদের ব্যবসায়কর্ম সমানভাবে চলেছে। অনুর্বর রুক্ষ মাড়োয়ার অঞ্চল থেকে—আজমির, যোধপুর, সিরোহি, নাগাউর, বিকানির যার অন্তর্ভুক্ত—আকবর শাহের সময় এরা ছড়িয়ে পড়ে বিহারে ও বঙ্গভূমে। ওসমল, মহেশ্রী, আগরমল, পরওয়াল, শ্রীমল, সারোগি, ক্ষেত্রী প্রভৃতি গোত্রে নামাঙ্কিত এই অধ্যবসায়ী বণিকসমাজ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গে কর্তৃত্ব করে। ভীতু ও কৃপণ স্বভাবের জন্য খ্যাত হলেও এদের ক্ষুরধার ব্যবসায় বুদ্ধি সর্বজনবিদিত। মেনুচী বর্ণিত এরাই আসল 'বেনয়ান' বা বানিয়ার জাত।

কারিগর শ্রেণী

হস্তশিল্প সম্ভারে—কি বয়নে, অলঙ্করণে, নির্মাণে ও চিত্রণে এবং কি পরিমাণে ও সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে—পাক-ভারত ছিল মধ্যযুগের মানবেতিহাসে শীর্ষস্থানীয় এবং দেশে দেশে বরণীয়। তখন এদেশ ছিল প্রধানত রপ্তানিকারী, আমদানিকারী নয়।

সে যুগে এদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুতিবস্ত্র, শাল, গালিচা, সোনা বা রুপার জরির বস্ত্র, বুটিদার রেশমি বা সুতি বস্ত্র ও চিকন কাজে এবং প্রস্তর শিল্পে, হস্তিদন্ত শিল্পে, দামি পাথরের কাজে। ডেলা-ভেল বলেন, 'সুতিবস্ত্র ছিল অতীব সূক্ষ্ম এবং পাশ্চাত্যখণ্ডের কল্পনার বস্তু।' পিরার্ড স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার বিপণি, গালিচা ও রেশম বস্ত্রের সম্ভার দেখে বিস্ময় মেনেছেন। মানরিক পাটনা থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে শিল্পজাত দ্রব্যের, বিশেষত সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের বিপুল সমাবেশ দেখে হতবাক হয়েছেন।

বস্ত্রশিল্পে তৎকালীন বাংলার স্থান ছিল সবার শীর্ষে। বার্নিয়ার বলেন,

> আমি এমন কোনো দেশের কথা জানিনে যেখানে এখানকার মতো এতো বিচিত্র শ্রেণীর মূল্যবান পণ্যের বিপুল সমাবেশ দেখা যায়। এখানে এতো বিপুল পরিমাণে রেশমি ও সুতিবস্ত্র মেলে যে, বাংলাকে এ দুটি পণ্যের মহাভাণ্ডার বলা যায় মোগল সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহের এবং পাশ্চাত্য জগতের। এখানকার রকমারি সুতিবস্ত্রের পরিমাণ চিন্তা করে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছি। মোটা মিহি সাদা রঙিন বিচিত্র বর্ণ ও জাতের বস্ত্র সম্ভারের কী বিস্ময়কর সমাবেশ। ওলন্দাজেরা এ সব বস্ত্র জাপানে ইউরোপে, নানা দেশে চালান দিত। প্রতি বছর কী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানি হয়, তা হিসাবের কল্পনাতীত।[৩১]

---

৩১. Romance of an Eastern Capital—Bradley Burt.

www.pathagar.com

পিরার্ড বলেন,

> পুরুষ স্ত্রীলোক সুতি ও রেশমি সুতা কর্তনে, বস্ত্র বয়নে, সূচীকর্মে এতো সূক্ষ্মভাবে নিপুণ যে, তাদের নির্মিত শিল্পের চেয়ে উন্নততর কাজ আমি অন্য কোথাও দেখি নি। তাদের সুতি ও রেশমি বস্ত্র এত বেশি স্বচ্ছ হয় যে, এরূপ বস্ত্রে পরিহিত মানুষকে নগ্নই মনে হয়।[৩২]

হিউ মুরে ১৮৪০ সালে—যখন এসব শিল্পের মুমূর্ষু অবস্থা—লিখেছেন :

> এদেশের বস্ত্রশিল্প এত উৎকর্ষ অর্জন করে যে, বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত অন্য কোনো দেশ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করে না। দুর্বল ও কৃশ মানুষেরা চুলবুলে আঙুল সঞ্চালন করে আশ্চর্য রুচিবোধে নিরলস শ্রমসহকারে এমন উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি করতে সহজে অভ্যস্ত। সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে ঢাকাই মসলিন ও করোম্যান্ডলের কেলিকো বস্ত্র এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে।[৩৩]

এ সম্পর্কে আর একটি প্রাচীনতম বর্ণনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা যায় না :

> এই একই দেশে তারা সুতি জামা এমন কৌশলে তৈরি করে যে, দুনিয়ার কোথাও তার তুলনা নেই। এসব জামা গোলাকৃতির এবং এমন সূক্ষ্মবস্ত্রে তৈরি যে, একটা মাঝারি ধরনের আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসেই এটিকে চালিয়ে আনা যায়।

ট্যাভের্নিয়ার বলেছেন, 'ষাট হাত দীর্ঘ মসলিনের একটি পাগড়ি হাতে নিলে ধারণাই হবে না হাতে কিছু আছে। উটপাখির ডিম্বের আকৃতি একটি নারিকেলের খোলের মধ্যে এমন একখানি পাগড়ি রাখা হয়েছিল।'

গুণানুসারে মসলিন বস্ত্রের নানা শ্রেণীবিভাগ ও নামাঙ্কিত ছিল। এ রূপক নামগুলো ছিল, আব-ই-রওয়ান বা প্রবাহিত বারিধারা, শবনম বা শিশির প্রভৃতি। চিকন কাজের ও ফুলতোলা জামদানি, মখমল খাসের খ্যাতিও কম ছিল না। স্বচ্ছতা, সূক্ষ্মতা ও শিল্পনৈপুণ্যে এসব বস্ত্রের আজও তুলনা নেই। আধুনিক বস্ত্রশিল্প উৎকর্ষের শীর্ষশিখরে উঠেছে, রাসায়নিক তন্তু নির্মিত বস্ত্র স্বচ্ছতায় তুলনা রহিত; কিন্তু প্রাকৃতিক তন্তু নির্মিত কার্পাস ও রেশমি বস্ত্রের উৎকর্ষ আজও মসলিনের সমকক্ষ নয়। অথচ এসব বস্ত্রনির্মাণে কারিগররা ব্যবহার করত আদিকালের বাঁশের সব যন্ত্রপাতি। কয়েকখণ্ড বংশদণ্ডেই একাজ চলত। আব-ই রওয়ান বস্ত্রের সুতা কর্তনে এক শ পঁচিশটি বংশদণ্ডের প্রয়োজন হতো। কী পরিমাণ ধৈর্য, দক্ষতা ও সাবধানতার প্রয়োজন হতো সহজেই অনুমেয়। বয়নকারী শিল্পীর চোখের ওপর এমন টান পড়ত যে, এ শ্রেণীর বস্ত্রবয়নে ষোলো থেকে ত্রিশ বছর বয়সের কারিগর নিযুক্ত হতো। আবহাওয়ার প্রভাব এত বেশি গণ্য হতো যে, কঠোর রৌদ্রকালে এ বস্ত্রবয়ন বন্ধ করা হতো। মসলিন বস্ত্র কী পরিমাণ সূক্ষ্ম ছিল ও স্বচ্ছ ছিল, একটি কাহিনী থেকে তার কিছুটা অনুমান করা যায়। জনৈক কারিগর মসলিন বয়নের পর

৩২. Pyrard i. p 339 : Barbasa ii. p 145-56.
৩৩. Historical and Descriptive Account of Br. India : ii p 442.

www.pathagar.com

সন্ধ্যাকালে শীতল ঘাসের উপর সেটি ছড়িয়ে দেয় শুষ্ক করার উদ্দেশ্যে। নিকটেই একটি গরু চরছিল। গরুটি ঘাসের সঙ্গে বস্ত্রটিও বেমালুম খেয়ে ফেলে। ঘাসের ও সুতিবস্ত্রের পার্থক্য তৃণবিলাসী জীবের নিকট ধরা পড়ে নি।

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশারদ মোরল্যান্ড দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পকর্মের, বিশেষত রেশমি ও সুতি বস্ত্রশিল্পর উৎকর্ষ স্বীকার করেছেন ও বলেছেন, 'বস্ত্রশিল্পে স্বদেশ ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভারতের একচেটিয়া অধিকার ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, হস্তশিল্পকর্মে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব পাশ্চাত্য দেশগুলোর তুলনায় অবিসংবাদী ছিল।'

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না, তাদের ব্যবসায়ে নিরাপত্তাও ছিল না। জাতি হিসেবে তারা নিম্নস্তরে গণ্য হতো। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। জাতীয় পেশা হিসেবে তারা আপন আপন শিল্পকর্মে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করত পিতা পিতামহের নিকট থেকে, কোনো কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না; কিংবা আপন বিশেষ জাতি ব্যতীত অন্য জাতির লোকের সে বিশিষ্ট শিল্পে অধিকারও ছিল না। এমনকি একটি শিল্পের কারিগর স্বজাতি ব্যতীত অন্য জাতির কন্যার সঙ্গে পরিণীত হতে পারত না। তন্তু শিল্পীর বিবাহ হতো স্বগোত্রেই, এইরূপ স্বর্ণকার, কর্মকার, সূত্রধরের আপন আপন গোত্রেই বিবাহ হতো এবং এ অবস্থা ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্মী হস্তশিল্পীদের মধ্যে। এজন্য এসব শিল্পীজাতি প্রগতিশীল হয় নি, পুরাতন ধারাবাহী হয়েই বিদ্যমান ছিল। কঠোর জাতিত্বের গণ্ডিতে সীমিত হয়ে স্ব-স্ব ঐতিহ্য বহন করেই চলত মধ্যযুগের সমস্ত হস্তশিল্পী ও কায়িক শিল্পী সম্প্রদায়।

এসব শিল্পকর্ম কুটিরশিল্পেই সীমিত ছিল। স্ব-স্ব কুটিরে এসব শিল্পকর্ম হতো ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাজারে নিজেরাই বহন করে বিক্রয় করত। শহুরে শিল্পীরা কোথাও কোথাও শিল্পীসংঘ স্থাপন করত, কিন্তু সেগুলো বণিক সংস্থারই ওপর নির্ভরশীল ছিল। গ্রাম, অঞ্চল থেকে এসব শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করা, একত্র করা ও অন্যত্র চালান করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বিদেশি পাশ্চাত্য বণিকেরা সর্বপ্রথমে কুঠি স্থাপন করে ও কুঠিয়ালরা পাইকার ও দালাল মারফত শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা ও কারিগর শ্রেণীকে দাদন দেওয়া আরম্ভ করে। পিটার মুন্ডি ১৬৩২ সালে পাটনা শহরে এ ব্যবস্থা লক্ষ করেছিলেন। তখন গঙ্গারাম নামক একজন মোটা কাপড়ের দালাল তাঁকে বলেছিল,

> মাসে দু'তিন হাজার টাকা দাদন দিয়ে মাল কেনা যায়, কিন্তু দাদন দিয়ে কারিগরদের কুটির থেকে সংগ্রহ করে কাপড় বাজারে ছাড়তে চল্লিশ-পঞ্চাশ দিন সময় লেগে যায়।[৩৪]

---

৩৪. The Travels of Peter Mundi in Europe and Asia, p. 146 & App. D.

www.pathagar.com

এ ব্যবস্থায় হস্তশিল্প কুটিরে কুটিরে সীমাবদ্ধ থাকায় মধ্যযুগে মধ্যবর্তী শ্রেণীর দালাল বা পাইকার শ্রেণী বিশেষভাবে গড়ে উঠে নি। এজন্যই মোরল্যান্ড বলেছেন,

> শিল্পকর্মের ব্যবস্থাপনা কোনো ব্যবসায় হিসেবে দানা বাঁধে নি এবং শিল্পীরা স্ব-স্ব শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করত, সরবরাহ করত কোনো মধ্যবর্তী লোকের সাহায্য ব্যতিরেকেই এবং কোনো ধনপতির হুকুম বরদার না হয়ে।[৩৫]

অবশ্য সুলতানি আমলে ও বাদশাহি আমলে শাহি কারখানা ছিল শাসকের চাহিদা পূরণের জন্য। দিল্লিতে সুলতানের শাহি কারখানায় প্রায় চার হাজার বয়নশিল্পী ছিল, এ ছাড়া ছিল অন্যান্য শিল্পের কারিগর। প্রাদেশিক শাসকদের ও পৃথক কারখানা ছিল। মোগল বাদশাহরা ছিলেন এ বিষয়ে আরও যত্নবান এবং তাঁরাই একরকম বর্তমান শিল্পপতিদের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। বার্নেয়ার বলেন, বাদশাহের নিজস্ব কারখানাগুলোতে সহস্র সহস্র সুদক্ষ কারিগর নিয়োজিত হতো সূক্ষ্ম মসলিন ও রেশমি বস্ত্র বয়নে, চিকন কাজে, সোনা ও রুপার জরির কাজে, ফুল তোলা কাজে, স্বর্ণরৌপ্যের ও বহুমূল্যের পাথরের অলঙ্কার ও আসবাবপত্র নির্মাণে। এমনকি জরির জুতা ও চর্মশিল্পের কাজে, রঙের কাজে, চিত্রণের কাজে ও বহুবিধ বিলাসদ্রব্য নির্মাণ কাজে শত শত কারিগর নিয়োজিত হতো। ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হতো প্রথম শ্রেণীর কারিগর দিয়ে। এসব কারিগর সরকারি বিশিষ্ট কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে কাজ করত, তাদের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরকার থেকেই সরবরাহ করা হতো। কিন্তু কারখানার শিল্পীরা আশানুরূপ মজুরি পেত না। শাহি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও *'শিল্পীরা প্রায়ক্ষেত্রে প্রাণধারণের চেয়ে বেশি মজুরি লাভ করত না।*[৩৬]

বাদশাহের মতো প্রাদেশিক সুবাহদাররাও কারখানা পোষণ করতেন। তখন কারিগররা আপন শিল্পকর্ম বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভোগ করত না, এজন্য আশানুরূপ মুনাফাও পেত না। ডাচ পর্যটক পেলসার্ট ১৬২১ থেকে ১৬৬২৭ সাল পর্যন্ত আগ্রায় ছিলেন। তিনি বলেন :

> স্থানীয় শাসকদের হস্তে শিল্পীরা প্রায় নির্যাতিত হতো। তাঁরা কোনো কারিগরকে প্রয়োজন হলে জোর করে ধরে আনতেন এবং সারাদিন খাটিয়ে নামমাত্র মজুরি দিতেন।[৩৭]
>
> কেবল কঠোর দারিদ্র্য ও সময়ে সময়ে নির্যাতনই এসব কারিগরকে সরকারি কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করত।[৩৮]

---

৩৫. India at Death of Akbar, p. 184.
৩৬. India—Moreland, p. 118.
৩৭. F. Pelsaert : Jahangir's India, p. 60.
৩৮. Bernier, p. 229.

www.pathagar.com

উপরের আলোচনা থেকে এ কথাটি পরিচ্ছন্ন যে, যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও এবং নানাবিধ অবস্থাঘটিত কারণে মধ্যযুগে ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী এবং কারিগর শ্রেণীর সমবায়ে কোনো সুসংবদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি এবং তার দরুন এসব শ্রেণীর এমন কোনো সম্মিলিত সাধনা বা দান ছিল না দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারপূর্বক এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন, সংশোধন বা উন্নয়ন করার। আরও পরিষ্কার যে, নাগরিক জীবন তখন এমন শক্তি অর্জন করে নি, যার ফলে এসব শ্রেণীর প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারত, কিংবা নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে দেশের বৃহত্তর জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হতো। গ্রামীণ জীবনের প্রাচীন ধারায় সাময়িকভাবে লুণ্ঠনপ্রিয় ও উৎপীড়ক ভাগ্যান্বেষীর কিংবা মগ, হার্মাদ, বর্গীদের অভ্যুত্থানে বা আবির্ভাবে আলোড়ন এসেছে, ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নি। দিঘির বারিধারায় লোষ্ট্রনিক্ষেপণে সাময়িক আলোড়ন জাগার মতো, সাধারণ মানুষের জীবনে ক্ষণিক আলোড়ন সৃষ্টি করে কোথায় তলিয়ে গেছে—সেই একই জীবনধারা রয়েছে অব্যাহত ও অপরিবর্তিত।

ভূম্যাধিকারী উচ্চশ্রেণী

মুঘল যুগে তাবৎ ভারতীয় উপমহাদেশের ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; প্রথম, শাহি বা খালসা—এগুলো শাহি তত্ত্বাবধানে থাকত ও সরাসরি খাজনা আদায় হতো। দ্বিতীয়, জায়গির—এগুলো কিছু লাখেরাজ ও কিছু খেরাজদার ছিল, এবং আমির, মনসবদার ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা ছিল। আকবরের সময় বাংলাদেশ থেকে খালসা জমির হস্তবুদ খাজনা ছিল ৬৩,০৩,৭৫২ টাকা ও জায়গির থেকে হস্তবুদ খাজনা ছিল প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা।

মুসলমানি শাসন আমলে আমির ও আমলা শ্রেণী এবং অভিজাত শ্রেণীকে আয়মা, আল-তমঘা, মদদ-মাশ ও জায়গির হিসেবে ভূমিদান করা হতো। বেসামরিক ব্যক্তি ও কর্মচারীদের দান করা হতো আল-তমঘা ও জায়গির এবং ওলেমা সম্প্রদায়, ধর্মনেতা ও অভিজাত বংশের ব্যক্তিদের দেওয়া হতো আয়মা ও মদদ-মাশ। জায়গির মুখ্যত আজীবন দান করা হলেও প্রায় বংশাবলিক্রমে ভোগ করা হতো, আয়মা ও মদদ-মাশ চিরস্থায়ীভাবে দান করা হতো। এসব ছাড়াও বহু লাখেরাজ জমি দান করা হতো মসজিদ, খানকাহ প্রভৃতির জন্য, হিন্দুদের মন্দির-মঠের জন্যও। দেবোত্তর, পিরোত্তর, সূর্য-পর্বত লাখেরাজ জমির সংখ্যা কম ছিল না। এসব শ্রেণীর লাখেরাজ দানের নামসংখ্যাও ত্রিশের উপর। আরও লক্ষণীয়, আয়মার নাম কেবল বাংলাদেশেই মেলে, এ থেকে অনুমান হয় আয়মা গৌড়ীয় সুলতানদেরই দান ছিল। মদদ-মাশ মোগল বাদশাহদের দান। *যুক্তবাংলার পঁচিশটি জেলায় আয়মার অস্তিত্ব দেখা যায়। একমাত্র মুসলমানদেরই আয়মা দান করা হতো।*[৩৯] বর্তমানকালে অবশ্য এসব ভূমি দানের কোনো অস্তিত্ব নেই।

---

৩৯. Origin of Musalmans of Bengal—Fazle Rabbi—Ch. II.

www.pathagar.com

আবুল ফজল ওলেমা, কাজি ও মুফতির একটি নামতালিকা দিয়েছেন যাঁদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জায়গির দান করা হয়েছিল। আকবরের শিক্ষক মওলানা আলাউদ্দীনকে সম্বল জেলায় চার হাজার বিঘা জমির জায়গির দেওয়া হয়েছিল।

মুঘল আমলাতন্ত্র মনসবদারি নামে চিহ্নিত ছিল। সাত হাজারি থেকে মাত্র দশ জন পর্যন্ত মনসবের বিভিন্ন স্তর ছিল এবং শাহজাদা থেকে স্থানীয় নিম্নতম সামরিক বা বেসামরিক আমলা এই মনসবদারিতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই এ তন্ত্রে স্থান ছিল। তবে নিম্নতম রাজস্ব কর্মচারীরা, যেমন মুৎসুদ্দি, মুহুরার, মুনশি, পোদ্দার প্রায় সবই হিন্দু এবং বিচার বিভাগীর সব কর্মচারীরা মুসলমান ছিলেন। মাত্র এসব পদাধিকারীরা প্রায় বংশানুক্রমে নিয়োজিত হতেন। আকবরের আমলে মনসবদারের সংখ্যা ছিল ১৩৮৮, জাহাঙ্গীরের সময় ছিল ২০৬৪।

এই মনসবদারিতে সব দেশের লোক নিয়োজিত হতো। নানা জাতির ও ধর্মের সমন্বয়ে, কোনোরকম শিক্ষাগত নিম্নতম মানের বিবেচনা না করে, প্রায়শ বংশকৌলিন্যের জোরে মনসবতন্ত্রে প্রবেশাধিকার মিলত। তাঁদের চাকরির কোনো সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ছিল না। উর্ধ্বতনের বা খোদ বাদশাহের মর্জির ওপর তার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। এজন্য মনসবদারিতন্ত্র ছিল একান্তভাবেই শাহি দাসত্বের পর্যায়ভুক্ত। *'যাকে মর্জি তিনি মর্যদাসিক্ত করেন; আবার যাকে ইচ্ছে, অন্ধকারে ফেলে দেন।'*[8০]

আবুল ফজল বলেন,

> রিপুর বশে ও দুষ্ট প্রকৃতির জন্যে মানুষ স্বভাবত পশুর মতো এবং যেহেতু বাদশাহের একা তাদের দমন করা ও শাসনে রাখা সাধ্য নয়, সেজন্য তিনি মনসবদারদের নিয়োগ করেন, তাঁরই খবরদারীতে শাসনকার্য চালানোর জন্য।[8১]

আমীরুল ওমরাহ থেকে নিম্নতম মনসবদার এক ভিন্ন কোটির মানুষ ছিলেন। বিলাসের প্রাচুর্য ছিল, সঞ্চয়ের ইচ্ছা ছিল না। ফৌত আইনে সবই যখন শাহি মালখানায় যাওয়ার যোগ্য, তখন মিতব্যয়ী হওয়ার মনোবৃত্তি জন্মে না। আওরঙ্গজেব কর্তৃক লিখিত একটি পত্রে জানা যায়, আমিরের মৃত্যু হলেই তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি সিলমোহরাঙ্কিত হয়ে যায়। পেলসার্ট একটি করুণ চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, একজন আমীরের মৃত্যুর পর, তাঁর সন্তানদের কী দারিদ্র্যের দিন আরম্ভ হয়।

সুলতানি আমলে আমির শ্রেণী সেনানায়ক, প্রশাসক, এমনকি সময়ে সময়ে সুলতান বানানোর অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু তখনও এ শ্রেণী বংশপরম্পরা

8০. Bernier p. 212.
8১. আইন-আকবরী—১ম খণ্ড : পৃ. ২৩৬-৩৭।

www.pathagar.com

ছিল না, সুগঠিত ও বলশালী ছিল না ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের ব্যারনকুলের মতো। তুর্কিরা প্রধানত হলেও আরব, আফগান হাবশি, মিসরি, জাভাবাসী, ভারতীয় সব দেশের সব জাতের মানুষ তখন আমির শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এমন জগাখিচুড়ি জাতের মানুষের সমন্বয়ে কোনো শক্তিশালী সুসংবদ্ধ সমাজ গঠিত হতে পারে না। এজন্য একজন আধুনিক লেখক সুন্দরভাবে বলেছেন, 'আমির শ্রেণী ছিল পরমাণুসমূহের সমষ্টিমাত্র, যার দ্বারা দেশের কল্যাণমুখী কোনোকিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।' ইংরেজ ব্যারনকুলের মতো আমিরদের শিকড় মাটিতে ছিল না। তারা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর তুঙ্গে অবস্থান করত, কিন্তু নিতান্তই এক স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল এবং প্রায়শ বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে তাদের দলবৃদ্ধি করা হতো। পেলসাটের ভাষায়, তাদের উন্নতি, মর্যাদা, অর্থাগম, সবকিছুই সুতার ওপর নির্ভর করত। কবির কথায়, 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

মুঘল আমলেও আমির শ্রেণীর সংগঠন, অধিকার ও দুর্বলতা একই ধরনের ছিল। তখন তুর্কি, তাতারি, ইরানি ও ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুর সংমিশ্রণ ছিল। জায়গিরে আমীরের জীবনস্বত্ব ছিল। ফৌত প্রথা ছিল, তবে খুবই কড়াকড়ি ছিল না। মুঘল আমির শ্রেণীও বাদশাহের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চিন্তা স্বপ্নেও করতে পারত না। সাধারণের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাঁদের জন্মায় নি ইংল্যান্ডের লর্ড ব্যারনদের মতো। এজন্য আমির শ্রেণী তখনও সর্বদাই বাদশাহের মুখাপেক্ষী থাকত নিজেরই ভাগ্য নির্মাণের জন্য।

আমির শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান এবং বাকি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অর্থ ও জাঁকজমকের সমারোহে বিলাসের প্রাচুর্যে ও অগণিত দাসদাসীর সমাবেশে আমির শ্রেণীর জীবনধারা ছিল ভোগবিলাসের তুঙ্গশৃঙ্গে আর কৃষক, কারিগর প্রভৃতি সাধারণ মানুষ কী দুর্বিষহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করত পূর্বে তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং আরও দেখানো হয়েছে দুর্ভিক্ষের কালে এসব সাধারণ মানুষ কী মর্মান্তিকভাবে পশুর স্তরে নেমে যেত। কবি আমীর খসরু এই বিসদৃশ ব্যবস্থা লক্ষ করে গভীর বেদনার্ত হয়ে বলেছেন, 'শাহি মুকুটে খচিত প্রতিটি মুক্তা গরিব কৃষককুলের আঁখি নিঃসৃত রক্তবিন্দুই স্ফটিকাকারে পরিণত হয়েছে।' শীতে গায়ে জামা ও পায়ে জুতা জোগানো দূরে থাক, সামান্য নুন-ভাত জোগানোও তাদের পক্ষে কষ্টকর হতো! অবশ্য তখন সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। মোটা কোরা কাপড়, নুন-তেল-লাকড়ি জোটানোর সমস্যা গ্রামেই মিটে যেত। এজন্য রাজধানীতে প্রাসাদে প্রাসাদে কী ষড়যন্ত্র চলত, কী রাষ্ট্রিক বিপ্লব ঘটত, সিংহাসনে কে উঠল, কে ধুলায় লুটাল—এসব সমস্যাসংকুল ব্যাপার নিয়ে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা থাকত না। শাহি দরবারের রাজনীতিতে কিছুমাত্র আগ্রহান্বিত না হয়ে

www.pathagar.com

তারা আপন পুরাতন একই জীবনধারায় জীবন কাটিয়ে দিত। তার ফলে এই হয়েছিল যে, আমাদের দেশের ইতিহাসের ধারাই প্রবাহিত হয়েছে, আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে। এজন্য কোনো যুগের রাষ্ট্রিক ইতিহাস সমসাময়িক কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কার্যাবলির সমষ্টিমাত্র। জনসাধারণ নামে যে ব্যক্তিসমষ্টি ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রতি পদক্ষেপেই ব্যক্ত করেছে আপনসত্তার প্রভাব, আমাদের দেশের ইতিহাসক্ষেত্রে সে জনসমষ্টি সত্তার মোটেই সাক্ষাত মেলে না। সুতরাং আমাদের অতীত যুগের কোনো রাষ্ট্রিক ব্যাপারের আলোচনাকালে মাত্র গুটিকয়েকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে এবং তা নিয়েই আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করতে হয়। যে জনসমষ্টির জাগ্রত সচেষ্ট মনোভাব এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলোকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে পারত, তার উপস্থিতি নেই; জনসাধারণ তাদের সমগ্র জীবনটাই এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রাঘোরে অতিবাহিত করেছে, নিশ্চেষ্টভাবে মার খেয়েছে, নয় বিনীতভাবে আজ্ঞাবহ হয়েছে, কিন্তু কখনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তায় জ্বলে উঠে নি, নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে নি। এই দ্রুততর জীবনস্পন্দন ও গভীরতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুপস্থিতিই আমাদের ইতিহাসধারার বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক জীবনে হিন্দুদের জাতিভেদের কড়াকড়ি কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। জলচল ও অস্পৃশ্যতার কঠিন নিয়ম আরও সুকঠিন করা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানে মেলামেশা ছিল, কিন্তু সামাজিকভাবে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ছিল না। একের ধর্মীয় পালাপার্বণে বা বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে অন্যের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে পুনঃবিবাহে নিষেধ পুরামাত্রায় ছিল। ইবনে বতুতা বলেন, সতীদাহে শাহি হুকুমের প্রয়োজন হতো। মুঘল আমলেও সতীদাহের জন্য অনুমতিপত্র গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের ধর্মীয় বা সামাজিক জীবনে কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন নি।

মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক জীবনে দুটি বৃহৎ স্তর ছিল—আশরাফ ও আতরাফ বা শরীফ ও রযীল। এ দুটি স্তরের মধ্যে পরিবর্ত বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়াতেও পার্থক্য করা হতো। বহিরাগত মুসলমানরা সাধারণত শরীফ হিসেবে এবং স্থানীয় নিম্নবর্ণ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা রযীল হিসেবে আখ্যাত হতো। তবে এ জাতিভেদটা ছিল সামাজিক ও আর্থিক মানমর্যাদাভিত্তিক, ইসলামের কোনো সমর্থন তাতে ছিল না। এজন্য এ বিভেদটা কোনো অচলায়তন জগদ্দলের মতো মুসলমান সমাজের বুকে স্থায়ীভাবে চেপে বসতে পারে নি, কিংবা সমাজদেহকে অনিবার্যভাবে খণ্ডবিখণ্ড করে রাখে নি। হিন্দুদের মতো বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না ও অশাস্ত্রীয় হিসেবে ঘৃণিত হতো

www.pathagar.com

না। অনেক শরীফজাদী উপযুক্ত ও প্রতিষ্ঠাবান রযীলজাদার সঙ্গে পরিণীতা হতেন; অবশ্য সৈয়দজাদীর সন্তানরা মাতার উপাধি গ্রহণ করে সৈয়দ হিসেবে পরিচিত হতো। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে দাসও সুলতানের কন্যা ও সিংহাসন লাভ করেছেন। কিন্তু সামাজিক স্তরভেদের উপস্থিতি অস্বীকার করা চলে না।

মধ্যযুগেও পেশা হিসেবে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ নির্ণীত হতো। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের অধিকারী; অতএব সর্ববিধ ধর্মকর্মে, পৌরোহিত্যে ও চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রালোচনার একচ্ছত্র অধিকার ছিল তাঁদের। ক্ষত্রিয়রা রাজাসন অধিকার করত এবং সামরিক বেসামরিক সর্ববিধ পদের অধিকারী ছিল। রাজপুতদের এ বিষয়ে পারদর্শিতা স্মরণীয়। ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে বৈশ্যকুলের একচেটিয়া অধিকার ছিল। বৈদ্যবৃত্তিতেও বৈশ্যরা ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কৃষিকার্য ও সর্বপ্রকার হস্তশিল্পে ব্যস্ত থাকত। মধ্যযুগে কায়স্থ নামধারী বর্ণহিন্দুর উদ্ভব হয়। কোলব্রুক বলেন, সামাজিক মর্যাদায় তারা ছিল নিম্ন শ্রেণীর। ওয়েবার বলেন, *'কায়স্থরা নিঃসন্দেহে শূদ্র ছিল।'*[৪২] কেবলমাত্র শাহি পৃষ্ঠপোষকতায় এই জাতিটি মধ্যযুগে প্রভাবশালী হয়ে উচ্চবর্ণে উন্নীত হয়। তারা মুনশিগিরি ও কেরানির কাজে এবং আদায় তহশিলের কাজে ছিল সুপটু। উচ্চপদস্থ না হয়েও কায়স্থকুল মুঘলযুগে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্মকুশলতা ও ফারসি ভাষা -শিক্ষায় কিছুমাত্র সংকোচ না থাকায় মুঘল সরকারে তাদের সমাদর ছিল। শিক্ষার দিক দিয়ে ও লেখনী চালনায় তারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত, যদিও হিন্দুশাস্ত্র পাঠে তাদের অধিকার ছিল না। তবে কায়স্থের কদর ছিল নাগরিক ও সরকারি পরিবেশে, পল্লীজীবনে নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়পাত্র রাজা মোহনলাল ছিলেন কায়স্থ নন্দন এবং তাঁর এক পুত্র সিরাজ কর্তৃক পূর্ণিয়ার নায়েব নিযুক্ত হন। 'রিয়ায-উস-সালাতীন' বলেন,

> 'এই অখ্যাত ও উদ্ধত কায়স্থ নন্দন রাজা মোহনলাল সিরাজের দেহে ও মস্তিষ্কে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেন, এবং পুরাতন কর্মচারীদের বরখাস্ত করে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিগণকে নওয়াবী খাস-তালুকসমূহে ও রাজস্ব বিভাগের সকল পদে নিয়োগ করেন।'[৪৩]

এ থেকেই সহজে ধারণা হবে, কায়স্থকুল কী প্রকার কুশলী ও ধুরন্ধর ছিল, শাহি আমলে কীভাবে তাদের প্রতিপত্তি বর্ধিত হতো।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,

> মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতিষ্ঠিত নবাবি আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি হয়। বাংলার অধিবাসীরাই সরকারি সকল পদে নিযুক্ত হতো। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি

---

৪২. Asiatic Researches V. 58 : The Religion of India—Weber, p. 76 : The Indian Middle Classes, p. 52-53 : Bengal in the Sixteenth Century, J. N. Dasgupta, p 155.

৪৩. রিয়ায-উস্-সালাতীন্—আবদুস সালাম কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ (১৯০২)।

www.pathagar.com

সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তররূপে ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে বহু উচ্চ-পদ অধিকার করতো। ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশ হিন্দু ছিল। নবাব আলীবর্দীর আমলে হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়... হিন্দু জমিদারেরা নবাবীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।[৪৪]

যদুনাথ সরকার বলেন,

মুর্শিদ কুলি খাঁ ভূমি রাজস্ব আদায়ে ইজারা দানের প্রথার প্রবর্তন করেন এবং ইজারাদার নির্বাচনে তিনি হিন্দুদেরই পছন্দ করতেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশে ভূম্যাধিকারী অভিজাত শ্রেণীর গোড়াপত্তন করেন; এ শ্রেণীর স্থায়ীত্ব ও বংশ পরম্পরা উত্তরাধিকারী স্বত্ব স্বীকৃত হয় কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে।[৪৫(ক)]

তিনি আরও বলেন,

হিন্দু সমাজে আরও একটি পরিবর্তন ঘটে ১৭১০ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাংলার স্থায়ী দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ফলে। এতদিন মোঘল প্রশাসন বিভাগে সামরিক ও আইন বিভাগীয় সব উচ্চপদগুলোসহ রাজস্ব ও হিসাব বিভাগের সদরদপ্তরের পদসমূহে আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে লোক আমদানি করে নিয়োগ করা হতো এবং তাঁরা বাংলায় বসবাস করতেন না, সুবাহদারের পরিবর্তন হলে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে চলে যেতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর ও পরবর্তী নওয়াবদের আমলে বাঙালি হিন্দুরা দক্ষতাগুণে ও ফারসি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে বেসামরিক প্রায় সকল পদে ও সামরিক বহু পদে নিয়োগ লাভ করে। হোসেন শাহের আমল থেকে বাঙালি হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিক্ষা করে ও মুসলিম দরবারি আদব-কায়দা রপ্ত করে দিওয়ান, কানুনগো প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সময় এসব হিন্দু অর্থবলে জমিদার বংশাবলির প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এসব পদস্থ কর্মচারীরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এমনকি মোদককুল থেকে উদ্ভূত—আজকাল তাঁদের বংশধররা রাজা নামে কীর্তিত। নওয়াবি আমলে একাধিক বাঙালি হিন্দু 'রায়-রায়ান' (খান-ই-খানান উপাধির সংস্কৃত রূপ) মর্যাদাধিকারী ছিলেন। উপরোক্ত তিনটা জাতের বাঙালি হিন্দুর অনেকেই 'রায়-রায়ান' পদাভিমানী। গাভার (বরিশাল) কায়স্থ ঘোষেরা দস্তিদার নামে পরিচিত, তাঁদের কেউ নওয়াবি আমলে নৌবহরের আলোকধারী ছিল। পুরাতন সরকারি উপাধি বকশি, কানুনগো, সাহনা, চাকলাদার, শিকদার, তরফদার, মুনশি, লস্কর, খাঁ প্রভৃতি এখনও বাঙালি-হিন্দু পরিবারসমূহে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের নওয়াবি সরকারে ভাগ্য নির্মাণের কথা স্মরণ করায়। ... মুর্শিদ কুলি খাঁ যেসব বৃহৎ জমিদার বংশের পত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে রঘুনন্দন ও তাঁর ভ্রাতা ভূষণা পরগনার রামজীবন; রঘুনন্দনের তিলি ভৃত্য ও দিঘাপাতিয়া রাজের (রাজশাহী) প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়; মুক্তাগাছার (পরগণা মুমিনশাহী) মহারাজা-বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী প্রমুখের নাম স্মরণীয়।[৪৫(খ)]

৪৪. বাঙলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ—২২২-২৩ পৃ.।
৪৫ (ক). History of Bengal, vol II pp 409-10, 414-15.
৪৫ (খ). History of Bengal, vol II pp 409-10, 414-15.

www.pathagar.com

উপরের বর্ণনা থেকে এ কথাটি প্রতিপন্ন হয়, পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালি হিন্দুরা যুক্ত বাংলার প্রশাসনিক পদগুলো প্রায় অধিকার করে বসেছিল এবং বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে রাজস্ববিষয়ক সর্বকর্মই কুক্ষিগত করে ফেলেছিল। ভূম্যাধিকারেও তারা মুসলমানদের পিছনে ছিল না। এভাবে বাংলাদেশে হিন্দুরা এতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থবলের অধিকারী হয়েছিল যে, শ্রী মজুমদারের ভাষায়, 'হিন্দু জমিদারেরা নবাবির উপর সন্তুষ্ট ছিল না।' অতএব তারা বাংলার মসনদ থেকে মুসলমান নবাবকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের মেতে উঠবে এবং মুসলমানি শাহি লুপ্ত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠবে, মোটেই বিচিত্র নয়। তখন নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেছে এবং পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে যারা বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে থাবা বিস্তারের জন্য শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে, সেই ইংরেজদের সঙ্গে মিতালিতে হিন্দুরা মত্ত হয়ে পড়বে, তাও বিচিত্র নয়। কারণ শাসনদণ্ডের হাতফের হলে হিন্দু সমাজই লাভবান হবে বেশি মুসলমানদের চেয়ে। প্রভুত্ব যদি আর কারো মানতেই হয়, তাহলে ইংরেজ ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দু সমাজের চোখে কোনো পার্থক্য ঠেকে নি। বরং এই প্রভুবদলের মাধ্যমে উচ্চাভিলাষী হিন্দু সমাজ নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতির পথই সন্ধান করেছিল।

এইটাই ছিল মুসলমানি শাসন আমলের পরিসমাপ্তি সাধনে বাংলার উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মর্মান্তিক ভূমিকা এবং এ ভূমিকার হোতা ছিল নিঃসন্দেহে সেসব বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়, যারা ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে এদেশের আকাশে উদিত হয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে হিন্দুজাতির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হওয়ার উপাদানসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ও সক্রিয় ছিল, কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থাঘটিত কারণে এ সমাজ দানা বেঁধে সুগঠিত হতে পারে নি। *ব্রিটিশের শাসননীতি—যা রামমোহন, দ্বারিকানাথ, কেশব সেন থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত প্রতিটি হিন্দুর চোখে প্রতিভাত হয়েছিল বিধাতার আশীর্বাদ—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করেছিল।*[৪৬] মনে রাখা ভালো, সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করেছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজি সংসাধিত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ক্ষতি ও দুঃখের বোঝা বহন করা ব্যতীত তৎকালীন বাংলা তথা ভারতীয় জনসাধারণের আর কোনো ভূমিকা ছিল না। এ বিপ্লবের প্রধান নায়ক ছিল ইংরেজ জাতি, আর অংশীদার ছিল ইংরেজ সৃষ্ট ও ইংরেজ নির্ভর হিন্দু ভূম্যাধিকারী শ্রেণী, বণিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী—যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে সংগঠিত হয়ে উঠে। পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে নানা উপহার যা এদেশে বর্ষিত হয়েছিল, সেসব ষোলো আনা রূপেই যে মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দু সমাজ

৪৬. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ১৪, ৭৫ ও পরে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আত্মসাৎ করেছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে তাদের জন্মবৃত্তান্ত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরবর্তী অধ্যায় আলোচিত হবে। *এখানে শুধু এইটুকু স্মরণ রাখলেই যথেষ্ট হবে, তাদের সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে, ইংরেজ শাসকদের খেয়াল-খুশিতে ও অনুগ্রহে এবং তারাই ছিল এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।*[৪৭] এখানে আরও স্মরণ রাখলে যথেষ্ট হবে, ব্রিটিশ শাসনের যা কিছু শোষণ, নিষ্পেষণ, নির্যাতন ও লাঞ্ছনা-অপমানভার, তারও ষোলো আনা বিধাতার অভিশাপ হিসেবে নেমে এসেছিল হতভাগ্য মুসলমান জাতিসহ বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশের কোটি কোটি জনসাধারণের ললাটশীর্ষে।

এখানে আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। সাত শতকে পারস্য ও মিশর অধিকার করার পর আরবরা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য খণ্ডের সওদাগরি ব্যাপারটা একেবারে কুক্ষিগত করে ফেলে। তারা স্থলপথের একক অধিকারী হয়ে প্রাচ্যের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের যাবতীয় পণ্যজাত ব্যবসায় ইউরোপখণ্ডে একচ্ছত্রভাবে ভোগ করতে থাকে। পনেরো শতকে পর্তুগিজরা জলপথে ভারত সন্ধানে দিকে দিকে হানা দিতে থাকে এবং ১৪৯৮ সালের ২০ মে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পূর্ব উপকূলস্থ কালিকটে পদার্পণ করেন। অতঃপর বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে আগমন করতে থাকে। এসব বণিক সমাজের সঙ্গে বহু বণিকবেশী পর্যটক ও মিশনারি এদেশের গভীরতম অঞ্চলসমূহে সফর করতে থাকেন এবং দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজশক্তির বলাবল সম্বন্ধেও গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যাপৃত থাকেন। বাংলাদেশ সম্বন্ধেই তাঁদের আগ্রহ অধিক ছিল এবং এদেশের মানচিত্রও অঙ্কিত হয়েছিল ১৬৬০ সালে ভ্যান ডেন ব্রুক ও ১৭৩০ সালে আইজাক টিরিয়ান কর্তৃক। পর্তুগিজ ডুয়ার্তে বারবোসা (১৫১৪), ইতালিয়ান বারথেমা (১৫০৫), ইংরেজ রালফ ফিশ (১৫৮৪), পারকাস (১৬২১), ভেনিসের সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩), পর্তুগিজ সেবাসটিন মানরিক (১৬২৮), ইতালিয়ান নিকোলা মেনুচি (১৬৬৩), ফরাসি টাভার্নিয়ার (১৬৬৬) প্রমুখ ইউরোপীয় পর্যটকরা ব্যাপকভাবে সফর করে এদেশের নাড়িনক্ষত্রের গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এভাবে সংগৃহীত গোপন তথ্যসমূহ থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর লোলুপদৃষ্টি এদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও প্রত্যেকটি জাতিই থাবা বিস্তার করতে হন্যে হয়ে ওঠে। জার্মান সম্রাট টাভার্নিয়ারকে সাদরে আহ্বান করেছিলেন প্রাচ্য তথা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে একটি উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে। মেনুচি তো ইউরোপকে বলেই ছিলেন, *'ভারতের মুঘলশক্তির মর্মস্থল অতি দুর্বল, একজন সুদক্ষ কর্নেল মাত্র ত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে মুঘলশক্তিকে ধ্বংস করে*

---

৪৭. ঐ—পৃ. ৩২।

www.pathagar.com

দিতে পারে।[৪৮] এসব গোপন তথ্যাদি সম্বল করে বিপর্যয় ঘটানোরও দুরভিসন্ধি করেছিল। পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজদের এদেশীয় রাজনৈতিক ঘটনাসমূহে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসি বিরোধও এই দুরভিসন্ধিসঞ্জাত। অদৃষ্টদোষে তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রিক আবহাওয়া ছিল আরও কলুষিত ও বিষাক্ত, এবং অপর বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দুরা ছিল মুসলমান নবাবি শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিদ্বিষ্ট। এজন্যই ইংরেজরা বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র ও চাতুরীর খেলায় সফলকাম হতে পেরেছিল এবং পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের প্রহসন দেখিয়ে এদেশের শাসনদণ্ড অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল।

---

৪৮. Storia do Mogor, vol II, p. 7.

www.pathagar.com

কোম্পানি আমল

(১৭৫৭-১৮৫৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে সেই সাধারণ অর্থে বুঝতে চেষ্টা করেছি, যা সাধারণ্যে প্রচলিত। কোনো বিশেষ অর্থে নয়।

সাধারণ কথাবার্তায় বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'বুর্জোয়া' কথাটি ফরাসি ভাষার, অর্থ নাগরিক : মধ্যবিত্ত শ্রেণী : ব্যবসায়ী বা দোকানদার। বিশেষ অর্থে বোঝায় একটি সমাজ, যা কালচারে ধনী সম্প্রদায়ের এবং যারা শিল্প বা ব্যবসায়ে প্রভুত্ব করে ও যার আয় হচ্ছে ব্যবসায় ও শিল্পকর্ম যারা করে তাদের থেকে লব্ধ, অথচ যারা কায়িক পরিশ্রমে এসব কাজ করে না। আরও বিশেষ অর্থে বোঝায় ইউরোপে রেনেসাঁ ও রিফর্মেশানের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজে জাত প্রভাবশালী কালচার; আর পাক-ভারতে বোঝায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঞ্জাত পাশ্চাত্য কালচার অভিসারী নব্য সমাজ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে ব্যবসায়ী ও কেরানি সম্প্রদায় বোঝাত। ধনতান্ত্রিকতার বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে তাদের বোঝাত, যাদের ভূমি ছিল ও ভূমির আয় থেকে যাদের ব্যয় নির্বাহ হতো। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর একশ্রেণীর মালিকদের বলা হতো 'টেনিওর হোল্ডার' অর্থাৎ মধ্য স্বত্বাধিকারী—যারা জমির কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা ইত্যাদি উপরিস্বত্ব হিসেবে উপভোগ করত, কৃষিকাজে কিছুমাত্র সংশ্রব না রেখেও।

> বর্তমানে বুর্জোয়া বলতে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বোঝায়, যাদের আয়ের পরিমাণ মোটা; তার নিচে মধ্যশ্রেণী, যাদের আয় মাঝামাঝি পরিমাণের এবং তাদের নিচের শ্রেণীকে বলা হয় নিম্নমধ্যবিত্ত।[১]

আদিতে ইংল্যান্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বোঝাত। প্রথমত, আর্থিক বিন্যাসে তারা ছিল মধ্যবর্তী স্তরের—পুঁজিপতি এবং মজুর শ্রেণীর তুলনায়। তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকত, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান ও আচার-ব্যবহার হতো একই প্যাটার্নের। দ্বিতীয়ত, তারা

---

১. Modern Islam in India : C. W. Smith, pp. 308-09.

www.pathagar.com

কতকগুলো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুসারী ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তাদের এ মূল্যবোধ প্রকাশ পেত। আদর্শ হিসেবে এ শ্রেণী বুদ্ধির মুক্তি, সামাজিক প্রগতি, ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি উদার দৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিকতার উপাসক ছিল।

> এভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুসংবদ্ধ সমাজে পরিণত হয়ে উঠে এবং এসব নয়া মূল্যবোধে জীবনের প্রতি ক্ষেত্র প্রভাবিত করতে থাকে।[২]

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, মধ্যযুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হওয়ার উপাদানসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল, কিন্তু দানা বাঁধতে পারে নি। ইংরেজরা সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এই উপাদানসমূহের সদ্ব্যবহার করল। ধনিকতন্ত্র ধনতন্ত্রে এবং ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ার ক্রমের মধ্যে এদেশীয় বুর্জোয়াদের তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্বিভাব হলো স্বার্থের খাতিরে। মেকলের ভাষায়: 'তাঁরা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ'। ঐতিহাসিক টয়েনবি এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের বলেছেন 'লিয়াজোঁ অফিসার শ্রেণী'। তারা ব্রিটিশ শাসনকে গ্রহণ করল বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে। ইংরেজ এসেছে ও থাকবে; ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের। ইংরেজের যাওয়াটা কল্পনাতীত ও নানা দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়। অতএব ইংরেজের নিরাপদ আশ্রয়ে ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধি সঞ্চয়ই কল্যাণের পথ—এই ছিল নবপ্রসূত মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্যানধারণা ও স্বপ্নসাধ।

বলাবাহুল্য, নিছক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ব্রিটিশ জাতি ভারতে অনুগ্রহ ভিখারি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল। এদেশের মাটি থেকে তার উদ্ভব হয় নি। সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণদৃষ্টি থেকে এ শ্রেণীর জন্ম হয় নি। ব্রিটিশরা এ শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল তাঁবেদার অনুকারী হবার বীজমন্ত্র দিয়ে, নতুন ও মহৎ মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা যা কিছু দিয়েছিল, তা কেবল নিজেদের অর্থনীতিক ও সাম্রাজ্যিক চাহিদা মিটানোর 'বাবু' উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। এবং এ ছিল ঠিক ঘোড়ার সামনে গাড়ি বেঁধে দেওয়া।

> ব্রিটিশ শিক্ষানীতির ফলে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হলো, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকুরিতে ও কাউন্সিলে ব্যক্তিগত পদমর্যাদায় বৃত হওয়া, জনশিক্ষার প্রসার কিংবা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নয়।[৩]

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকিরণ, কারিগরি অর্থকরী শিক্ষার সম্প্রসারণ বিলম্বিত হলেও যেটুকু হয়েছিল তার পূর্ণ সুযোগ করল এই মুষ্টিমেয় শ্রেণী। সরকারি চাকুরে, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষকবৃন্দ সবই এই শ্রেণী থেকে আগত। পাশ্চাত্য

---

২. The Indian Middle Classes : Misra, p 7.
৩. Misra, p. 11.

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানত যেসব বাণিজ্যিক ও শিল্প সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত, এদেশে তারা প্রথমে সংখ্যায় নামমাত্র হলেও কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, আহমদাবাদ, জামশেদপুরে যাদের দর্শন মিলল তারাও ছিল এই নব্য ভাগ্যান্বেষী গোষ্ঠীয় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই তারা বিপুল ভাগ্যনির্মাণ করে উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বর্তমানে তারাই পাকিস্তান ও ভারতের অর্থনীতিগগনে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এবং উভয় দেশের আর্থিক ভাগ্য প্রায় তাদেরই কুক্ষিগত। অতএব তাদের গোষ্ঠীকে প্রথমে স্মরণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর তালিকা নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে :

১. কারবার (হৌস) সমূহের ব্যবসায়ী, গোমস্তা অংশীদারগণ, ডিরেক্টরগণ—উচ্চস্তরের পাইকারি ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও অর্থদাদনকারী কারবারসমূহ বাদে।

২. বেতনভোগী ম্যানেজার, ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার ও বিশেষজ্ঞ দল, যাঁরা কারবারে, ব্যাংকে, উৎপাদনকেন্দ্রে নিয়োজিত থাকেন।

৩. বণিক সভাসমূহের কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাজনীতিক দলসমূহের কর্মী ও অফিস কর্মচারী; সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলোর কর্মচারী।

   প্রাথমিক যুগে ইংরেজ বণিকের এজেন্ট, গোমস্তা মুৎসুদ্দি বা দেওয়ানরূপে এসব শ্রেণীর ব্যক্তিরা ইংরেজ রাজশক্তির একান্ত বশংবদ সার্থক ভৃত্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এদের জীবিকা তথা বৈষয়িক জীবনের উন্নতি ছিল সর্বতোভাবে ব্রিটিশ বণিকের করুণানির্ভর। *সম্পূর্ণ অভিনব অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বলে দেশীয় জনসাধারণ ও সমাজ জীবনের সঙ্গে তারা আত্মিক মিল অনুভব করে নি—দেশের হয়েও এরা দেশজ নয়।*[৪]

৪. ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী মালিকবৃন্দ (টেনিওর হোল্ডার); খাজনাভোগী ইজারাদারগণ; জলকর, বনকর প্রভৃতির উপস্বত্বভোগীরা; ভাগচাষের জমির উপস্বত্বভোগীরা।

   ভূমির সঙ্গে সম্পর্করহিত এসব শ্রেণীর লোকদের ভূমির মালিক বানিয়ে ইংরেজরা নিজেদের রাজ্যশাসনের ইমারত গড়েছিল—এদের স্কন্ধে ভর করে ইংরেজের ভারত শাসন হয়েছিল নিরাপদ, নির্ভয় ও অত্যাচারে নিঃশঙ্ক। শাসিত ও শাসকের মধ্যে এরা সেতুবন্ধের মতো বিরাজ করত। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর এরাই ছিল বশংবদ সন্তান। উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে জমিদারি স্বত্বের বিলোপ সাধন করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' রহিত হয়েছে ও এসব সরকার অনুগৃহীত গোষ্ঠীও

৪. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

ধ্বংসের মুখে। তবে তাদের স্থানে বর্তমানে ভাড়াটে বাড়ির মালিকদের উদ্ভব হয়েছে ও বাড়িভাড়াভোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. সরকারি চাকুরে ও অন্যান্য আধা-সরকারি কিংবা স্থানীয় সংস্থাগুলোর চাকুরে; জনসংস্থা, শিক্ষা, কৃষি, যানবাহন (রেলসহ) প্রভৃতি সংস্থাসমূহের চাকুরে।

৬. অনগণ্য সকল প্রতিষ্ঠানের কেরানি ও অন্যান্য শ্রেণীর চাকুরে।

৭. শিক্ষায়তনসমূহের শিক্ষক শ্রেণী; লোক্যাল, মিউনিসিপাল প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরে।

এঁরাই ইংরেজ সরকার আমলের বাবুর দল। কলম-পেষায় শারীরিক পরিশ্রম হলেও এঁরা শিক্ষিত এবং সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের চেয়ে সংস্কৃতি-অভিমানী। ইংরেজ সরকারে চাকরির সম্মান ও জীবনের নিরাপত্তার নিদর্শন পাওয়া যায় এসব প্রবাদ বাক্যে : যেমন—তেমন চাকরি ঘি-ভাত; লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। বর্তমানে অবশ্য এসব প্রবাদ বাক্যের মূল্য নেই।

৮. অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত ডাক্তার, উকিল, কম্পাউন্ডার মুহুরী, কলেজের অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক-লেখক শ্রেণী, সাংবাদিক শ্রেণী, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী, ধর্মীয় প্রচারক শ্রেণী ও ধর্মীয় পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা; প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রেণী।

৯. সম্পন্ন দোকান-মালিকগন ও হোটেল-মালিকগন এবং তাদের ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি।

১০. চা বাগান প্রভৃতি ক্ষেত্রের ম্যানেজার ও বেতনভুক্ত কর্মচারী।

১১. বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে, গবেষণাগারে নিযুক্ত ও শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ।

এ তালিকা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, সে চেষ্টাও করা হয় নি। কিছুটা মাত্র ইঙ্গিত দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ কীভাবে হয়েছে এবং ক্রমাগত হয়ে চলেছে, দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিটিশ ভূমিবিষয়ক আমূল পরিবর্তিত নীতির ফলে কেবল ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীদেরই উদ্ভব হয় নি, গ্রাম্য মহাজন শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছিল। তাদের শোষণ ও অত্যাচার কী পরিমণে অসহনীয় ছিল, তার পরিচয় মেলে 'মহাজনী আইন', 'চাষি ঋণসালিশি বোর্ড আইন' প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে এদের শোষণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায়। আরও উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব আইনে ভূমির স্বত্ব স্বামীত্ব সম্বন্ধে অভিনব বিধান থাকায় মামলা সৃষ্টির যে দিগন্ত খুলে গিয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে বহু শ্রেণীর চাকুরে ও উকিল-মোক্তারেরও স্বভাবতই ভিড় দেখা গেল এবং তার দরুনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

www.pathagar.com

সংখ্যা বিপুলায়তন হয়ে উঠল। ব্রিটিশের শাসন নীতি, ব্রিটিশের অর্থনীতি, বিচার ও ন্যায়নীতি এবং অন্যান্য নীতির ফলে সহসা দেশের আর্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হলো, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ করে জনৈক লেখক বলেছেন :

> গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে; নতুন মানুষ উপরে ভেসে উঠছে, আর যারা পূর্বে প্রধান ছিল, মুখ্য ছিল, তারা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, পূর্বে যেসব সূত্র সমাজ জীবনকে গ্রথিত করে রাখত, সেগুলো খসে পড়ছে; সমগ্র জন সাধারণই কোথায় গলে যাচ্ছে, সে রূপ ও রঙের আর সাক্ষাৎ মিলছে না। এই ধ্বংসকৃত সমাজদেহ থেকে নতুন চেহারা নিয়ে কী নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, এখনও তা কল্পনা করার সময় আসে নি।[৫]

কোম্পানি আমলে শোষণের খতিয়ান

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী দল কী মহামূল্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজদণ্ড এদেশবাসীর জন্য ক্রয় করেছিল, তার সঠিক খতিয়ান আজও নির্ণীত হয় নি, হওয়া সম্ভব নয়; কারণ কেবল লিখিত বিবরণ থেকে তার কিছুটা পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব, কিন্তু হিসাবের বাইরে যে বিপুল অর্থ সাগরপারে চালান গেছে, কীভাবে তার পরিমাণ ধরা যাবে?

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতির মানেই হলো, সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী ইতিহাস।

> ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসাব ধরে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান গেছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা, কিন্তু ১৯০০ সালের মূল্যমানের তিনশো কোটি টাকা।[৬]

মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চিখানা থেকে পাওয়া গেল পনেরো লক্ষ পাউন্ডের টাকা, অবশ্য বহুমূল্য মণিমাণিক্য দিয়ে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশ স্থলসেনা ও নৌসেনা পেল চার লক্ষ পাউন্ড; সিলেক্ট কমিটির ছয় জন সদস্য পেলেন নয় লক্ষ পাউন্ড; কাউন্সিল মেম্বাররা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউন্ড; আর খোদ ক্লাইভ পেলেন দু লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড, তাছাড়া ত্রিশ হাজার পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারিসহ বাদশাহ্ প্রদত্ত উপাধি 'সাবাত জঙ'। অবশ্য পলাশীবিজয়ী ক্লাইভের ভাষায় 'তিনি এত সংযম দেখিয়ে নিজেই আশ্চর্য।' মীর কাসিম দিয়েছেন নগদ দু লক্ষ পাউন্ড কাউন্সিলের সাহায্যের জন্যে। মীরজাফর নন্দন নজমদ্দৌলা দিয়েছেন এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাউন্ড। এছাড়া সাধারণ সৈনিক, কুঠিয়াল ইংরেজ কত লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছে, বলা দুঃসাধ্য। বিখ্যাত জরিপবিদ জেমস

৫. I. O. Miller, quoted by Misra, p 15.
৬. Advanced Hist. of India, p 807.

www.pathagar.com

রেনেল ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাইশ বছর বয়সে বার্ষিক হাজার পাউন্ডে নিযুক্ত হন এবং ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বিলাত ফিরে যান ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে। এ থেকেই অনুমেয়, কোম্পানির কর্মচারীরা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। তাঁরা এদেশে কোম্পানি রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে এবং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর হোমে প্রত্যাগত হয়ে এরূপ রাজসিক হালে বাস করতেন যে, *তাঁরা 'ইন্ডিয়ান নেবারস' রূপে আখ্যাত হতেন।*[৭]

লর্ড হেস্টিংস বেনারসের চৈৎ সিংহের নিকট প্রথমে পাঁচ লক্ষ, পরে দুই লক্ষ টাকা গ্রহণ করে পুনরায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাবি করেন, কিন্তু চৈৎ সিং দিতে অশক্ত হওয়ায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জমিদারি দান করা হয়। অযোধ্যার বেগমদের নিকট থেকে তিনি প্রথমে ত্রিশ লক্ষ, পরে পঁচিশ লক্ষ এবং শেষে বলপ্রয়োগ করে এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।

এসব তো ব্যক্তিগত মুনাফার নগদ মুদ্রার অঙ্ক। কোম্পানির কর্মচারীরা ও তাদের এদেশীয় মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, গোমস্তারা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। লোককে জুলুম করেও বিপুল অর্থ গ্রহণ করেছেন। ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, 'আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলা প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় নি।' অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। একমাত্র লবণ ব্যবসায়ে বৈধরূপে গভর্নর সাড়ে সতেরো হাজার ও কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য সাত হাজার পাউন্ড বর্ধিত হারে গ্রহণ করতেন, এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদে সাহেবদের ছিল বিভিন্ন হারে বরাদ্দ।

এ শোষণ পর্ব চলেছিল তিনটি পর্যায়ে : (১) প্রত্যক্ষভাবে লুণ্ঠন; (২) বিদেশি বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংস; (৩) বিদেশি মূলধন দ্বারা অন্যান্য উপায়ে পরোক্ষভাবে শোষণ। এদেশের তুলা ও বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বাজার বিলেতি বস্ত্রে ছেয়ে যায়। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯০ খ্রি. পর্যন্ত এদেশে বার্ষিক বস্ত্রাদি আমদানি হতো বারো লক্ষ পাউন্ড মূল্যের, ১৮০৯ সালে তার পরিমাণ ওঠে এক কোটি চুরাশি লক্ষ পাউন্ডে। এদেশি তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোম্পানি নীতিগ্রহণ করে যে, এ দেশ থেকে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস করে দিয়ে কাঁচা তুলা ও রেশমের উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হবে। *তাঁতিদের নিজ নিজ তাঁতে কাজ না করে কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হবে।*[৮] তার ফলে তাঁতি সম্প্রদায়ই ধীরে ধীরে কীভাবে লোপ পেয়ে গেল, তার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন জওয়াহেরলাল নেহরু :

৭. The Indian Nabobs—P. Spear দ্রষ্টব্য।
৮. British Policy and the Muslims in Bengal : A. R. Mullick, p. 57.

www.pathagar.com

তাদের কী গতি হবে? পুরানো পেশা তাদের বন্ধ হয়ে গেল, নতুন পেশার দ্বার উন্মুক্ত নেই। তাদের অবশ্য মৃত্যুর পথ খোলা ছিল। এবং তারা লক্ষে লক্ষে মৃত্যুবরণ করল। ভারতের ইংরেজ গভর্নর লর্ড বেনটিংক ১৮৩৪ সালের রিপোর্টে বলেছিলেন, 'তাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনীর কোনো তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। তাঁতীদের অস্থিতে ভারতের পথপ্রান্তর শুভ্র হয়ে উঠেছে'।[৯]

পলাশীর পর অর্ধ শতকের মধ্যে বাংলার তুলা ও রেশম বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য কুটিরশিল্প একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল। বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত হয়ে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল পরনের বস্ত্র ও প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্যে। পৃথিবীতে বাণিজ্যক্ষেত্রে তার ঈর্ষাজনক স্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; দু হাজার বছরের খ্যাত রপ্তানির দেশ হলো মাত্র আমদানির দেশ, বিদেশি পণ্যদ্রব্যের খোলাবাজার মাত্র। আরও মর্মান্তিক হলো, এদেশের কাঁচামাল তুলাদি বিলেতে বহন করে তাই দিয়ে তৈরি পণ্য এদেশে আমদানি করা হতে লাগল।

বহু বিদেশি ও এদেশি লেখক বলেছেন, ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল *'ভারতীয় উপমহাদেশের লুণ্ঠিত ধনসম্পদের বলে।'* ইংল্যান্ডর যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠল এদেশের হস্তশিল্পকে পিষে মেরে। নির্মমভাবে এদেশের প্রত্যেকটি শিল্পকে হত্যা করা হয়েছে ব্রিটিশের স্বার্থে। যেটুকু দেশজ শিল্প ছিল, তার ধ্বংস করে দেশটা পুরোপুরি কৃষিজীবী দেশে পরিণত হলো। লক্ষ লক্ষ কুশলী বেকার শিল্পজীবী চাষবাসের উপর নির্ভর করতে লাগল।

আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হলো, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এ বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ লোক মরেছে, চাষের চরম অবনতি ঘটেছে। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিস হিসাব কষে ও কড়া চাপে নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশি টাকা আদায় করেছে; রাজস্বের শতকরা একভাগও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের দুঃখমোচনের জন্য খরচ করেন নি। বরং বাখরগঞ্জ জেলার ৩৩,৯১৩ মণ চাউল বিক্রয় করে ৬৭,৫৯৩ টাকা মুনাফা লুটেছেন, ঢাকার ৪০,০০০ মণ চাউল বাঁকীপুরের সেনানিবাসে গুদামজাত করেছেন।

এমনকি যে তাজমহলকে স্থপতিরা পৃথিবীর বুকে স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেন, নির্মাণকর্মে ২৩০,০০০,০০০ ডলার ব্যয়িত হয়েছিল এবং যার পরিকল্পনামানস সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়ীর মানসকেও ম্লান করে লজ্জা দেয়—সেই তাজমহলটিকে ভেঙে তার মাল-মসলা আত্মসাৎ করার জন্যে ভারতের অন্যতম পরম দয়ালু ও কল্যাণসাধক বড়লাট হিসেবে বন্দিত লর্ড বেনটিংক একবার একজন হিন্দু কন্ট্রাকটরকে মাত্র ১,৫০,০০০ ডলারে বিক্রয় করারও চুক্তি করেছিলেন।[১০]

৯. The Discovery of India : Nehru, p. 352.
১০. The Round the World Traveller-Lorenz; p. 379.

www.pathagar.com

> ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হাম্মামখানা উপড়ে নিয়ে বিলাতে রাজা চতুর্থ জর্জকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং লর্ড বেনটিংক, প্রাসাদটির অন্যান্য অংশ বিক্রয় করে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন।[১১]

ইংরেজ আমলের আগে বাংলার যে অবস্থা, তার বিশদ বিবরণ দিয়ে গেছেন ট্যাভার্নিয়ার, মেনুচি, বার্নেয়ার প্রভৃতি। স্বয়ং ক্লাইভই বলেছেন, ১৭৫৭ সালে তাঁর মুর্শিদাবাদে প্রবেশকালে এই শহর লন্ডন শহরের চেয়ে সুবিস্তীর্ণ ও জনবহুল ছিল, তবে মুর্শিদাবাদ শহরে কোনো কোনো ব্যক্তি এরূপ প্রভূত ধনের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদের ন্যায় বিত্তশালী ব্যক্তি লন্ডন শহরে একটিও ছিল না। এসব তুলনামূলকভাবে বিচার করে বেদনায় আপ্লুত হয়ে চিন্তা করতে হয়, মনুষ্যত্বের প্রতিকারহীন কী গভীর অমর্যাদাকর পঙ্কে আমাদের নিমজ্জিত করে গেছে ইংরেজ জাতি। সমকালীন অবস্থা চিন্তা করে এডমন্ড বার্ক উক্তি করে গেছেন :

> আমাদের আজ যদি ভারত ছাড়তে হয়, তাহলে ওরাং ওটাং বা বাঘের চেয়ে কোনো ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এদেশ ছিল, তার প্রমাণ করার কিছুই থাকবে না।

১৮৬২ সালে কোম্পানির শাসন আমল সমাপ্তির ঠিক পূর্বেই বলেছিলেন জন ব্রাইট :

> ভারতের নিরীহ জনগণের উপর একশো বছরব্যাপী অকথ্য অপরাধসমূহের ইতিহাস মাত্র।[১২]

ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী

আঠারো শতকের মধ্যভাগে পলাশীর পর ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তাদের আদি পুরুষরা ছিল ইংরেজ হৌসে ও ব্যাংকিং কর্মে নিযুক্ত দালাল পর্যায়ের। গোমস্তা, মুনিব, বৈশ্য, বেনিয়ান নামে তারা খ্যাত; মাদ্রাজে তাদের নাম ছিল দোভাষ; ইংরেজরা তাদের বেনিয়ান বলেই উল্লেখ করত। কারবারে, কুঠিতে তারা মূল্য আদান-প্রদানের জন্য দায়ী থাকত। টাকা দাদন দেওয়া, পণ্য সংগ্রহ করা, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তাদের কর্তব্য ছিল। গাড়ি, বলদ, উট প্রভৃতি সংগ্রহ করে পণ্য চলাচলের ব্যবস্থার জন্যও পৃথক বেনিয়ান থাকত।

ড. ফ্রেয়ার বেনিয়ান শ্রেণী সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন তিনি মসলিপট্টমে উপস্থিত হন, তখন একদল লোক দেখলেন, যাদের পরনে পাজামা, গায়ে চটকদার জামা, মাথায় কেলিকোর পাকানো পাগড়ি জড়ানো ও কোমরবন্দ আঁটা। তারা ভাঙা ইংরেজি বলতও সামান্য মজুরির বিনিময়ে বিদেশির

---

১১. India : Chirol : p 54; The Story of Civilisation, Our Orental Heritage, by Will Durant : pp. 609-10.

১২. Oxford Hist. of India, p. 680.

www.pathagar.com

কাজ করে দিত। তারা শহরেই বাস করত ও বিদেশিদের পাশে পাশে ঘুরত দোভাষীর কাজ করে দিতে। জরিপবিদ রেনেল বাংলাদেশেই প্রায় এক হাজার এরূপ দোভাষী দেখেছিলেন। আরও একশ্রেণীর লোক ছিল যারা 'শরফ' এবং বিদেশি বণিকদের পোদ্দারি কর্ম করত। টাকা আদান-প্রদান ঋণের ব্যবস্থা প্রভৃতি তাদের কাজ ছিল। বেণীদাস নামক পোদ্দার মাসিক শতকরা ৫।৮ হারে বাট্টায় কোম্পানিকে দুলাখ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা করেছিল।

পাইকারদের কাজ ছিল টাকা দাদন দিয়ে কুটিরে কুটিরে পণ্য সংগ্রহ করা। তারা পদব্রজে (পা-ইক) বাংলার কুটিরশিল্প প্রধান গ্রামে গ্রামে, গঞ্জে ও আড়ং-এ শিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করত। ঢাকার রামগঙ্গা নামক পাইকার তাঁতবস্ত্র সংগ্রহ করত। সে বিপুল টাকা দাদন দিয়ে তাঁতিদের কাছ থেকে বস্ত্র সংগ্রহ করে বাড়িতে গুদামজাত করত এবং কোম্পানির কঠিয়ালকে সরবরাহ করত। দালালরা গোমস্তা, মুৎসুদ্দির মতো কমিশন হারে (দস্তুরি) পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করত।

এই পাইকার, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি শরফ বা পোদ্দাররাই ছিল ইংরেজদের এদেশে বাণিজ্যিক যোগসূত্র। চীনদেশের Compradore-দের সঙ্গেই তাদের তুলনা করা যায়। এরাই কোম্পানির বেনামিতে পৃথক বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করত। এদেরই পুরোধায় ছিল জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ এবং এরাই পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভকে সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিল। কারণ কোম্পানির বিজয়লাভে তাদেরই ব্যবসায়িক লাভ। মীর কাসিমের সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ বাঁধে এদেরই বাণিজ্যিক দুর্নীতির জন্যে। তিনি দাবি করেছিলেন :

> কোম্পানির কোনো কর্মচারী, এজেন্ট, গোমস্তা বা অন্যবিধ বশংবদ দেশের সরকারের (নওয়াবের) অধীনে কোনো কাজ করতে পারবে না, জমিদার বা কালেকটারগণকে টাকা কর্জ দিতে পারবে না, কারণ এসব ক্ষেত্রে কোম্পানির সঙ্গে নওয়াবের সংঘর্ষ অনিবার্য।

কোম্পানি এ দাবি মানে নি, কারণ তাহলে এসব অনুগৃহীতের নিজস্ব ব্যবসার বন্ধ হয়ে যেত এবং তার ফলে তারা দালাল পাইকারদের স্তরেই থাকতে বাধ্য হতো, ব্যবসায়ীর মর্যাদায় উন্নীত হতে পারত না। এসব ব্যবসায়ীদের প্রভূত অর্থাগমের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে গেল এবং কল্যকার গোমস্তা অর্থবলে নওয়াবের পদস্থ কর্মচারীদেরকেও অমান্য করতে ও অপমান করতে সাহসী হয়ে উঠল। এমন একটি নজির মেলে, তিরহুতের ফৌজদার শাকীর উল্লাহকে ইমামবখশ নামক জনৈক সোরা গোমস্তার তুচ্ছ কারণে অপমান ও মারপিট করার ঘটনায় (১৭৭৭)। এসব কারণে ফৌজদারের পদ রহিত করে ১৭৮১ খ্রি. থেকে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়মে নীতি প্রবর্তিত হয়।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত সমৃদ্ধি লাভের কারণসমূহের মধ্যে এগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়ের অংশীদারি লাভ : ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, দুর্নীতি ও লুণ্ঠনবৃত্তির দরুন কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকলেরই হাতে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হয়ে উঠে। ছলে-বলে-কৌশলে এদেশি এজেন্ট-গোমস্তারা বিপুল অর্থের মালিক হয়ে পড়ে ইংরেজ কর্মচারীদের সহায়তায়। তন্মধ্যে লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতির অবাধ বাণিজ্যে তাদের বিপুল অর্থাগম হতে থাকে।

২. ভূমি ও জমিদারিতে অর্থনিয়োগ : ভূমিস্বত্বের আইন ত্রুটিহীন না হওয়ায় এই শ্রেণীর মধ্যবিত্তরা সরকারি ভূমি তত্ত্বাবধানের সুযোগে বিপুল ভূমির মালিকানা স্বনামে-বেনামে লাভ করতে থাকে, অথচ কোম্পানির জমিদারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, গোবিন্দরাম নামক জনৈক ব্যক্তি কোম্পানির কলকাতা জমিদারির তত্ত্বাবধানকালে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা তছরুপ করে ফেলে, অথচ তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৫০ টাকা। অনুসন্ধানে জানা যায়, সে সমস্ত টাকা খাটিয়ে প্রভূত ভূসম্পত্তি অর্জন করেছে। কিন্তু তার কোনো শাস্তি হলো না, তছরুপকৃত অর্থও দাবি করা হলো না। অজ্ঞাত রহস্যে কাউন্সিল তাকে নিষ্কৃতি দিল। *শুধু তাই হলো না, পলাশী যুদ্ধের পর তাকে কলকাতার নায়েব জমিদার পদে উন্নীত করা হলো।*[১৩] রামচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ অন্যান্য অনেকের মতো ইংরেজের পলাশী বিজয়ে ভাগ্যনির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন ক্লাইভের খাস অনুচর। তবুও ক্লাইভকে ভাঁওতা দিয়ে মুর্শিদাবাদের মালখানা থেকে তাঁরা কোটি কোটি মুদ্রার হীরা-জহরৎ গোপন করে মীরজাফরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। এসব টাকা তাঁরা ভূসম্পত্তিতে লগ্নি করেছিলেন এবং বিলাস-ব্যসনেও উড়িয়েছিলেন। রামচন্দ্র কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে যান। নবকৃষ্ণ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং মাতৃশ্রাদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে অতি সাধারণ ব্যক্তিও অসামান্য ধনী হয়ে গেছে। হাটখোলার মদনমোহন দত্ত কোম্পানির সামান্য বেনিয়ান থেকে কয়েকটি জাহাজের মালিক ও প্রসিদ্ধ ব্যাংকার হয়েছিলেন। রামদুলাল দে ছিলেন ফেয়ার্লী কোম্পানির চার-পাঁচ টাকা মাস মাহিনার গোমস্তা। কিন্তু দালালি করে তিনি ষাট লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যান। তাঁর পুত্র আশুতোষ দে পামার অ্যান্ড কোম্পানির বিখ্যাত হৌস ১৮৩০ সালে ক্রয়

১৩. Calcutta Review, iii (1845.)

www.pathagar.com

করেন। তখন কলকাতার আবহাওয়া ছিল এসব বেনিয়ান মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীর অনুকূলে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে ছিল তাদের স্বর্গরাজ্য, সামান্য নগণ্য লোকেরা রাতারাতি লক্ষপতি, কোটিপতি হয়ে গেছে রহস্যময় নীতি অনুসরণ করে।

৩. আন্তঃশুল্ক : জমিদারির মধ্য দিয়ে পণ্য যাতায়াত কালে একটা মাশুল দিতে হতো। কোম্পানি ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এ মাশুল রহিত করে বশংবদ ব্যবসায়ীদের সুরাহা করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে অনুগৃহীত ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করা হতো, যার দরুন সাধারণ মানুষই বেশি অসুবিধা ভোগ করত।

৪. ইউরোপীয় কালোনাইজেশনের বাধানিষেধ : কোম্পানি আপন স্বার্থে অন্য ইউরোপীয়ানকে এদেশে প্রবেশ করতে দিত না। ব্যবসায়িক এ নীতি 'অত্যন্ত ক্ষতিকর' গণ্য হতো। আর 'বেঙ্গল নেটিভ' ভিন্ন অন্য গোমস্তা, এজেন্ট নিয়োগের নিষেধ থাকায় বাঙালি ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পোয়াবারো অবস্থা হয়েছিল। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের আইনে কলকাতার চারদিকে দশ মাইলের মধ্যে কোম্পানির কর্মচারী ব্যতীত কোনো ইউরোপীয়ানের বাস নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য ইউরোপীয়ানরা কুঠি স্থাপন করে বংলার প্রধান ফসল উৎপাদনে সাহায্য করতে পারত। এই সাহায্যকরণের অজুহাতে বাংলায় নীল চাষের প্রবর্তন হয় এবং ১৮২১ সাল থেকে প্রায় চৌষট্টি হাজার মণ নীল কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানি হতো। এ কাজে আমলা, দেওয়ান, গোমস্তা নিয়োগ কম হতো না। তারা মাহিনা ও দস্তুরি ব্যতীত প্রভূত অর্থ দুর্নীতিবলে উপায় করত এবং এসব অর্থ নীল চাষের জমি ক্রয়ে লাগাত। তাদের সমবায়ে নীলকর সাহেবরা বাংলার কৃষককুলের ওপর মনুষ্যত্ত্বের প্রতিকারহীন কী সীমাহীন নির্যাতন ও অত্যাচার করত, তার মসিচিত্র কিছুটা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এ বিধৃত হয়েছে। এইরূপ আফিম, চিনি, চা ও কফি চাষাবাদের ব্যাপারেও এ শ্রেণীর মধ্যবিত্তরা নিজেদের ভাগ্য নির্মাণ করত। এভাবে কোম্পানি দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যোদয়ে কম সাহায্য করে নি।

৫. ইংরেজ এজেন্সি হৌসের প্রতিষ্ঠা : দেশীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণপূর্বক ব্যবসায় প্রসারের উদ্দেশ্যে ইংরেজ হৌস বা কারবারগুলোর প্রতিষ্ঠা হয়। এগুলো যৌথসংঘের নীতিতে পরিচালিত হতো। দেশি পণ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহের কর্মে হিন্দু বেনিয়ান, এজেন্ট, গোমস্তাকুলই ছিল এসব হৌসের দক্ষিণহস্ত। এজন্য এসব বশংবদ শ্রেণীকে যৌথসংঘের নীতিতে

www.pathagar.com

শিক্ষানবিশি করতে হতো। বাঙালি ও কিছু ফরাসি এ শিক্ষানবিশির সুযোগ লাভ করত। কালক্রমে তারাও স্বতন্ত্র যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করতে থাকে।

এসব বিলেতি হৌসে কোম্পানির কর্মচারীরা উদ্বৃত্ত টাকা খাটাতো। তাদের সঙ্গে হিন্দু কর্মচারীরাও এ সুযোগ পেত এবং অধ্যবসায়ী কর্মীরা পরে নিজেরাই সেই হৌসটির মালিকানা লাভ করত, কিংবা নিজেরা স্বতন্ত্র যৌথ কারবার স্থাপন করত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এসব হৌস ও ব্যাংকিং কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি মুদ্রা সঞ্চয় বাবদ ইংল্যান্ডে চালান যেত।

৬. অবাধ বাণিজ্য : অবাধ বাণিজ্য নীতিতে সবরকম বাধা দূরীভূত হওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির পথও সুগম হয়ে যায়। কোম্পানি নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে এ নীতির প্রবর্তন করে নি, নিজের বিনিয়োগ প্রথাটি নিরঙ্কুশ রেখেই এ নীতির অনুসরণ করেছিল। অবশ্য অবাধ নীতির ফলে নব্বই ভাগ সুবিধা ভোগ করেছে কোম্পানি এবং দশ ভাগ মাত্র পড়েছে এ দেশীয় ব্যবসায়ীদের ভাগ্যে, কিন্তু এই এক-দশমাংশই তাদের পক্ষে বৃহৎ হয়েছিল। এ পন্থাটি অনুসৃত হয়েছিল ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি অর্জন করার পর। পূর্বে চার-পাঁচ লক্ষ পাউন্ড বার্ষিক মুনাফা হিসেবে স্বর্ণপিণ্ডে ইউরোপে পাঠাতে হতো কোম্পানিকে; এখন সে টাকা কাঁচামালে পাঠানোর সুবিধা হলো। এমনকি যেসব কোম্পানির কর্মচারীরা অবসর গ্রহণ কালে এ টাকা নগদ নিয়ে যেত, তারাও এ টাকাটা বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা লাভের সুযোগ পেল। চার্লস গ্রান্টের মতে দেওয়ানি লাভের ত্রিশ বছর পর এরূপ বিনিয়োগ প্রথার মুনাফা হিসেবেই বার্ষিক পাঁচ কোটি পাউন্ড বাংলা থেকে সাগরপারে গেছে পলাশীর যুদ্ধজয়ের পরবর্তী কয়েক বছর ধরে কোম্পানির বিলেতি কর্মচারীরাও এদেশি অবাধ বাণিজ্য নীতির আশ্রয় নিয়ে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির একচেটিয়া ব্যবসায়ে অগাধ টাকা লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু অসহায় জনসাধারণকে তার চাপটা সহ্য করতে হয়েছে। বিলেতের ডিরেকটররা এই দুর্নীতিটা সম্যক অবগত হয়েও প্রতিকার করতে সক্ষম হয় নি। এ নীতির ফলে এদেশে উৎপাদন শক্তি যতটা না বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি বেড়েছে নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য। নিচের মূল্য তালিকা থেকে তার কিছুটা পরিচয় মিলবে :[১৪]

১৪. 6th Report Sel. Com. H. C. 1782-83.

www.pathagar.com

দ্রব্যাদি	মুর্শিদাবাদে মূল্য ১৭২৮ সা	টাকায়	কলিকাতায় মূল্য ১৭৭৬ সাল	টাকায়
মিহি চাউল ১নং	১ মণ	১০ সের	০	১৬ সের
মিহি চাউল ২নং	১ মণ	২৩ সের	০	১৮ সের
মিহি চাউল ৩নং	১ মণ	৩৫ সের	০	২১ সের
মোটা চাউল ১নং	৪ মণ	১৫ সের	০	৩২ সের
মোটা চাউল ২নং	৪ মণ	২৫ সের	০	৩৭ সের
মোটা চাউল ৩নং	৫ মণ	২৫ সের	১ মণ	০
মোটা চাউল ৪নং	৭ মণ	২০ সের	৯ মণ	১০ সের
গম ১নং	৩ মণ	০	০	৩২ সের
গম ২নং	৩ মণ	৩০ সের	০	৩৫ সের
সরিষার তৈল ১নং	০	২১ সের	০	৬$\frac{১}{২}$ সের
ঘৃত	০	১০$\frac{১}{২}$ সের	০	৩ সের

পূর্বে তন্তুবায় শ্রেণীর স্বাধীনতা থাকত যে কোনো দেশের ব্যবসায়ীর কাছে সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা বা দাদন করার। কিন্তু অবাধনীতি প্রবর্তিত হলেও তন্তুবায়দের স্বাধীনতা লুপ্ত হলো। তারা কোম্পানি ও তাদের বশংবদ এদেশি 'বাবু' ব্যবসায়ীদের কাছে থেকেই থেকেই দাদন গ্রহণ করতে ও তাদের নির্ধারিত মূল্যে মাত্র তাদেরকেই পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। অথচ ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ও তাদের অনুগৃহীতের দল নীলচাষিদের মতো তাঁতিদের ভয় দেখিয়ে কাপড় বুনতে বাধ্য করত, কিন্তু দামের বেলায় কখনো ন্যায্য দিত না। *কোম্পানির গোমস্তাদের কাছে প্রায় ক্ষেত্রে বাজার দরের চেয়ে শতকরা ১০ থেকে ৪০ ভাগ দাম কম দেওয়া হতো।*[১৫] আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। মার্কিন, তাসকান, জেনোয়াবাসী প্রভৃতি বিদেশি বণিকরা এদেশে বাণিজ্য করত কাঁচামাল ও মসলাদির রপ্তানির, কিন্তু তারা মূল্যটা স্বর্ণপিণ্ডে ব্যাংক মারফত ইংল্যান্ডে পাঠাতে বাধ্য থাকত, তার ফলে পণ্যটা বের হয়ে যেত বাংলা প্রদেশ থেকে কিন্তু তার স্বর্ণমূল্যটা জমা হতো ইংল্যান্ডে। এটিও ছিল অবাধনীতির অভিনব মহিমার আরেকটি।

এ সময়ে কলকাতা ও বোম্বাইয়ে বাণিজ্যিক প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাঙালি ব্যবসায়ী আশুতোষ দে ও দ্বারিকানাথ ঠাকুর বোম্বাইয়েও এজেন্সি ব্যবসায় চালাতেন পামার অ্যান্ড কোম্পানির মালিক হওয়ার পর।

১৮৩৩ সালের পূর্বে এদেশের কৃষি ও বাণিজ্যিক কারবারগুলোর তদারক করত অশিক্ষিত সাধারণ ঘরের ইংরেজরা, শিক্ষিত ভদ্রবংশের ছেলেরা এসব কাজে

১৫. British Policy and the Muslims in Bengal : A. R. Mullick, p. 57.

www.pathagar.com

আসত না। প্রশ্নটি যখন বিবেচিত হয় ১৮৩১-৩২ সালে, তখন রাজা রামমোহন রায় বিলেতে। *রাজার কণ্ঠ থেকে বিশ্বজনগণের স্বাধীনতার নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু তিনিই আবার নীলকর সাহেবদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন।*[১৬] তিনি এদেশে নীল, চা, কফি, চিনি, পাট প্রভৃতি কৃষিশিল্পে ইংরেজ নন্দনদের আরও বেশি আমদানির নীতি সমর্থন করে বলেছিলেন, *ভদ্রবংশের শিক্ষিত ছেলেরা নেটিভদের অপেক্ষাকৃত কম নির্যাতন করবে, অতএব পরবর্তী বিশ বছর ঘরানা লোকদের দিয়ে কলোনাইজেশন করতে হবে।*[১৭] অতএব কলোনিকরণ নীতি সমর্থিত হলো ভারতীয় রাজার দ্বারাই। তার ফলে এদেশের কৃষি ও বাণিজ্য যতটুকু না প্রসারিত হয়েছে, লাভবান হয়েছে কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ বন্দর ও নগরের ভারতীয় বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই, কারণ তার ফলে এদেশ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ 'সাহেবকুল' ভারতীয়দের দ্বারাই তাঁদের কাজকর্ম করিয়ে নিতেন। সে জন্য মুনাফার মোটা অংশটা যেত 'সাহেবদের মারফত সাগরপারে, আর দস্তরখানায় পড়ে থাকা অভুক্তাংশের মতোই ছিটেফোঁটা অংশ মিলত এ দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যে। কিন্তু এই উচ্ছিষ্টাংশ সংগ্রহ করায় নেটিভদের মধ্যে কাড়াকাড়ির অন্ত ছিল না।

অবশ্য এই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের এ দেশীয় ভাগ্যে পতিত অংশটার ষোলো আনাই গ্রাস করত বাঙালি হিন্দুরা। তারা প্রথমে নগণ্য সেবকদের মতো বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল, গোমস্তা, দোভাষী প্রভৃতি নামাঙ্কিত হয়ে ইউরোপীয় হৌসে প্রবেশ করত, ব্যবসার ফন্দি-কৌশলগুলো আয়ত্ব করত, তারপর নিজেরা সামান্যাকারে ব্যবসা ফেঁদে বসত। এভাবেই রামদুলাল দের পুত্র আশুতোষ দে চার্লস কান্টর কোম্পানির রেলি ব্রাদার্সের বেনিয়ান হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন। এভাবেই বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ জয়রাম আমিনগিরি করে প্রথমে অন্নসংস্থান করতেন; তাঁর পৌত্র দ্বারিকানাথ প্রথম নিমকি সাহেবের সেরেস্তাদারি করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর হিসেবে ব্যবসায় ও জমিদারিতে জ্যোতিষ্করূপে গণ্য হতেন। ১৮৩৫ সালের বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে দেখা যায়, কলকাতা চেম্বার অব কমার্সের শাসন পরিষদে তিনিই একমাত্র ভারতীয় সভ্য। ১৮৫৮ সালের বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের ১০৩ জন সভ্যের মাত্র পাঁচ জন ভারতীয়; তার এক জন ফরাসি ও চার জন বাঙালি হিন্দু। ব্যাংক-এর দিকেও ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি হিন্দুরাই ছিল সর্বাধিক। ইউনিয়ন ব্যাংকের তিন জন ট্রাস্টির একমাত্র ভারতীয় আশুতোষ দে। তার তিন জন ডিরেক্টর বাঙালি হিন্দু এবং ১৮৩৫ সালে দু শ দুজন মালিকের মধ্যে তিয়াত্তর জন ভারতীয়, তার সত্তর জন বাঙালি হিন্দু। বিভিন্ন

---

১৬. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃ. ১৩৩-১৩৪।
১৭. Report Sel. Com. H. C. 1831-32.

www.pathagar.com

ব্যাংকে, হৌসে, কারখানায় ও বাণিজ্যিক অফিসে ভারতীয় কর্মচারীদের প্রায় সকলেই বাঙালি হিন্দু। *১৮৫৮ সালে সরকারি সেভিং ব্যাংক পরিচালনায় ৩৪ জন কর্মচারীর সকলেই বাঙালি হিন্দু ছিল।*[১৮]

বাঙালি হিন্দু বেনিয়ান ও সরকাররাই বাণিজ্যিক সকল ক্ষেত্রে 'নেটিভদের' প্রতিনিধিত্ব করত। তারা অন্যান্য কর্মেও নিয়োজিত হতো এবং সরকারও একমাত্র তাদেরই অস্তিত্ব স্বীকার করত। *দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১৮৩৫ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের পেটি জুরি তালিকাতে ৯৯ জনের নাম ছিল, তার মধ্যে ৯৬ জন বাঙালি হিন্দু এবং তারাও ছিল ৫৪ জন বেনিয়ান বা সরকার, ২৮ জন মুনশি, ১০ জন জমিদার, ৪ জন কেরানি ও ৩ জন ব্যাংকার।*[১৯] ফরাসিরা বোম্বাইয়ে ও ব্রাহ্মণরা মাদ্রাজে এ প্রকার একচ্ছত্র অধিকারী ছিল।

অবাধ নীতির ফলে কলকাতায় বহু বাণিজ্যিক সংঘ স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৩০ সালে কলকাতা ট্রেড-অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৩৪ সালে কলকাতা চেম্বার অব কমার্স এবং ১৮৫৪ সালে নীলকর সমিতি উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যতীত এসব সংঘের আরও কর্তব্য ছিল ব্রিটিশ রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ের তথ্য, পরিসংখ্যান প্রভৃতি সংগ্রহ করা—পথ, জলপথ, সেচপ্রণালি, রাজস্ববিধি ও তৎসম্পর্কিত আইনসমূহ, ব্যক্তি-সম্পত্তি, বাণিজ্য, শিল্প সম্পর্কিত অধিকার ও আইনসমূহ, এমনকি বিচার বিভাগের কাজেরও। বলাবাহুল্য, এসব তথ্য সরবরাহের কাজ ছিল বেনিয়ান, সরকার প্রভৃতি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কারণ এরাই ছিল ইংরেজদের এদেশ দর্শন-শ্রবণের চক্ষু-কর্ণ; ইংরেজদের নিকট এদেশের গণ ও সমাজজীবনের সেতুবন্ধ স্বরূপ।

> ভারতীয় সমাজ, সমাজজীবন, রীতিনীতি, বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের পাঠ এরাই ইংরেজদের সরবরাহ করত; আর বৈষয়িক এবং শাসনকার্যাদির ব্যাপারে ইংরেজকে এদের উপরেই নির্ভর করতে হতো।[২০]
>
> এই স্বার্থ সংরক্ষণের গরজটা ইংরেজ ও এই শ্রেণীর হিন্দু মধ্যবিত্তদের এতখানি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল যে, ১৮৮৮ সালে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে বেঙ্গল চেম্বার অব সমার্সের তদানীন্তন চেয়ারম্যান ডেভিড ইয়ুলকে আহ্বান করতে চক্ষু লজ্জায় বাধে নি।[২১]

কোম্পানি আমলের এক শ বছরের বাণিজ্যিক গতি-প্রগতির ইতিহাস অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, কী স্বার্থের ডোরে ইংরেজরা এবং এদেশের একশ্রেণীর বর্ণহিন্দু সন্তানেরা বাঁধা পড়েছিল এবং অনুগ্রাহক সাহেববৃন্দ

---

১৮. Misra, p. 103-4.
১৯. Bengal Directory, 1854, p. 470-81.
২০. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১০ পৃ.।
২১. Misra, p. 105.

www.pathagar.com

অনুগৃহীত নেটিভদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপায়িত করেছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনায় ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান করে বংলার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপ সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এমন কি এই লৌহ খুঁটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রাজা রামমোহনের নামও স্মরণীয়। 'তিনি কোম্পানির কাগজ কিনতেন এবং ব্যবসা করতেন, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিতেন, তাঁদের কয়েকজনের আনুকূল্যে তিনি কয়েক মাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি এবং কিছুকাল টমাস উডফোর্ডের ও দীর্ঘ বছর জন ডিগবির ব্যক্তিগত দেওয়ানরূপে কাজ করেন। এই সব বৈষয়িক কর্ম, ব্যবসা এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-সাহচর্য থেকে রাজার প্রভূত অর্থ সমাগম হয়েছিল, *তিনি বিভিন্ন স্থানে তালুক এবং কলকাতায় একাধিক বাড়ি ক্রয় করেছিলেন'*।[২২] রাজনৈতিক ও অর্থোপার্জনের সুবিধা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও সুখশান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীর মতো রাজা রামমোহনেরও কর্ম, চিন্তা ও মানস জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল, কারণ ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহচর্যে লাভবান স্বধর্মী অন্যান্যের মতো *তিনিও ভারতে ইংরেজ বিজয়কে ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ জ্ঞান করতেন*।[২৩] কৌতুককর এই যে, তখন ব্যবসায়ে যাঁরা এতখানি ভাগ্য নির্মাণ করেছিলেন, সেই রামমোহন, রামদুলাল দে, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ, কারও বংশগত পেশা ব্যবসায় ছিল না। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ যুগের বর্ণহিন্দুরা ইংরেজের শাসন মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ইংরেজের পরম খয়ের খাঁ হয়ে উঠেছিল।

> 'এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বৃহদাংশ ইংরেজ শক্তির আবির্ভাবকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিল'।[২৪]

আলোচ্য শতকে বাণিজ্যিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণীর মধ্যবিত্তদের সংখ্যা, সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বর্ধিত হতে থাকে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাদের বাণিজ্যিক স্তরে মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকে; যৌথসংঘ স্থাপন করে ও বিদেশি হৌসের মালিকানা ক্রয় করে তারা ব্যবসায়িক কৌলিন্যও অর্জন করতে থাকে। আরও হতে থাকে বাণিজ্যিক ব্যাপারে কৌশল শিক্ষার ও ইংরেজি শিক্ষার স্পৃহাবৃদ্ধি। বস্তুত বাংলার নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণী ইংরেজি শিক্ষা গ্রহনে প্রথম থেকেই অগ্রগামী ছিল এবং তারা জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থ। উল্লেখযোগ্য যে, দ্বারিকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে প্রথম বাঙালি আই সি এস। হিন্দুজাতির ঐতিহ্যগত ব্যবসায় ও শিক্ষার ব্যবধানা এ যুগে ক্ষয়িত হয়। বাণিজ্য

২২. ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১০-১১ পৃ.।
২৩. ঐ—১৪ পৃ.।
২৪. India in Transition–M. N. Roy.

www.pathagar.com

সংঘে ও শিক্ষাক্ষেত্রে এই শ্রেণী সমান প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে। এমনকি পরবর্তীকালে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেও। আর. জি. ঘোষ কোম্পানির মালিক রামগোপাল বেঙ্গল চেম্বার অব কর্মাসের প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন, তিনিই আবার ১৮৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষা কাউন্সিলর'-এর সভ্য নিযুক্ত হন।

ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আর একটি সংস্থার উদ্ভব হয়, যথা ট্রেড ইউনিয়ন ও সমিতি। ভারতীয় উপমহাদেশেও দ্রুত বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে এসব সংস্থার উদ্ভব হয় মজুর শ্রেণীর স্বার্থ ও সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য, এসব সংস্থার পরিচালনা ও কর্তৃত্বও গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত সমাজ। তবে এখানে পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এসব সংস্থার উদ্ভব হয়েছিল অতি ধীরে। বাণিজ্যে রাজনীতির আমদানি কোম্পানি আমলে হয় নি বললেই চলে।

শিল্পানুসারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, শিল্পক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল শম্বুক গতিতে। আর তার কারণ হলো, শিল্পসৃষ্টিতে যে পরিমাণ অর্থ ও সাধনা-নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তা তৎকালীন এই শ্রেণীর কারো আয়ত্তে ছিল না। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির তথা বিলেতবাসী ইংরেজদের শিল্পক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভের চেয়েও বেশি রাক্ষসীসুলভ নীতিই ছিল প্রবল ও অনমনীয়, তার দরুন ইংল্যান্ডের সদ্য শিল্পবিপ্লব সাধকরা ভারতীয় শিল্পের অস্তিত্বও বরদাস্ত করতে পারত না।

ইংল্যান্ড কৃষিবিপ্লব শেষ করে শিল্পবিপ্লব করেছে ভারতীয় উপমহাদেশের লুণ্ঠিত ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার করে। আর এদেশের শিল্পগুলো, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পকে কণ্ঠরোধ করে পিষে ফেলেছে ভারতীয় উপমহাদেশে বাজার সৃষ্টি করতে। এজন্যে শিল্প প্রসারের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ও কারিগরি শক্তির প্রয়োজন, সেগুলো আমদানি করা বা সদ্ব্যবহার করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এদেশের বস্ত্রশিল্প ছিল প্রাচীন পন্থায় চরকায় সুতা কাটা ও হাতের তাঁতে বোনায় নির্ভরশীল। এসব কাজ একটি পরিবারের লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হতো। বাইরের কোনো শিল্পী বা কারিগরি জ্ঞানীর সাহায্য প্রয়োজন হতো না। এজন্য এদেশের বস্ত্রশিল্প ছিল প্রধানত গৃহ বা কুটিরশিল্প। এ কথা অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সাধনা চলেছিল বিদ্যুৎগতিতে। ১৫৭৮ সালের মধ্যেই কয়লার ব্যবহার ও তার সাহায্যে লোহা গলানো আরম্ভ হয়েছিল। টাকু ও মাকুর ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের সাধনা চলছিল; ১৭৬৭ সালে হারগ্রেভস স্পিনিং-জেনি, পর বছর আর্করাইট স্পিনিং রোলার ও ১৭৭৯ সালে ক্রমটন মিউল-জেনি আবিষ্কার করলেন। ১৭৪১ সাল থেকে ম্যানচেস্টার কলে কাপড় বোনা শুরু করে ও বস্ত্রশিল্পের বৃহৎ কেন্দ্রে রূপায়িত হয়: পরের দশকে কেলিকো ও আরও পরে

www.pathagar.com

মসলিনের মতো সূক্ষ্মবস্ত্র উৎপাদন করতে থাকে। আঠারো শতকের শেষের দিকে ইংলন্ড যন্ত্রে বোনা বস্ত্রে ভারতীয় বাজারে বন্যা এনে দেয়। ১৭৭১ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ২৩,৭৭,০৪২ পাউন্ড কাঁচা তুলা ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়, ১৭৯০ সালে হয় ৩,১৪,৪৭,৬০৫ পাউন্ড। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ বস্ত্র উৎপাদন ছিল ৩২,০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের; ১৭৮৭ সালে হয় ৭৫ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের। বস্ত্রশিল্পেই ছিল ইংল্যান্ডের শ্যেনদৃষ্টি; এ শিল্পে প্রাধান্য অর্জন করে ভারত তথা বাংলার বস্ত্রশিল্পের উচ্ছেদই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটি ষোলো আনায় পূর্ণ হলো। একমাত্র ঢাকা থেকেই ১৭৯৯ সালে রপ্তানি মসলিনের মূল্য ১২ লক্ষ টাকা। ১৮১৩ সালে তা কমে আসে ৩$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকায় এবং ১৮১৭ সালে মসলিন রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ও ঢাকার বাণিজ্যিক দপ্তর কোম্পানি তুলে দেয়। এ সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমরা ভারতের শিল্প একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছি'।[২৫]

বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতাই ছিল শিল্পক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগঠনের প্রধান অন্তরায়। কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশের তুলা চাষের উন্নতি করেছে গুজরাট, মালাবার, বোম্বাই, মধ্যদেশে, কিন্তু বাংলা প্রদেশে নয়। উন্নত জাতের তুলা উৎপাদনের গরজ ছিল ম্যানচেস্টারের বস্ত্রমিল চালু রাখার জন্যে। অতএব বাংলার তুলা উৎপাদনও ধ্বংস করা হয়েছিল বাংলায়, বিশেষত ঢাকার বস্ত্রশিল্পীদের তুলা সরবরাহ বন্ধ করার মানসে। একে তো বস্ত্রশিল্পীরা ছিল হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিচের তলায়। অতএব অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই ইংল্যান্ডের মতো এদেশে শিল্প সম্বন্ধীয় মধ্যবিত্ত সমাজ সহজে গড়ে উঠে নি।

১৮৪০ সালে হিউ মুরে সাহেব এদেশি হস্তশিল্পের উৎকর্ষ স্বীকার করেও তার উৎপাদনে স্বল্পতা ও অনুন্নতি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> সূক্ষ্মতায় ঢাকাই মসলিন এবং করোম্যান্ডেলের কেলিকো অন্যান্য বস্ত্রের পাকা রং ও ঔজ্জ্বল্যের উৎকর্ষ অনতিক্রমণীয়; অথচ এগুলো উৎপাদিত হয় মূলধন, যন্ত্রপাতি, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি ইউরোপীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও কৌশলের সাহায্য না নিয়ে। তন্তুবায় একক কর্মী, সে খরিদ্দার পেলে পুরানো মান্ধাতার আমলের যন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করে; এটি কতকগুলো কাঠের টুকরা নিয়ে গঠিত। অথচ এমন উৎকৃষ্ট শিল্প উৎপাদনের পদ্ধতির কোনো উন্নতি হয় নি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উদ্যম করা হয় নি, শিল্পীর অসুবিধাগুলো দূরীকরণের চেষ্টা হয় নি—সেই প্রাচীন ধারাই অব্যাহত রয়েছে, হিন্দুর (অর্থাৎ ভারতীয়ের) অনমনীয় স্বভাবের নিদর্শন হিসেবে।[২৬]

মুরে সাহেব বিস্মিত হয়েছেন, শিল্পবিপ্লবের পূর্বেও তাঁর স্বদেশে বস্ত্র তথা হস্তশিল্প উৎপানের প্রক্রিয়া ছিল এদেশ থেকেও অনুন্নত; বিস্মিত হয়েছেন এদেশের

২৫. The Economic Hist. of India—R. C. Dutt. p. 110 (এইচ লোপেন্টের উক্তি উদ্ধৃত)।

২৬. Murray, ii. p. 442–43.

www.pathagar.com

শিল্প মার খেয়েছে তাঁর দেশের শিল্পকে উজ্জীবিত করার অত্যন্ত হীন প্রচেষ্টায়। অতএব এদেশি হস্তশিল্প উন্নয়নের বিষয় চিন্তাও করতে সাহসী হয় নি সমকালীন এদেশীয়রা।

পূর্বে উক্ত হয়েছে, পাইকার ও দালাল শ্রেণীর মধ্যবর্তিতায় হস্তশিল্প কুটির থেকে সংগৃহীত হয়ে বাজারে-গঞ্জে পণ্য হিসেবে আমদানি করা হতো। ঢাকার একটি বিবরণীতে প্রকাশ, এরকম মধ্যবর্তী লোকেরা একটা দস্তুরি নিয়ে এ কাজ করত। ১৭৭৩ সালে ঢাকার কোম্পানিপ্রধান রিচার্ড বারওয়েল নিজস্ব তত্ত্বাবধায়ক দিয়ে সরাসরি তন্তুবায়দের সঙ্গে সংযোগ করতে থাকেন। তখন পাইকার ও দালালরা তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ করে ও ১৭৭৬ সালে কোম্পানি সরকারে একটা আবেদনও প্রেরণ করে :

> মুসলিম সরকারি আমল থেকে বস্ত্রশিল্পে কাপড়-ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং বর্তমান সরকারও কাপুড়িয়াদের সমান সুযোগ দিচ্ছেন; দালালরাই বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ ব্যবসায় করছে এবং সামান্য দস্তুরীর বিনিময়ে নিয়মিত মাল সরবরাহ করছে এবং সমস্ত বকেয়া দাদনের জন্যে দায়ীও থাকছে... ।[২৭]

ঢাকার খ্যাতনামা পাইকার রামগঙ্গাও বারওয়েল সাহেবের নামে সমান অভিযোগ এনেছিলেন যে, তিনি মধ্যবর্তী দালালদের উৎখাত করেছে। বহুকাল বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকায় এসব মধ্যবর্তী লোকেরা সম্যক জ্ঞাত ছিল, কোথায় কীভাবে উৎকৃষ্ট পণ্য পাওয়া যাবে এবং কীভাবে উৎকৃষ্ট পণ্য পাওয়া যাবে এবং কীভাবে চুক্তিমত পণ্য সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু তাদেরও উৎখাত করে ফেলা হয়েছিল অন্যায় মুনাফা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে। এই রকম বিহার ও বাংলায় সোরা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কোম্পানি নিযুক্ত পরিদর্শকরা সরাসরি উৎপাদকদের সঙ্গে সংযোগ করত। প্রায় ক্ষেত্রে এসব পরিদর্শকরা অসাধু ছিল, এজন্য নিজেদের স্বার্থে তারা কাপড়ে ও সোরায় নিকৃষ্ট পণ্যের সরবরাহ আরম্ভ করে এবং এজন্যে এ দুটি শিল্প নিম্নগামী হতে থাকে।

মাদ্রাজে তুলাচাষেও একই অবস্থা দাঁড়ায়। সেখানে ইংরেজরা চেট্টিদের নিযুক্ত করে তুলা সরবরাহ কর্মে। তখন তুলা গুদামের দালালরা চেট্টি ও কৃষকদের মধ্যবর্তী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দালাল পেত চেট্টির নিকট সামান্য মুনাফা, কারণ চেট্টির মুনাফাও বেশি নয়। অতএব দালাল চেট্টিকে তুলা সরবরাহের পূর্বে খারাপ জিনিস তুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিত, চেট্টিও তাই সরবরাহ করত ইংরেজদের। বিলেতে উৎপাদনকারীরা সস্তায় খারাপ তুলা পেত এবং তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তুলার বাজার ভারতের বদনামে মুখর করে তুলত। ১৮৪৮ সালে আমেরিকা তুলা-পরিষ্কারকযন্ত্র উদ্ভাবন করায় এ প্রথা রহিত হয়ে যায়।

---

২৭. 9th Rep. Sel. Com. H. C. 1782-3 : p 2136.

www.pathagar.com

হস্তশিল্পী ও কৃষকদের উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও ভারতীয় মধ্যবর্তীরা বাস্তবপক্ষে বাণিজ্যিক এজেন্টের কাজ করত, শিল্প পরিচালনার বা তত্ত্বাবধায়কের কাজ নয়। এজন্য তার মুনাফাটা ছিল ফড়িয়ার মতো, শৈল্পিক কারবারির মতো নয়। প্রথম যুগে কোম্পানির কুঠিয়ালরা ছিল এই শ্রেণীর লোক; পরে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। মেটকাফ, বেন্টিংক ও রামমোহন এজন্য 'কলোনাইজেশন' প্রথার সমর্থন করেন। এ-উদ্দেশ্যে ১৮৩৭ সালে একটা আইন পাস করা হয়, যার বলে ইউরোপীয়রা চিরস্থায়ীভাবে ফার্ম বা বৃহৎ ক্ষেত্রের মালিক হতে পারতেন। অবশ্য চা বাগান প্রভৃতিতেই তাঁদের অধিক আকর্ষণ ছিল।

গ্রাম্য এলাকায় নীল চাষ, কফি চাষ প্রভৃতিতে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা সহজ ছিল না। আর দাদন না পেলে চাষিরা বড় অসুবিধায় পড়ত। এজন্য স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা মূলধন দাদন করতেন এবং চাষের নিরাপত্তারও বিধান করতেন। অবশ্য টাকা দাদন দেওয়ার কাজে গ্রাম্য মহাজন শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছিল। গ্রাম্য মহাজনের ৩৬-৫০ টাকা শতকরা বার্ষিক সুদের হারে টাকা ধার দিত চাষিদের। মহীশুরে ও বাংলাদেশে মহাজন শ্রেণীর প্রতাপ উল্লেখযোগ্য। মহাজনি অত্যাচার এত চরমে উঠেছিল যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসল টাকার দু শ-তিন শ গুণ আদায় দিয়েও চাষিরা নিষ্কৃতি পেতো না। বাংলা প্রদেশে 'মহাজনি আইন' ও 'চাষি খাতক সালিশি বোর্ড আইন' পা করে এসব অনাচার বন্ধ করা হয়েছিল।

যান্ত্রিক শক্তির জন্যে কয়লা উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। ১৮২০ সালে বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ হয়। বলাবাহুল্য, এসব শিল্পে বিলাতি মূলধন ও ইংরেজদের তত্ত্বাবধানই ছিল বেশি।

রেলওয়ে বসানো আর একটি বৃহৎ শিল্প বিষয়ক পদক্ষেপ। ১৮৪৪ সালে ইউরোপীয় ফার্মের তত্ত্বাবধানে প্রথম রেল বসানো আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ সালে রেলওয়ে আইন পাস হয় এবং কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে রেলওয়ে বসানোর চুক্তি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়ান, গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিন সুলার, বোম্বে, বারোদা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া প্রভৃতি কোম্পানি সৃষ্ট ও দ্রুত রেলওয়ে লাইন বসানো হতে থাকে। ১৯০০ সালের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশে ২৫,০০০ মাইল রেল বসানো হয় এবং ১৯১৪ সালের মধ্যে আরও ১০,০০০ মাইল যুক্ত হয়ে এ কাজ প্রায় সমাধা হয়। ১৯০০ সালে নিট মুনাফা হয় ১১ লক্ষ টাকা। ১৯০৫ সালে প্রথম রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে সমগ্র রেলওয়ে লাইনের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৪৩,০০০ মাইল। বলা বাহুল্য, দেশকে শিল্পায়িত করার পক্ষে রেলওয়ে নিঃসন্দেহে বৃহৎ পদক্ষেপ। দ্রুত মাল চলাচল ও দূরদূরান্তরে সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। স্মরণীয় যে, এসব রেলওয়ে ইংরেজ কোম্পানির, এদেশীয়রা মাত্র কর্মচারী হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।

www.pathagar.com

অনস্বীকার্য যে, শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় উৎসাহ বা মূলধন প্রথমে সন্তোষজনক ছিল না। ভারতীয়রা সুযোগ লাভেও বঞ্চিত ছিল। জনাকয়েক ফরাসি ও বাঙালি এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হয়। দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৮৩৬ সালে রাণীগঞ্জে একটি কয়লার খনি ক্রয় করেন, পরে চিনি ও শণশিল্পে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। ফরাসিরা বোম্বাই ও ব্রোচে কয়েকটা সুতার কল ও তুলা পরিষ্কারক কল স্থাপন করেন। জাহাজ নির্মাণ কর্মেও ফরাসিরা উৎসাহী হয়। নওশেরওঁাজী ওয়াদিয়ার বংশ বোম্বাইয়ে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও শুষ্ক-ডকইয়ার্ড স্থাপন করেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পস্থাপন কর্মে নানা কৃত্রিম অসুবিধাও সৃষ্টি করা হয়েছিল। মূলধন ছিল না, যন্ত্র একবার খারাপ হলে দরকারি অংশটি সংগ্রহ করে পুনরায় চালু করা মুশকিল ছিল। যান্ত্রিক শিক্ষানবিশি মোটেই ছিল না, ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। কারিগরি বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ায় সরকার আগ্রহী ছিল না। সবার উপরে ছিল ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বিমাতৃসুলভ মনোভাব, তাঁরা এদেশে যান্ত্রিক শিল্পের সৃষ্টির পথে প্রবল বাধাদান করতেন। এদেশে বস্ত্রমিল স্থাপিত হয়ে 'হোমর'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে–এমন চিন্তাও তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা প্রচার করতেন, 'এদেশবাসী বিলেতি মালেরই বেশি ভক্ত।' অতএব এদেশে বস্ত্রমিল স্থাপন করা অহেতুক ও অপচয় মাত্র। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতে প্রস্তুত বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ব্রিটেনে প্রবেশ জোর করে বন্ধ করে দেয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চালানের পথও রুদ্ধ করে দেয়, ফলে এদেশে শিল্পদ্রব্য উৎপন্নের উৎসাহও নষ্ট হয়ে যায়। অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত থাকলেও ব্রিটেনের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় ভারতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য কোথাও বিক্রয়ের সুযোগ ছিল না।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিলাতী মূলধন

ভারতীয় উপমহাদেশে বিলাতি মূলধনের অবস্থা স্বাধীনতালাভের পর কী দাঁড়াবে তা নিয়ে আজাদিলাভের প্রাক্কালে লন্ডনের বণিক মহলে কিরূপ আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছিল, এখানে তার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ সম্বন্ধে একখানি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সমকালীন যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার কতকাংশ উল্লেখযোগ্য :

> ইংরেজ বণিকদের হিসাবে ভারতভর্ষের বিলাতী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। শিল্প-বাণিজ্যে এই টাকা খাটিয়ে ব্রিটেন ভারতবর্ষ থেকে সুদে ও লভ্যাংশে প্রায় দশ কোটি টাকা উপার্জন করে। এই অর্থ উপার্জনের জন্য ইংরেজ বণিকেরা ভারত-শাসন আইনে অনেকগুলো রক্ষাকবচ বিধিবদ্ধ করে এতদিন ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে বসেছিল।

www.pathagar.com

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের অন্যায় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বৃহৎ শিল্পগুলো আজ পর্যন্ত মাথা তুলতে সক্ষম হয় নি। বিলাতী জাহাজওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে এদেশে জাহাজের কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিধিমতো বাধা দেওয়া তো হয়েছিলই, অধিকন্তু দেশীয় অধিকাংশ জাহাজ কোম্পানির পক্ষে তাদের অন্যায় ও অসাধু প্রতিযোগিতার ফলে আত্মরক্ষা করাও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কোনো সভ্য দেশ দেশীয় কোম্পানির সাথে বিদেশির 'রেট-ওয়ার' বা অন্যায়ভাবে ভাড়া কমানো প্রতিযোগিতা সহ্য করে না; কিন্তু এদেশে তাও ঘটেছে। বিলাতি ইঞ্জিন আমদানির পথ খোলা ও নিরংকুশ রাখার জন্যে ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্মাণে বাধা দেওয়া হয়েছে। দুই মহাযুদ্ধে বিলাতি লোহ আমদানি বন্ধ না হলে ভারতের টাটা কোম্পানি মাথা তুলতে সক্ষম হতো কিনা সন্দেহ। আমাদের সমস্ত কয়লা ইংরেজ বণিকদের করতলগত। শুধু যে ভালো ভালো কয়লার খনিগুলোই তারা দখল করে বসে আছে তাই নয়; তাদের অপচয়ে খনিগুলো নষ্ট হচ্ছে এবং কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করে তারা বহু ভারতীয় কোম্পানির সর্বনাশ সাধনও করেছে। যেসব কারখানা বিলাতি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তাদের হাত থেকে কয়লা বের করতে না পারায় তাদেরই ক্ষতি হয়েছে সব চেয়ে বেশি। ভারতবর্ষের সমস্ত পেট্রল ইংরেজ বণিকদের হাতে। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব নতুন পেট্রলের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলোরও লাইসেন্স ইংরেজ বণিকদেরই দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের সময় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি যেসব মূল্যবান খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, তার সমস্ত খনি ইংরেজ বণিকদের কুক্ষিগত। কৃষি-সম্পদের মধ্যে চা ও পাট ইংরেজ বণিকদের সম্পূর্ণ আয়ত্বে থাকার ফলে চা-বাগানের কুলি এবং পাট চাষির দুর্দশার চূড়ান্ত হয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ আর্থিক সম্পদ কেবলমাত্র টাকার অঙ্কেই মাপলে চলবে না, তার গূঢ় অভিসন্ধিও ভালো করে তলিয়ে দেখতে হবে। দেশের কয়লা, পেট্রল, খনিজ সম্পদ এবং চা ও পাট প্রভৃতি কৃষিসম্পদ ইংরেজদের হাতে আছে বলেই তারা আমাদের বৈষয়িক জীবনের বহুক্ষেত্রেই খবরদারি করার সুযোগ পায়। প্রত্যেক স্বাধীন দেশ যেসব আর্থিক সম্পদ জাতীয় মূল সম্পদ বিবেচনা করে, কখনো বিদেশির হাতে ছেড়ে দেয় না, এদেশে ইংরেজ বণিকেরা সেই সবগুলোই দখল করে বসে আছে। এই সব ক্ষেত্র থেকে ইংরেজদের হটাতে না পারলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধান স্বাধীন ভারতেও কঠিন হয়ে উঠবে।

ভারতে বিলাতি মূলধন ৩০০ কোটি টাকা—কেবল একথা বললেই সবটুকু বলা হয় না। ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে—পরের টাকায় ব্যবসা করে তার চৌদ্দ আনা লাভ পকেটস্থ করার অপূর্ব কৌশল—ম্যানেজিং এজেন্সি নামক যে বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তার তুলনা নেই। এই ম্যানেজিং এজেন্সির ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া জানা থাকলে ভারতের বৈষয়িক জীবনের ওপর এগুলোর ক্ষমতা কতোখানি সুদূরপ্রসারী, তাও বোধগম্য হবে। ভারতবর্ষের চট-কলগুলোর শতকারা ৬০ ভাগেরও বেশি মূলধন (কেবলমাত্র অমুসলিম) ভারতবাসীর হাতে এসেছে সত্য, কিন্তু সেগুলোর পরিচালন ব্যাপারে সামান্য মাত্র ক্ষমতাও ভারতীয় অংশীদাররা পায় নি। বার্ষিক সভায় আনা যাবে এমনই ধরনের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের হাতে শতকরা

www.pathagar.com

৩০-৪০ ভাগ শেয়ার থাকলে যে কোনো কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব হারানোর কোনো আশঙ্কাই থাকে না। এই কারণে বিলাতি ম্যানেজিং এজেন্টরা যেসব কোম্পানি পরিচালনা করেন, তার শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার নিশ্চিন্ত মনে বাজারে ছেড়ে দেন। সুতরাং এদেশে বিলাতি মূলধনের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার মূলধনের ওপর ইংরেজদের ক্ষমতা অপ্রতিহত।[২৮]

দ্বিতীয় মহাসময়ের প্রাক্কালে লক্ষ করা গেল, শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার বাজারে ছেড়ে দিয়ে ও খেয়ালখুশিমতো ব্যবসা চালানো ইংরেজ বণিকদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। তখন অনেক বিলেতি ব্যবসা অবাঙালিদের নিকট কলিকাতায় এবং অন্যান্য শহরে বন্দরে অমুসলিমদের নিকট হস্তান্তর হতে থাকে। যুদ্ধের সময় স্টার্লিং সিকিউরিটি জমা রেখে যে ১২০০ কোটি টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়েছিল, তার অধিকাংশই অল্প কয়েকজন মাত্র অমুসলিম ভারতীয় বণিকদের করতলগত হয়েছিল। এবং এই টাকার জোরে ভারতীয় বণিকরা বহু কোম্পানির শেয়ার আটক করে ফেলে ম্যানেজিং এজেন্টদের কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আবার তাদের এক অংশ ইংরেজ বণিকদের দলে জুটে তাদের সঙ্গে ভাগের কারবারেও লিপ্ত হতে লাগল। বিড়লা ব্রাদার্সের সঙ্গে নুফিল্ড এবং টাটার সঙ্গে ইমপিরিয়াল কেমিক্যালের চুক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ফলে দেশি নামে বিদেশি পণ্য বিক্রয়ের পথটিও পরোক্ষভাবে পরিষ্কার হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, আজাদি উত্তর কালে ও পাকিস্তানে এবং ভারত ইউনিয়নে এক রকম বহু বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকর্তৃক দেশি নামে বিদেশি কোম্পানির পণ্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য একদল ভারতীয় বণিক যুদ্ধ চলার কালে বিলেতি ম্যানেজিং এজেন্টদের বিতাড়িত করে তাদের কারবারগুলোও দখল করেছিল। *এই প্রসঙ্গে বড় বড় মিলমালিকদের দ্বারা তৎকালীন ভারতীয় বড় বড় বিলেতি সংবাদপত্রসমূহের স্বত্বক্রয়*[২৯] ও নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যমও লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্ব সমরের পর বিলেতের ও আমেরিকার কোটিপতি মিলমালিক ও শিল্পপতিরা ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলো ক্রয়পূর্বক আত্মসাৎ করার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে যেভাবে সংবাদপত্রসমূহের স্বত্ব দখলের আগ্রহ দেখিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাসমরের পর পাক-ভারতে ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এবং আজাদি উত্তর যুগে পাকিস্তানে বা ভারত ইউনিয়নে এ মনোবৃত্তি আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং এসব দেশীয় বণিককুলের দ্বারা ইংরেজ বণিককুল বিতাড়িত হলেও পাশ্চাত্য বাণিজ্যনীতির পুরাদমে প্রসার চলেছে এবং ক্রেতাসাধারণ ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকে কিছুমাত্র রেহাই পায় নি।

---

২৮. দৈনিক ভারত—২১ শে চৈত্র, ১৩৫৩ সাল: প্রবাসী, ১৩৫৩ বৈশাখ, ১২ পৃ. উদ্ধৃত। (ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)।

২৯. কলিকাতার বিখ্যাত পত্রিকা স্টেটস্‌ম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী

ইংরেজ বাংলা জয় করল পলাশীর প্রান্তরে সতেরো শ সাতান্ন সালে। ১৭৬৪ সালে বকসারের যুদ্ধে মীর কাসিমকে পরাজিত করে ও পরের বছর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কি থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানিপদের ফরমান লাভ করল (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)। প্রায় দেড় মাস পরে ৩০ সেপ্টেম্বর নওয়াব নজমুদ্দৌলার সঙ্গে একটি চুক্তি করে, যার বলে কোম্পানি বাংলার রাজস্ব-সংক্রান্ত ভার গ্রহণ করে।

অতঃপর আটাশ বছর ধরে চলল ভূমি ব্যবস্থায় আশ্চর্য বিবর্তন ও পরিবর্তন, যার অনুষঙ্গ হিসেবে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও সংসাধিত হলো আলোড়ন ও বিপ্লব—যদৃচ্ছা তালুক বিলি, জমিদার সৃষ্টি; চলল পাঁচশালা-একশালা বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্ব বিষয়ে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজ সর্বপ্রথমে এদেশে ভূমিতে স্বত্বস্বামিত্বের চেতনা আনয়ন করেছে—ভূমি পরিণত হয়েছে কেনাবেচার পণ্যে। বিধ্বস্ত দেশি শিল্পসমূহের জীবনোপায়হীন কর্মীরা, বস্ত্রশিল্পীরা জমির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ভূমি রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে ইংরেজ রাজ্য সংগঠনের স্তম্ভ হিসেবে আর একটি বিশ্বস্ত ও চিরবশংবদ শক্তিশালী সমাজ সৃষ্টি করল। অর্থাৎ ভূমির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একদল লোককে ভূমির মালিক বানিয়ে ইংরেজ তার রাজ্যশাসনের ইমারত সুদৃঢ় করে তুলল—যাদের স্কন্ধে নির্ভর করে তার বাংলা তথা ভারত শাসন হবে নিরাপদ, নির্ভয় ও অত্যাচারে নির্বিবাদ। শাসিত ও শাসকের মধ্যে যারা বিরাজ করবে সেতুবন্ধের মতো। কিন্তু এ ব্যবস্থায় নজরুলী ভাষায় 'মাটিতে যাদের *ঠেকে* না চরণ, মাটির মালিক তাঁহারাই হন'; অথচ জমি কর্ষক চাষির জমিতে স্বত্ব রইল অনির্দিষ্ট এবং সর্বদা উৎখাতযোগ্য—*সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।*[৩০]

মুঘল যুগে ভূম্যাধিকারীদের ক্রমস্তর ছিল এরূপ—জমিদার, তালুকদার, মোকররীদার, ইজারাদার প্রভৃতি। তালুকদারদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং বাংলা বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ সর্বত্র তাঁদের অস্তিত্ব ছিল। বেনারসে ও উত্তর-ভারতের প্রদেশগুলোতে মোকররীদারকে বলা হতো গ্রাম্য-জমিদার, তাঁরা ছিলেন যৌথ-মালিক। বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাদের বলা হতো মিরাসদার বা কৃষিমালিক, জমি রেহেনাবদ্ধ বা হস্তান্তর করার তাঁদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল।

ভূমিরাজস্ব এসব ভূম্যাধিকারীরা সরকারে জমা দিতেন না। যেখানে জমিদার, তালুকদার ছিল না, সেখানে ইজারাদার নিযুক্ত হতো রাজস্ব আদায় কর্মে। জমিদার ও ইজারাদারে প্রভেদ ছিল এই : জমিদারকে কোনো জামিন দিতে হতো না, কিন্তু জামিন না দিলে ইজারা মিলত না। জমিদারের স্বত্ব উত্তরাধিকারযোগ্য ছিল এবং

---

৩০. নজরুল-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ফরিয়াদ—৩৯ পৃ.

www.pathagar.com

খাস হলে হস্তবুদ জমার শতকরা দশভাগ বৃত্তি হিসেবে দিতে হতো। জমিদাররা নিজেদের তহশিলদার নিয়োগ করতেন, রাজস্ববিষয়ক মামলার নিষ্পত্তি করতেন এবং নিজ এলাকার শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার জন্যে দায়ী থাকতেন।

ইংরেজদের প্রথম কাজ ছিল, জমিদারদের বিচার ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করা। প্রথমে ইজারাদারিই প্রশস্ত বিবেচিত হওয়ায় প্রধানত ইজারা প্রথায় রাজস্ব আদায় করা হতো। এ সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেন,

> দেওয়ানি লাভের পর আমরা পুরাতন আমলা ও ইজারাদারদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলাম, কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ সব তথ্য তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত হতো এবং পারস্পরিক স্বার্থের সূত্রে আমরা আবদ্ধ ছিলাম। নীতিগতভাবে আমরা এদেশি লোকদের তুষ্ট করতে সবরকম চেষ্টা করেছিলাম।[৩১]

১৭৭২ সালে হেস্টিংস ইজারাদারি পাঁচশালা বন্দোবস্তে দিতেন। তালুকদার ও ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে সরাসরি রাজস্বব্যবস্থা হয়। কিন্তু জমিদার ফৌত হলেই তাঁর জমিদারি ভেঙে কয়েকজন ইজারাদার নিযুক্ত হতো। উল্লেখযোগ্য যে, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারি খণ্ডে খণ্ডে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। ইজারা প্রথায় জমিদারদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং ঘরানা জমিদারিগুলো ভেঙে পড়তে থাকে।

ইজারা বিলি নিলাম ডাকে আরম্ভ হওয়ায় ভূমিক্ষেত্রে বাজার গরম হয়ে উঠে এবং ফটকাবাজি চলতে থাকে। যত বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, গোমস্তা ব্যবসায়ে উপার্জিত অঢেল অর্থ ভূস্বত্বে খাটাতে থাকে এবং এভাবে ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্তদের উদ্ভব হয়। ইজারাদারির মুনাফা এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠে যে, কোম্পানির কর্মচারীরা বেনিয়ানদের সহযোগে ভূমি রাজস্বের মুনাফা লুটতে থাকে। একটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মেলে, 'যেখানে বেনিয়ানের বেনামিতে ভূমি স্বত্বাধিকারের দাবি উত্থাপিত হয়।' ১৭৭৫ সালে কাউন্সিল মেম্বার ফিলিপ ফ্রান্সিস দেখান, *'বাংলার বহু লাভজনক ইজারাদারি বেনিয়ানদের হস্তে চলে গেছে এবং সন্দেহের উপযুক্ত কারণ আছে যে, কোম্পানির কর্মচারীদের সুপারিশে এসব ইজারার খাজনা নানাভাবে রেহাই দান করা হয়েছে।'*[৩২] ১৭৭৬ সালে কোনো এক তারিখের একটি পত্রে কোর্ট অব ডিরেকটর্স স্বীকার করেন, ভূমির বন্দোবস্তে ব্যবসায়ীরা প্রবেশ করেছে, এবং বেআইনিভাবে কোনো কোনো জেলা প্রশাসক বেনিয়ানদের বেনামিতে ভূমিস্বত্ব অর্জন করেছেন। এমনকি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের স্বার্থে তাঁর বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী আপন পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে বহরবন্দ পরগনায় বহু ভূসম্পত্তি ইজারা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত নতুন ইজারা নীতির ফলে পুরাতন

৩১. Clive to Court. 29 Sept. 1765.
৩২. 11th. Rep. Sel. Com. H. C. 1782-83.

www.pathagar.com

অভিজাত শ্রেণীর জমিদারগোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে গেল, এবং নব্য বেনিয়ানরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে লাগল।

১৭৭০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং বহু গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। এর অভিঘাত পড়ে কৃষিকার্যে তথা রাজস্ব আদায়ে; কৃষকের অভাবে জমি অনাবাদি থেকে যায় এবং খাজনাদিও আদায় ওয়াশিল শক্ত হয়ে পড়ে। অথচ হেস্টিংস কড়া চাপে কোম্পানির প্রাপ্যটা নির্ধারিত অঙ্কেরও বেশি আদায় করেছেন। তার ফলেও বহু প্রাচীন জমিদার হয় ফৌত হয়ে যায়, অথবা দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। অনেকেরই জমিদারি নিলামে উঠে ও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়ে যায়। *দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যেতে পারে যে, ২৩৭৭ টাকা হস্তবুদের তালুক ঘোষগাঁও মাত্র ৯০০ টাকায়, ১২৮২ টাকা হস্তবুদের তালুক মজকুরি ৮০০ টাকায়, ১৫,৭১৯ টাকা হস্তবুদের তালুক ৪৫০০ টাকায় নিলাম হয়ে যায়।*[৩৩] অবশ্য এসব নিলামে খরিদ্দার ছিল বেনিয়ানরা। এই সময়েই পায়কশত কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তারা অস্থায়ী কৃষক হিসেবে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে হলকর্ষক ছিল না; যেমন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সুবিধায় বহু জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

বাংলায় প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে কোম্পানির রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের বহু নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর দল। তারা কৌশলে বহু জমির নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত হাসিল করত। নদীয়া জেলার একজন আমিন স্বনামে বহু জমির জমাবন্দী নিজ নামে প্রস্তুত করে ও সেসব বিনা সেলামি ও বিনা বন্দোবস্তে আত্মসাৎ করে। অথচ সেগুলো স্বীকৃতিও লাভ করে।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জয়রাম। তিনি বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। আমিন হিসেবে তিনি কোম্পানির চব্বিশ পরগনা জেলার বন্দোবস্ত কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে প্রভূত ভূমির মালিক হন। ১৭৬২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ ইংরেজি ফরাসি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন এবং চন্দননগরের ফরাসি সরকারে চাকরি করে প্রভূত অর্থের মালিক হন। তিনি সেসব অর্থ দিয়ে রাজশাহীর ব্রাহ্মণ জমিদারের বিশাল জমিদারি ক্রয় করেন। এই জমিদারির বিস্তৃতি ছিল বর্তমান কুষ্টিয়া জেলাস্থ শিলাইদহ থেকে দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা পর্যন্ত। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথ ১৭৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেরবোর্ন স্কুলে ইংরেজি এবং পরে ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথমে ল-এজেন্ট হিসেবে কাজ করে বাংলার তৎকালীন ভূ-স্বত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় হয়। পরে তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার নিমকি কালেক্টারে সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন ও ক্রমে দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এখানে কার্যকালে তিনি অবিশ্বাস্যরূপেই ভাগ্যনির্মাণ করেন ভূম্যাধিকারীরূপে এবং নগদ অর্থের মালিক হিসেবেও।

---

৩৩. Bengal Rev. Consl. 20 Dec. 1776.

www.pathagar.com

১৮৩৪ সালে চাকরি ত্যাগ করে তিনি পামার অ্যান্ড কোম্পানির অংশ ক্রয় করেন এবং পরে চিনি ও শণের ব্যবসা করেন। তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ ছিল ভূমি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত। পরবর্তীকালে তিনি প্রিন্স, রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁরই পৌত্র বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ।[৩৪]

যাহোক, হেস্টিংসের পাঁচশালা ইজারা বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। ১৭৭৬-৭৯ সালের আদায়ী রাজস্ব থেকে ৭২৫,২৩৮ পাউন্ড কম আদায় হলো ১৭৮১ সালে। *চৈতসিং-এর ব্যাপারকে কেন্দ্র করে*[৩৫] বিহারের জমিদারেরা প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন; এমনি গোলযোগের মধ্যে কর্নওয়ালিস এলেন ১৭৮৬ সালে। স্যার জন শোরের সুপারিশক্রমে প্রথমে তিনি ১৭৯০ সালে জমিদারগণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন দশশালা নীতিতে। জমিদারদের স্বত্ব ওয়ারিসি হিসেবে স্বীকৃত হলো। কোর্ট অব ডিরেকটর্সের অনুমোদন লাভ করে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হিসেবে ঘোষিত হলো ১৭৯৩ সালে। বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার চুক্তিতে জমিদারদের স্ব স্ব চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য স্বীকৃত হলো। সহসা জমিদারগোষ্ঠী ভূমির মালিক হয়ে গেলেন, হতভাগ্য কৃষক শ্রেণী তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। রাজা রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'উত্তম' বলেছিলেন, তবে এ কথাও বলেছিলেন, চাষিদের অবস্থার উন্নতি করা উচিত।

অতঃপর ভূমিকর যা-ই বৃদ্ধি পাক, তার মালিক জমিদার। পুরাতন জমিদার গোষ্ঠীর পরিবর্তে চরিত্রে, মনমেজাজে কোম্পানির ইজারাদার বেনিয়ানরা নয়া জমিদার শ্রেণী হিসেবে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপায়িত হলো। তারা কলকাতায় বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হলো এবং নিজেদের ভাগ্যের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শাসনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থক হয়ে দাঁড়াল। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে লাগল ১৮৫৯ সালের ১১ আইন প্রভৃতি আইনবলে। 'সূর্যাস্ত আইন'বলে অলস জমিদারদের স্বত্ব নিলাম হয়ে নতুন জমিদারদের আবির্ভাব হতে লাগল। প্রায় কুড়ি বছরের মধ্যে প্রাচীন জমিদারদের এক-তৃতীয়াংশ 'সূর্যাস্ত আইন'-এ পরিবর্তিত হয়ে নয়া জমিদারদের আবির্ভাব হয়। অনেক জমিদারি নতুন মহাজনদের উচ্চহারে সুদের দাবি মেটাতে অশক্ত হয়ে নিলামে চড়তে লাগল। নতুন ধনী-সম্প্রদায়, অর্থাৎ বেনিয়ান, সরকার, আমিন গোষ্ঠী এসব জমিদারি আত্মসাৎ করে নয়া জমিদার, তালুকদার বনে যেতে লাগল।

এভাবে পুরাতন জমিদার শ্রেণীর বদলে ইংরেজের আশীর্বাদপুষ্ট নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী জমিদার তালুকদার হিসেবে প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রে কলকাতা বা অন্য শহর এলাকাবাসী; এজন্য অনুপস্থিত অন্যত্রবাসী জমিদার শ্রেণীতে বাংলা ভরে গেল। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য থাকত খাজনা আদায়,

৩৪. Modern Hist. of Indian Chiefs, Rajas. Zaminders etc, vol ii, p. 160-2 + 215-16.

৩৫. পূর্বে দেখুন ৬১ পৃ.

www.pathagar.com

তাছাড়া নানাবিধ অলিখিত 'আবওয়াব' আদায়। এভাবে মধ্যস্বত্বের নামে জমির প্রায় সর্বস্বত্বের মালিক ও ভোগী হয়ে দাঁড়াল জমিদার শ্রেণী; গরিব চাষী বা প্রজার প্রতি যাদের এতটুকু মায়া মমতা থাকত না। কৃষিকর্মের উন্নতি বিধায়ক কার্য বা পরিকল্পনারও কোনো ক্ষেত্র ছিল না, এমন মনোবৃত্তিও জন্মে নি। অতঃপর ভূমি রাজস্ব বিষয়ক যাবতীয় আইন খাজনাভোগী জমিদার-তালুকদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বশংবদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমি-স্বত্ব সংরক্ষণ বিষয়ে বিলেতি বণিক সংঘ প্রভৃতির উৎকণ্ঠারও সীমা ছিল না। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৯ সালের রাজস্ব বিষয়ক আইনটি মধ্যবিত্তদের ভূমিস্বত্ব পূর্ণভাবেই হেফাজত করে। এই আইনটি যখন বিল আকারে আলোচিত হচ্ছিল, তখন নীলকর সমিতির সেক্রেটারি নিম্নের মন্তব্য করেন :

> পত্তনিদার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে জমিদারীর অংশ বিশেষ চিরস্থায়ী স্বত্বে ক্রয় করে একটি মাত্র শর্তে—তিনি জমিদারকে খাজনা দিবেন, যার পরিমাণ পত্তনিভুক্ত রাজস্বের পরিমাণের কম হবে না। এই শর্তেই মধ্যস্বত্বটি সৃষ্ট। জমিদারের সঙ্গে পত্তনিদারের শুধুমাত্র এই খাজনারই সম্পর্ক এবং এই দায় ব্যতীত পত্তনিদারের নিগূঢ় ও নিরঙ্কুশ স্বত্ব জন্মায় এবং এ স্বত্ব জমিদারের বিরুদ্ধেও নিরঙ্কুশ অতএব জমিদারের পত্তনিতে মাত্র নির্দিষ্ট খাজনারই অধিকার আছে, এবং এই খাজনা আদায়-সম্পর্কিত ব্যাপারেই জমিদার পত্তনিভুক্ত জমিতে জোর খাটাতে পারেন, অন্য কোনো বিষয়ে নয়। এবং আরও পরিষ্কার যে, পত্তনিদার যদি খাজনা আদায়ে অবহেলা না করে, তাহলে তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে নিজের পূর্ণস্বত্ব সেরূপ খাটাতে পারবেন, যেমন জমিদার পারেন সরকারের বিরুদ্ধে।[৩৬]

বলাবাহুল্য, এ যুক্তি আইনে বিধিবদ্ধ হয়, এবং পত্তনিদার খাজনা আদায়ে ত্রুটি না করলে জমিদারি নিলাম হলেও পত্তনি ও তার নিম্নস্বত্বসমূহ অবিকৃত থাকার আইন রচিত হয়।

হান্টার বলেন : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যেসব নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা কৃষকদের সঙ্গে কায়কারবার করত, সেসব কর্মচারীদের জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।*[৩৭] তিনি আরও বলেন, *এই বন্দোবস্তের ফলে যেসব হিন্দুরা নগণ্য পদে নিয়োজিত ছিল, তারা জমিতে মালিকানা স্বত্ব লাভ করল এবং পূর্বে যে ধন মুসলমানদের ঘরে যেত সেসব হিন্দুরা আত্মসাৎ করতে লাগল।*[৩৮]

মুসলমানদের অবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠে। তাদের প্রায় সব ভূম্যাধিকার হস্তচ্যুত হয়ে তাদের মৃত জাতিতে পরিণত করে। কিন্তু এই 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, পড়ল বাযয়াফতী করণ নীতিতে। হান্টার বলেন, আমরা যখন বাংলাপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করি, তখন আমাদের সুদক্ষ রাজস্ব কর্মচারী

---

৩৬. Rep. Sel. Com. H. C. 1858.
৩৭. Indian Musalmans (1945), p. 154.
৩৮. Ibid. p 115.

www.pathagar.com

হিসাব কষে দেখান, সমগ্র প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ জমি সরকারের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। ১৭৭২ সালে হেস্টিংস এই বৃহৎ ধাপ্পাবাজি (!) ধরে ফেলেন, তখন থেকেই চেষ্টা চলে এসব ভূমি পুনরায় হস্তগত করার। বহু জল্পনা-কল্পনার পর ১৮২৮ সালে আইনবলে বাযয়াফতী কোর্ট বসানো হয় ও কয়েক হাজার মামলা দায়ের করা হয়। সারা দেশ মিথ্যাসাক্ষী ও ক্রুর বাযয়াফতী কর্মচারীতে ভরে যায়। আঠারো বছর ধরে কঠোর মামলাদির পর সহস্র সহস্র লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারে খাস করে নেওয়া হয়। প্রায় আট লক্ষ পাউন্ড বাযয়াফতী মামলাসমূহে ব্যয় করে কোম্পানি বার্ষিক তিন লক্ষ পাউন্ড মুনাফা লাভ করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তার চিহ্ন আজও সরকারি দলিল-দস্তাবেজে মেলে। শত শত প্রাচীন অভিজাত বংশ ধ্বংস হয়ে গেল এবং মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা—যা প্রধানত এসব লাখেরাজ ভূমির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল—একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পরেও পঁচাত্তর বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন ভোগদখল স্বত্ব সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল হিসেবে গণ্য হয় নি। আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা কোনো মমতা দেখান নি। সেকালের আতঙ্ক আজও স্মরণ করা হয় এবং এটি আমাদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণার স্মৃতি রেখে গেছে। *একথা নিঃসন্দেহ যে, বাযয়াফতী মামলাগুলোর ফলে মুসলমান শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি তাদের অবনতির নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় প্রধান কারণ।*[৩৯] শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানের চরম বিপর্যয়ের আর একটি চিত্র মেলে জওয়াহেরলাল নেহরুর লেখনী মুখে :

> ইংরেজরা যখন বাংলায় শক্তি প্রকাশ করে, তখন সেখানে বহু 'মুয়াফী' অর্থাৎ লাখেরাজ ভূদানের অস্তিত্ব ছিল। তাদের অনেক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষায়তনগুলোর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত। প্রায় সমস্তই প্রাইমারি স্কুল (মকতব) এবং বহু উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব মুয়াফীর আয়নির্ভর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলাতে অংশীদারদের মুনাফা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি টাকা তোলার দরকার অনুভব করে, কারণ কোম্পানির ডিরেকটাররা এ বিষয়ে খুবই চাপ দিচ্ছিলেন। তখন এক সুপরিকল্পিত উপায়ে মুয়াফীর জমি বাযয়াফত করার নীতি গ্রহণ করা হলো। এসব ভূদানের স্বপক্ষে কঠিন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করার নিয়ম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু পুরানো সনদগুলো ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ইতিমধ্যেই হয় হারিয়ে গেছে, নয় পোকায় খেয়ে ফেলেছে। অতএব প্রায় সমস্তই 'মুয়াফী' সরকারে বাযয়াফত করে ফেলা হলো। বহু বনেদি ভূম্যাধিকারী স্বত্বচ্যুত হলেন এবং স্কুল ও কলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে প্রভূত জমি সরকারের খাস দখলে আসে এবং বহু বনেদি বংশ উৎখাত হয়ে যায়। এ পর্যন্ত দেশের যেসব শিক্ষায়তন সেসব মুয়াফীর আয়নির্ভর ছিল, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারী বেকার হয়ে পড়লেন।[৪০]

---

৩৯. Ibid, pp 176-78.
৪০. The Discovery of India, pp. 376-77.

www.pathagar.com

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এরূপ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকারোক্তির পর আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বঞ্চিতের যে পরিমাণ নিরীহ অশ্রু ঝরেছিল, যে পরিমাণ ক্ষোভ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনা করে এ সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ধ্বংসীকৃত মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্থিস্তূপ থেকেই ইংরেজরা তাদের বশংবদ ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মদান করেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য প্রদেশে এ কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসৃত হয় নি। *বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনিস্টোন ইনাম প্রথা চালু রেখেছিলেন; তিনি সর্বপ্রকার উত্তরাধিকার স্বত্ব স্বীকার করে নেন, ইনাম বৃত্তি ও ধর্মীয় দানসমূহ কিছুই লোপ করেন নি।*[৪১] মাদ্রাজে টমাস মনরো জমিদারি বন্দোবস্তের চরম বিরুদ্ধতা করেন ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থাই চালু রাখেন। এখানেও সর্ববিধ ইনাম রক্ষা করা হয়। এসব প্রদেশের গ্রাম্য অঞ্চলে ব্যক্তিসত্তার উদ্ভব হয় প্রাচীন পঞ্চায়তি প্রথার পরিবর্তে, এবং এসব প্রদেশেও ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়। *কিন্তু বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন একমাত্র বাংলাদেশেই বহুল পরিমাণে সাধিত হয়েছিল।*[৪২]

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী : পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা সম্প্রসারণের দ্বারা বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি তিনটি : সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহে কর্মচারীর চাহিদা পূরণ; অর্থনৈতিক ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচার। অবশ্য এ তিনটার সমবায়ে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোহমুগ্ধ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইংরেজ-স্তাবকের সৃষ্টি করা, যারা আপন স্বার্থেই ইংরেজি শাসনের স্থায়িত্ব সাধনে প্রধান সহায়ক হবে।

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এদেশে টোল-পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হতো সংস্কৃত ভাষায় এবং মাদ্রাসা-মকতবে আরবি ও ফারসি ভাষায়। উর্দু ও বাংলা ভাষা শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। এসব শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচি ছিল যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ইতিহাস, ধর্মীয় বিধিবিধান, উত্তরাধিকার নীতি, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও সাহিত্য। আধুনিক পাশ্চাত্যানুসারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এসব শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিতের দলই তৎকালীন বৃহৎ বাদশাহি চালাত, দপ্তর চালাত, বিদেশি কূটনৈতিক সম্বন্ধ ও বৈদেশিক নীতি চালাত, দেশের স্থাপত্য বিষয়ক ও কারিগরি বিষয়ক সকল কর্মই নির্বাহ করত; শিক্ষা-সংস্কৃতির কোনো বিষয়ে কোনো বিদেশি বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হতো না।

---

৪১. Misra. p.142.
৪২. Misra, 146.

www.pathagar.com

ইংরেজরা এদেশ অধিকার করে প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর শিক্ষা বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামায় নি। কেবল শাসন চালানোর জন্যে কর্মচারীর চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯২ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়, ইংরেজ সরকারের মৌলবি ও পণ্ডিতের চাহিদা পূরণের জন্যে। অবশ্য বিলেতি হৌসের ভাঙাবুলিসর্বস্ব ইংরেজি শিক্ষিত বেনিয়ান, সরকার প্রভৃতির চাহিদা মেটানো হতো বেসরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে। দ্বারিকানাথ এই ধরনের শিক্ষায়তন সেরবোর্ন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা করেছিলেন।

এদেশে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করে ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ওকালতি করেন, সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান চার্লস গ্রান্ট। তাঁর মতে 'এদেশের সর্বব্যাপী ঘন জ্ঞানান্ধকার শিক্ষা বিস্তারে এবং একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারেই দূর করা সম্ভব।' কিন্তু তাঁর আবেদনের বিলেতি কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করে নি। তাঁর আবেদন নিষ্ফল হলেও খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতায় বাংলা ও মাদ্রাজে ইংরেজি শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ সালে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং কয়েকজন উৎসাহী মিশনারির সহায়তায় শ্রীরামপুরে স্থায়ীভাবে মিশন স্থাপন করে একাধারে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যান্য ইংরেজ উদরমনা ব্যক্তি, যেমন ডেভিড হেয়ার, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজি স্কুল স্থাপন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচার করতে থাকেন।

কিন্তু সরকারিভাবে প্রচেষ্টা হয় আরও অনেক পরে, ১৮২৩ সালে তখন জনশিক্ষার একটা কমিটি স্থাপিত হয় ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি আসে রাজা রামমোহনের কাছে থেকে; তিনি সংস্কৃত শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তা হিসেবে লর্ড আমহার্স্টের কাছে একটি লিখিত আবেদন পেশ করেন। পূর্বে উক্ত হয়েছে, রাজা কলিকাতায় ১৮১৪ সালে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৭৭০ সালে কৃষ্ণনগরের এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর কুলে এক সতীদাহ দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে গৃহত্যাগ করেন। সাত বছর তিনি তিব্বত পর্যন্ত নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন এবং উপনিষদাদি হিন্দুর শাস্ত্র, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন। আরবি, সংস্কৃত, গ্রিক, ফারসি, হিব্রু ও ইংরেজিসহ দশটি ভাষায় তাঁর অধিকার জন্মে। মুসলমান ও ইংরেজের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন এবং এভাবে তাঁর মনমানস আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহচর্যে লাভবান অনেকের মতো তিনিও ভারতে ইংরেজ বিজয়কে বিধাতার আশীর্বাদ জ্ঞান করেছেন। তাঁর প্রতীতি জন্মেছিল, ইংরেজ শাসন চিরকাল থাকবে, অতএব ইংরেজের ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতার পূর্ণাঙ্গভাবে অনুশীলন ও অনুসরণেই এদেশবাসীর কল্যাণ নিহিত। এ আবেদনে তিনি ইংরেজের মাধ্যমে এই হতভাগ্য দেশকে তার পূর্বতন

www.pathagar.com

শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইংরেজের সাহিত্য-দর্শন ও ব্যবহারিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে ইংরেজ জাত সম্পর্কে তাঁর মনে যে উচ্চাশা ও শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয়, ঐ আবেদনে তিনি তাও ব্যক্ত করেন ও বলেন,

> 'ইংরেজ এমন জাত যারা শুধুমাত্র নিজেরা নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করে না, যে দেশে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় সেখানেও সামাজিক সুখশান্তি, সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ চর্চা ও অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে'।[৪৩] এই ইংরেজশাসনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রবল প্রবক্তা হিসেবে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের দিকে জোর দেন ও তদুদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ স্থাপনের সুপারিশ জানান।[৪৪]

রাজার সুপারিশ কার্যকরী করার চেষ্টা হয় লর্ড বেন্টিংক ১৮২৮ সালে গভর্নর জেনারেল ও লর্ড মেকলে ১৮৩৪ সালে আইন মেম্বার হিসেবে নিযুক্ত হলে পর। এই সময় ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য প্রণালির শিক্ষা প্রবর্তন বিষয়ে যে তুমুল বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে নীতিগতভাবে তিনটি মতের প্রাধান্য দেখা যায় : প্রথম টোরী বা রক্ষণশীল দল—প্রাচ্যবিদ হোরেস উইলসন ছিলেন এ দলের নেতা; তিনি বিরোধী ছিলেন না, তবে সাবধানতার সঙ্গে ধীরগতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমদানির সুপারিশ করেন এবং আরও পরামর্শ দেন সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষা এবং প্রাচ্য সংস্কৃতিরও উন্নতি বিধান করতে হবে। দ্বিতীয় উদারপন্থী দল—মেটকাফ, মনরো, ম্যালকম ও এলফিনিস্টোন। তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা, জীবনের মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, তবে তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য উন্নয়নেরও সুপারিশ করেন। তাঁরা এ দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধনের দিকে বেশি জোর দেন। ম্যালকম বলেছিলেন,

> আমাদের ক্রমশ উন্নতিসাধনের পথে অগ্রসর হতে হবে। যখন আমাদের শাসন শেষ হবে এবং তা হতে বাধ্য (যদিও সম্ভবত বহু পরে),[৪৫] তখন আমাদের শিক্ষার বিকীরণের স্বাভাবিক সুফল স্বরূপ আমাদের জাতি হিসেবে এ গর্ব থাকবে যে, আমরা ভারতের চির পরাধীনতার পরিবর্তে সভ্যতাকেই উচ্চস্থান দিয়েছিলাম। আমাদের ক্ষমতা শেষ হলেও আমাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তিত হবে, কারণ আমরা একটি এমন মহৎ নীতিবোধের স্মৃতিসৌধ রেখে যাব, যা মানুষের সব নির্মিতির চেয়ে মহত্তর ও অবিনশ্বর।[৪৬]

তৃতীয় মতের সমর্থক ছিল উগ্রপন্থীর দল—বেন্থাম, জেমস মিলের মতো যুক্তিবাদীরা; মেকলে, ট্রিভেলিয়ন ও লর্ড বেন্টিংকের মতো ঝানু সাম্রাজ্যবাদী

---

৪৩. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১৪১৫-পৃ.।

৪৪. Advanced Hist. of India, p 187.

৪৫. ম্যালকমের দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়, যদিও এ দৃষ্টিভঙ্গি রামমোহনসহ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তখন জন্মে নি।

৪৬. Memoirs, ii. p. 304.

www.pathagar.com

প্রশাসনের পুরোবর্তী ব্যক্তির এবং তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ইলবার ফোর্স, ক্লাপহ্যাম প্রভৃতি খ্রিষ্টীয় মিশনারিগোষ্ঠীর কর্তাব্যক্তিরা। তাঁদের যুক্তিগুলো ব্যক্ত হয়েছিল মেকলে সাহেবের নিম্নের উক্তিতে :

> বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তাঁরা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।[৪৭]
>
> আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয়, তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি সমাজে কোনো মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না এবং আমাদের তরফ থেকে কোনো রকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও, এই ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও প্রয়োজন হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য সাধন হবে।[৪৮]

মেকলের এই সদম্ভ উক্তিও এখানে স্মরণীয় :

> ইউরোপীয় যেকোনো ভালো লাইব্রেরির একখানিক মাত্র আলমারি ভারত ও আরবের সমগ্র দেশীয় সাহিত্যের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

টিভেলিয়ন সাহেব বলেছিলেন,

> ব্যবসায়ী ধনী, শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রথমে লাভবান হবেন; একদল নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব হবে; দেশি ভাষার পুস্তকাদি বেশি প্রকাশিত হবে; তখন এসব দ্বারা আমরা শহর থেকে গ্রামে, অল্প থেকে বিশাল জনসাধারণে ঘরে ঘরে অগ্রসর হবো প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের প্রতিষ্ঠা করে। কমিটির বিবেচনায় দরিদ্রের কথাও চিন্তা করা হবে, তবে আমাদের সামর্থ্য সীমিত, অথচ লক্ষ লক্ষ লোককে শিক্ষা দিতে হবে। এজন্যই নির্বাচনের প্রয়োজন এবং প্রথমে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দিকেই লক্ষ দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা শিক্ষিত হলে জনসাধারণের মধ্যেও সুযোগ ছড়িয়ে পড়বে।

অতএব ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন মেটাতে এবং রাজনৈতিক গরজে এদেশে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। এবং শিক্ষার বিস্তারও সীমিত রাখা হয়েছিল শহরবাসী (প্রথম বাংলায় মাত্র কলকাতাবাসী) উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে। কারণ এরাই ছিল ধন-সম্পদে ও শাসকদের বশবর্তিতায় সবার অগ্রণী। ১৮৩৫ সাল থেকে কয়েকটি আইনবলে ইংরেজি রাজভাষা ও ফারসির বদলে সরকারি ভাষা নির্দিষ্ট হয়, ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান দেশীয়দের শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা স্থিরীকৃত হয় এবং শিক্ষাখাতের সমস্ত বরাদ্দটাই ইংরেজি শিক্ষার্থে ব্যয়িত করা নির্ধারিত হয়। ১৮৩৭ সালের পহেলা এপ্রিল থেকে সরকারি সর্বকর্মে ফারসিকে দূরীভূত

---

৪৭. Woodrow—Macaulay's Minutes on Education in India (1862).
৪৮. Trevelyan—Life and Letters of Lord Macaulay, vol I, p. 455.

www.pathagar.com

করে ইংরেজির বোধন কার্য সম্পন্ন হয়। *বলাবাহুল্য, আজাদি উত্তর যুগে বিশ বছর পরেও কি পাকিস্তানে কি ভারতে ইংরেজির এ আসন অটুট রয়ে গেছে।*[৪৯]

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, ইংরেজরা কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে চুপে চুপে ইংরেজিকরণ নীতি প্রবর্তন করেছে কোনো বিধিবদ্ধ দিন ধার্য করে এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসমষ্টিকে সচেতন না করে নিজের সংকল্প কর্মে পরিণত করা। ১৮২৯ সালে সবরকম শিক্ষার বাহন হিসেবে স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। এবং ১৮৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে (তৎকালীন আর্থিক বছরের প্রথম দিন) সহসা সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রবর্তন হয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজ মিশনারিদের কূটচালে আরবি-ফারসি শব্দাশ্রিত ভারতীয় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ভাষা-অবদান উর্দুকেও স্থানচ্যুত করে সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দুস্তানি ভাষাও সৃষ্ট হয় এবং সরকারা অনুমোদিত একমাত্র দেশি ভাষা হিসেবে চাকরিপ্রাপ্তির সনদরূপে স্বীকৃত হয়। তার ফলে ইংরেজি ভাষা এ দেশটার সরকারি-বেসরকারি ক্রিয়াকর্মে এভাবে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে গেছে এবং শিক্ষিতদের মগজে ও মন-মানসে এরূপ শিকড় প্রবেশ করে ফেলেছে যে, ১১০ বছর পর যখন ব্রিটিশরাজ পাকিস্তান ও ভারতকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদাসিক্ত করল ১৯৪৭ সালে, তখন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রই ব্রিটিশ-রাজের অবদান ইংরেজি এবং ভারত হিন্দুস্তানিকেও ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতে পারে নি। *ভারত অবশ্য ইংরেজ মিশনারির অবদান হিন্দুস্তানিকে একমাত্র রাষ্ট্র বনাম জাতীয় ভাষায় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।*[৫০]

বস্তুত মিশনারিদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রবর্তনের জন্যে প্রবল উৎসাহের পিছনে যে মৌল উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটি সমকালীন মুসলমানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। এজন্য দেখা যায়, হোরেস উইলসন সাহেব বলেছেন, শিক্ষা বিষয়ক সব মূলধন যখন কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত করার নীতি গৃহীত হয়, তখন কলিকাতা শহরের মৌলভি ও সম্ভ্রান্ত প্রায় ৮,০০০ মুসলমান বড়লাটের নিকট একটি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন। তাঁরা এ নীতির সাধারণভাবে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন,

> সরকারের এ উদ্দেশ্যটি সুপরিস্ফুট যে, তাঁরা দেশীয় লোকদের ধর্মান্তীরত করতে চান; সরকার মুসলমানি ও হিন্দুয়ানি শিক্ষা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহ দিতে চান এদেশি লোকদের খ্রিষ্টান করার লোভ দেখানোর উদ্দেশ্যেই।[৫১]

এভাবে ইংরেজি শিক্ষার বোধন হয়েছিল প্রধানত রাজনৈতিক গরজে এবং নগরবাসী একটি মাত্র শ্রেণীর মঙ্গল বিধানে। বাস্তবপক্ষে ইংরেজি শিক্ষাই হলো এ দেশীয়দের সরকারি অফিস-আদালতে চাকরি লাভের একমাত্র পাসপোর্ট, আর

৪৯. Trevelyan, p 48.
৫০. A Study of History, pp. 604-605.
৫১. Indian Muslims : A Political History—Ram Gopal, p. 18-19.

www.pathagar.com

এজন্যে এ ভাষাটার শিক্ষা হয় দ্রুত, নিশ্চিত ও সর্বব্যাপক। কিন্তু এ শিক্ষানীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো, মাত্র মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজেই তা সীমিত করা হয়েছিল, বৃহৎ জনসাধারণ মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত হলো। আবার ইংরেজি শিক্ষার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরাই আত্মসাৎ করল, অভিজাত হিন্দুরা এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় দূরে পড়ে রইল। *দেশকে ইংরেজিয়ানাকরণের এই অনুপ্রবেশ যুদ্ধে মেকলেপন্থীরাই জয়ী হয়েছিলেন।*[৫২]

অর্থনৈতিক গরজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি হলে ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাম্রাজ্যিক শাসনকর্মে ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে তথা শোষণকর্মের শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠবে, এটাই ছিল তৎকালীন ধারণা। ব্রিটিশ সাম্রাজিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল, এই শ্রেণীর দ্বারা দুটি প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করা : ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি করা এবং এই বিশেষ শ্রেণীর সমৃদ্ধির ফলে অর্থসঞ্চয়টা এমনভাবে সীমিত রাখা, যার দরুন বিলাতি পণ্য ক্রয় ও ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। কোম্পানি ব্যবসায়ে অবাধ নীতিটা এমনভাবে প্রয়োগ করেছিল, যার ষোলো আনা লাভ ভোগ করত ইংরেজরা এবং এ দেশীরা ছিটেফোঁটা লাভ করেই ধন্য হয়ে ইংরেজিয়ানার স্তাবক হয়ে উঠেছিল। চালস গ্রান্ট ১৭৯০ সালে দুঃখ করেছিলেন : এ দেশিরা আমাদের পোশাক গ্রহণ করছে না, বিলেতি পণ্য ব্যবহারে ধর্মীয় সংকোচ-শঙ্কা প্রকাশ করছে, অতএব ইংরেজি শিক্ষা দাও, ইংরেজি চালচলনে, পোশাকে, খানায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তিন দশক পরে বিশপ হিভার ১৮২৩ সালে লিখেছিলেন : আমাদের স্বভাব অনুকরণে উন্নতিটা বেড়েছে। আমাদের পোশাক কেউ পরে না। কিন্তু তাদের ঘরগুলো আমাদের মতো সাজায়, বারান্দা কোরিন্থীয় থাম দিয়ে সাজায়। *তাদের বিলেতি জুড়িগাড়ি আছে, তারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলে, পাশ্চাত্য সমাজের চালচলনও রপ্ত করেছে।*[৫৩]

১৮৩২ সালে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বিক্রয় কী হারে বেড়েছে। তথ্য মেলে যে, কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিলেতি বস্ত্রেরই চাহিদা বাড়ে নি, বিলেতি মদেরও কদর বেড়েছে। হোল্ট ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন, কলকাতাবাসী দেশীয়দের মধ্যে বিলেতি বিলাসদ্রব্যের আকর্ষণ বেড়েছে, তাদের বিলেতী আসবাবে সজ্জিত বাড়ি আছে, ঘড়ি আছে, জুড়িগাড়ি আছে এবং তারা মদ্যপানও করছে। *বিলেতি মদের বিষয়ে পার্লামেন্টে বলা হয়, কলকাতার নেটিভরা নিশ্চয়ই বেশি মদ্যপান করে, কারণ ইউরোপীয়ানায় তাদের 'প্রেজুডিস' নেই এটাই প্রমাণ করতে চায়; তারা মদ, ব্রান্ডি, বিয়ার পান করে।*[৫৪]

---

৫২. Advanced Hist. of India, p. 818-19.
৫৩. Narrative, ii, p. 291.
৫৪. Sel. Com. H.C. 1831-32.

www.pathagar.com

এসব লোকের দ্বারাই নয়া মধ্যবিত্ত সমাজ সংগঠিত হয়েছিল। তাদের শ্রেণী সচেতনতা বোধ না থাকলেও অপরিমিত অর্থ ছিল। সরকারি অফিসে কিংবা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে তারা বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে তুমুল আন্দোলন করেছিল। শিক্ষিত ও বিত্তবান বাঙালি ইংরেজি ব্যতীত সন্তানদের শিক্ষার কথা চিন্তা করতে পারত না। বৈষয়িক চেতনার সঙ্গে কালক্রমে অন্যান্য উপকরণ এসে মিশ্রিত হয়েছে–ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা, শিক্ষাদীক্ষা, পুঁথিপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত ভাবরাশি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বিরোধ জাগায় নি, আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সম্পূর্ণ অভিনব অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভব বলে দেশীয় জনসাধারণ ও সমাজজীবনের সঙ্গে তারা আত্মিক মিল অনুভব করে নি—*দেশের হয়েও যেন দেশজ নয়, কৃষ্ণ হয়েও যেন শ্বেতগন্ধী।*[৫৫]

১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই চার্লস উড যে বিখ্যাত 'শিক্ষাবিষয়ক বিবরণী' বিলেতে পাঠান, তাতেও ব্রিটিশ শিক্ষানীতির এই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, সরকারি কর্মচারীদের জ্ঞান ও চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনের জন্যে ইংরেজি শিক্ষাই প্রয়োজন, তখন মাত্র তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে, নীতির দিক দিয়ে এটা শুভদ যে, এমন একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করতে হবে যারা ভারতীয় সম্পদসমূহের উন্নয়ন করবে ইউরোপীয় পন্থায় এবং যাদের মধ্যে বিলেতি পণ্যের ব্যবহার ক্রমাগত বর্ধিত হবে। ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কলকারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করবে এবং ব্রিটিশ শ্রমজাত পণ্যদ্রব্যেরও চাহিদা অবিরাম ও অপ্রতিহত থাকবে। উড সাহেব আরও বলেছিলেন *"সরকার উচ্চশিক্ষা দানের ক্ষেত্র একেবারে সীমিত রাখবেন উচ্চশ্রেণীর দেশীয় সন্তানদের মধ্যেই।"*[৫৬]

কোম্পানি সরকার যখন চিন্তা করছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের কথা সাম্রাজিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ও লাভের দিক দিয়ে, তখন মিশনারিরা এটাকে দেখছিলেন খ্রিষ্টপ্রচারণার উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে। ইউরোপীয় বণিকদের পিছনে পিছনে মিশনারি দলও এদেশে উপস্থিত হয়ে মথিলিখিত সুসমাচার প্রচারের কার্যে তৎপর ছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় নি। কোম্পানির শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই মিশনারিরা উৎসাহী হয়ে উঠে এবং সোচ্চারে তাদের উপস্থিতি প্রকাশ করতে থাকে। বাংলায় চার্লস গ্রান্ট ইংরেজির মাধ্যমে খ্রিষ্ট প্রচারণা আরও দ্রুতগতি হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। উইলিয়ম কেরী, মার্শমান ও উডওয়ার্ড যখন জোরেশোরে বাংলাদেশে মিশনারি কর্মে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গ্রান্ট সাহেব বিলেতে বসে ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে সরকারি ব্যয়ে ভারতে ব্যাপ্টিস্ট মিশন স্থাপনের বিধিও সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন।

৫৫. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ৯ পৃ.।
৫৬. Parliamentary Papers : 1854.

www.pathagar.com

মার্শম্যান ও ইংলিশ প্রথমে সুপারিশ করেন, ভারতে মিশনারি কার্যের সুবিধার্থে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন অবিলম্বে আরম্ভ করা হোক। শিক্ষার মাধ্যমে মিশনারি কার্যের প্রবক্তা ইংলিশ সাহেব 'এ ডনবরায় প্রথমে প্রকাশ করেন, ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়েই হিন্দু সন্তানদের 'সুসমাচার'-এ আকর্ষণ করা সহজ হবে।' ইংরেজির প্রতি হিন্দু বেনিয়ান, সরকারদের আকর্ষণ পূর্বেই জন্মেছিল, এখন সরকারি অফিসে চাকরির জন্য ইংরেজি শিক্ষার আকর্ষণ আরও জন্মানোর চেষ্টা চলল মিশনারিদের মারফতে। খ্রিষ্টান হলেই চাকরি নির্ঘাত—অতএব মিশনারি সাহেবদের প্রলোভনে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

প্রথমে অবশ্য মিশনারির মায়াজালে ইংরেজি শিক্ষা অগ্রসর হচ্ছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এমনিতেই তাদের প্রতি এদেশি লোকের বিতৃষ্ণা ছিল। ১৮২০ সালে বিশপস কলেজ স্থাপিত হলে অখ্রিষ্টানকে ভর্তি করার নিষেধ ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে হিদেনদের খ্রিষ্টের আলোকদান করা। ১৮৩০ সালে অখ্রিষ্টানদের জন্যে কলেজটা উন্মুক্ত হলেও পনেরো বছরের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা এগারোর উর্ধ্বে ওঠে নি। উল্লেখযোগ্য যে, মাইকেল মধুসূদন ছিলেন তাদের অন্যতম।

পূর্বে উল্লিখিত মুসলমানদের আবেদনক্রমে লর্ড বেন্টিংক নির্দেশ দিতে বাধ্য হন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা প্রতিপালিত হবে; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রকারে কোনো শিক্ষায়তনে খ্রিষ্টধর্মীয় শিক্ষার সম্পর্ক থাকবে না। তবু মিশনারিদের মনোভাব অনমনীয় থেকে যায়। গ্রান্ট সাহেব পরামর্শ দেন, শিক্ষায়তনে সাহায্য নীতিটা মিশনারিদের প্রভাবমুক্ত রাখাই বুদ্ধির কাজ, অন্যথায় এদেশীয় মনোবৃত্তি শাসকদের বিরুদ্ধে যাবে একমাত্র ধর্মীয় কারণে। কিন্তু তাঁদের যুক্তি গৃহীত হয় নি। তবে তাঁর ভবিষদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল মিউটিনির সময়। ভারতীয়রা দিল্লিতে ব্যারাক আক্রমণের পূর্বে গির্জা আক্রমণ করেছিল এবং চিম্মলাল ডাক্তারসহ বহু মিশনারিকে হত্যা করেছিল, কারণ তিনি বহু স্থানীয় হিন্দুকে খ্রিষ্টান করেছিলেন। সরকার এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম প্রধানত রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন, এখানে সরকারিভাবে 'সুসমাচার' প্রচার নিরাপদ নয়। এজন্যে বেসরকারিভাবে বিদেশি মিশনগুলো স্কুল-কলেজ স্থাপন করে ইংরেজি শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে খ্রিষ্টানত্বে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে আসছে।

সরকারি ব্যয়ে স্কুল-কলেজ স্থাপন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কী গতিতে হয়েছিল তার একটা খতিয়ান নেওয়া যেতে পারে। ১৮৩৬ সালের আগস্ট মাসে হুগলি কলেজ খোলার পর মাত্র তিন দিনে ১,২০০ ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। ১৮৩৪-১৮৩৫ দুটি পূর্ণ বছরে ইংরেজি বই বিক্রয় হয়েছে ৩১,৬৫৯; কিন্তু দেশীয় সর্বভাষার বই বিক্রয় হয়েছে পনেরো হাজারের কিছু বেশি। ১৮৪৫ সালের

www.pathagar.com

সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে সরকারি ব্যয়ে এদেশের স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীর এরূপ সংখ্যা মেলে :

প্রদেশ	খ্রিষ্টান	হিন্দু	মুসলিম	মোট
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৮২	১৫৯৭	৫০৭	২১৮৬
বাংলা বিহার	১৫৪	৫৯৭৫	৯০৭	৭০৩৬
বোম্বাই	×	৭৯১৬	২২২	৮১৩৮
	২৩৬	১৫৪৮৮	১৬৩৬	১৭৩৬০

এ হিসাবের মধ্যে মিশনারি কলেজগুলো ধরা হয় নি। বাংলায় বিশপস কলেজ, ডাফ কলেজ, জেনারেল এসেম্বলি ইনস্টিটিউসন ও শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট কলেজ ছিল। মাদ্রাজের মসলপট্টমে ও নাগপুরে মিশনারি শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়েছিল। কলিকাতা বিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৬ সালে এবং ইংরেজিতে শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। ১৮২৩ সালে জনশিক্ষা কমিটি হিন্দু কলেজের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। বোম্বাইয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই উচ্চশিক্ষা সীমিত ছিল। এলফিনিস্টোন কলেজ স্থাপিত হলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই প্রবেশাধিকার থাকে। বেসরকারি উদ্যোগে কলেজ স্থাপনে মিশনারিরাই বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে। অবশ্য এসব মিশনারি স্কুল বা কলেজে মুসলমান ছাত্ররা প্রবেশ করত না। এবং বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রথম থেকেই মাথাভারি ছিল। বিহারে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ভীষণ বিমুখতা দেখা গেল। উল্লেখযোগ্য, এখানে জমিদাররা অধিকাংশই মুসলমান এবং তাঁরা একযোগে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধতা করেন। ১৮৫৮ সালের ১৯ নভেম্বর বাংলার গভর্নর রিপোর্ট করেন যে, পাটনার ইনস্পেক্টরের অফিসটিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'শয়তান কা দফতরখানাহ্'। লর্ড এলেনবরা একবার মন্তব্য করেছিলেন, বিহারে স্থানীয় জমিদারদের ও জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং এজন্যই বিহারে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়েছিল। বস্তুত বিহারে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকে ধরা হয়েছিল প্রদেশটিকে খ্রিষ্টান করণের দুরভিসন্ধি।

১৮৫৩ সালের শিক্ষা রিপোর্টে জানা যায়, বছরে ১০ থেকে ২১ লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হতো। এ সম্বন্ধে বাংলার গভর্নর মন্তব্য করেছিলেন : যদিও এ ব্যয়টা আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে একটা আশ্চর্য অপব্যয়ের নিদর্শন, তবুও এটা ভারতের জন্য করা হয় এবং জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের এক শতাংশের চেয়েও কম; কিংবা বলা যায়, ইংরেজি পদাতিক সেনাদের দুটা রেজিমেন্টের খরচের চেয়ে কম।

ব্রিটিশ প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার একটি বৃহৎ গলদ এই ছিল যে, শিক্ষায়তনগুলোর সঙ্গে কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানের কোনো পার্থক্য ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যখন চাকরি, তখন বিদ্যার যেটুকু মূলধন সম্বল করে সেই লক্ষ্যে মাত্র

www.pathagar.com

পৌঁছানো যায়, তার বেশি বিদ্যা অনাবশ্যক। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান পরিণতি হয়েছে অর্থকরী বা পেশাকরী মাত্র, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানের পরিচর্যাতে নয়। এজন্য ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি হয়েছে কেরানি, কর্মচারী ও আমলাবাহিনী উৎপাদনে। আর তার পরিণামে সংস্কৃতিক্ষেত্রেও মর্মান্তিক ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতির এই শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে একজন লিখেছেন :

> "...তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কর্মচারী উৎপাদন করা, আইনজীবী, ডাক্তার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কেরানি সৃষ্টি করা। এই সংকীর্ণ অর্থে তাদের প্রচেষ্টা আশ্চর্যভাবে ফলবতী হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্ণ ব্যর্থতা হয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।[৫৭]

এমনকি মেকলের সদম্ভোক্তিরও বহ্বাড়ম্বর সার হয়েছে শুধু। তিনি যে ভারতীয় মেটে রঙের চামড়ার অন্তরালে ইংরেজের সংযমী ও বিজ্ঞানী মনটি গড়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, তাও ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যের আংশিক সাফল্য এসেছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি দোভাষী শ্রেণীর বিকাশের মধ্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার কোনো আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজম, কোনোকিছুই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী বা ব্যাপকভাবে বাঙালি বা ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ্বৎ-সমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পারে নি। তার কারণ দেশের জলবায়ু মাটির গুণ বদলায় নি। পাশ্চাত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে এদেশের বর্ধিষ্ণু নাগরিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই—বিশাল জনসাধারণকে একেবারে উপেক্ষা করে। কেবল বীজের গুণে প্রথম দিকের উনিশ শতকে তার বিস্ময়কর অঙ্কুরোদ্গমে আমরা ধাঁরিয়ে গেছি। ভেবেছি, নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে। কঠোর সত্য যে, তা আসে নি। সমাজের অর্থনৈতিক স্তরের মৌলিক কাঠামো খানিকটা বদলেছিল ঠিকই এবং তার সংঘাতে সমাজের গড়নও যে কিছুটা বদলায় নি তা বলি না। কিন্তু মধ্য পথেই এই পুরাতনের ভাঙন ও নতুনের গড়নের স্রোতধারা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরাধীন উপনিবেশের অদৃষ্টে যা হওয়া সম্ভব তাই হয়েছিল।

> তাই অঙ্কুরেই পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে গেছে, শুধু অবশিষ্ট আছে ব্যর্থ অনুকরণজড়িত পরাধীন জাতির অঙ্গে বিদেশি পলাতক প্রভুদের শত লাঞ্ছনার চিহ্ন।[৫৮]

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী : বুদ্ধিজীবীদের পেশাসমূহ

ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পরিণতি হয়েছে অর্থকরী পেশায়—চাকরি বা স্বাধীনভাবে লিপ্ত হওয়া। অর্থাৎ শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দিন

৫৭. Arthur Mayhew : Education in India, p. 149.
৫৮. বাঙ্গালী বিদ্বৎ-সমজের সমস্যা—বিনয় ঘোষ (চতুরঙ্গ, ১৩৬৪ বৈশাখ, ৮১-৮২ পৃ.)

www.pathagar.com

মজুরি উপায় করা। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পেশাকরী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আইনজীবীরাই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দেশের বনাম নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সোচ্চার; আরও স্মরণীয় যে, এঁদের মধ্য থেকেই জাতির শ্রেষ্ঠতম নেতার উদ্ভব হয়েছে, পাকিস্তানে ও ভারতেও। অতএব তাঁদের দিয়েই এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হচ্ছে :

ক. আইনজীবী

উকিল (ভকিল) বলতে আমরা আইনজীবীকেই বুঝি। বলাবাহুল্য, এ পেশাটি ব্রিটিশ কোর্টকাছারির অবদান। পূর্বে উকিল শব্দে বোঝাত প্রতিনিধি; জমিদারদের উকিল থাকতেন সুলতান বাদশাহের দরবারে, জমিদারের স্বার্থের তদারক করতে। আবার সুলতান বাদশাহের উকিল থাকতেন বিদেশি শাসকের দরবারে আধুনিক রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায়। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আইনজীবী শ্রেণী হিসেবে বর্তমান ছিল না।

কোম্পানির কোর্টসমূহে আইনজীবীর ভূমিকা সম্বন্ধে বহু কৌতুককর কাহিনী আছে। সে সব থেকে এ কথাটি বিশদ যে, আদিম স্তরে আইনজীবীর কোনো মাপকাঠি ছিল না। যে কেউ নিজের মামলা বা অপরের মামলা চালাতে পারত। মামলার সমন জারি হলে বিবাদি স্বয়ং কিংবা অপর কারও মারফত আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্থন করত। যে কেউ যেকোনো পক্ষের সমর্থন করতে পারত। তখন উকিল হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল না।

সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলে প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পে রেগুলেশন সমূহ সম্পাদন করেন এবং কোর্টের কার্যবিধির নিয়মাবলিও প্রস্তুত করেন। সেসব সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বোধগম্য ছিল না। এজন্য তাদের সাহায্য করতে পারিশ্রমিকভোগী আইনজীবীর উদ্ভব হয়। বস্তুত ইম্পে সাহেবই এদেশে আইনজীবী পেশার জন্মদাতা। তখন প্রয়োজন হয় আইনজীবীর যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা এবং কোর্টে তাঁর নাম ভুক্ত করা। ফারসি জ্ঞান ছিল প্রাথমিক যোগ্যতা, কারণ তখনও ফারসি ছিল আদালতের ভাষা। তাছাড়া প্রয়োজন হতো হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তি–আইনে মোটামুটি জ্ঞান এবং কোর্টের কার্যবিধি মেনে চলা। ১৭৯৩ সালের একটি রেগুলেশনবলে চরিত্রবান, শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিকেই উকিলের সনদ দেওয়া হতো। তখন কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের এ সনদ দেওয়া হতো। ১৮২৬ সালের ১১নং রেগুলেশনে বিধান হয় : দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এবং হিন্দু ও মুসলিম আইনে ব্যুৎপত্তি ও ব্রিটিশ রেগুলেশনসমূহের জ্ঞান জন্মালে যেকোনো জেলা কোর্টে ওকালতি করার সনদ দেওয়া যাবে।

১৮৩২ সালের বিবরণে দেখা যায়, ওকালতি ইংলিশ বারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে এবং ওকালতি পেশাও উচ্চস্তরে উঠে যাচ্ছে। ক্লার্ক বলেন,

www.pathagar.com

তখন উকিলদের জ্ঞান, বুদ্ধি ইংলিশ বারের যেকোনো সভ্যের চেয়ে কম বিবেচিত হতো না এবং মক্কেলের ইচ্ছানুসারে উকিলদের ইংলিশ বারে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো।

১৮৩২ সালেরই বিবরণীতে হোলট ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, তখনও আইন ব্যবসায় সম্মানজনক গণ্য হতো না। তাঁর মতে—

> সর্বোচ্চ কোর্ট ব্যতীত উকিলের অবস্থা মোটেই সম্মানজনক ছিল না। মফস্বল কোর্টে এমনকি জেলাকোর্টেও এ পেশা লোভনীয় ছিল না। কলিকাতা সদর দিওয়ানি আদালতের কিংবা চিফ কোর্টের বহু উকিলকে চিনি, যাঁরা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন, এবং আমার মনে হয়, প্রাদেশিক কোর্টের উকিলরাও সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁদের নিচের স্তরে তত সম্মানজনক মনে হয় না।[৫৯]

তখন উকিলরা একশ্রেণীর পরামর্শদাতা বা এজেন্ট নিযুক্ত করতেন, তাঁদের মোক্তার বলা হতো। তাঁদের কাজ ছিল সলিসিটরের মতো। কর্নওয়ালিস মোক্তারদের একেবারে বিতাড়িত করেন এবং উকিল হিসেবে সনদপ্রাপ্ত না হলে কাউকে আইন ব্যবসায় করতে দিতেন না। তবুও মোক্তাররা জেলা কোর্টে হাজির হতেন। শেষে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন মোক্তাররা ফৌজদারি কোর্টসমূহে পৃথকভাবে ব্যবসা করতে থাকেন। ১৮১৪ সালের ১৭নং রেগুলেশনে বিধান থাকে যে, কোর্টের জজদের সনদ ব্যতীত কেউ এজেন্ট বা মোক্তার হিসেবে কোনো অভিযোগে হাজির হতে পারবেন না। ১৮৩২ সালে ম্যাকেঞ্জি সাহেব বলেছিলেন, এটর্নির কাজগুলো মোক্তাররাই করে থাকেন। মোক্তাররা তখনও আইনত স্বীকৃতি পান নি এবং আইনত কোর্টে মামলা চালনার অধিকার পান নি। কোনো পক্ষ তাঁদের নিযুক্ত করলেও মামলার খরচ হিসেবে মোক্তার ফি ধরা হতো না।

১৮৩৪ সালে ল-কমিশন নিযুক্ত হলে কার্যবিধি আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং দণ্ডবিধি আইনও বিধিবদ্ধ করার প্রস্তুতি চলতে থাকে। আইনের ব্যাখ্যায় জটিলতা বৃদ্ধি পায়। বিদেশি ভাষায় আইন রচিত হতে থাকে এবং ১৮৩৭ সালের পর কোর্টের ভাষাও ইংরেজি হয়ে যায়। ফারসির বদলে ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ আইনজীবীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি হতে থাকে। তখন আইন ব্যবসায় পৃথকভাবে গড়ে উঠে এবং কোর্টসমূহে বিচারকার্য নির্বাহে উকিল শ্রেণী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেন।

লর্ড বেন্টিংকের আমল থেকে আইন-বিদ্যা শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা হিন্দু কলেজে ১৮৪২ সালে আইন অধ্যাপক নিযুক্তির ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৫ সাল থেকে আইন পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। উক্ত বছরেই মাদ্রাজে ও এলফিনিস্টোন কলেজে আইন শিক্ষাদানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আইন ব্যবসায় হলো স্বাধীন; জাতিধর্মনির্বিশেষে যে কেউ যোগ্যতা অর্জন করলে আইন ব্যবসায়ের অধিকারী হয়। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আলোচ্য

৫৯. Sel. Com. H. C. 1831-32.

www.pathagar.com

শতকে আইন ব্যবসায় ছিল কলকাতাবাসী বাঙালি হিন্দুর একচেটিয়া। আবার এই একচেটিয়া অধিকার নিরঙ্কুশ হলো যাবতীয় আইন ও কার্যবিধি নিয়মাবলি ইংরেজিতে বিধিবদ্ধ হওয়ার দরুন। এ সম্বন্ধে ভিন্সেন্ট স্মিথের একটি উক্তি কৌতুকপ্রদ: এসব ইংরেজি ভাষায় আবদ্ধ ও ইংরেজি কোর্টের প্যাটার্নে রচিত কার্যবিধিসমূহ ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ হতবুদ্ধি বিচারপ্রার্থীদের জ্ঞানগম্যির উর্ধ্বে হওয়ায় আইন পরামর্শদাতা উকিল শ্রেণীর স্বতই উদ্ভব হয় এবং এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে আইনজীবীরূপী এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও জন্মলাভ হয়। *অবশ্য হতবুদ্ধি বিচার-প্রার্থীরা আইনের কূটতর্ক কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হয়ে বিচার কার্যটাকে কূটতর্কের দাবাখেলা হিসেবে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার ক্ষেত্র বিবেচনা করা ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারত না।*[৬০]

ব্রিটিশ কোর্টে আইন কর্মচারীরা মুফতি ও পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হতেন আইনের ব্যাখ্যা দানের জন্য। পুরাতন আইনজীবীদের থেকে তাঁরা নিযুক্ত হতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই এসব পদে নিযুক্ত হতেন, ১৮৪৫ সালে এ পদসমূহ সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। তখন নিয়ম হয় প্রেসিডেন্সি ফোর্ট উইলিয়াম বাংলাদেশের কোর্টসমূহে হিন্দু বা মুসলিম আইন কর্মচারী হিসেবে যে কেউ নিযুক্ত হতে পারবে, সরকার প্রণীত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে।' ১৮৬২ সালে হাইকোর্ট স্থাপিত হলে পর আইন কর্মচারীর পদসমূহ অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিলুপ্ত হয়।

খ. সরকারি কর্মচারী

কোম্পানি আমলে সরকারি কর্মচারীরা ছিলেন দুটি পৃথক বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত : কভেনান্টেড ও আনকভেনান্টেড। প্রথমটির জন্ম হয় লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে; ১৭৯৩ সালে চার্টারবলে আইনত বিধিবদ্ধ হয়। এটিই 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস'-এর প্রাথমিক রূপ। বর্ণে এরা চাকরি জগতে দ্বিজোত্তম, কোর্ট অব ডিরেকটর্স কর্তৃক বিলেতে জাত। *কোনো ভারতীয় কোম্পানি আমলে এ শ্রেণীতে নিযুক্তি পায় নি, বিশেষ বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল।*[৬১] বিলেতে একটি চুক্তি অনুযায়ী খাস ব্রিটিশ নন্দনদের এ শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার ছিল।

চুক্তিবিহীন বেসামরিক সকল পদে এ দেশীয়, ইংরেজ ও বর্ণসংকর ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার ছিল। প্রথমে অবশ্য 'মাসিক লেখক' হিসেবে ইংরেজরা নিযুক্ত হতো, পরে কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলে ভারতীয়দের কম বেতনে নিয়োগ করা হতো। এ দেশীয় শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কারণেও এসব পদের অধিকাংশই ইংরেজরা অধিকার করত। আফিম, চা, লবণ প্রভৃতির ব্যবসায়সংক্রান্ত

---

৬০. Oxford Hist. of India (1961), p. 628.

৬১. Ibid. p 623. এই পৃষ্ঠার ফুটনোটে বলা আছে, বেনারসের জজ আলি ইবরাহিম খাঁ ছিলেন একমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রম।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে, হিসাব পরীক্ষা বিভাগে, গুপ্তচর বিভাগ ও পলিটিক্যাল বিভাগে ভারতীয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। প্রথমে রাজস্ব আদায় ক্ষেত্রে প্রধানত হিন্দুরা ও বিচার বিভাগে মুসলমানরা নিযুক্ত হতেন। এ সম্বন্ধে বার্ড সাহেব বলেছেন, বিচার বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারীই মুসলমান। আমার মনে হয়, মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুরা উত্তম বিচারক হয় না। হিন্দুরা রাজস্ব আদায়ে, হিসাবপত্র তৈরি করতে খুবই দক্ষ, কিন্তু বিচারকার্যে আমার জ্ঞানমতে মুসলমানরা অনেক উচ্চে। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত জেলার ভার ভারতীয় নায়েবদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ১৭৮৬ সালে বোর্ড অব রেভেনিউ স্থাপিত হলে এবং পরে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হলে সব উচ্চপদেই ইংরেজরা নিযুক্ত হতেন। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত ফৌজদারি কোর্টের সব হাকিম ছিলেন মুসলমান, কিন্তু কর্নওয়ালিস তাঁদের অপসৃত করেন। তারপর তাঁদের সালিশ পদে নিযুক্ত করা হতো ক্ষেত্রবিশেষে। লর্ড বেন্টিংক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ স্থাপন করেন। পরে ১৮৪৩ সালে এই পদ একটি আইনবলে বিধিবদ্ধ হয়।

সরকারি কভেনান্টেড পদে ১৮১৫ সালে ৭৮৮ জন, ১৮৩৫ সালে ৮৯৭ জন, ও ১৮৫৫ সালে ৮০৬ জন ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই খাস ইংরেজ। বিভিন্ন আনকভেনান্টেড পদে ১৮২৮ সালে নিযুক্ত ছিলেন ১,১৯৭ জন এবং ১৮৪৯ সালে ছিলেন ২,৮১৩ জন। ১৮২৭ সাল পর্যন্ত কোনো দেশীয় রাজস্ব বা বিচার বিভাগের কর্মচারীর বেতন মাসিক ২৫০ টাকার উর্ধ্বে ছিল না। আরও উল্লেখযোগ্য সমমর্যাদার পদে ইংরেজের মাহিনা দেশীয় কর্মচারীর প্রায় দ্বিগুণ ছিল। রাজনৈতিক কারণে দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য রাখা হতো আকাশ-পাতাল। ইংরেজদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হতো, তারা দেশীয়দের সঙ্গে খানাপিনায় মিশত না, 'বাবু'-কে বহু দূরে রাখত। বার্ড সাহেব ছিলেন এই পার্থক্যকরণে বিশেষ উৎসাহী। ১৮৩৫ সালে তিনি বলেন, আনকভেনান্টেড কর্মচারীদের খুব কমই ইংরেজি জানতেন। তাঁদের নিয়োগ করা হতো চরিত্র ও অভিজাত বংশে জন্মের গুণে এবং বাংলা ও ফারসি ভাষায় জ্ঞান থাকার জোরে। ১৮৩৫ সালে শিক্ষানীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হওয়ার ফলে কলেজে ইংরেজি শিক্ষিতরাই অধিকাংশ চাকরিতে প্রবেশাধিকার লাভ করতেন এবং এটাই চাকরি লাভের একমাত্র পাসপোর্ট হয়ে দাঁড়ায়।

গ. চিকিৎসক শ্রেণী

লে. কর্নেল ক্রফোর্ডের বর্ণনা মতে, কোম্পানি নিযুক্ত ইংরেজ সার্জেনরা দেশি এসিস্টান্ট ও সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জেন নিয়োগ করতেন। এসব নিম্ন শ্রেণীর দেশীয় ডাক্তাররা তখন কলকাতা মাদ্রাসার হেকিমি ও বেনারস সংস্কৃত কলেজে কবিরাজি শিক্ষালাভ করতেন। দেশি ডাক্তারদের ইউরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮২২ সালে একটা স্কুল খোলা হয়। সেখানে—

www.pathagar.com

মাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানিতে বক্তৃতা দিতেন। হিন্দুস্তানিতে ছোট ছোট পুস্তিকা ছিল ডাক্তারি বিদ্যা সম্বন্ধে এবং এগুলোই ছিল একমাত্র পাঠ্যপুস্তক। ছোট ছোট জন্তু কেটে শারীরবিদ্যা শেখানো হতো। তার দরুন শিক্ষা পূর্ণ হতো না এবং বাস্তবমুখী হতো না।[৬২]

বেন্টিংক এ বিষয়ে উন্নতিতে প্রথম অগ্রণী হন। তাঁর চেষ্টায় ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় প্রণালিতে সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জেনসমূহ তৈরি করা। বোম্বাইয়ে ১৮৪৫ সালে ও মাদ্রাজে ১৮৫২ সালে অনুরূপ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫২ সালে বার্ড বলেন, এসব কলেজের উদ্দেশ্য ছিল, 'হোম'-এর শিক্ষিত সার্জনদের সহকারী ডাক্তার তৈরি করা। এবং তাঁদের অবস্থা ছিল ঠিক সেই রকম, যেমন ছিল কভেনান্টেড সাহেবের নিম্নস্থ দেশীয় 'বাবু' কর্মচারীর। তখন দেশীয় ডাক্তাররা উচ্চ পদে নিয়োগের সুযোগ পেতেন না, কারণ ইউরোপীয়রা 'নেটিভ' ডাক্তারের চিকিৎসা মোটেই গ্রহণ করত না। এজন্য বিশেষ পারদর্শিতা সত্ত্বেও এ দেশীয়রা কেউ 'আই এম এস' সার্ভিসে নিযুক্ত হন নি।

অবশ্য ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারদের ব্যক্তিগত পেশায় অর্থাগম হতো খুবই; এজন্য কেউ চাকরি গ্রহণে স্বীকৃত হতো না। ১৮৫০ সালের মধ্যে দেশীয় ডাক্তাররা মর্যাদাসিক্ত স্বাধীন পেশায় এবং তাঁদের সংখ্যাও দ্রুত বর্ধিত হতে থাকে।

ঘ. লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ইত্যাদি

ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ইউরোপীয়দের সংখ্যা অল্প ছিল না; কারণ মনে রাখা ভালো যে, ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পুস্তক মুদ্রণের কাজ প্রথমে হয়েছিল মিশনারিদেরই প্রচেষ্টায়। মথিলিখিত সুসমাচার দেশীয় ভাষায় প্রচারের আগ্রহেই তাঁরা এ কাজে উৎসাহী হয়েছিলেন। অনস্বীকার্য যে, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে বাংলায় সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর প্রবর্তন হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা গ্রন্থ রচনায় অত্যন্ত উৎসাহী হন; রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উল্লেখযোগ্য যে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলায় পুঁথি-সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। প্রথমে শ্রীরামপুরে, পরে কলিকাতায় এবং ক্রমে ক্রমে মফস্বল শহরগুলোতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে লাগল। এদেশে সংবাদপত্রের আবির্ভাবও মুদ্রাযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলিকাতায়, ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়।

১৮৫৫ সালের একটি সরকারি বিবরণীতে প্রকাশ, বাংলাপ্রদেশে গত পঞ্চাশ বছরে ৫১৫ জন ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৬০

৬২. Trevelyan, p. 27.

www.pathagar.com

জন তখন মৃত এবং বাকি ৩৫৫ জন দেশীয় গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ১০ জন মুসলমান এবং বাকি ৩০৩ জনই বাঙালি হিন্দু ছিলেন। ১৮৫৪ সালে জেমস লঙ সাহেব সরকারকে যে হিসাব দাখিল করেন, তাতে দেখা যায়, ১৮৫৩ এপ্রিল থেকে ১৮৫৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মুদ্রণে ৪৬ টি মুদ্রাযন্ত্র ছিল, ২৫২ খানা পুস্তকের ৪,১৮.২৭৫ কপি মুদ্রিত হয়েছিল; ১৯ খানা সংবাদপত্র ছিল ও তাদের প্রচার সংখ্যা ছিল ৮,১০০। তিনি বলেছিলেন,

> উপসংহারে আমি এ কথা বলতে চাই, গত দশ বছরে দু'লক্ষ বাংলা পুস্তকের মুদ্রণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যিক মেজাজ গঠনের প্রচেষ্টায় নিশ্চয়ই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এসব পুস্তকের প্রচার কলিকাতা ও তার চতুর্দিকের ২০ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৬৩]

উল্লেখযোগ্য যে, মুদ্রণ ও প্রকাশন কর্মে বাংলাই ছিল সবচেয়ে অগ্রসর প্রদেশ, অন্যান্য প্রদেশ এ বিষয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল।

এ প্রসঙ্গে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কর্নওয়ালিসের পূর্বে মুসলমানদের যা কিছু অস্তিত্ব ছিল বুদ্ধিজীবীর পেশায়, তাঁর বক্রদৃষ্টির প্রভাবে তাদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে যায়। আবার যদিও বা তাদের দেখা মিলত ছিটে-ফোঁটার মতো এখানে-সেখানে, মেকলে বেন্টিংকের প্রচণ্ড ইংরেজিয়ানার প্রবর্তনে তাদের স্থান শূন্যের কোঠায় চলে যায়। ইংরেজি ভাষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন দেশের পক্ষে সুফল বা কুফল হয়েছে, সে প্রশ্ন এখন অর্থহীন। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রথম দিকে এর ফলে মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা সর্বপ্রকার জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

ধর্ম ও সমাজজীবনে সরকারি নীতি :

ব্রাহ্মমত ও নববিধান

বণিকের জাত ইংরেজ কোম্পানি প্রথম দিকে ধর্ম বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ নীতি পালন করত। ১৮০৬ সালে মাদ্রাজের ভেলোরে সিপাহিরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় দু শ ইংরেজকে হত্যা করে ফেলে, কারণ সিপহিদের একই ধরনের পাগড়ি পরতে ও প্যারেডকালে কানবালা প্রভৃতি জাতিনির্দেশক চিহ্নাদি ত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ থেকেই কোম্পানির চৈতন্য হয় যে, জাতিত্ববাদ হিন্দুদের ধর্মীয় বিধান, এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করা মোটেই সমীচীন নয়। ১৮০৭ সালের মে মাসে কোর্ট অব ডিরেকটর্স নির্দেশ পাঠান :

> ভারতীয় অধিকারসমূহ শাসনকালে আমাদের সর্ববিদিত নির্দিষ্ট নীতি হচ্ছে, সর্ব প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রতি উদার হওয়া! প্রত্যেককে তার মত ও প্রথানুযায়ী চলার নিরঙ্কুল স্বাধীনতা দেওয়া; আমরা এবম্বিধ এবংবিধ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না, কিংবা অন্যকেও করতে দেব না।[৬৪]

৬৩. Bengal Govt. Records No. 22, 1855.
৬৪. Despatch to Madras, vol. 40.

www.pathagar.com

কোম্পানি শুধু নীতিগতভাবেই এ নির্দেশ দেয় নি, প্রত্যেক গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলকে এ নীতি মেনে চলতে বিশেষ সাবধান করেছিল। তবু মিশনারিদের প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, তাদের প্রভাব কোম্পানি স্বীকার করে নিয়ে সরকারি ব্যাপটিস্ট বিভাগ স্থাপন করেছিল, এবং প্রচারকার্যে মিশনারিদের সর্বপ্রকার সুযোগ দান করত। ইংরেজরা সুবিধাবাদির মতো ধর্মীয় আচারাদি পালনে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ করে নি, কিন্তু আইন পাস করে হিন্দু-মুসলমান উত্তরাধিকার নীতিকে লঙ্ঘন করেছে নও-খ্রিষ্টানদের স্বার্থ রক্ষার্থে। ১৮৫০ সালের একুশ আইনবলে বিধান হয় যে, ধর্ম বা জাতি ত্যাগকারী উত্তরাধিকার স্বত্বে বঞ্চিত হবে না।

হিন্দুদের জাতিনাশ ধর্মনাশের মতো এবং কোনোক্রমেই এর লঙ্ঘন হিন্দুরা সহ্য করে না। এ সম্বন্ধে হনমন্তরাও-এর কাহিনী কৌতুকপ্রদ। তিনি জাতিতে মারাঠা ব্রাহ্মণ। পেশোয়ার দূত হিসেবে তিনি ১৭৮১ সালে বিলেতে যান সিলেক্ট কমিটির নিকট পেশোয়ার নালিশ জানাতে। তখন তিনি বলেছিলেন, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণকে পূজা করে, বিশেষত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সকল বর্ণই পূজা করে। সামাজিক মর্যাদার নিকট অর্থ তুচ্ছ। নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের পাদোদক পান করে নিজেকে ধন্য মনে করে। সাগর যাত্রা করে বিলেত ভ্রমণ করতে হনমন্তরাও কী অস্বাভাবিক অসুবিধায় পড়েছিলেন, তারও বর্ণনা দেন। *তিনি মাত্র ফলমূল ও মিষ্টান্ন খেয়েই কাটাতেন এবং দেশ থেকে যে গঙ্গাজল বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কেবলমাত্র তাই পান করতেন।*[৬৫]

এমন গোঁড়া জাতিত্ববাদীদের মধ্যে মিশনারিরা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাংলা ব্যতীত অন্য কোথাও বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারে নি। আর বাংলা প্রদেশে নব আবির্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই তার যতটা প্রচার হয়েছিল, কলিকাতার বাইরে তা নামমাত্র ছিল। শ্রীরামপুরে ছিল মিশনারি কেন্দ্র, সেখানেও প্রচার উল্লেখযোগ্য হয় নি।

তবুও রেভারেন্ড ওয়ার্ড সাহেব গর্বভরে ১৮২০ সালে লিখেছিলেন :

> আমাদের আনন্দ করা উচিত, কারণ পুরাতন শিকলের মরিচা সব খেয়ে ফেলেছে। হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নিয়ম ভঙ্গকারীর দল এত বেশি হয়েছে যে, পুরাতন বর্বর প্রথাগুলো আর চালু থাকবে না। সামাজিক স্পন্দন হিন্দুরা অন্যান্য জাতির মতো প্রবলভাবেই অনুভব করছে। এখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা হিন্দুদের দেখি, বিভিন্ন জাতির ব্যক্তির একত্রে উঠাবসা করছে এবং গোপনে একত্রে খানাপিনা করছে ও ধূমপান করছে এবং এভাবে একত্রে সামাজিকভাবে ভাব আদান-প্রদান সুযোগ লাভ করছে।[৬৬]

৬৫. Rep. Com. HC on petitions, 1781.
৬৬. A View of the Hist. Literature and Mythology of Hindus. iii p xc.

www.pathagar.com

এ অবস্থার পরিবর্তন বাংলা প্রদেশের মধ্যবিত্ত সমাজেই লক্ষ করা গিয়েছিল, অন্যান্য প্রদেশে নয়। বিহারে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার চেষ্টা কীভাবে নিষ্ফল হয়েছে, পূর্বেই দেখানো হয়েছে। মাদ্রাজে কিছু লোক খ্রিষ্টান হলেও তারা নিজেদের মধ্যে পুরাতন জাতিভেদ মানত, তার ফলে গির্জাতেও তাদের নিয়ে বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হতো।

তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, আইনের শাসন প্রবর্তনকালে ইংরেজরা মুসলমানি ও হিন্দুয়ানি বহু ধর্মীয় নীতি লঙ্ঘন করেছে। সাক্ষ্য বিষয়ক আইনে স্ত্রী-পুরুষভেদে সকল মানুষের সাক্ষ্যকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, পিতৃত্ব বিষয়ের আইন পরিবর্ধিত হয়েছে। দণ্ডবিধি আইনে ইসলামি অনুশাসন লঙ্ঘন করা হয়েছে, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় উভয় ধর্মেরই অনুশাসন লঙ্ঘন করে মানুষে-মানুষে সমান আইনের শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। অনস্বীকার্য যে, এসব কল্যাণমুখী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখন কোনো সম্প্রদায় কোনো প্রতিবাদ তোলে নি। মুসলমানেরা বেন্টিংকের সময় কেবলমাত্র এই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মীয় কোনো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাবে না।

হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা ধর্মীয় সংস্কারের জোয়ার এসেছিল এবং কয়েকটি অমানুষিক প্রথা রোধের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ কাজ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ প্রগতিবাদী উদারমনা হিন্দুনেতার সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, কন্যাহত্যা ও সাগরে সন্তান নিক্ষেপ। রাজপুতরা সমান ঘরে কন্যার বিবাহ দান করতে অশক্ত হলে কন্যাদের মাটিতে প্রোথিত করত এবং বাংলাসহ সকল প্রদেশেই মানত হিসেবে সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করত। ওয়েলেসলি ১৮০২ সালের ৬ নং রেগুলেশন দ্বারা এ প্রথাকে নরহত্যার সামিল অপরাধ গণ্য করেন ও বন্ধ করে দেন। দ্বিতীয়ত, সতী প্রথার বিলোপ। মৃত স্বামীর চিতায় হিন্দু স্ত্রীকে জোরপূর্বক বেঁধে পুড়িয়ে মারা হতো এবং আর্তনাদ করলে দামামা বাজিয়ে কণ্ঠরোধ করা হতো। কলকাতার নিকটবর্তী জেলাসমূহেই বছরে পাঁচশতেরও অধিক সতীদাহ করা হতো। ওয়েলেসলি হিন্দু পণ্ডিতদের বিধান সংগ্রহ করতে থাকেন এ বীভৎস প্রথা রোধ করার মানসে, কিন্তু সক্ষম হন নি। ১৮২৯ সালে বেন্টিংক একটি রেগুলেশন দ্বারা এ প্রথায় জড়িত প্রত্যেককে নরহত্যার সমান অপরাধী বলে ঘোষণা করেন। সতীদাহ একেবারে বন্ধ হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানি ও মোঘল আমলে প্রত্যেক সতীদাহ ক্ষেত্রে শাহি হুকুমনামা গ্রহণ করতে হতো। তৃতীয়ত, সর্ব প্রকার দাসপ্রথা রহিত করা হয় ১৮৪৩ সালের পাঁচ নম্বর আইনবলে। চতুর্থত, হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬) বলে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত ঘোষিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে বীভৎস বহুবিবাহ প্রথাও রহিত করে কুলীনদের একসঙ্গে শত শত নারীর পানিপীড়ন করার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, উপর্যুক্ত অমানবিক প্রথাসমূহের একটিও মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল না। এজন্য এসব ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথা রহিতের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট ছিল না।

আলোচ্য ১৭৫৭-১৮৫৭ মধ্যে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় আন্দোলনের একপ্রকার জোয়ার এসেছিল। হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাবহেতু নানা কারণে ধর্মবিশ্বাসে শিথিলতা জন্মে ও খ্রিষ্টধর্মে আকর্ষণ দেখা দেয়। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি শহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এ প্রবণতা উদ্রিক্ত হয়। প্রবলভাবেই হয় কলিকাতায়; সেখানে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের সবকিছুই দূষণীয় ভাবতে থাকে এবং প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করা বীরত্ব ও গর্বের বিষয় বিবেচনা করতে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তারা প্রকাশ্যে গৃহে, বাহিরে সর্বত্র দল বেঁধে গরুর গোশত ভক্ষণ ও মদ্যপান করত। মাইকেল মদুসূদনেরও এ প্রবণতা ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও নানাভাবে ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা, পাশ্চাত্য ভাবধারা বিশেষত মিল, বেস্থামের শিক্ষার প্রভাব ও 'ইউটিলিটেরিয়ান' সম্প্রদায়ের উদার মানবিক শিক্ষাবলির প্রভাবে এ অবস্থার উদ্ভব হয়। মিল হিন্দু-ভারতের কোনো কিছুতেই ভালো দেখেন নি; হিন্দুর বুদ্ধি, যুক্তি বহু শতাব্দীর অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে, হিন্দুর চিন্তাভাবনা নির্বোধোচিত, হিন্দুর ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রথাসমূহ বীভৎস ও মানবতার সর্বনাশকর—*এসব দূরীভূত করতে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মুক্তবুদ্ধির জোরে, ভারতীয়রা জীবনের আলোক প্রত্যক্ষ করবে পাশ্চাত্য ভাবধারায়—এসব ছিল মিলের যুক্তি।*[৬৭] এ ছিল প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মের ওপর প্রবল আঘাত—ধর্ম, সমাজ, পরিবার সবকিছু ভেঙেচুরে পাশ্চাত্যের উপহৃত ভাবধারা ও জ্ঞানের আলোকে নবরূপায়ণ করতে হবে। হিন্দুধর্মের ওপর এত বড় সংঘাত ইসলামও হানতে পারে নি।

হিন্দুধর্মের এ যুগসন্ধিক্ষণে রামমোহন উদিত হলেন নতুন ধর্মাদর্শ নিয়ে ভাঙনের এ প্রবল জোয়ারের গতিরোধ করতে। তিনি হিন্দুধর্মের গণ্ডির মধ্যেই আত্মরক্ষা করে এ ভাঙনের গতিরোধ করলেন ব্রাহ্মমতের প্রবর্তন করে। নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করাই এ মতের সারমর্ম। এজন্য হিন্দুত্ব ত্যাগ করতে হয় না, অমানবিক ও অসামাজিক প্রথা ও আচারগুলো পরিত্যাগ করে সাধারণ মন্দিরে পরমব্রহ্মের উপাসনা করতে হয় আদি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে।

এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, রামমোহন কখনো নিজেকে হিন্দু ব্যতীত অন্য ভাবেন নি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাঁকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলেছে। তাঁর আয়োজিত সাপ্তাহিক

৬৭. Oxford Hist. of India, p. 646.

www.pathagar.com

ব্রহ্মসভার অধিবেশনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদপাঠ করানো হতো এবং কোনো অব্রাহ্মণের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজা মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করেছেন।[৬৮]

'তাঁর মানস জীবন গড়ে উঠেছিল একেশ্বরবাদী ইংরেজ ও মুসলমান কর্মচারীর সাহচর্যে; ব্রিটিশ দার্শনিক বেন্থামের তিনি ছিলেন অনুরাগী ভক্ত, বিলেতে বেন্থামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারও হয়েছিল তাঁর : সম্ভবত ভল্টেয়ার-সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। ব্যবহারিক চেতনা থেকেই হোক অথবা সত্যানুসন্ধানের ফসলরূপেই হোক অথবা দুয়ের সংমিশ্রণেই হোক, রামমোহন ব্যক্তিগত জীবনে নতুন ধর্মমত আশ্রয় করেছিলেন। রাজা যে ধর্মমতে উপনীত হয়েছিলেন, তা সেকালের সামাজিক পরিবেশের ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা রাজনৈতিক সুবিধাদি এনে দিক বা না দিক, মত ও ভাবরাশির দিক থেকে তা খ্রিষ্টান ইংরেজ ও মুসলমান মৌলবিকে রামমোহন ও তাঁর পরিজনদের নিকটতর করেছে। ... ধ্বংসের ভিতরে দিয়ে ইংরেজ সৃষ্টি করছিল বাইরের দিক থেকে; রামমোহন সৃষ্টি করছিলেন ভিতরের দিক থেকে। তাঁর কর্ম, চিন্তা ও ধ্যান ভারতের হিন্দু সমাজকে গতিদান করেছে।

ইংরেজ শাসন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নতুন বিকাশ পথে চালিত করেছিল, রামমোহন তার উপযোগী হিন্দু সমাজ-মানস সৃষ্টি করে সে বিকাশধারাকে সফল করতে চেয়েছিলেন।'[৬৯]

এখানে স্মরণ রাখা উচিত, রামমোহন ভারতে ইংরেজ বিজয়কে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ জ্ঞান করতেন; এই হতভাগ্য দেশকে তার পূর্বতন শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার করার জন্য তিনি ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৯) ও নেপাল অভিযানের সময় (১৮১৪-১৬) কলিকাতার নাগরিকগণের সঙ্গে তিনি ইংরেজদের বিজয় কামনা করে প্রার্থনাও করেছেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ 'শর্মণঃ' ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের নেতা হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উৎকট বেদ-উপনিষদ প্রীতি, বেদকে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে প্রচার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রীতি ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন ধরিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী; তিনি হিন্দুদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি খ্রিষ্টানদের প্রভাব প্রতিরোধ করতে অগ্রণী হন।*[৭০] অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর সহযোগী।

---

৬৮. Dr. R. C. Mazumdar in Advanced Hist. of India, p. 877.
৬৯. ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত পথিক; ২৩, ২৮ পৃ.।
৭০. Misra, p. 210.

www.pathagar.com

দেবেন্দ্রনাথের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেশবচন্দ্র সেন নতুন ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' সংগঠন করেন। রাজা রামমোহনের মতো তাঁরও চোখ ইংরেজের উপরেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর মানসজীবনও সেকালের কলেজি শিক্ষার বিচিত্র বর্ণ সমারোহকে কেন্দ্র করে এবং ব্যবহারিক জীবন ইংরেজ সংসর্গে কাটে। ইংরেজ শাসন, অন্যান্য সকলের মতো তাঁর কাছেও বিধাতার আশীর্বাদ। আবেগ-উৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় তিনি স্বয়ং বলেছেন, করুণার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর ভারতবর্ষকে উদ্ধার করার জন্যে ব্রিটিশ জাতিকে প্রেরণ করেন; ঈশ্বরেরই আজ্ঞাবহরূপে ইংল্যান্ড এলো এবং ভারতের তিমির-গুণ্ঠিত দরজায় আঘাত করে বলল, উঠো এবার, দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিলে তুমি (Noble sister, rise, thou has slept too long)। *তাঁর মতে বর্তমান ভারত বাইবেলের মর্মবাণী গ্রহণ না করে বাঁচতে পারে না।*[৭১] তিনি প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে সফর করে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। রাজার মতো তিনিও ইংল্যান্ডে গমন করেছিলেন। শেষে চৈতন্যের ভক্তিবাদও প্রচার করেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানবপূজা বা অবতারবাদ আরম্ভ হয়। তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পর্দাপ্রথা বিলোপের উৎসাহী ছিলেন।

> অথচ তিনিই কুচবিহারের নাবালক হিন্দু রাজার সঙ্গে চতুর্দশী কন্যা সুনীতি বালার হিন্দুমতে বিবাহ দিয়ে (১৮৭৮ খ্রিঃ) ব্রাহ্মশিবিরে দ্বিতীয় ভাঙন ধরিয়ে ছিলেন।[৭২]

এ প্রসঙ্গটা এখানে আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য, ইংরেজ আশ্রিত নবগঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বিশেষত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মন-মানস, চিন্তাভাবনা ও প্রত্যয়াদির গঠন ও ভঙ্গি কী প্রকার ছিল ও কোন খাতে প্রবাহিত হতো, তার ইঙ্গিত দান করা। এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তর পর্যায়ে।

মুসলমান জাতি : তথাকথিত ওহাবি আন্দোলন

সতেরো শ সাতান্ন থেকে আঠারো শ সাতান্ন পর্যন্ত পূর্ণ এক শতককে সংক্ষেপে বলা যায় মুসলমানদের ঘন তমসাবৃত পতন যুগ।

প্রতিবেশী হিন্দু জাতি ও তাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ যখন ইংরেজ বিজয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছিল বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ, যখন তারা রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখশান্তি লাভের উৎস হিসেবে ইংরেজ শাসনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছিল, তখন সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানরা ইংরেজদেরকে ধিক্কার দিচ্ছিল বিধাতার চরম অভিশাপ হিসেবে; তাদের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের হেতু হিসেবে; আর এ জীবননাশা গুরুভার বোঝার চাপে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল, এবং আর কোনো দিগন্তে নিরাপত্তার সূর্যের সন্ধান করেছিল।

---

৭১. উনবিংশ শতাব্দীর ভারত পথিক, ৭৫-৭৬ পৃ.।

৭২. Advanced Hist. of India, pp. 878-80.

www.pathagar.com

কিন্তু সূর্যের সন্ধান মেলে নি। একদিকে বণিকতন্ত্রের, নয়া সাম্রাজ্যতন্ত্রের রূপায়ণের কঠোর নিপীড়ন ও শোষণ, অন্যদিকে নব আবির্ভূত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের হৃদয়হীন আচরণ ও শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিতালি করে মুসলমানদের সব সম্পদ গ্রাসের ঘৃণ্যকর ষড়যন্ত্র—এ সাঁড়াশির মাঝখানে পড়ে প্রতিটি মুসলমান ত্রাসে ও আতঙ্কে দিগ্বিদিকে স্বস্তির আশায় ঘুরে মরেছে।

তবু মুসলমানরা হতোদ্যম হয় নি। এবং এ ভাগ্য বিপর্যয় সহজে মেনে নেয় নি। তাদের এ বোধ উপলব্ধি প্রথম থেকেই জন্মেছিল, ইংরেজ ক্রমশ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ অধিকার করে ফেলবে এবং এভাবে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ফলে সমস্ত হিন্দুস্তানবাসী স্বদেশেই পরাধীন বা গোলামে পরিণত হবে। এই উপলব্ধির দরুনই মুসলমানেরা বারে বারে বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে ইংরেজ শক্তির ওপর। পুরো শতকটাই এই বিদ্রোহের অনলে রাঙিয়ে রেখেছিল মুসলমানেরা। তারই চরম বিস্ফোরণরূপে দেখা দিয়েছিল আঠারো শ সাতান্নর সারা দেশব্যাপী বিপ্লব। কিন্তু তার পরেও ছিল ১৮৬৪ সালের সীমান্ত অভিযান। পাবনা ও রংপুরে ১৭৬৫ সালের ফকির বিদ্রোহ দিয়ে এ সংগ্রাম অধ্যায়ের ভূমিকা; মাঝখানে তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার আন্দোলন; পাটনার শাহ ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলীর কার্যকলাপ; বালাকোটের যুদ্ধ, সিত্তানা, মুলকা, পাঞ্জতরের ঘটনা প্রভৃতি দিয়ে এর বিস্তৃতি; এবং ১৮৬৪ সালের সীমান্তের অভিযান ও সর্বশেষ পাটনা, আম্বালা ষড়যন্ত্র মামলায় সে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

মুসলমানদের এ অনমনীয় মনোভাবকে লক্ষ করেই হান্টার সাহেব বলেছেন, 'আমাদের অধিকারে একটা চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র এবং আমাদের সীমান্তে একটা স্থায়ী বিদ্রোহ শিবির।' *তাঁর 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' নামাঙ্কিত গ্রন্থটির*[৭৩] *রচনা সূচিত হয় লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২ খ্রি.)*[৭৪] কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব হিসেবে : ভারতীয় মুসলমানরা কি ধর্মীয় অনুজ্ঞা হেতু মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য? যদিও গ্রন্থখানা রচনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষত বাঙালি মুসলমানদের ওপর ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারসমূহের একটা সাফাই প্রস্তুত করা, তবু তার প্রথম দুটি অধ্যায়ের ছত্রে ফুটে উঠেছে সদ্য রাজ্যহারা একটা বিরাট জাতির অপরিসীম ক্ষোভ ও বিদ্বেষ-বহ্নি। হান্টার বলেছেন,

> ভারতীয় মুসলমানরা বহু বর্ষ ধরেই হয়ে রয়েছে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে একটা মহাবিপদের উৎস। নানা কারণেই তারা আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা

---

৭৩. গ্রন্থটি ১৮৭১ সালে লিখিত হয়। বর্তমান লেখক কর্তৃক গ্রন্থটির ইংরেজি শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে এবং লেখক কর্তৃক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ বাংলা একাডেমীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

৭৪. আন্দামান পরিদর্শনকালে জনৈক পাঠান কর্তৃক ১৮৭২ ফেব্রুয়ারিতে নিহত হন।

www.pathagar.com

করে আসছে; এবং যেসব পরিবর্তনকে নমনীয় মনোভাবাপন্ন হিন্দুরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, সেগুলোকে মুসলমানেরা তাদের উপর তীব্র অবিচার হিসেবেই বিবেচনা করে।[৭৫]

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাসের মূলকথা হচ্ছে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির নেতৃত্বে যে জেহাদি সংগঠন হয়, তার প্রথম আক্রমণ উদ্যত হয় ওদ্ধত ও অত্যাচারী শিখদের বিরুদ্ধে। প্রথমে কিছুটা বিজয়ী হলেও সৈয়দ আহমদ বালাকোটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও শহিদ হন বিশিষ্ট আলেম ও সহকর্মী শাহ মুহম্মদ ইসমাইলের সঙ্গে (মে ১৮৩১)। কিন্তু পাটনার ইনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী মুমূর্ষু জেহাদি দলকে সংগঠন শক্তিবলে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন, ধুলা থেকে জেহাদি ঝাণ্ডা আকাশে তুলে ধরেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা ভারতীয় উপমহাদেশে আবার জেহাদি আন্দোলন জেগে ওঠে। তাঁরা বাংলাদেশে ও দক্ষিণ-ভারতে সফর করে রসদ ও সৈন্য সংগ্রহ করেন। তাঁদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় স্ত্রীলোকেরাও শরীরের গহনা খুলে জেহাদ ভাণ্ডারে দান করে। বাঙালি মুসলমানের কূটবুদ্ধির সঙ্গে উত্তরাংশের মুসলমানদের ক্ষাত্রশক্তি মিলিত হয়। সম্মুখসমরে বাঙালিও দুর্দান্তভাবে লড়ত। *'আম্বালা অভিযানে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা উপেক্ষণীয় নয়, এবং ক্ষেত্র উপস্থিত হলে ভীরু বাঙালিও আফগানের ন্যায় হিংস্রভাবে লড়তে জানে।*[৭৬] সিলেট ও রংপুর থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় এই শতাব্দীর সংগ্রামে সৈন্য ও রসদ যুগিয়েছেন। তখন বাঙালি মুসলমান পরিবারের প্রত্যেক সমর্থ তরুণটি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যেত হাজার মাইল দূরবর্তী সীমান্তস্থিত জেহাদি শিবিরে। প্রতিটি মুসলমান পরিবার থেকে মুষ্টিভিক্ষা নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করা হয়েছে জেহাদ ভাণ্ডারে। আর জেহাদ শিবিরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জমায়েত হয়েছে মুসলমান সমাজের সর্বশ্রেণীর লোক—সর্বোচ্চ অভিজাত বংশের মওলানা, জঙ্গি কনট্রাক্টর, সিপাহি, সাধারণ চাষি, কসাই নির্বিশেষে। যুদ্ধের ময়দানে, জেহাদ শিবিরে, পথে-প্রান্তরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে বাঙালি মুসলমানের পূত অস্থি। মালদহ, পাটনা, আম্বালার বিচারালয়ে আসামির কাঠগড়ায় বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, সরহদ্দি মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে একই লক্ষ্যের অনুসারী হয়ে।

বাংলাদেশের বুকেও সশস্ত্র বিদ্রোহ চলেছিল তিতুমীরের নেতৃত্বে। নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আজ ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। এখানে প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হন তিতুমীর (১৮ নভেম্বর ১৮৩১)। তাঁর

৭৫. Indian Musalmans, p. 3.
৭৬. Ibid, 142.

www.pathagar.com

অনুচরদের বিচার হলে সিপাহসালার মাসুম খাঁর ফাঁসির হুকুম হয় এবং ১৪০ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। আজাদির সংগ্রামে প্রথম শহিদের গৌরব তিতুমীরের, অন্য কারও নয়।

সশস্ত্র না হলেও সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক আন্দোলন তুলেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর উপযুক্ত পুত্র দুদু মিয়া ওরফে মহসিন। যেসব আনইসলামি আচার ও প্রথা হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর 'ফারাজি' অনুগামীদের বর্জন করতে বলেছিলেন, সে সবের মধ্য দিয়েই উচ্চশ্রেণী হিন্দু ও ইংরেজ সরকার চাষিদের দেহমনের উপর কর্তৃত্ব করে আসছিল। এবং একই উদ্দেশ্যে তিতুমীর তাঁর 'হেদায়তি' দলকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলে পূঁড়ার হিন্দু জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এই বিপ্লবী দলকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন এবং হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর ও কোম্পানি সরকার একযোগে তাঁর সহযোগিতা করেছিল।

> কৃষক শ্রেণীর পরিচালিত আন্দোলনে স্বাভাবিক উগ্রতা ও আক্রোশ ছিল, তাই আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক ব্রিটিশ সরকার দুদু মিয়াকে ডাকাত ও কৃতঘ্ন দেশদ্রোহী অপবাদে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত বারবার বন্দী করে রাখে।[৭৭]

বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'ওহাবি' নামাঙ্কিত মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা এক বিশিষ্ট অধ্যায়। পলাশীর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার প্রকাশ হতো মুসলমানদের দ্বারাই। কোনো রাজা-বাদশাহ বা রাজপুরুষের স্বার্থে এ আন্দোলন পরিচালিত হয় নি। বিধর্মী ও বিদেশি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র মুসলমান, এবং একে সংগঠন করেছিল ও পরিচালনা করে নেতৃত্ব দিয়েছিল ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজবংশের কয়েকজন এতে এসে যোগ দিলেও আন্দোলনের কোনো সময়েই এর শক্তি কোনো নবাব রাজার স্বার্থে কেন্দ্রীভূত হয় নি। ধর্মপ্রতিষ্ঠা না করে ইসলামের সংস্কার করা যায় না এবং ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে বিধর্মী রাজশক্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন, এ চেতনা আসে ক্রমে ক্রমে এবং তার সঙ্গে আন্দোলনের স্বরূপও বদলাতে থাকে। নেতাদের মনে ধর্মরাষ্ট্রের কোনো পরিকল্পনাও দানা বাঁধার সুযোগ পায় নি। কয়েক মাসের জন্যে পেশোয়ার যখন জেহাদিদের হাতে আসে, তখনও কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ক্ষমতা হস্তগত করার সুযোগ দেওয়া হয় নি; *বরঞ্চ স্থানীয় সরদার সুলতান মুহম্মদ খানের এই দুরভিসন্ধিতে বাধা দেওয়ার ফলেই পেশোয়ার থেকে জেহাদিরা বিতাড়িত হয়।*[৭৮]

---

৭৭. ভারতে ওহাব আন্দোলন—আ. ম. হবিবুল্লাহ।
৭৮. ঐ—আ. ম. হবিবুল্লাহ।

www.pathagar.com

নেহাৎ সুবিধার জন্যে এ আন্দোলনকে ওহাবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবং বিদেশি শাসক ইংরেজরা মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে ওহাবি নামাঙ্কিত করেছে। আসলে হেজাজে আঠারো শতকে মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রি.) যে পিউরিটানিক বা অতিনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওহাবিদের সঙ্গে চিহ্নিত করেন নি। চারটি মযহাবের যেকোনো একটি অনুসারী হওয়া সুন্নী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু আবদুল ওহহাব ইমাম হামবলের অনুসারী হলেও তাঁর অনুগামীরা বরং কোরান-হাদিসের একান্ত অনুসারী। ভারতীয় জেহাদিরা নিষ্ঠার সঙ্গে মযহাবপন্থী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, পীর-ফকিরি ও কবর-আস্তানা জিয়ারতের বিরুদ্ধাচরণ করা আরবি ওহাবিদের প্রধান নীতি। এগুলোকে তারা পৌত্তলিকতা জ্ঞান করে এবং এই বিশ্বাসে তারা ১৮০৪ সালে মদিনায় বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের মাজার পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিল। ভারতীয় জেহাদিরা কখনো কবর-মাযার জিয়ারতের বিরুদ্ধতা করে নি। তাছাড়া বাংলা দেশে যে সংস্কারধর্মী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে হেজাজি আন্দোলনের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। হয়তো আরবি আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় জেহাদিদের ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টায় কিছুটা মিল ছিল, *কিন্তু সেহেতু জেহাদি আন্দোলনকে ওহাবি হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। জেহাদি আন্দোলনকে ইংরেজরা ওহাবি বলে আখ্যায়িত করেছে ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগানোর দুরভিসন্ধি মূলে। দুটিকে একধর্মী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা চলে না।*[৭৯]

এ মতের পোষকতায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের এ উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোনো সম্বন্ধ ছিল এমন কোনো প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলির সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভি যখন ভারতে এ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরবদেশে যান নাই। তাঁদের দল অনেকটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম করে, তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোনো সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না—তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসেবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৮০]

---

৭৯. ঐ—আ. ম. হবিবুল্লাহ।
৮০. প্রবাসী : ১৩৫৬ অগ্রহায়ণ ; পৃ. ১৮৮ (বিদ্রোহ ও বৈরিতা—যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক গ্রন্থের সমালোচনায়)।

www.pathagar.com

আঠারো শ সাতান্নর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে জেহাদি আন্দোলনের যোগযোগ ছিল, এ কথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন, কিন্তু তার বিস্তারিত তথ্য এখনও গবেষণার অপেক্ষায় আছে। *বিলায়েত আলী বাদশাহ বাহাদুর শাহেরে সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এ প্রমাণ পাওয়া যায়।*[৮১] দীর্ঘ এক শতক ধরে জেহাদি মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বারে বারে ছোটখাটো বহু বিস্ফোরণ ও প্রতিরোধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছিল, তার সঙ্গেই বহুদিনের ধূমায়িত অসন্তোষ সর্ব-ভারতীয় বিরাট ও ব্যাপক আকারে ফেটে পড়েছিল, এ কথাটি অস্বীকার করা যায় না। ফ্রেডারিক জন শোর এ কথাটি পরিচ্ছন্নভাবেই বলেছেন, বাইরে অবস্থা শান্ত বিচিত হলেও আসলে সারা দেশটা বারুদের স্তূপ হয়েছিল এবং জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষই বিস্ফোরণে মূর্ত হয়েছিল। মওলানা আহমদ উল্লাহ, মৌলভি ফজলে হক খয়রাবাদি প্রমুখ এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থবশে নয়, ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের দুর্বার বাসনা নিয়ে। চর্বি মেশানো টোটা সৈন্যদের মধ্যে নতুন কোনো অসন্তোষের সৃষ্টি করে নি, তাদের অন্তঃশীল পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে মূর্ত করেছিল মাত্র।

> আর এ মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রধানত মুসলমানরাই, এজন্য সংগ্রাম শেষে ইংরেজ রাজশক্তি নির্মমভাবে চণ্ডনীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্বটা সৃষ্টি করেছিল মুসলমানদের শির লক্ষ করে। সীমাহীন নির্মমতা দেখিয়ে কুখ্যাত হডসন শাহজাদাদের হত্যা করেছে, নীল গর্ব করে বলত, বিনা বিচারে শত শত মুসলমানকে ঈদুল আজহার দিনে ফাঁসি দিয়েছে, হত্যা করেছে। মুসলমান অভিজাতদের শুয়োরের চামড়ায় জীবন্ত সেলাই করে হত্যা হয়েছে। জোর করে তাদের শুয়োরের গোশত খাওয়ানো হয়েছে।[৮২]

আফসোস এই যে, সে জেহাদ আন্দোলনের, সে মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। সে দিনের মহাবিদ্রোহ সামরিক যুদ্ধ না জনগণের বিদ্রোহ ও জাতীয় সংগ্রামের পরিচায়ক, এ প্রশ্নের জবাব আজও নির্ণীত হয় নি। স্বার্থসন্ধানী নেতাদের মাধ্যমে না দেখে এটিকে টি. রাইস হোমসের চোখ দিয়ে 'সিভিল রিবেলিয়ান' বা জনবিদ্রোহ হিসেবে দৃষ্টিপাত করে ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে তার ইতিহাস রচনা করতে হবে। বিদ্রোহিদের অপরাধ যতই অমার্জনীয় হোক না কেন, কোনো বিদেশি শক্তির প্ররোচনায় এ বিদ্রোহ হয় নি—নিজেদের পারিপার্শ্বিক ক্লেদ ও গ্লানি থেকেই তার উৎপত্তি। এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 'বিদ্রোহিরা' ঐতিহাসিকের নিকট স্বীয় মর্যাদা দাবি করতে পারে। ঐতিহাসিক ফরেস্ট যত্নের সঙ্গে নিম্নতম ব্রিটিশ সৈনিকের নামও তালিকাভুক্ত করে অমর করে রেখেছেন, কেননা তিনি এটিকে 'মিউটিনি' দেখেছিলেন স্বদেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজের

৮১. Wahabis in India : Cal. Review (1870), cii.
৮২. আঠারো শ সাতান্ন—মওলানা আবুল কালাম আজাদ. চতুরঙ্গ ১৩৬৪ বৈশাখ।

www.pathagar.com

জাতীয় জীনের 'এপিক' হিসেবে—যার বাণী ইংরেজের কর্ণকুহরে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রতিধ্বনিত হবে। কিন্তু কেউ আজও স্বীকার করল না, এ কথাটি আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে অগণিত জনসমষ্টি সতেরো শ সাতান্ন পর্যন্ত বিদ্রোহে, সমরে ও ফাঁসির মঞ্চে জীবনপাত করে গেছে, আজ তারা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পশ্চাতে এই দাবি নিয়ে—*তাদের মহৎ আত্মত্যাগেরও মর্যাদা দিতে হবে।*[৮৩]

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বারবার উল্লেখ করেছেন,

> দেশের সর্বত্রই মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ রাজশক্তির সহায়তা করেছে।[৮৪] কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্র নাগরিকগণ এবং মাদ্রাজের ন্যায় বাংলার তাবৎ ভূম্যাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের ও বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছেন।[৮৫] কলিকাতার নব্য সম্প্রদায়; যেটি পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, সেদিন সেসম্প্রদায় শুধু চুপ করে থাকে নি, সক্রিয়ভাবে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে।[৮৬] গিরিশচন্দ্র ঘোষ কনিষ্ঠ শ্রীনাথ ঘোষ কালেকটরকে লিখেছিলেন 'শয়তান বিদ্রোহীদের উপর দশ হাজার বজ্রপাত হউক।[৮৭]

কাজি আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গটি আরও বিশদ করে বলেছেন,

> সেদিনের বাংলাদেশে অন্তত বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় সিপাহী বিদ্রোহের কোনো প্রভাব অনুভূত হয় নি। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখার্জী এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের কর্মমাত্র। দেশের প্রজাবর্গের সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরেজ গভর্নমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে।" হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের মত যে মোটের উপর সেদিনের বাংলাদেশের মত ছিল তার একটি ভালো প্রমাণ, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা বাঙালিরাও সেদিন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোনোরূপ কৌতূহল দেখান নি।[৮৮]

বস্তুত দেশের জনগণ যখন বিদেশি ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করতে মরণপণে শুধু হাতেই লড়ছে এবং স্বাধীনতা লাভের আশায় সমগ্র দেশে সমরানল জ্বলে উঠেছে, তখন কলকাতার সংস্কৃতিমনা উচ্চ সম্প্রদায় পাইকপাড়ার রাজার বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে সখের নাট্যশালায় 'রত্নাবলি'-এর অভিনয় দেখেছেন। মাইকেল মধুসূদন মহামান্য ইংরেজ অতিথিদের অভিনয় উপভোগের সুবিধার্থে 'রত্নাবলি'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ও স্বয়ং 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেছেন।

---

৮৩. লেখকের উদ্বোধন অভিভাষণ—চাখার ইতিহাস পরিষদ সম্মেলন ১৩৭৪ : ৬ পৃ.।
৮৪. আঠারো শ সাতান্ন—হুমায়ূন কবীর (চতুরঙ্গ ১৩৬৪ শ্রাবণ : ১১৮ পৃ.)।
৮৫. Eighteen fiftyseven—S. N. Sen. p 408.
৮৬. Autobiography of Debendra Nath Tagore.
৮৭. The life of Girish Chandra Ghosh.—M. N. Ghosh.
৮৮. বাংলার জাগরণ, ৭৪ পৃ.।

www.pathagar.com

হিন্দু কলেজের উন্নতি মানসে তদানীন্তন গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের দরবারে হাজিরা দিচ্ছেন 'ধুতিপরা লোকটি' ঈশ্বরচন্দ্র প্যান্টালুন চোগা-চাপকান ও পাগড়ি শোভিত হয়ে।[৮৯]

আর রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় পাদদেশে নির্জনে নিশ্চিন্তে আত্মিক উন্নতির সাধনায় তৎপর আছেন।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে, এই শতাব্দীব্যাপী মুসলমানদের আজাদি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এক সংগঠনও পরিচালনা করেছিলেন ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ। তার কারণ এই ছিল যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে আলেম ও মোল্লা সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত, শিক্ষিত ও ধর্মভীরু স্বাধীনচেতারূপে সাধারণ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। এবং দেশকে নেতৃত্বদানের জন্যে বর্তমানকালের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মোটেই অস্তিত্ব ছিল না মুসলিম সমাজে। এই আলেম সম্প্রদায় দেশকে দারুল-হরব ঘোষণা করলেন এবং একদিকে যেমন ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে দারুল ইসলাম তথা দারুল আমান প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অন্যদিকে ভিতর থেকে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সংস্কার সাধনে তৎপর হলেন। লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো অমানুষিক নৃশংস বা মানবতার অপমানকর প্রথার প্রচলন ছিল না— হিন্দুদের সতীদাহ, বহুবিবাহ, বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়ার মতো। এজন্য মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে কোনো বাধা আসে নি মুসলমানদের কাছ থেকে এবং তার দরুন ইংরেজ রাজশক্তির সাহায্যেও প্রয়োজন হয় নি। বরং প্রবল বাধা এসেছে ও খড়্গ উদ্যত হয়েছে হিন্দু জমিদার, নীলকর ইংরেজ ও কোম্পানি রাজশক্তির দিক থেকে বাংলাদেশে ফরায়েজি হেদায়তি আন্দোলনের এবং উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির তাবগির-ই-মুহম্মদীয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আর তার কারণ এই যে, এসব সংস্কারধর্মী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল।

যে সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে এই আন্দোলনের সূচনা, তার আদিতে ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬১)। দিল্লিতে বসে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং মারাঠা শিখ ও ইংরেজশক্তির অভ্যুত্থান ও বিস্তার লক্ষ করেছিলেন। মধ্যযুগ যে শেষ হয়ে গেছে এ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। তাই অস্ত্রের পরিবর্তে তিনি কলম ধরেছিলেন সমাজ মানসকে জাগ্রত করতে, উজ্জীবিত করতে। মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি কোরানের একটি ফারসি তর্জমা প্রকাশ করেন; এটা ভারতের মুসলমানদের আত্মজিজ্ঞাসা ও চেতনার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এতে ব্যাখ্যা বা টীকা ছিল না। তর্জমাটির জন্যে তাঁকে দিল্লির আলেম সমাজের কোপানলে

৮৯. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র।

www.pathagar.com

পড়তে হয়েছিল। উর্দুতেও কোরানের প্রথম তর্জমা প্রকাশ করেন তাঁরা পুত্র আবদুল কাদের। ওয়ালীউল্লাহকে বলা হয় হিন্দের ইমাম। যা দ্বারা ভারতীয় মুসলমানকে অন্য দেশের মুসলমান থেকে আলাদা করে চেনা যায়, তার কাঠামোর প্রায় সবটুকুই ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারার ফল। এসব চিন্তাধারা উনিশ শতকে যে সক্রিয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে তার গঠনে তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ আবদুল আযীযের (১৭৪৬-১৮২৩) অবদান ছিল বেশি। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি, শাহ ইসমাইল শহীদ, ফযলে হক খয়রাবাদী ছিলেন শাহ্ আবদুল আযীযের শিষ্য এবং তাঁরই প্রেরণা উৎসাহ ও কর্মোদ্দীপনায় এঁদের সংস্কারধর্মী মেজাজ গড়ে ওঠে।

> পাঞ্জাব ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর যখন এই সংস্কারধর্মী আন্দোলন সামরিক ভূমিকায় সক্রিয় হয় ও ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, তখনও আবদুল আযীযের বংশধররাই তার সংগঠন ও নেতৃত্ব করেন।[৯০]

৯০. ভারতে ওহাবী আন্দোলন—আ. ম. হবিবুল্লাহ।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক আমল
(১৮৫৭-১৯৪৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আর্থিক উন্নয়ন

কোম্পানির শাসন শেষ হলো। ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অবাধনীতি পূর্বের চেয়ে আরও নিরঙ্কুশভাবে অনুসৃত হলেও একমাত্র ইংরেজই ছিল প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে বাণিজ্য জগতের একমাত্র মালিক। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকে এ জগতে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হতো না, আর এদেশীয়দের নিজস্ব বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে উঠতে আরম্ভ করলেও শৈশব স্তরে ছিল। কিন্তু এ যুগে আর্থিক ক্ষেত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয় এবং এজন্য সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে পেশাধারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাটাও বিপুল পরিমাণে স্ফীত হয়ে ওঠে। এ যুগে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সেক্রেটারি, ডিরেকটরি, ম্যানেজারি ও পরিদর্শনকারী উচ্চ বৃত্তির সংখ্যাও বেড়ে ওঠে। আর বাণিজ্যিক প্রসার হেতু আর্থিক উন্নতি সাধিত হওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ প্রভাবশালী মিশপতি ও ধনপতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। শিল্পক্ষেত্রেও ইংরেজরা একচেটিয়া অধিকারী থাকে; কেবল তুলার বস্ত্রশিল্পে কিছু ভারতীয় স্থান লাভ করে। তবুও এ সময়ে ম্যানেজারি কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে উচ্চস্থানসমূহ ইংরেজ ও বর্ণসংকর ইঙ্গ-ভারতীয়দের তুলনায় অতি তুচ্ছ হলেও পেশার ক্ষেত্রে তারা বেশি বিবেচনা ও সুযোগ লাভ করত। সুয়েজ খাল খোলার পর বাণিজ্য জগতটা আরও প্রশস্ত হয়, আমদানি ও রপ্তানির হার প্রচুরভাবে বর্ধিত হয় এবং তার দরুন জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যায়। পুরাতন জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে পাশ্চাত্য শিল্পজাত দ্রব্য, যেমন ওষুধ, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কারিগরি যন্ত্রপাতি, কাগজ ও মুদ্রণ শিল্প, মদ, সিগারেট, ঘড়ি, বাসনকোসন, কাঁটাচামচ, দেহসজ্জার বিবিধ উপকরণ, গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি, টিনে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যাদি, বাইসাইকেল মোটর, মেকানিক ও ইলেকট্রিক দ্রব্যাদির ব্যবহার বিপুল পরিমাণে বেড়ে ওঠে; তেমনি এসবের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। আর এসব ক্ষেত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদের পেশাকরী ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়।

www.pathagar.com

প্রথমেই ধরা যাক বিদেশি বাণিজ্যিক ক্ষেত্র। নিম্নোক্ত তালিকায় বহির্বাণিজ্যের চিত্রটা খুলে ধরা হচ্ছে :

বছর	আমদানি ও রপ্তানি	বছর	আমদানি ও রপ্তানি
১৮৪২	২৪.৮১ কোটি টাকা	১৯১২	৪৮৫.৩১ কোটি টাকা
১৮৫২	৩৮.৪২ কোটি টাকা	১৯২১	৫৮১.৬২ কোটি টাকা
১৮৬২	৯২.১১ কোটি টাকা	১৯২৮	৬৪৬.১৯ কোটি টাকা
১৮৭২	৯২.৯৭ কোটি টাকা	১৯২৯	৬০১.৬৭ কোটি টাকা
১৮৮২	১৫০.০৭ কোটি টাকা	১৯৩৭	৩৬২.৯৯ কোটি টাকা
১৮৯১	১৯৫.৬১ কোটি টাকা		
১৯০১	২৪৫.৭০ কোটি টাকা	১৯৪০	৩৫৫.৬৬ কোটি টাকা

এ চিত্র থেকে পরিষ্কার হবে, ১৮৪২ সালের বহির্বাণিজ্যের অঙ্কটা প্রায় ২৫ কোটি থেকে ১৯২৮ সালে ৬৪৬ কোটিতে উঠেছে। তার কারণ হিসেবে বলা হয়, অবাধ বাণিজ্য যাতায়াতের উন্নতি ও ১৮৬৯ সালে সুয়েজ ক্যানেল খোলা। এ যুগে ভারত কাঁচামালই বেশি রপ্তানি করেছে, যেমন তুলা, পাট, গম, তৈলবীজ, নীল, চা প্রভৃতি এবং আমদানি করেছে তৈরি পণ্যদ্রব্য, যেগুলোর নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৯০ সালে বিদেশি মূলধনের আমদানি পরিমাণ ছিল ১৯.৮১ কোটি, ১৯৩০ সালে সেটা দাঁড়ায় ২২.৮৬ কোটি টাকা। অবশ্য এ অর্থের প্রায় সবটা ইংরেজের। এ অর্থ গৃহমুখী হলে ভারতীয় আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়। ১৯৩১-৭ সাল পর্যন্ত ৩৭০.৩০ কোটি টাকা ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়; তার মধ্যে ৩২.৮০ কোটি সরকারি খাতের। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের প্রাক্কালে এরূপ বিপুল অর্থ বিলেতে চলে যাওয়ায় এদেশের আর্থিক অবস্থা কী পরিমাণে পঙ্গু হয়ে যায়, তা অনুমেয়।

'হোম'-এর দেনা ও বাণিজ্যিক উন্নতির খাতে জমার অঙ্ক থেকে প্রতিবছর ভারতসচিবের হিসাবে দুটি ধারায় অর্থ চালান হতো : (১) ভারত সরকারের সাধারণ দেনা ও রেলওয়ে, সেচ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের ঋণের সুদ বাবদ; (২) রাজনৈতিক অন্যান্য দায়িত্ব পালনের হেতু বেতন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বাবদ। ১৮৭১ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছর ধরে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত জমা হয়েছে বার্ষিক ১,৬৩,৮২,৪১১ পাউন্ড; কিন্তু ভারতসচিব উপরোক্ত দেনার খাতে কেটে রেখেছেন প্রতি বছর ১,৬০,৭০,২০৮ পাউন্ড। মজা এই যে, ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত বার্ষিক বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত জমা ছিল ১,৬৩,১৩,৪৯০ পাউন্ড হারে, কিন্তু ভারতসচিবের দাবিটা ছিল প্রতি বছর ১,৭৫,৩২,৩৯৮ পাউন্ড হারে। এই নির্মম শোষণনীতিটা বহু ইংরেজ কর্মচারীরও সহ্য হয় নি। স্যার রিচার্ড স্ট্রাচি ভারতসচিবের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্বন্ধটা বলেছেন 'নেকড়ে ও মেষশিশুর কাহিনীর মতো।' যদি কখনো কিছু সামান্য উদ্বৃত্ত থাকত, তাহলে তাও ভারতসচিব গলাধঃকরণ করে বলতেন 'এটা তো আমার পিঠা, এ দিয়ে দেনা শোধ করব।'

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেছিলেন : 'ভারতসচিবের ইন্ডিয়া অফিস হিন্দুদের বহু হস্তপদ বিশিষ্ট দেবতার মতো, কোনো মুখে গরম বুলি, কোনো মুখে বরফের মতো ঠাণ্ডা বুলি বের হয়। একটা হাতে দূরে ফেলে দেয়, অন্য হাতে সব টেনে নেওয়া। আমরা অবশ্য দেবতাদের আদেশ মানতে বাধ্য। ... ভারতকে খুবই কঠোর ব্যবহার দেখানো হয়, লন্ডন কখনো ভারতকে বিশ্বাস করে না। অবস্থাটা অত্যন্ত ক্ষতিকর।' এ অভিযোগ কার্জনসহ বহু ভাইসরয়ও করেছেন।

এ নীতির ফলে ভারতের আর্থিক শোষণ হয়েছে মর্মান্তিকরূপে, এবং বারবার আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, উন্নয়ন কর্মের ব্যবস্থা কমই হয়েছে। এসব তথাকথিত দেনা শোধ করা হতো প্রধানত রপ্তানিকৃত কাঁচামালের মূল্য থেকে। ১৮৪২ সালে রপ্তানি তুলার মূল্য ছিল ২০.৩৯ লক্ষ পাউন্ড, তা ১৯৩৪ সালে বর্ধিত হয় ২.৩০ কোটি পাউন্ডে। ১৮৬০ সালে রপ্তানি পাটের দাম ৬,২৩,৯৯৫ পাউন্ড। ১৯৩৪ সালে কাঁচা পাটের রপ্তানি হয় ১০.৮৭ কোটি টাকার। ১৯১২ সালে চাউল রপ্তানি হয় ১০.৮৭ কোটি টাকার। আমদানি বাণিজ্যের চিত্রটা ছিল এইরূপ :

বছর	তুলার বস্ত্রাদি	অন্যান্য দ্রব্য	মোট
১৮৪২	৩.১৩ কোটি পাউন্ড	৪.৪৭ কোটি পাউন্ড	৭.৬০ কোটি পাউন্ড
১৮৫২	৪.৮০ কোটি পাউন্ড	৫.২৭ কোটি পাউন্ড	১০.০৭ কোটি পাউন্ড
১৮৬২	৯.৬৩ কোটি পাউন্ড	১৩.০০ কোটি পাউন্ড	২২.৬৩ কোটি পাউন্ড
১৮৭২	১৭.২৩ কোটি পাউন্ড	১৪.৬৪ কোটি পাউন্ড	৩১.৮৭ কোটি পাউন্ড
১৮৮২	২৪.৮০ কোটি পাউন্ড	২৭.২৯ কোটি পাউন্ড	৫২.০৯ কোটি পাউন্ড

ভারতীয় বণিকদের চেষ্টায় বস্ত্রশিল্পের প্রসার হওয়ায় বর্তমান শতকে তুলাবস্ত্রের আমদানি হ্রাস পায়। বোম্বাইয়ে প্রথম বস্ত্রমিল বসে ১৮৫৪ সালে। ১৮৭৭ সালের পর নাগপুর, আহমদাবাদ, শোলাপুর ও অন্যান্য স্থানে বস্ত্রমিল বসতে শুরু করে। বর্তমান শতকে এসব মিলের সংখ্যা বেড়ে যায়; বাংলা প্রদেশেও কয়েকটি বস্ত্রমিল স্থাপিত হয়। পাটের ব্যবসায়েও উন্নতি লক্ষিত হয়। কলকাতা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত গঙ্গার উভয় পাশে বহু চটকল বসে। এসব চটকলের জন্যে কাঁচা পাট আমদানি হতো পাটের দেশ পূর্ব-বাংলা থেকে। কিন্তু অবাক কাণ্ড এই যে, পাটের দেশ পূর্ব-বাংলায় আজাদি পূর্ব যুগে একটিও চটকল বসানো হয় নি, কলকাতাকে কেন্দ্র করে এ শিল্পের প্রসার হয়েছে সমস্ত কাঁচাপাট পূর্ব-বাংলা থেকে বহন করে এনে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এ বিমাতৃসুলভ ব্যবহারটাও লক্ষণীয়। সংক্ষেপে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বন্দর শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল, তার স্বার্থ রক্ষার্থেই সমগ্র দেশকে রক্তদান করতে হয়েছে, সারা পূর্ববাংলায় বাণিজ্যিক কোনো ব্যবস্থাই গড়ে উঠে নি আজাদি পূর্বকালে।

www.pathagar.com

যৌথ কারবারসমূহের আবির্ভাব এ যুগের একটি বিশিষ্ট অবদান। তার ফলে বাণিজ্যিক প্রসারও যেমন দ্রুত হয়, তেমনি এগুলোকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক মর্যাদাও শতগুণে বর্ধিত হয়ে উঠে।

কোম্পানি হৌসগুলো একে একে হ্রাস পেতে থাকে ১৮২৮ সালের পর এবং সে সবের স্থান অধিকার করতে থাকে যৌথ কারবারগুলো।

এসব বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে মূলধন দিতে ব্যাংকিং ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তার জন্যে ইনস্যুরেন্স বা বীমা-ব্যবসায়ের উদ্ভব ও দ্রুত প্রসার লক্ষণীয়।

যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রায় চারটি পূর্ব বাংলার নদীপথে কার্যরত যৌথ-কারবার স্থাপিত হয় ১৮৪৭ সালের মধ্যেই—এস. এন. কো., ই. জি. এস. এন. কো., জি. এস কো. তাদের মধ্যে প্রখ্যাত। আসাম কোম্পানি ও বেঙ্গল কোল কোম্পানির নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। যৌথ-কারবারে ব্যাংকিং প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়। কলকাতা ইউনিয়ন ব্যাংক ১৮৩৫ সালে ও ঢাকা ব্যাংক ১৮৪৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৮১ সালের মধ্যে বাংলায় ১৫টি, মাদ্রাজে ৭২টি ও মহীশূরে ৫১টি ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত সালের মধ্যে বাংলায় ১৭৭টি, বোম্বাইয়ে ১০০, মাদ্রাজে ৯৬ টি যৌথ-কারবার স্থাপিত হয়েছিল। এবং এগুলোর সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ১০৬৯টি। ১৯০১ সালে সংখ্যা ছিল ১৪০৫ ও ১৯২৫ সালে ছিল ৫৩১১টি; তখন তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ৩৭.৩৯ কোটি ও ২৭৭.২৮ কোটি টাকা। ১৯২৫ সালে বাংলাদেশে যৌথ-কারবারের সংখ্যা ছিল ২৪৫১টি। ১৯৩৭ সালে যৌথ-কারবার ছিল ১০,০৬১টি। তখন হোটেল, থিয়েটার, জমি ও বাড়ি, চা বাগান, চিনি, শোধনাগার, পানীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বহু যৌথ-কারবার সৃষ্টি হয়েছিল। এসবের আবির্ভাবের ফলে জীবনযাত্রার ধারাও বহুধায় পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল।

কলকারখানা ও শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রেও বিপ্লব সূচিত হয়েছে এ যুগে। তন্মধ্যে বস্ত্রমিলই সর্বপ্রধান এবং বোম্বাই ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী। ১৮৮২ সালে ৬২টি বস্ত্রমিলের মধ্যে ৪৬ ছিল বোম্বাইয়ে। এগুলোর সংখ্যা ছিল ১৯০২ সালে ২০১টি, ১৯২১-২২ সালে ২৩৭টি, ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪০৩টি। ভারতীয় কাঁচামালের প্রাচুর্য, শ্রমের অসম্ভব কম মূল্য, রেল-স্টিমার দ্বারা যোগাযোগের দ্রুত উন্নয়ন ভারতীয় শ্রমশিল্পের দ্রুত প্রসারবৃদ্ধির কারণ। পাট, চা, কয়লা শিল্পেও এ নিমিত্ত দ্রুত প্রসার বৃদ্ধি হয়। আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী কুড়ি জনের বেশি কর্মী নিযুক্ত কারখানার সংখ্যা ছিল ১৯১১ সালে ৭১১৩টি এবং ১৯২১ সালে ১৫,০০০ টির উর্ধ্বে।

তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশকে কাঁচামালের দেশ স্তরে রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ শিল্প সংরক্ষণের স্বার্থে। ১৯১৬ সালে নিযুক্ত ভারতীয় শিল্প কমিশন স্বীকার করেন, 'ভারত এখনও প্রধানত কাঁচামাল উৎপাদনের দেশ।' এ অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন বিষয়ক আইনে বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত দপ্তর মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত

www.pathagar.com

হয়। ১৯২৩ সালে একটি ট্যারিফ বা মূল্য নির্ধারণ বনাম শুল্ক বোর্ড স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সহজেই পরিচ্ছন্ন হয় যে, যতই অবাধনীতি, ট্যারিফ বোর্ড প্রভৃতির বাহ্যিক নিদর্শনে ভারতীয় বাণিজ্যশিল্পের উন্নতির দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নয়নের সদিচ্ছা প্রকাশিত হোক না কেন, এসবের বাস্তব প্রয়োগনীতি এমনই রহস্যময় ছিল যে, ব্রিটিশ শাসন আমলে বিলেতি বাণিজ্যিক স্বার্থ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় নি এবং বিলেতী শিল্প সম্ভারের খোলাবাজার হিসেবে পাকভারতে নিরঙ্কুশ অধিকার এতোটুকু খর্ব হয় নি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিলেতি বস্ত্রের বাজার কিছুটা সংকুচিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু অন্যান্য বহু বিলাস-পণ্য, অঙ্গরাগদ্রব্য, মোটর, বাইসাইকেল, ইলেকট্রিক দ্রব্য প্রভৃতি অবাধ পণ্য আমদানির দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল। এখানে বিলেতি নানা বিদ্যার, বিশেষত অর্থকরী, কারিগরি, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদির আমদানিটাও উপেক্ষণীয় নয়।[১]

বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রচারের চিত্রগুলো আরও গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, এসব উন্নয়ন হয়েছে শহর অঞ্চলে, গ্রামীণ অঞ্চলের সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই। এবং এই কারণে আর্থিক উন্নতিটাও হয়েছে সর্বাংশে শহর এলাকায়, পল্লী এলাকায় নয়। আর্থিক বিন্যাসের এমন অসম ব্যবস্থার দরুন নাগরিক ও পল্লীজীবনের পার্থক্যটাও বেড়ে গেছে অসম্ভবরূপে। জীবনযাত্রার মান উন্নতিতে এবং সাংস্কৃতিক উচ্চ রুচিতে নগরবাসী ও গ্রামবাসীর ব্যবধান হয়ে পড়েছিল এত বেশি যে, দুজনে একই রাজ্যের বাসিন্দা, এটাও ভ্রম হতো। 'শহুরে ভদ্রলোক' ও গেঁয়ো ভূতের পার্থক্যটা হৃদয়ঙ্গম করলে আমার বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হবে।

আর্থিক বিন্যাসের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একটা বিষম অসম অবস্থা লক্ষিত হয়। সমস্ত কাঁচা অর্থ একেবারে স্তূপীকৃত বা কেন্দ্রীভূত হয়েছে বড় বড় শহরগুলোতে, বিশেষত কলকাতা ও বোম্বাইয়ে। আর এই অসম অবস্থা সৃষ্টির প্রধান হেতু তিনটি : বহির্বাণিজ্যিক বিষয়টা একেবারে কেন্দ্রীভূত করা, আয়কর কাঠামোটা এ দুটি শহরেই স্থাপন করা এবং ব্যাংকিং কর্মটা একেবারে কুক্ষিগত করে রাখা। এদেশের সমগ্র আমদানি-রপ্তানির পথ ছিল মাত্র কলকাতা ও বোম্বাই—৭০ থেকে ৮০ ভাগ বাহির্বাণিজ্য হয়েছে, পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়েছে এই দুটি বন্দর দিয়ে। তার ফলে বাণিজ্যলব্ধ সমস্ত অর্থই এই দুটি শহরে বন্দী হয়ে থেকেছে। এই অসম অর্থ বিন্যাসের ফলে এই দুটি শহরেই বেশি বর্ধিত হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজ। ফলে কলকাতা উত্তর ভারতের বিশেষত বাংলার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে উনিশ শতকব্যাপী অর্থ সমারোহের ফলে। আর এজন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার প্রগতি বা আন্দোলনের জন্মস্থানও ছিল আলোচ্য শতকে এই কলকাতা।

---

১. Advanced Hist. of India, p 898-900.

www.pathagar.com

বোম্বাই ও কলকাতায় ভারতীয়রা ইংরেজ বণিকদের দালাল, সরকার, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান হিসেবেই ব্যবসায়ে বুদ্ধি লাভ করে। এবং কালক্রমে এ দুটি কেন্দ্রস্থলে ইংরেজ বণিককুলের আনুকূল্যে তারা এদেশীয় ব্যবসায়ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়ায়। অবশ্য বোম্বাই এ বিষয়ে কলকাতাকে অতিক্রম করে। কলকাতায় বিলেতি ফার্মগুলোর প্রাধান্যই এন. সি. সরকার ব্যতীত অন্য সমকক্ষ যৌথ কারবার এদিকে উঠে দাঁড়ায় নি। টাটা কোম্পানি পাঁচটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রের মালিক ছিল এবং কলকাতার *'বিগ-ফাইভ'*[২] ফার্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। পশ্চিম ভারতে অবশ্য সাসুন, খাটাও, কয়াসজি, থ্যাকার্সে, জিজিভাই, ওয়াদিয়া প্রভৃতি ইহুদি, ফরাসি ও গুজরাটি বৃহৎ বংশীয় কোম্পানি সৃষ্টি হয়। এসব কোম্পানি যেমন অধিকাংশ ব্রিটিশ, সেগুলোর ডিরেক্টররাও ছিল বহুলাংশে ইংরেজ। ১৯৩১ সালে এসব কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৫১০; তার মধ্যে ৪১৬টি ব্রিটিশ; ২২৮২ জন ডিরেক্টরের ১৩৩৫ জন ইংরেজ। বাকির মধ্যে ফরাসি, গুজরাটি ও বাঙালির সংখ্যাই বেশি এবং বাঙালি অর্থে উচ্চবর্ণ হিন্দু। মাড়োয়ারিরা দ্রুত স্থানলাভ করেছে। মুসলমানের ১০টি কোম্পানির ৭০ জন মাত্র ডিরেক্টর। মাড়োয়ারির মধ্যে সকল ভারতীয়ের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়।

শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মচারীদের সেন্সাস থেকে জানা যায়, সর্বস্তরের কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১৯১১ সালে ১,৪৩৭ ও ১৯২১ সালে ১৪,৬৭১ জন ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়; ১৯১১ সালে ৬০,৭৩৪ ও ১৯২১ সালে ১,০৮,৫৭৩ জন এদেশীয়। আরও জানা যায়, ধাতুশিল্প, আগ্নেয়াস্ত্র, লৌহ ঢালাই, ইস্পাত তৈরি, যন্ত্রপাতি, মুদ্রার কারখানা, বাইসাইকেলের ও মোটর নির্মাণ কারখানা, রেলওয়ে কারখানা, ট্রামওয়ে কারখানায় ইংরেজ ও ইঙ্গ-ভারতীয়রা প্রায় একচেটিয়াভাবে নিয়োজিত হতো; অন্য সবক্ষেত্র এদেশীয়দের জন্যে উন্মুক্ত। ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রেলওয়ের উচ্চ পদগুলো ইউরোপীয়রা ও ফিরিঙ্গিরা বেশি অধিকার করে; এদেশীয়রা অর্ধেকেরও কম ছিল। ৭৫-২৫০ টাকা মাসিক মাহিনার পদগুলোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয়রা ও ফিরিঙ্গিরা অধিকার করত। তখন এসব পদে তারা ১৯,৯৮৫ জন ও ২০-৭৫ টাকা বেতনের পদে এদেশীয় ২,৩৩,৪১৬ জন ছিল। অবশ্য চাকরির বাজার কী অসম্ভবভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তার একটি নজির হলো, সেচ বিভাগের মতো নগণ্য বিভাগেও ৮৪১ জন কর্মচারী স্তরে এবং প্রায় ১১,০০০ জন নিম্নপদে বহাল ছিল।

ডাক ও তার বিভাগের উচ্চতম পদগুলোতে ইউরোপীয়রা ও ফিরিঙ্গিরা বিরাজ করত, কিন্তু সব পদেই এদেশীয়রা নিয়োজিত হতো। রেলওয়ে ও পূর্ত বিভাগে কনট্রাক্টরের আবির্ভাব চলতি শতকের গোড়া থেকে শুরু হয়, ১৯২১ সালে এ

২. এই পাঁচটি কোম্পানির নাম : এন্ড্রু ইউল, শ. ওয়ালেস, ডানবান্ ও বেগ, বার্ড কোম্পানি ও ডানলপ কোম্পানি।

www.pathagar.com

দেশীয় ১১,৬০১ কনট্রাক্টরের অস্তিত্ব ছিল এ দুটি বিভাগে। কারিগরি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কর্মসমূহে দ্রুত দেশীয়রা জ্ঞানলাভ করে ও এসব কর্মে নিয়োগ প্রায় একচেটিয়া হিসেবে অধিকার করতে থাকে।

উপসংহারে একথা নিদ্বিধায় বলা যায়, বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে যে অর্থলাভ হতে থাকে, তার প্রায় ষোলো আনাই শহর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে। কেউ খোদ ব্যবাসায়ী বা শিল্পমালিক হিসেবে এবং কেউ কর্মী হিসেবে এক্ষেত্রে প্রচুর অর্থোপার্জনের সুযোগ লাভ করে। বিলেতি কলকারখানা ও শিল্পসমূহের কাঁচামালের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে এদেশে কাঁচামাল উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি এসব যাতায়াতের জন্যে রেলপথ ও জলপথের প্রসার বিস্তৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মীর চাহিদা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই মেটানো হতো। এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আলোচ্য শতক ব্যবসায় ও শিল্পক্ষেত্রে যেমন বিস্তৃতির যুগ, তেমনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণেরও যুগ।

ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন

কোম্পানি সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে বড় বড় জমিদারিগুলো ভেঙে ফেলে ছোট ছোট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূম্যাধিকারী সৃষ্টি করা, যার ফলে এ শ্রেণীর অবিমিশ্র সহানুভূতি থাকবে ইংরেজ রাজশক্তির ওপর। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি অনুসৃত হয়েছিল। এ ব্যবস্থা অন্যান্য প্রদেশে তখন গৃহীত হয় নি। এখন এ ব্যবস্থাও অন্য সব প্রদেশে চালু করার চেষ্টা নেওয়া হয়। আরও একটি পন্থা অনুসৃত হয়, সেটি হচ্ছে, ইউরোপীয়ানদের এদেশে বড় বড় জোত বন্দোবস্ত দিয়ে একদিকে বিদেশি 'কলোনাইজেনশন' এবং অন্যদিকে 'প্লানটেশান' সৃষ্টি করা, যার দরুন চা বাগান, কফি বাগান, অন্যান্য বৃহৎ ফসলের বাগান সৃষ্টি হয়েছিল এবং এসব বৃহৎ জোতগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের বড় বড় খুঁটিতে রূপায়িত হয়েছিল। পূর্বেই উক্ত হয়েছে, রামমোহন রায়ও এই কলোনাইজেশন নীতির সমর্থন করেছিলেন। ভূমি ব্যবস্থায় এই নয়া নীতি প্রবর্তনের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো, এদেশে কাঁচামাল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, যার দ্বারা ব্রিটেনের শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা মেটানো হতো।

> এ উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালের ১৭ অক্টোবর ভারতসচিবের অফিসে একটি 'সংকল্প' প্রস্তুত হলো। তার নিয়মাবলি অনুসারে তিন হাজার একর পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া চলত, মাত্র আড়াই টাকা একরপ্রতি অপরিষ্কার জমি ও পাঁচ টাকা একরপ্রতি জঙ্গলা জমির মূল্য নির্ধারণ করে।[৩]

৩. Resolution on Waste Lands, No. 3264.

www.pathagar.com

বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হতো, তবে গ্রহণকারীর ইচ্ছামতো যেকোনো সময়ে ইস্তাফা দেওয়া চলত। এভাবে আসাম, সুন্দরবন , দেরাদূন, কুমাউন, ঘারওয়াল, ও নীলগিরি অঞ্চলে অনুর্বর ও জঙ্গলা জমি হিসেবে কথিত প্রকৃত অকর্ষিত মূল্যবান উর্বর জমি নামমাত্র মূল্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের দান করা হয়েছে।

রাজস্ব থেকে অব্যাহতি দানের নীতিটা কৃষিজমির ভূম্যাধিকারীরাও দাবি করলেন। যেহেতু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা এ সুবিধা পেলেন, সেহেতু এ সুবিধা এ শ্রেণীর জমিদারদেরও দেওয়া হয়, কারণ :

> এ পরিবর্তিত নীতির ফলে যে রাজনৈতিক উপকার হলো সেটা উপেক্ষণীয় নয়। জমিদাররা এমন একটা বিশেষ সুবিধা লাভ করে সরকারের প্রতি আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অতএব রাজস্ব অব্যাহতির বিনিময়ে যে রাজভক্তি পাওয়া যাবে, স্বার্থের দিক দিয়ে তার মূল্যও কম নয়।[৪]

স্যার চার্লস উড এ নীতির সমর্থন করে বলেছিলেন, 'এটি খুবই বাঞ্ছনীয় যে, ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমৃদ্ধিকল্পে সবরকম সুযোগ দেওয়া হবে'। তিনি অবশ্য সদিচ্ছা পোষণ করেছিলেন, এ নীতির ফলে বৃহৎ কৃষকগোষ্ঠী উপকৃত হবে। তার দরুন কখনো যদি অন্য কোনো সম্প্রদায় সরকারের বিরুদ্ধবাদী হয়, কিংবা সামরিক ব্যয়ের ঘাটতি হয়, সেসব আনুষঙ্গিক খরচের ব্যবস্থা হবে। স্যার জন লরেন্স এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা থেকে ভূমিনীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ মানস অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হয়েছিল :

> এটা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে, ভারতে ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত সমাজকে ক্রমশ সংগঠনের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হবে ... এ শ্রেণীর মধ্যে বহু বুদ্ধিমান উৎসাহী ও সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন ... এজন্য খুবই দরকার যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান ও উৎসাহী তাঁদের সব রকম সুযোগ দেওয়া হবে আপন অবস্থা উন্নয়নের জন্য। তাঁদের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হলে এবং অবস্থার উন্নতি হলে সরকারও উপকৃত হবে, এতে কোনো ভুল নেই।

এসব উক্তি থেকে ব্রিটিশের ভূমিনীতি সম্বন্ধে কোনো ভ্রান্ত মত থাকতে পারে না। কৃষকরা কেবল ব্যয়ভার বহন করার জন্যই উদ্দিষ্ট, তাদের স্কন্ধে ভর করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিরাজ করবে, তাদের অবস্থার উন্নতি হলে সরকারের উপকার অবধারিত। অতএব কোটি কোটি কৃষকের স্বার্থের বিনিময়ে কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান লোকের স্বার্থসংরক্ষণই ছিল এ যুগের ভূমিনীতির মূলকথা। অবশ্য ম্যাকডোনেলের প্রস্তাব অনুযায়ী একটা কৃষি পরিসংখ্যান কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ভূমিকর্ষক প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং ভূম্যাধিকারীরা যাতে অন্যায় অজুহাতে তাদের উচ্ছেদ করতে না পারে, তার বিরুদ্ধে আইনত নিরাপত্তার বিধান করা। কিন্তু তাদের ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এই আইনটির

৪. Rev. Despatch. 31 Despatch 1858.

www.pathagar.com

প্রণয়নকারীদের মধ্যে মধ্যবিত্তরাই ছিল প্রভাবশালী, এই জন্য প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণের চেয়ে ভূম্যাধিকারীর স্বার্থই আরও দৃঢ় করা হয়েছে এ আইনটিতে। এজন্য অনেকে এটিকে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন না বলে প্রজানিধন আইন বলে থাকেন। পরে অবশ্য যথাস্থানে উন্মোচিত হবে, এই আইনের বিধানগুলো প্রজানুকূল্যে আরও সুবিধাজনক বিধিমূলে সংশোধনের চেষ্টা কীভাবে বানচাল হয়েছিল জমিদার শ্রেণীর প্রভাবশালী কাউন্সিল সদস্যদের উদ্যমে।

কিন্তু বাংলায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। বিহার, উড়িষ্যা তখন বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এজন্য এ দুটি জায়গায়ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বনাম জমিদারি প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮০২-৫ সালের মধ্যে। কিন্তু বারো বছর পরে তখন এ প্রথার কুফল প্রকট হয়ে উঠেছে এবং অন্যত্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীরাই দৃঢ়ভাবে বিরুদ্ধতা করেছেন। পূর্বেই উক্ত হয়েছে, স্যার টমাস মনরো প্রবল বিরুদ্ধতা জানিয়েছেন মাদ্রাজ প্রদেশে। সেখানে ও বোম্বায়ে রায়তয়ারী প্রথাই ফলবতী রইল। এর বৈশিষ্ট্য হলো : বন্দোবস্তটা হয় প্রজার সঙ্গে সরাসরি; এবং যদিও না কায়েমি তবু নির্দিষ্ট প্রজাই পুনরায় বন্দোবস্ত লাভ করত এবং নির্দিষ্ট খাজনা সরাসরি সরকারে আদায় দিয়ে যদৃচ্ছা জমি ভোগ করত ওয়ারিশানক্রমে এবং সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হয়ে। বন্দোবস্ত দেওয়া হতো সাধারণত ত্রিশ বছরের মেয়াদে এবং মেয়াদ মধ্যে খাজনা হার বৃদ্ধি করা চলত না। ফলে জমির সবরকম উন্নতির ফলভোগ প্রজাই করত। জমিদার শ্রেণীর মতো গরহাজির রক্ত-শোষকের দল উন্নতির সুযোগ বা অতিরিক্ত হারে খাজনার দাবি করার মতো মধ্যবর্তী কেউ ছিল না। ভূমি রাজস্ববদদের মতে জমিদারি প্রথা অপেক্ষা রায়তয়ারী প্রথা প্রজার পক্ষে অধিক সুবিধাজনক ছিল।

বাংলার ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কীভাবে উদ্ভব হয়েছিল, পূর্বেই বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, বাংলার এই শ্রেণী অন্যান্য প্রদেশে জমিদারদের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় দিয়ে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা হিসেবে অধিক মুনাফা লাভ করত। প্রতি বর্গমাইল ভূমির রাজস্ব বাংলায় ছিল ১৭ পাউন্ড ১৪ শিলিং; বোম্বাইয়ে ছিল ২২ পাউন্ড; মাদ্রাজে ২৯ পাউন্ড; উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিল ৪৫ পাউন্ড ৪ শিলিং। এছাড়া ছিল তীব্র স্বার্থপ্রণোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবওয়াব, মাথট, পরবি প্রভৃতি নামাঙ্কিত নানা প্রকারের আইনবহির্ভূত আদায়। নানা ক্ষেত্রে কর্মোপলক্ষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, দাখিলায় জমা ২ টাকা লেখা থাকলেও প্রজাকে ১০ টাকা ১১ টাকা নিয়মিতভাবে বছর বছর আদায় দিতে হয়েছে এবং নিরীহ নিরক্ষর প্রজা এ অঙ্কটাই আসল খাজনা ভেবে এসেছে। এসব নানাবিধ কারণে বাংলায় ভূম্যাধিকার ছিল এক লাভজনক ব্যবসায়।

www.pathagar.com

এজন্য উনিশ শতকে ব্যবসায় বা শিল্পে টাকা না খাটিয়ে জমিদারিতে টাকা লগ্নি করার প্রবণতা বাংলা প্রদেশে বেশি দেখা গিয়েছিল। একই কারণে শহরবাসী গরহাজিরা জমিদার শ্রেণীর আধিক্য ছিল বাংলা প্রদেশেই। এবং তাঁদের প্রধান আস্তানা ছিল কলকাতা।[৫]

আরও অদ্ভুত হলো, নানাবিধ মধ্যস্বত্বের উদ্ভব—জমিদারের নিচে পত্তনি, দরপত্তনি, সেপত্তনি, তালুকদার, হাওলা, নিমহাওলা, দরহাওলা প্রভৃতি বিচিত্র নামাঙ্কিত মধ্যস্বত্ব, যা নিম্নতম দশ-বারো স্তরেরও সৃষ্টি হতো। এসব ক্ষুদে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনেকেই হতো অন্যত্র ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী বাসিন্দা এবং ভূমিস্বত্বের আয়টা ছিল চাকরি বা ব্যবসায়লব্ধ বাৎসরিক আয়ের পরিপূরক; এজন্য তাদের জমি বা জমিকার্ষকের ওপর কিছু মাত্র মমতা বা আকর্ষণ থাকত না।

আধুনিক ব্যাংকিং প্রথার চালু হওয়াতে পূর্ব আমলের রায়রায়ান জগৎ শেঠদের আধিপত্যও বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্র থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ যুগে আর তাঁদের অস্তিত্বই নজরে ঠেকে না। এজন্য পুরাতন শরফ বা পোদ্দারদের স্থান অধিকার করেছে মহাজন শ্রেণী। এবং মহাজন শ্রেণী রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠাবান না হলেও অর্থকৌলিন্যের জোরে এ যুগে কিছু কম প্রভাবশালী ছিল না। এরা সর্বজাতির লোক—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র, কায়স্থ, সোনারু। এমনকি চাকুরিয়া ও ভূম্যাধিকারীরাও মহাজনি কারবার করত। তাদের ফলাও কারবার ছিল পল্লী অঞ্চলের কৃষিকুলে এবং পাওনা আদায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ভূমির মালিকানা অর্জন ছিল প্রধান লক্ষ্য। সুচতুর ও হৃদয়হীন গোষ্ঠী হিসেবে কৃষক ও অলস জমিদারদের শোষণকারী নামে তারা বিখ্যাত। কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করত বীজ ধান, গরু ক্রয়ের জন্যে এবং অজন্মা অনাবৃষ্টি হলেই জমিচ্যুত হতো; আর জমিদাররা অমিত ব্যয়ের দরুন জমিদারি চ্যুত হতো। তাদের সুদের হার সাধারণত ২৫ থেকে ৫০ হতো। এবং চক্রবৃদ্ধি হারে চলত। প্রায় ক্ষেত্রে আট-দশ গুণ সুদ আদায় দিয়েও আসল দেনা অবিকৃত থাকত।

একটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, মাত্র ৫০০ টাকা দেনা গ্রহণ করে জনৈক জমিদার তার জমিদারি দখলসহ রেহানাবদ্ধ করে, এবং দশ বছর পর দেখা যায় যে, মহাজন জমিদারি থেকে দশ বছরে ৭,০০০ টাকা মুনাফা লুটেছে, অথচ দেনার পরিমাণ উঠেছে ১০,০০০ টাকা। অন্য এক ক্ষেত্রে মহাজন মাত্র ৫০ টাকা ঋণদান করে ২৫৭ টাকা সুদ আদায় করে এবং দশ বছর পরে ৯৯১ টাকা আদায়ের নালিশ রুজু করে। এসব ছিল মহাজন শ্রেণীর সাধারণ কারবার। এ সম্বন্ধে বহু মামলার রিপোর্টে কোর্টের নথিপত্র ভারাক্রান্ত। হান্টারও স্বীকার করেছেন, কীভাবে মহাজন শ্রেণী অমিতব্যয়ী অলস মুসলিম জমিদার শ্রেণীকে উৎখাত করে ফেলত।[৬]

৫. Oxford Hist. of India. p 637.
৬. Indian Musalmans, 147.

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি

স্যার চার্লস উডের ১৮৫৪ সালের 'শিক্ষা ডেসপ্যাচ'-এ শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুতর সংস্কারনীতি সূচিত হয়। তদ্দ্বারা যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার নীতির পূর্ণ সমর্থন করা হয়, তেমনি উচ্চশিক্ষার বিস্তার প্রশমিত করে জনশিক্ষার প্রসার এবং দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি স্বীকার করা হয় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয় এবং তদনুযায়ী ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

উল্লেখযোগ্য, ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বি. এ. পাস করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এবং ১৮৬১ সালে দিলওয়ার হোসেন প্রথম মুসলমান বি. এ. পাস করেন হুগলি কলেজ থেকে।[৭]

উচ্চবর্ণ এবং শিক্ষিত বর্ণহিন্দু জাতিরাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রথম সুযোগ-সুবিধা পূর্ণভাবে লাভ করেছিলেন, এবং তাঁরা নয়া সরকারি নীতির বিরুদ্ধতা করেন এই অজুহাতে যে, ভারতে নানা বর্ণ, জাতি ও ভাষার কোটি কোটি মানুষ বাস করে; অতএব এরূপ ব্যাপক শিক্ষার প্রসারণ বাস্তবিকতার দিক দিয়ে অসম্ভব এবং প্রয়োজনীয় প্রভূত ব্যয় সংকুলানও অসম্ভব। দ্বিতীয়ত এর ফলে পল্লী সমাজজীবন ভেঙে পড়বে, গ্রাম্য অর্থনীতিতে বিপ্লব দেখা দেবে এবং দৈহিক পরিশ্রমকারীর সংখ্যাও কমে যাবে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তরাই এ পর্যন্ত শিক্ষা পেয়ে আসছে এবং একমাত্র তাদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করলে যথেষ্ট হবে।

কিন্তু সরকার এ নীতি গ্রহণ করল না। এর একটা রাজনৈতিক কারণও ছিল। আই.সি.এস. পদগুলো ভারতীয়দের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং ১৮৬৯ সালেই ৪ জন উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

উচ্চশিক্ষার প্রসার অর্থে উচ্চতম পদসমূহে আরও ভারতীয়ের প্রবেশ এবং তার ফলে ইউরোপীয়দের জন্যে সংরক্ষিত পদে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ। অন্তত এরূপ একটি কারণ সেকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের দ্বারা দেখানো হয়েছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যেই বাঙালি শিক্ষিত বাবুর সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তাদের চাকরি সংস্থান অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।[৮]

এসব ব্যতীত আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল, যার জন্যে বর্ণহিন্দুরা জনশিক্ষার প্রসার রোধ করতে অগ্রণী হয়েছিল। আঠারোশো সাতান্নর পর গোটা মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়, তারা অসি ছেড়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণেও আগ্রহী হয়। মুসলমানরাও উচ্চশিক্ষা নিয়ে চাকরিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। এতদিন এ ক্ষেত্রটি ছিল বর্ণহিন্দুদেরই একমাত্র একাধিপত্যের ক্ষেত্র। এখন নতুন উপদ্রবের আশঙ্কায় তারা জনশিক্ষার বিরুদ্ধতা আরম্ভ করল।

---

৭ বঙ্কিম মানস—অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ১৭২।

৮. বঙ্কিম মানস—অরবিন্দ পোদ্দার,পৃ. ৬৩।

www.pathagar.com

বাংলার গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চশিক্ষার জন্যে মঞ্জুরীকৃত অর্থ থেকে জনশিক্ষার অজুহাতে বৃহদংশ ছেঁটে দিলেন। তাঁর আদেশে সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও বহরমপুর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবনমিত হয়।[৯]

নতুন নীতি অনুসারে কতকগুলো সরকারি কলেজ ও স্কুল 'দেশীয় ভদ্রলোকদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাঁরা সরকারি সাহায্য নিয়ে নিজেদের দায়িত্বে এগুলো পরিচালনা করবেন।'[১০]

সংক্ষেপে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রেও অবাধনীতি অনুসরণ করল এবং সাহায্য দান করে শিক্ষায়তনগুলো স্থানীয় ভদ্রলোকদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিল। তার ফলে শিক্ষাখাতের ব্যয় কমে গেল, দায়িত্বটাও কমল এবং এ ব্যবস্থায় উৎসাহিত হয়ে সরকার পরিষ্কার ঘোষণা করল, 'বেসরকারি শিক্ষা উদ্যমের সঙ্গে সরকার প্রতিযোগিতা করবেন না; শিক্ষাপ্রসারের পথ দেখিয়ে দিয়েই সরকার জনগণের হস্তেই এ ব্যবস্থা তাদের হিতার্থে ছেড়ে দিলেন।'[১১]

নয়া শিক্ষানীতিতে অবশ্য উচ্চশিক্ষার প্রসার কমে নি। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খতিয়ান নিয়ে দেখা গেছে, উচ্চশিক্ষার অবস্থা ছিল এরূপ :

বছর	কলেজ সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৮৭৩	৫৫	৪,৪৯৯
১৮৮১	৮৫	৭,৫৮২
১৮৮৬	১১০	১০,৫৩৮
১৮৯৩	১৫৬	১৮,৫৭১

লক্ষণীয় যে, কলেজের সংখ্যা বেড়েছে বিশ বছরে তিনগুণ, ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র এক-চতুর্থাংশ, অবশ্য ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ডবলের বেশি। সবচেয়ে মার খেয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা—যার সঙ্গে বৃহৎ জনগণ সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক স্কুলের বৃদ্ধি নগণ্য এবং ছাত্রসংখ্যাও সেইরূপে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণী শহরের বাসিন্দা, তারা কায়িক পরিশ্রমে অন্নসংগ্রহ অপমানবোধ করে, অতএব তাদের সন্তানরা যেমন সুযোগ পায়, তেমনই পিতামাতাও উচ্চশিক্ষা দান করে পেশাকরী বৃত্তি হিসেবে।

এজন্যে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে অবহেলিত হয় উনিশ শতকে।

এই নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে একদল এমতও পোষণ করেন : নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়ে এ শ্রেণীকে আত্মসচেতন করা ইংরেজদের ভুল হয়েছিল; কারণ তার ফলে তারা মাথা তুলে দাঁড়ায় ও শাসনকর্মে সমান অংশ দাবি করে। তাদের দাবি অস্বীকার করার দরুন তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বোধ হয় এ ভুল সংশোধনের মানস থেকে উচ্চশিক্ষার সংকোচন ও প্রাথমিক শিক্ষা

৯. ঐ—৬৩ পৃ.।
১০. Misra, 283 : Ed. Com. 1882, para 5.
১১. Misra, p 283.

www.pathagar.com

জোরদার করার নীতি অনুসৃত হয়েছিল। এ মনোভাবের কিছুটা আভাস মেলে লর্ড কার্জনের শিক্ষা সম্মেলনের বক্তৃতায় নিম্ন উক্তি থেকে :

> একটি শক্তিশালী দলের মতামতে এ ধারণাটি আর প্রচ্ছন্ন নয় যে, ইংরেজি শিক্ষার এদেশে প্রচলন ভুল হয়েছিল এবং তার ফলাফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরাসমাসকে যখন ভর্ৎসনা করা হয় এমন ডিম্ব প্রসবের জন্য যার ফলে ইউরোপে 'রিফর্মেশন' এসে যায় তখন ইরাসমাস বলেছিলেন, 'হাঁ, আমি মুরগির ডিম্ব দিয়েছিলাম, কিন্তু লুথার যে তা দিয়ে মারমুখী বাচ্চা ফুটিয়ে দিল'। আমার বিশ্বাস অনেকেরই ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে এই ধারণা। তাঁরা মনে করেন, তার দরুন এমন মনোবৃত্তি ও স্বভাব জন্মেছে যা উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বিনীত, অসন্তুষ্ট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজদ্রোহী।[১২]

কিন্তু কার্জনের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞান প্রশংসনীয়। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রটার গণ্ডি প্রসারিত করে দিলেন; ভাগ্যবান কয়েকজনের পরিবর্তে বিশাল জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। শিক্ষার ভোজে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির অধিকারটাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একটা মুষ্টিমেয় জনশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে শিক্ষার আলোক সর্বত্রগামী করার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই তিনি নতুন নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর এ উদ্দেশ্যটি জোরালো ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল;

> প্রাথমিক শিক্ষা বলতে আমি বুঝি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। আমি তাঁদের দলে, যাঁদের বিশ্বাস, সরকার এ দায়িত্ব পালন করেন নি ... আমার বিশ্বাস এ নীতিতে ভুল ছিল দুটি কারণে। প্রথমত, দেশি ভাষাগুলো এ উপমহাদেশের জীবন্ত ভাষা। ইংরেজি হয়েছে শিক্ষার ও প্রগতির বাহন অতি ক্ষুদ্র শ্রেণীর জন্য, দেশের বৃহদংশ লোকের নিকট তা বিদেশি ভাষা, যা তারা বোঝে না ও খুবই কম শোনে। ... আমার দ্বিতীয় যুক্তি আরও ব্যাপক। ভারতের সবচেয়ে মহাবিপদ কী? এত সন্দেহ, কুসংস্কার, বিদ্রোহ, অপরাধ—আর হাঁ, কৃষক অসন্তোষ ও জনগণের দুঃখভারের কারণ কী? শুধুমাত্র অশিক্ষা। আর এ অশিক্ষার ওষুধ কী? একমাত্র জ্ঞান। আমরা যে পরিমাণে জনগণকে শিক্ষাদান করব, ততটুকু তাদের সুখদান করব, আর তারা যত সুখী হবে, ততই তারা দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োজনীয় অঙ্গ হবে।[১৩]

এ সদিচ্ছায় সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৮৮৭ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কিছুই হয় নি। কিন্তু কার্জনের নীতির ফলে অন্তত ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনগুণ বর্ধিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা সংকুচিত হলেও ঊর্ধ্বগতি ব্যাহত হয় নি। উল্লেখযোগ্য, তাঁর আমলে ঢাকায় ছিল ২টি কলেজ, কিন্তু কলকাতায় ২২টি। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, ঢাকায় তিনি একটি কারিগরি স্কুল স্থাপন করেন। কারিগরি শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার উন্নতিতে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি নির্ভরশীল, এ বাস্তব জ্ঞান তাঁর ছিল। এজন্য

১২. Curzon in India, pp 315-16.
১৩. Curzon in India, pp 330.

www.pathagar.com

তিনি এসব বিশেষজ্ঞ ও অর্থকরী শিক্ষার উপর জোর দেন। তাঁর আরও সদিচ্ছা ছিল, দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারভাইজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে দেশের কাজ প্রকৃত সহৃদয়তার সঙ্গে সম্পন্ন হবে এবং বিদেশি এসব কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। তাঁর উৎসাহেই শিবপুর, পুণা ও মাদ্রাজের কারিগরি কলেজে ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকাল শাখায় শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। তাঁর আরও উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র সরকারি চাকরির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিপাত না করে দেশীয় শিল্পক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের আকৃষ্ট করা। এ উদ্দেশ্যে টাটা কোম্পানি তাঁর সহযোগিতা করে ও বাঙ্গালোরে একটি ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষায়তন স্থাপন করে। বাংলার জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনকারীরা যাদবপুরে বেসরকারিভাবে ১৯০৭ সালে একটি প্রকৌশল বিদ্যালয় স্থাপন করে : বর্তমানে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত।

শিক্ষা বিষয়ে উদার নীতি প্রবর্তনের ফলে কার্জন শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতিসাধন করে গেছেন। তাঁর পরিবর্তিত নীতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে ও অনুমোদনদানের সংস্থায় নিবদ্ধ না থেকে উচ্চতম শিক্ষাদান কেন্দ্রে রূপায়িত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এবং ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন সুপারিশ করে, আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষকদের দ্বারা উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা বিধেয়। তদনুসারে ঢাকা (১৯২১), আলীগড়, বেনারস ও লক্ষ্ণৌ-এ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কার্জন আরও জোর দেন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দেশীয় ভাষারও শিক্ষাদানের জন্যে এবং তাঁর চেষ্টাতেই দেশীয় ভাষাগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা কলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছি। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে এ দেশীয় সংস্কৃতির পুরাকীর্তিগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এটি তাঁর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। বিজ্ঞান শিক্ষাকে পৃথক করেন কলা বিভাগ থেকে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন। এজন্য পৃথক ট্রেনিং কলেজ খোলারও তিনি সুপারিশ করেন। এক কথায় তিনি শিক্ষাকে বহুধা বিস্তৃত পদ্ধতিতে সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

১৯১৯ সালে শিক্ষা বিভাগ এ দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত হয়। ফজলুল হক ছিলেন প্রথম বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী এবং তাঁর আগ্রহেই বাংলা প্রদেশে শিক্ষার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত, বহুজনের ভাগ্যে আরও সহজপ্রাপ্য হয়। ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেন, যার কর্তব্য ছিল সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং শিক্ষিতের বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে বাস্তবনীতির প্রবর্তন করা। কারণ এই সময়ে বিদ্বৎসমাজে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল যেহেতু এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের

www.pathagar.com

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কর্মচারীর চাহিদা মেটানো এবং তজ্জন্য সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা ছিল চাকরিলাভের প্রধান পাসপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের পরীক্ষা পাসের উপযুক্ত করে তোলা ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা দান করা।

> অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য হলো, ছাত্রদের শিক্ষার দিকে অধিক নজর দিয়ে দেশের প্রশাসনিক কার্যের ও স্বাধীনভাবে অর্থকারী পেশাতেও তাদের যোগদান করার মতো উপযুক্ত করে তোলা। আদর্শগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা চলতি শতকে ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু পুরাতন নীতি এখনও প্রধানভাবেই পালিত হচ্ছে : বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে পরীক্ষা গ্রহণ ও ছাত্রদের পাস করানো কর্মের মধ্য দিয়েই।[১৪]

প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে একনিষ্ঠ সাধকের মতো শিক্ষাচর্চারত উদার প্রশস্তমনা আত্মনির্ভর জ্ঞানী নাগরিকের জন্মদান করার উদ্দেশ্যটা আজও সদিচ্ছাতেই পর্যবসিত হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছিল এদেশে বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইংরেজের সংযমী ও বিজ্ঞানী মনটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার কোনো আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউমানিজম, কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে এ দেশীয় বিদ্বৎ সমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পেরেছে বলে মনে করার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আজাদি পূর্বযুগে সমগ্র ভারতের তুলনায় বাংলার অগ্রগতিটা বিস্ময়কর। ১৮৬৪-৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক থেকে এম. এ., আইন, ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাসের সংখ্যা ১২,৯৩২, মাদ্রাজের ও বোম্বাইয়ের সংখ্যা ৮,২০৫ জন। ১৮৮৯-৯৪ সালে ছিল কলকাতার সংখ্যা ১৮,৯৪৫, মদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ ও পাঞ্জাবের মিলিত সংখ্যা ২৮,৮৯৩ জন। ১৯২১ সালের কলেজ ছাত্রসংখ্যা ৫৯,৫৯৫ জন, তার মধ্যে ২১,৫৯৫ অর্থাৎ শতকরা ৩৬ জন বাংলার। ১৯১১-৩৯ সালে বি. এ. পাস ও ফেল সংখ্যার সমষ্টি ১৩,৫৫১ থেকে ৩,৩৮,০৯৩ জন, তার এক-তৃতীয়াংশ বাংলা প্রদেশের। ১৯২১ সালে সারা ভারতের কলেজ সংখ্যা ২৩১, তার ৪৬টি বাংলা প্রদেশে। ১৯৪০-৪১ সালে সারা ভারতের কলেজ সংখ্যা ২৫টি, ১৯৪৫-৪৬ সালে ৫৯৩টি। তখন প্রতি হাজারে একজন কলেজ ছাত্র এবং প্রায় প্রতি ১,০০,০০০ জনের ৫০ জন বি. এ.। এ সংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায়, কলেজের ছাত্রসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেলেও স্কুলের ছাত্রসংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ে নি। প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার হার অবশ্য বেড়েছে ১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকর প্রবর্তনের ফলে অধিকসংখ্যক প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপনের পর। অবশ্য উচ্চশিক্ষার হারে আনুপাতিক প্রাথমিক শিক্ষার হার বরাবরই কম, কারণ ব্রিটিশ আমলে উচ্চস্তরে শিক্ষা ছিল বরাবরই মাথাভারি।

---

১৪. Indian Statutary Com. Report.

www.pathagar.com

পেশাধারী শ্রেণীসমূহ

ইংল্যান্ডের বাণিজ্যে ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত জনসমষ্টি তথাকার শক্তিশারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদেশের বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শিক্ষিত ও বেতনভোগী ব্যক্তিরাই পেশাধারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রভাবশালী; এসব ক্ষেত্রে বাকি কর্মীরা ও শিল্পীরা গণনার মধ্যেই পড়ে না। আজাদি পূর্ব তিন দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে আইনজীবী, সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, শিক্ষক, পণ্ডিত, লেখক, সাংবাদিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বর্ধিত হয় শিক্ষা ও বিচার এবং প্রশাসনিক বিভাগসমূহের ক্ষেত্র অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন; কারিগরি ও শিল্পক্ষেত্রের প্রসারের দরুন ততটা নয়। দ্বিতীয়ত, এ বৃদ্ধিটা হয়েছিল প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে, এবং তাও চিরন্তন প্রথামতো বর্ণহিন্দু শ্রেণীর মধ্যেই।

এসব শ্রেণীর পেশাধারী ব্যক্তিরাই ছিল ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিরোমণি। যদিও বিভিন্ন জাতি থেকে এ শ্রেণী উদ্ভূত, তবু একই স্বার্থের কারণে তাদের জীবনধারা, চিন্তা ও আদর্শ ছিল এক এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও প্রগতি হয়েছিল এসব গোষ্ঠীরই স্বার্থ উন্নয়নে ও সংরক্ষণে। জোতদার ও কৃষক শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পকর্মীদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা জাগ্রত হলেও তা ছিল আঞ্চলিক ও স্থানীয়, জাতীয়তাবাদী নয়। পেশাধারী শ্রেণীরাই আঞ্চলিক ও বর্ণগত স্বার্থের উর্ধ্বে নিজেদের সমবায়ী স্বার্থরক্ষার হেতু একত্রিত ও সুগঠিত হয়েছিল এবং পরিণামে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদীরূপে বিকশিত হয়েছিল। এ শ্রেণীর বিকাশ হয় ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের পর এবং তার অগ্রগতি দ্রুত হয় ১৮৮০ সালের পর। এই শ্রেণীর বিকাশ ও প্রভাব অক্ষুণ্ন ও সর্বব্যাপী ছিল ১৯২০ সাল পর্যন্ত; তারপর বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, বাণিজ্য ও শিল্পসেবীরা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

এখানে প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, উপর্যুক্ত পেশাধারীদের সমবায়ে যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজাদিলাভের প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদীরূপে চিহ্নিত ও আখ্যায়িত হয়েছিল, তার প্রায় ষোলো আনাই ছিল বর্ণহিন্দু; দু একজন মুসলমান বা তফসিলি সম্প্রদায়ের নাম এ শ্রেণীতে উচ্চারিত হলেও তার রূপ ও রঙে, গঠন ও অবয়বে—এ দুটি সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র রেখাপাত হয় নি। আর এখানে এই বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের কথাই আলোচিত হচ্ছে, অন্যদের সম্বন্ধে নয়।

ক. সরকারি কর্মচারী

প্রথমেই ধরা যাক সরকারি কর্মচারীদের কথা। এদের বিভিন্ন বিভাগের সংখ্যা এত বেশি যে, সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য সাধারণ্যে যে তিনটি

www.pathagar.com

বিভাগের কথা সমধিক আলোচিত এবং সাধারণ দৃষ্টিতে বেশি প্রখর ঠেকে সেই তিনটি বিভাগ—যথা : বিচার, প্রশাসনিক ও পুলিশ সম্বন্ধেই আলোচনা সীমিত থাকবে।

ব্রিটিশ আমলে আমলাব্যূহ বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, সরকারি সকল কর্মই কেন্দ্রীভূত করা হয়। পূর্বে জমিদারদের, পঞ্চায়েত ও গ্রাম্য সরদারদের যা কিছু শান্তিরক্ষা, নিরাপত্তাকরণ, রাজস্ব আদায়, বিচার প্রভৃতি কর্তব্য ছিল, সেসব সরকারি বেতনভুক আমলাব্যূহের দ্বারাই নির্বাহিত হতে লাগল এবং এজন্য ক্রমে ক্রমে আমলার সংখ্যা ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কর্নওয়ালিসি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কেবল রাজস্ব বিষয়ক কর্মচারীর সংখ্যাই বাড়ে নি, দারোগা ও পুলিশের সংখ্যা বেড়েছিল, কালেক্টরদের সংখ্যা বেড়েছিল এবং মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে বিচারকের সংখ্যাও বেড়েছিল। এইরূপ সারা উনিশ শতকে বিভিন্ন আইন, রেগুলেশন ও কমিশনজনিত সরকারি কর্তব্যের সীমানা বর্ধিত হওয়ার দরুন এ তিনটি বিভাগে ক্রমাগত আমলার সংখ্যা বর্ধিত হতে থাকে। দণ্ডবিধি আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি আইনসমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে এবং হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম দ্রুতগতিতে বর্ধিত হতে থাকে। ফলে বিচারকার্যের জন্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহে বিচারকদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এমনিভাবে এ তিনটি বিভাগে আমলার সংখ্যা ১৮৫৭ সালের পর কীভাবে বর্ধিত হয়েছে, তার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া এখানে অযৌক্তিক হবে না।

১৮৫৭ সালে ৯০০ জন 'কভেনান্টেড' সর্বোচ্চ পদে ছিলেন, তাঁদের কেউ ভারতীয় নন। 'আন-কভেনান্টেড' পদে ছিলেন ৫,৯২৮, তার মধ্যে ৩,০৮২ জন ইংরেজ ও ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ২,৮৪৬ জন ভারতীয়। একশত টাকা ও তদূর্ধ্বে ছিলেন ১৮৭৩ সালে ৪,০৩৯ জন ভারতীয়।

১৯০১ সালের সালতামামিতে বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগের সর্বস্তরে ছিলেন ১০,২৪৯ জন। কার্জনের হিসাব মতে ১৯০৩ সালে পঁচাত্তর টাকা মাস-মাহিনার ঊর্ধ্বে ছিলেন ১৬,০০০ ভারতীয়। এ হিসাবে পুলিশ ধরা হয় নি। কারণ ১৯০১ সালে ৭১২৫ জন পুলিশ কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৬,০০০ সাব-ইনস্পেক্টর। ম্যাট্রিক পাস নিম্নতম মান ও পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বেতন ধরলে তখন ছিল ২৫,০০০ পুলিশ কর্মচারী।

> পরবর্তীকালে বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগে বেতনভোগী কর্মচারীর সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায় নি, কারণ তখন সরকার অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বিনা বেতনে অনারারি হিসেবে 'প্রতিপালন' করতেন। তাঁদের সংখ্যাটাও উপেক্ষণীয় নয়। নিচে সবরকম দেওয়ানি ফৌজদারি আদালতের হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেটদের সংখ্যা দেওয়া গেল শেষ দুদশকের।

www.pathagar.com

বছর	বেতনভোগী	অবৈতনিক
১৯৩১	৮,২৭১	১৮,৬০৯
১৯৪০	৬ ৪৮০	২১,৪৮৫
১৯৪৫	৭,০২০	১৮,৭০৬[১৫]

লক্ষণীয় যে, বেতনভোগী কর্মচারীদের চেয়ে অবৈতনিক সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। তার ফলে কিছুটা খরচ বাঁচানো যেত, আর সেসব শিক্ষিত ধনীরা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যাশী হতেন, তাঁদের প্রশাসন ও বিচারকর্মে অংশ দিয়েও ধন্য করা হতো।

নিচের তালিকা থেকে পরিচয় মিলবে, শেষ ষাট বছরে ব্রিটিশ সরকারের বেসামরিক পুলিশবাহিনীর কী অবস্থা ছিল :

পদের নাম	১৮৮১	১৯০১	১৯২১	১৯৩১	১৯৩৯
পুলিশ কমিশনার, আইজি, ডিআইজি	২৬	৩৪	৬৪	৬৩	৫৭
এস পি, ডি এসপি, সহকারী	৩৩০	৪৭৭	৯৮৫	৯৭২	৮৬৩
ইনসপেক্টর ও সাব-ইনসপেক্টর	১৪,৫৮২	৬,৬১৪	১৩,১২১	১৩,৬১৯	১১,৬৪৫
সার্জেন্ট, হেড কনস্টেবল	×	১৭,৬১১	২৮,০৬৬	২৫,৮২৫	২৪,৪৫৭
ঘোড়সওয়ার পুলিশ	৩,১৫৬	২,৫৮৯	২,৭৬৭	২,২৩৬	১,৩৭৬
কনস্টেবল	১,০৫,০৭২	১,১৭,৮১৯	১,৫৭,৮৫৫	১,৫৮,২৭২	১,৫০,৫৩৩

লক্ষ করা যাবে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ১৯০১ সালের পূর্বের শতকে বেশি পুলিশ প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু পরবর্তী দুদশকে প্রায় দেড়গুণ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। পুলিশ খাতে সরকারি ব্যয় ছিল ১৮৬১ সালে ২.৩৩ কোটি টাকা, ১৯৩১ সালে ছিল ১২.১৭ কোটি টাকা। এ থেকে দেখা যাবে যে, পুলিশবাহিনী আনুপাতিক হারে যত না বেড়েছে, ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে চার-পাঁচগুণ বেশি এবং এর একমাত্র কারণ হলো, ডিএসপি থেকে উপরস্থ কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে দু তিন গুণ। মাথাভারি শাসন ব্যবস্থার পরিণামই এই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল মাথাভারি নীতি, অতএব শাসনব্যবস্থায়ও মাথাভারি নীতি এসে গেছে উচ্চশিক্ষিতদের জন্যে জীবনোপায় সংস্থানের উদ্দেশ্যে। এ নীতিটির আরও উৎকৃষ্ট পরিচয় মেলে সরকারের সদর দপ্তরের মাথাভারি কর্মচারীদের সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে।

১৫. Statistical Abstracts.

www.pathagar.com

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ছিল নিঃসন্দেহে আমলাতান্ত্রিক, আমলাব্যূহের ক্ষমতা প্রচণ্ড এবং বহুনিন্দিত লালফিতার ক্ষমতা রহস্য চির অজ্ঞাত। ১৭৯৯ সালে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা যখন পূর্ণভাবে সংগঠিত হয় তখন চিফ সেক্রেটারি থেকে নিম্নতম কর্মচারীর কর্তব্যও সুনির্দিষ্ট হয়। সদর দপ্তরের কর্মসূচিপত্র পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক কর্মচারীর কর্মের এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট, কর্মধারাও কীভাবে উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরে উঠানামা করে তার নীতি পরিষ্কারভাবে বেঁধে দেওয়া।

কিন্তু লালফিতার দৌরাত্ম্য কোন স্তরে কীভাবে ক্রিয়া করতে পারে সে রহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত। কর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি, কাগজি কর্মের পদ্ধতিতে অভিনব নীতি এবং আইনঘটিত প্রশ্ন—এসব হেতুতে কোনো ফাইল ঝটিতি পরিষ্কার করার কাজে স্বভাবতই বাধা এসে পড়ে। তার পর যদি ফাইলটা একাধিক বিভাগের কর্ম সংক্রান্ত হয়, তাহলে তার ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এজন্য আমলাব্যূহের একচ্ছত্র এখতিয়ারের আধিপত্য ক্লেশকর, বিরক্তিকর ও অসহনীয় হয়ে ওঠে।

চিফ সেক্রেটারি থেকে ডেপুটি সেক্রেটারিদের এবং কমিশনার প্রভৃতি মর্যাদা সম্পন্ন পদসমূহের অত্যধিক উচ্চ বেতনও তাদের করেছিল ক্ষমতা ও মর্যাদাগর্বী। বিশেষত এসব কর্মচারীর দৃঢ় ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা শাসক, তারা প্রভু, কর্তৃপক্ষ—এদেশে ব্রিটিশ 'ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টির' প্রতিভূ, শাসন বিচার ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা কর্মের। এ বদ্ধমূল ধারণা থেকেও আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের প্রকাশ স্বাভাবিক। তার ওপর নাগরিকের জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বপ্রকার অধিকার ও দায়িত্বের—তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ, তার নিরাপত্তা, তার কথা ও কর্মের নিয়ন্ত্রণাধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি—অসি আমলাতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম পদাধিকারীও সাম্রাজ্যিক প্রতিভূরূপে বিরাজিত থাকায় আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা অপরিসীম, অচিন্তনীয়রূপেই ব্যাপক ও সর্বত্রগামী।

> আমলাতন্ত্রে বিরাজ করেছে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার মতোই কঠিন উচ্চ-নীচ প্রথাদাসত্ব। ইংরেজ অবশ্য বলেছে, আইনের চোখে সমস্ত মানুষ সমান, কিন্তু কাজের বেলায় ইংরেজ মহাব্রাহ্মণের আচরণ করেছে। বস্তুতপক্ষে ইংরেজের আগমনের ফলে এদেশের ছত্রিশ জাতের মাথার উপরে নতুন এক মহাপ্রভু জাতের পত্তন হলো, একথা বলা অন্যায় হবে না।[১৬]

এবং এই নতুন মহাপ্রভু জাতের প্রতিভূ আমলাব্যূহ। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। এই আমলাব্যূহে জাতিভেদের মতো সিঁড়ির সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু জাতিভেদের দৃষ্টান্তেই।

> আর আমলারাজ্যে শ্বেতদ্বীপবাসীদের বাদ দিলে ভারতীয় বর্ণহিন্দু জাতিরই ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য—বিশেষত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের। অতএব তাদের দ্বারাও এ প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে সৃষ্ট হয়েছে।[১৭]

---

১৬. আঠারো শো সাতান্ন—হুমায়ুন কবীর (চতুরঙ্গ ১৩৬৪ শ্রাবণ, ১২৫ পৃ.)

১৭. Misra, p 322.

www.pathagar.com

১৮৮৭ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট দেখা যায়, বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগে ১,৮৬৬ জন ভারতীয় ছিলেন; তাঁদের মধ্যে ৯০৪ ব্রাহ্মণ, ৪৫৪ কায়স্থ, ১৪৭ ক্ষেত্রী বা রাজপুত, ১১৩ জন বৈশ্য ও ১৪৬ জন শূদ্র, বাকি অন্যান্য।[১৮]

মাদ্রাজে ২৯৭ জনের মধ্যে ২০২ জন ব্রাহ্মণ এবং বোম্বাইয়ে ৩২৮ এর মধ্যে ২১১ ব্রাহ্মণ। দক্ষিণ ভারতে ছিল এই জাতিভেদের দৌরাত্ম্য আরও নির্মম ও প্রচণ্ড। ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বলা হয়েছে :

> ব্রাহ্মণরা যদিও সমগ্র জনসমষ্টির এক-ত্রয়োদশ অংশেরও কম, তবু তারা প্রতি এগারোটির আটটি পদের অধিকারী ছিল। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল বর্ণধর্মের একচ্ছত্র রাজত্ব—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং কিছু বৈশ্যরাই ছিল এখানে প্রধান। ব্রিটিশ ভারতের তামাটে আমলাতন্ত্র ছিল প্রধানত ব্রাহ্মণ্যধর্মী এবং মাত্র কয়েকটি বর্ণহিন্দু জাতির একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।[১৯]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ করা যায়, কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দরুনই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র সার্বিক শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়েছে। এবং যেসব ক্ষমতাসূত্রে এ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে স্বাধীন বিচার বিভাগের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে তীক্ষ্ণদৃষ্টির দরুন, আইন পরিষদগুলোর উৎসাহ এবং ধনতান্ত্রিকতা ও অবাধ শিল্পকর্মের আগ্রহের দরুন। প্রথমটি এদেশের মাটিতে গভীরভাবে শিকড় স্থাপন করেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রবাদবাক্যের মতোই এদেশের সাধারণ্যে সুপরিচিত। আইন পরিষদগুলো ক্ষমতার সীমানা নির্ধারণে ও তার প্রয়োগ ব্যাপারে অনিশ্চিত ও অপটু ছিল তৃতীয়টি ১৯২০ সালের পর কিছুটা উপাদন ও বিভাজন কর্মে ক্ষমতাধিকারী হয়েও আমলাব্যূহেরই শিকারে পরিণত হয়ে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। কারণ সাধারণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ কর্মে আমলাদেরই মুষ্টি আরও শক্তিশালী করা হয়—এটা অনুন্নত দেশের এক অবধারিত নীতি। কোনো শ্রমশিল্পকে জাতীয়করণ অর্থে সরকারি কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়নই বোঝায়—তার ফলে লালফিতার দৌরাত্ম্য এসে পড়ে; ফলে শিল্পটির উৎপাদন ও বিভাজন কর্ম স্বভাবতই শ্লথগতি হয়ে পড়ে। এবং উৎপাদনের ব্যয় হারও বৃদ্ধি পায়। অথচ এ দুটি শিল্পোন্নতির পক্ষে মারাত্মক। এসব দৌরাত্ম্য আইন পরিষদগুলো শক্তিশালী ও কর্তব্যনিষ্ঠ হলে দূরীভূত হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠাও তত শক্তিশালী হয় নি। ফলে এই হয়েছিল যে, জাতীয়করণের দাবিদাররাই আমলাতন্ত্রের হস্ত আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

আমলাতন্ত্র নীতিগতভাবে অন্যায়, ক্ষতিকর ও দোষের সংস্থা নয়। সরকারি কর্মনির্বাহে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল নিয়মাবলি থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং রাষ্ট্রদর্শনের নীতি অনুযায়ী আমলাব্যূহ শাসনযন্ত্রের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন,

---

১৮. Ind. Pub. Service Com . Report ,1887-9, p33.

১৯. Misra, p 323.

www.pathagar.com

যাঁরা আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করেন, তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দুষ্ট লক্ষণটার দিকে, দুষ্ট ভিত্তিমূলের দিকে নয়। একথা সত্য যে, আজকাল পদাধিকারীরা সাধারণ নাগরিকদের ভৃত্য হিসেবে নিজেদের ভাবছে না, এবং অবিবেচক দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রভু ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ছে। কিন্তু এটা আমলাতন্ত্রের দোষ নয়। এটা হলো, আধুনিক সরকারি নীতির কুফল, যার দরুন নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার-প্রয়োগ ও কর্মসমূহ নিজেরই দ্বারা সম্পাদনের ক্ষমতা সংকুচিত করা হচ্ছে এবং সরকারের উপর ক্রমশ দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে। অতএব অপরাধী আমলাব্যূহ নয়, অপরাধ বর্তমান রাষ্ট্রনীতির।[২০]

খ. আইনজীবী

ধনসম্পদের বহু বিচিত্র উৎস সন্ধান ও উন্নয়ন এবং তার দরুন আইনের বোঝা বৃদ্ধির হেতু আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রটা ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। আরও হচ্ছে ব্যক্তি অধিকার বোধ, শাসনতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের উদ্বেগ হেতু। বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্র আন্তর্জাতিক স্তরে বৃদ্ধি পাওয়াও আর একটি অন্যতম কারণ। এখানে অবশ্য এসবের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন না করে আইনজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে বিকাশের ঐতিহাসিক ধারাটাই আলোচিত হবে।

পূর্বেই দেখানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের কল্যাণে এদেশে কীভাবে উকিল শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল; কর্নওয়ালিসি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন মামলার বাজার কী ভীষণ উত্তপ্ত হয়েছিল এবং এসবের ফলে আইন ব্যবসা কত লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৮১ সালের পরিসংখ্যান চুম্বকে জানা যায়, তখন সারা ভারতের মামলা সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ, তার ৫ লক্ষ বাংলা প্রদেশেই; ১৬.৫৪ কোটি টাকা মামলার তায়দাদ, তার ৫.১৮ কোটি টাকা বাংলার। ১৯০১ সালে এই তায়দাদ উঠেছিল ২৮.৭১ কোটি টাকায় এবং তার শতকরা ৩৮ ভাগ বাংলা প্রদেশের। বিশেষজ্ঞদের মতে রায়তয়ারী বন্দোবস্তের চেয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন বেশি মামলার আবির্ভাব হয়েছিল; এজন্য জমিদার ও প্রজা উভয়পক্ষের উকিল হিসেবে তখন বাংলা প্রদেশ উকিলদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এ স্বর্গরাজ্যের জৌলুস কিছুমাত্র কমে নি সারা উনিশ শতকে ও চলতি শতকের তিন দশক ধরে। ১৯৩৩ সালে মামলার সর্বাধিক সংখ্যা উঠে ২৭ লক্ষ। তারপর মন্দা পড়ে যায় ও ১৯৩৯ সালে সংখা নেমে যায় লক্ষে। কেবল বিহারে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, সেখানে ১১২১ সালে বিহার-উড়িষ্যার যৌথভাবে সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ, কিন্তু মাত্র বিহারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৩৭ সালে ২.১৮ লক্ষ ও ১৯৪০ সালে ২.৯৬ লক্ষ। বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বৈপ্লবিক সংশোধন এবং বঙ্গীর মহাজনী আইন ও বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন প্রবর্তনের ফলে মামলার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

২০. Bureaucracy—Ludwig, pp 7 + 9.

www.pathagar.com

বাংলা প্রদেশে আইন ডিগ্রিধারীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের অনুপাতে বিস্ময়কর। ১৮৬৪-৭৩ দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল. ডিগ্রি পান ৭০৪ জন, মাদ্রাজ থেকে ৭৮ ও বোম্বাই থেকে মাত্র ৩৩ জন। পরবর্তীকালেও কলকাতার সংখ্যা অসম্ভব বর্ধিত থাকে—১৮৭৯-১৮৮৮ দশকে কলকাতার সংখ্যা ছিল ৯২৪, কিন্তু মাদ্রাজে ২৩২ ও বোম্বাইয়ে ১৫৬ জন মাত্র। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতায় দুজন বি. এ. প্রতি একজন বি. এল.; মাদ্রাজের অনুপাত ছিল প্রতি ১১ জনে মাত্র একজন এবং বোম্বাইয়ে প্রতি ৯ জনে একজন। বাংলা প্রদেশে মামলা সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আইন ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বেড়েছে : ১৮৬৪-৭৩ দশকে ৭০৪, ১৮৭৯-৮৮ দশকে ৯২৪ এবং ১৮৮৯-৯৩ সালে ৬৪২ জন। অন্যান্য প্রদেশেও সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। চলতি শতকে সারা ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যাটা ছিল এইরূপ : ১৯১২-১৩ সালে ৩,০৩৬ জন, ১৯১২ সালে ৫,২৩৪ জন এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৬,৭৪৯ জন। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা বেড়েছে আটগুণেরও বেশি। অর্থাৎ মামলার চেয়ে উকিলের সংখ্যা বেড়েছে দ্রুতহারে, ১৯৩৩ সালের পর মামলার সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু উকিল বৃদ্ধি কমে নি। তার ফলে বেকার উকিলের সংখ্যা প্রচুর ছিল আজাদি পূর্ব দশকে।

১৮৬১ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে ছিলেন ৩২ জন অ্যাডভোকেট, তাঁদের সকলেই ইংরেজ এবং ৮০ জন এটর্নি' সলিসিটরের মধ্যে মাত্র ৪ জন এদেশীয় হিন্দু। কলকাতা স্মল কজ কোর্ট ছিলেন ৫১ জন প্লিডার, তাঁদের ২৬ জন হিন্দু, ২ জন মুসলমান। ১৮৬২ সালে কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হলে আইনজীবীর সংখ্যা ছিল এরূপ :

প্রবেশ সন	অ্যাডভোকেট	উকিল (ভকিল)
১৮৭০ পর্যন্ত	১৯	৩১
১৮৭১-৮০	৬৪	৩০
১৮৮১-৯০	৬০	৪৫
১৮৯১-১৯০০	১২৬	৮৬
	২৬৯	১৯২

তাঁদের মধ্যে অ্যাডভোকেট ১৬৭ কিন্তু উকিল ১৮৯ জন। ১৯০০ সালের পর আইনজীবী প্রায় পুরোপুরি বাঙালি হিন্দু হয়ে পড়ে, সামান্য দু-একজন মুসলমান ও জনকয়েক ইংরেজ। এটর্নি সলিসিটর ছিলেন ১৯০০ সালে ১৩৫ জন, তার মধ্যে ১৩৫ বাঙালি হিন্দু। স্মল-কজ কোর্টে প্লিডার ছিলেন ১৫২ জন, তাঁদের প্রায় সকলেই হিন্দু। মুসলমান প্রায় হাইকোর্টেই আকৃষ্ট হতেন। এখানে একথাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কলিকাতা হাইকোর্টে প্রথম বাঙালি হিন্দু জজ শম্ভুনাথ

www.pathagar.com

পণ্ডিত নিযুক্ত হন ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ এবং মুসলমান জজ আমীর আলী নিযুক্ত হন ২ জানুয়ারি ১৮৯০ সালে। উনিশ শতকে হিন্দু জজ ছিলেন ৭ জন ও ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চলতি শতকে ২৭ জন; কিন্তু সারা উনিশ শতকে মুসলমান জজ মাত্র ১ জন ও চলতি শতকে ৯ জন।

বোম্বাই হাইকোর্টে ১৯০০ সালে ছিলেন ১৭৬ জন অ্যাডভোকেট ও ৩৭৪ জন উকিল; মাদ্রাজে ছিলেন ৮৬ জন অ্যাডভোকেট ও ৪৯১ জন উকিল। এটর্নি ও সলিসিটার বেশি সংখ্যায় ফরাসি ও ইঙ্গ-ভারতীয়। বোম্বাইয়ে ফরাসিদের প্রাধান্য ছিল বেশি এবং ১০৮ জন ভারতীয় অ্যাডভোকেটের মধ্যে ৫৪ জন ফরাসি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ফিরোজ মেহতা ১৮৬৮ সালে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৯২ সালে ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৯৬ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে যোগদান করেন।

মধ্যপ্রদেশে ১৯০০ সালে অ্যাডভোকেট সংখ্যা বোম্বাইয়ের সমান; কিন্তু উকিলের সংখ্যা বেশি। এ অঞ্চলে মুসলমান ঘরানা জমিদারের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি, এজন্য ভারতীয় ব্যারিস্টারদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই বেশি ছিল। ১৯০০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১০ জন ইংরেজ, ৬ জন মুসলমান ও মাত্র ১ জন হিন্দু অ্যাডভোকেট। অন্যান্য আদালতসমূহে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি, যদিও তারা মধ্যপ্রদেশে ছিল শতকরা ১৫ জন। সমস্ত সরকারি উচ্চ পদগুলোর তারা সংখ্যানুপাতে ৪ গুণেরও বেশি অধিকারী ছিল। অর্থাৎ বাংলা প্রদেশের হিন্দুর ন্যায় মধ্যপ্রদেশে মুসলমানদের অবস্থা ছিল। মধ্যপ্রদেশে মুসলমান উকিল ছিলেন কম, প্লিডার আরও কম, আর তার কারণ এই যে, সেখানে বৃহৎ বৃহৎ জমিদার অনেক থাকলেও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। সেখানে মুসলমান যারা শিক্ষা গ্রহণ করত, তারা প্রায় ইংল্যান্ডে যেত এবং শিক্ষিত অর্থে আশরাফ শ্রেণীর ব্যক্তিই বোঝাতো। বিহারের অবস্থা মধ্যপ্রদেশের অনুরূপ। এখানের মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা মধ্যপ্রদেশের চেয়েও কম। তবু ১৯০১ সালে ১৭ ব্যারিস্টারের মধ্যে ১২ জন মুসলমান ও ১ জন মাত্র হিন্দু। ১২ জন উকিলের একজনও মুসলমান ছিলেন না।

১৯০১ সালে হাইকোর্টে ব্যবসায়েরত আইনজীবীর সংখ্যা ছিল এইরূপ : বাংলায় ২৬৯ জন অ্যাডভোকেট ১৯২ জন উকিল; বোম্বাইয়ে ১৭৬ ও ৩৭৪ জন এবং মাদ্রাজে ৮৬ ও ৪৯১ জন। ১৯২১ সালে সংখ্যাটা ছিল বাংলায় ৬৪৬ ও ৪৪৩ জন, বোম্বাইয়ে ২৭৫ ও ১,০৩৩ জন এবং মাদ্রাজে ৬৩ ও ৩০০ জন। তাছাড়া ছিলেন এটর্নি ও সলিসিটার। তাঁদের অধীনে বিপুলসংখ্যক মুহুরি কাজ করত, যাদের আয় ও প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এতদ্ব্যতীত ছিল মফস্বল কোর্টসমূহের উকিল ও মোক্তারের বিপুল বাহিনী। ইংরেজ শাসনের সুবর্ণ-ফল বলা হয় 'রুল'-অফ-ল—আইনের শাসন এবং এই

www.pathagar.com

স্বর্ণফল আহরণ লোভী মক্কেলদের যাঁদের শরণাপন্ন হতে হয়, তাঁরা ইংরেজি কোর্ট কাছারিরূপ স্বর্গরাজ্যের ভাগ্যবান বাহক ও ধারক; তাঁদের সাহায্য ব্যতীত এ স্বর্ণ ফল আহৃত হয় না এবং সেজন্য যে মূল্য দিতে হয়, তার দরুন স্বর্ণফল বহুর ভাগ্যেই মরণ বাণ হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ শাসনের সৃষ্ট ভাগ্যবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আইনজীবীর স্থান প্রথম সোপানে এবং নিঃসন্দেহে হিন্দুশাস্ত্র মতে লক্ষ্মীর প্রথম সোপান।

এই বহু আকর্ষণীয়, সম্মানার্হ ও ধন-যশ-মান লাভের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তির একটি দৈন্য ও লজ্জার কথা না বলে পারি না। যে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এই মহৎ বৃত্তির আমদানি হয়েছে এ উপমহাদেশে, যে দেশে আইনশাস্ত্রকে জ্ঞানভাণ্ডারের এক বৃহত্তম শাখায় রূপায়িত করা হয়েছে, জ্ঞানসাধক হিসেবে সে দেশের জুরিস্টরা বিশ্ববন্দিত। ইংল্যান্ডে একশ্রেণীর আইনচর্চাকারী পণ্ডিত আছেন যাঁরা অর্থোপার্জন করতে কোর্টে কোর্টে ছুটাছুটি করেন না, আইনশিক্ষাকে অন্যান্য শিক্ষার মতো জ্ঞান আহরণের উচ্চতর স্তরে উন্নীত ও মর্যাদাসিক্ত করার সাধানায় মগ্ন থাকেন।

> এজন্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিশ্ববন্দিত জ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ডাইসি, পললক, আনসন, মেইন, হোল্ডস-ওয়ার্থ অকসফোর্ড থেকে এবং আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসকো পাউন্ড জুরিস্ট হিসেবে লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আড়াইশো বছরের মধ্যেও[২১]

ঠিক এই জাতের একজন জুরিস্টের আবির্ভাব হলো না কেন? আমাদের মধ্যে বহু কৃতবিদ্য যশস্বী আইনজীবী ও বিচারপতির আবির্ভাব হয়েছে, আইনক্ষেত্র থেকে এ উপমহাদেশের বিশ্ববরেণ্য জননেতা ও জনসেবকের উদ্ভব হয়েছে, তাঁদের নাম শ্রদ্ধার ও গর্বের সঙ্গে ঘরে উচ্চারিত হয়, এমনকি আইনজীবী থেকেই স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধনী ভারতের জাতির জনক আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্ত এখানেই শেষ। একটিও উপরে বর্ণিত বিশ্ববন্দিত জুরিস্টের সমকক্ষ আইনপণ্ডিতের আজও দর্শন মেলে নি। এর কারণ বোধ হয় এই, বিদেশি মাটির আইনশাস্ত্রটা এদেশের মাটিতে জ্ঞানের মহৎ-শাখা হিসেবে বিকশিত হওয়ার জলবায়ু পায় নি, কেবলমাত্র অর্থকরী পেশার পর্যায়েই তার স্থান নির্দেশিত হয়েছে।

গ. অন্যান্য বৃত্তি

> বিদ্বৎসমাজের অন্যান্য অর্থকরী বৃত্তির মধ্যে ডাক্তারি, শিক্ষকতা ও ইঞ্জিনিয়ারিই উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে ডাক্তারিই প্রধান এবং আইনের পরেই এর স্থাননির্দেশ করা চলে। নিচের তালিকা থেকে এসব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা মিলবে :

২১. কলকাতায় Mayor's Court স্থাপিত হয়েছিল ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

www.pathagar.com

বছর	চিকিৎসা		শিক্ষকতা		ইঞ্জিনিয়ারিং	
	কলেজ	ছাত্র	কলেজ	ছাত্র	কলেজ	ছাত্র
১৯১১-১২	৪	১৩৯৬	১২	৫৫২	৪	১১৮৭
১৯২১-২২	৮	৪০৬৫	২০	১২৪৭	৫	১৪৪৩
১৯৩১-৩২	১১	৪২০১	২৩	১৫৮২	৭	২১৭১
১৯৩৯-৪০	১২	৫৬৪০	২৫	২২২৯	৭	২৫০৯[২২]

এই তালিকাটি আইন-ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো যেতে পারে :

বছর	আইন-ছাত্র	চিকিৎসা-শিক্ষকতা-ইঞ্জিনিয়ারিং
১৯১১-১২	৩০৩৬	৩১৩৫
১৯২১-২২	৫২৩৪	৬৭৫৫
১৯৩১-৩২	৭১৫১	৭৯৫৪
১৯৩৯-৪০	৬৭৪৯	১০৩৭৪

লক্ষণীয় যে, চিকিৎসার ছাত্র যে পরিমাণে বেড়েছে, শিক্ষকতা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সে পরিমাণে বাড়ে নি, আবার একা আইনের ছাত্র অন্য তিনটির প্রায় সমান। শিক্ষকতার ট্রেনিং স্কুল সবচেয়ে বেড়েছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা মোটেই বাড়ে নি। এদেশে শিক্ষকতা সবচেয়ে আকর্ষণবিহীন পেশা, বেতন কম, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই বললেই চলে। সরকার দেয় না শিক্ষকদের মান মর্যাদা, জনসাধারণ করে না শ্রদ্ধা। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররা প্রথমে শিক্ষকতায় প্রবেশ করলেও পরে প্রশাসনিক চাকরিতে বা আইন ব্যবসায়ে চলে যায়। আইনের মতো চিকিৎসাক্ষেত্রেও একটি মর্মান্তিক দৈন্যের ও লজ্জার কথা না বলে পারি না। একবার রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন,

> আমরা কি চিরদিনই ইউরোপের নিকট ঋণী থাকব? চিরকালই কি তাদের ভিক্ষা চাইব? আমাদের সৃষ্টি করা কিছুই কি বিশ্বজগৎকে দিতে পারব না? আমাদের দেশে অনেক উচ্চশিক্ষিত এলোপ্যাথিক ডাক্তার আছেন যাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন, অথচ তাঁরা কেহই একটি নতুন ঔষধ বের করতে পারেন নাই, ক্ষ্যাপা কুকুরে কাটার ঔষধ, ডিপথেরিয়ার ঔষধ ইত্যাদি সব সাহেবেরা গবেষণা করে বের করেছেন, জগৎকে দিয়েছেন। আমরা কোনো ব্যারামেরই বিশ্ব-মানবের গ্রহণযোগ্য ঔষধ আবিষ্কার করতে পারি নি।

রবীন্দ্রনাথের এ মর্মান্তিক ক্ষোভ ও দুঃখের আজও প্রশমন হয় নি। আজও ভারতীয় উপমহাদেশের চিকিৎসকরা পাশ্চাত্য ঔষধের ক্যানভাসার বা দালালের ভূমিকাই পালন করে জীবন ধন্য করছেন। আপন সৃষ্টির মহিমায় জগৎকে উপকৃত করার গৌরব তাঁদের আজও হয় নি।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত চিকিৎসার পিছনে ছিল যন্ত্রবিদ ও কারিগরি বিশারদরা। বর্তমানে অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরিতে ভীষণ আকর্ষণ। এসব কলেজে

২২. Statistical Abstracts for Relevant years.

www.pathagar.com

প্রবেশলাভে অসমর্থ হলে ছাত্ররা ডাক্তারি কলেজে যায়। সেখানেও স্থান না পেলে বি. এ., বি. এসসি. পড়তে যায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই। অর্থকরী বিদ্যার দিকে আকর্ষণ এত বেশি হবার একমাত্র কারণ হলো, অর্থোপার্জনই শিক্ষালাভের মূল লক্ষ্য। অতএব যেসব বিদ্যায় সহজে চাকরি মেলে বা অর্থাগম সহজ, সেদিকেই ছাত্ররা ধাবিত হয়। এ লক্ষণটি আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে বর্তমান শিক্ষা শতকের দু-তিন দশক থেকেই; বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির ফলে বাণিজ্যিক ও শিল্প-প্রশাসন সম্পর্কিত জ্ঞানলাভেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্য বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে। বর্তমানে এ দুটি বিষয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনক্ষেত্রেও সাধারণের স্বার্থ ও তজ্জনিত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং তার দরুন এ সম্বন্ধে উচ্চস্তরের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে করা হয়েছে। এদিকেও ছাত্র সমাজের আকর্ষণ কম নয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত

ক.

পূর্বের আলোচনা থেকে একথাটি পরিচ্ছন্ন হয়েছে যে, এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যিক গরজে, ইংরেজ শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে। আপন জন্মসূত্রের সম্বন্ধে এ শ্রেণীর কোনো সংশয় ছিল না। তারা ইংরেজের শাসনকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে। এবং তাদের কর্মে ও আচরণে এমন একটি সঙ্গতি লক্ষ করা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিন দশক থেকে মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ হলেও এবং এই শতকের শেষের দিকে স্বদেশ ও স্বজাতির হিত চিন্তায় তাদের মন বিচলিত থাকলেও ইংরেজের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন তখনও দেখার কথা তারা চিন্তা করতে পারে নি। তার দরুন তাদের আচরণে এবং রাজনৈতিক ব্যবহারে এমন একটা আপাত অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধ লক্ষ করা যায়, যা সত্যিই হাস্যকর। এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এ বক্তব্য সুপরিস্ফুট হবে।

> রাজা রামমোহনের কণ্ঠ থেকে বিশ্ব জনগণের স্বাধীনতার নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল বারেবারে, অথচ তিনিই অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের পক্ষাবলম্বন করে জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'নীলকর সাহেবরা কোথাও কোথাও অল্পবিস্তর অন্যায় করে থাকতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণভাবে অন্যান্য ইউরোপীয় অপেক্ষা তারাই এদেশীয় জনসাধারণের অধিকতর উপকার সাধন করেছে'।[২৩]

---

২৩. Asiatic Journal, June 1830.

www.pathagar.com

দ্বারিকানাথ ঠাকুর একটি জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার এদেশি জনসাধারণের সমস্তই হরণ করেছে, তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের সম্পত্তি সমস্তই আজ সরকারের করুণানির্ভর। অথচ তিনিই ইংরেজ সমাজের সমর্থন করে ইংরেজের বিচারে ভারতীয় বিচারপতির অধিকারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।[২৪]

'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' কলকাতার দেশীয় জমিদারদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি অবিচলিত আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরের বিভীষিকাময় অত্যাচার সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেও গ্রন্থটির ভূমিকায় মহারানীর এবং নতুন ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের ন্যায়নিষ্ঠার ওপর আস্থা স্থাপন করে ব্রিটিশ সুশাসন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'নীলদর্পণ' সংক্রান্ত বিচারে আসামি লঙ সাহেবের জরিমানার এক হাজার টাকা বন্ধুবাৎসল্যে নিজ পকেট থেকে দিয়েছিলেন, অথচ স্বরচিত মহাভারতখানা মহারানীর 'শ্রীপাদপদ্মে' উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন। 'বেঙ্গল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১) পার্লামেন্টের নিকট আবেদনে নিজেদের প্রচার করেছেন 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তার সেফটি ভাল্ব'। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিজাতীয় ভাবধারার নিন্দা করলেও ইংরেজের অধীনতায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রজার পক্ষে ক্ষতিকর বলেও তা রদ করতে চান নি, পাছে ইংরেজরা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়ীসন্তানদের চিকিৎসা করিয়ে তিনি ইংরেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বিধাতার মঙ্গলদূত হিসেবে। শিশিরকুমার ঘোষ বারবার বলেছেন, 'আমরা যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার দাবি করছি তা কেবলমাত্র ইংরেজের ভার লাঘবের জন্যে।'

১৮৯৭ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট 'জাতীয় কংগ্রেস'-এর মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, 'ইংরেজরা এত উদার যে, ইংরেজি ভাষার দাসত্ব সম্বন্ধে কাউকে বুঝানো যায় না।'[২৫]

এ স্ববিরোধী আচরণ যে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান প্রণোদিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। কীভাবে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা এদেশে চিরস্থায়ী হয়, অথচ কোন পথে প্রাগ্রসর নবসৃষ্ট ভারতীয় সমাজের সঙ্গে এই শাসনব্যবস্থার যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়, কীভাবে এ সমাজ ইংরেজের শাস্ত্রসম্মত নাগরিক ও সামাজিক অধিকারাদি ভোগ করতে পারে ও কীভাবে শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইংল্যান্ডের মতো উন্নত ও গর্বিত হতে পারে, এবং তার ফলশ্রুতিতে ক্রমে ক্রমে যে ভারতের আবির্ভাব হবে, সেই ভারত কখনো ইংল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে চাইবে না, বরং পারস্পরিক স্বার্থবোধ সেই সম্পর্ককে চিরকাল অটুট রাখবে—এই ছিল রামমোহন প্রমুখ তৎকালীন নবসৃষ্ট সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্যন্তিক চিন্তা ও ধ্যানধারণা।[২৬]

---

২৪. History of Political Thought, p. 175.
২৫. উনিবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১৩৪-৩৫ পৃ.।
২৬. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১৫-১৬ পৃ.।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবধারা থেকেও এ সিদ্ধান্ত করতে হয়, তৎকালীন ইংরেজ রাজনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় নি। হয়তো বন্ধনটি ক্ষীণ হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এই বন্ধন সূত্রটি অবলম্বন করে মধ্যবিত্ত সমাজ তখনও সুখস্বপ্ন রচনা করত। ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাই এ সমাজকে ইংরেজের নিশ্চিত আশ্রয়ে থেকে কল্যাণ লাভের আশায় উদ্দীপ্ত করেছিল।

> "তৎকালীন সামাজিক আলোড়ন থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিদের চিন্তায়, রাজনৈতিক কর্মে ও আদর্শে, সামাজিক আচরণের একটা বৈপরীত্য অন্তর্বিরোধ ও গলদ দেখতে পাওয়া যায়। একই নিশ্বাসে তাদের পক্ষে ভারতবর্ষের জন্যে দুঃখ ও ইংরেজের জয়গান করাও সম্ভব হয়েছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেও ইংরেজই রাজা হবে বলে বিজয়ের গৌরব বিসর্জন দিতে হয়েছে"।[২৭]

বস্তুত ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনোরূপ মৌলিক বিরোধ ছিল না। বিরোধ উপস্থিত হলো তখন, যখন ইংরেজ প্রবর্তিত রাষ্ট্রশাসন কর্মে এ শ্রেণী অংশ দাবি করল নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে, এবং যে শাসনব্যবস্থায় এদেশের ধনসম্পদ শোষণ করে সাগরপারে চালান হতো, সেই শাসনযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও দাবি করল শোষণ কর্মের লভ্যাংশ। ইংরেজের প্রতি আকর্ষণের ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল নিখুঁত ব্যবহারিক জ্ঞান। ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক আচরণ কর্তৃক যা কিছু অনুমোদিত, সে সবই শুভদ ও আচরণীয়, যা ইংরেজের অনুমোদিত নয় তা সুস্থ ব্যবহারিক ও সমাজ ধর্মের বহির্ভূত এ ধারণা দৃঢ়তর করে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় জনশিক্ষা ছিল না; সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে যে নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং যারা শাসক ও শাসিত তথা শোষিতের মধ্যবর্তী নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তাদের ও তাদের সন্তানদের জন্যেই হয়েছিল ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন। এই শিক্ষার ফলে বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত ও এদেশীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষাগত জাতিভেদ দেখা যায়, ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

> তার দরুন এবং শাসককুলের সঙ্গে একীভূত করে নিজেদের ভাবতে শিক্ষার দরুন আরও একটা চেতনা নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে— দেশীয় জনসাধারণের শাসন ও শোষণকার্যে তারাও ইংরেজদের ন্যায্য অংশীদার।[২৮]

অর্থাৎ এ সেই অতি প্রচলিত কাহিনী–সুচতুর বানরের সঙ্গে তস্কর বিড়ালের পিঠাভাগের ঝগড়া।

এ বিরোধের উদ্ভব হয় যেসব কারণে, সেগুলো শাসননীতির ফলে কালপ্রবাহে স্বতই উত্থিত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল, সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে, তাদের

---

২৭. ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১৩২ পৃ.।
২৮. বঙ্কিম মানস, ২৯ পৃ.।

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবাদর্শ এ সীমানা অতিক্রম করে বিস্তৃতি লাভ করুক, কর্তৃপক্ষের এটা কখনো কাম্য ছিল না। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যই এই যে, সৃষ্টিও অনেক সময় স্রষ্টনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, কালের অদৃশ্য প্রভাবে ও প্রকৃতির প্রভাবের দরুন অলক্ষ্যে সৃষ্টিরও রূপান্তর হয়ে যায়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল শুধুমাত্র ইংরেজ শাসকের তাঁবেদারি করার জন্যে, সেই শ্রেণীর মধ্যেও প্রকৃতি অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। যে 'ইয়ং বেঙ্গল' উদ্ভব হয়েছিল ইংরেজের সাহচর্যে, তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা বাদ দিলে একটি উজ্জ্বল দিকও ছিল। মিল-বেন্থামের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, ডিরোজিও-এর মহৎ শিক্ষা "Think for Themselves" দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হয়ে এই নব্য শিক্ষিতদের মন-মানসও পরিবর্তিত হচ্ছিল, আত্মচেতনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল। তার ফলে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করছিল, এবং শাসক ও শোষিতের মধ্যে শুধুমাত্র সেতুবন্ধনের কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে সেতু নির্মাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই দাবি জানাচ্ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই মস্তকোত্তলনের মনোবৃত্তিটা সহ্য করতে পারে নি। প্রথম যুগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট এই নব্যশ্রেণীর যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, কালপ্রবাহে সে প্রয়োজনীয়তাও কমে আসার দরুন উৎসাহ ও অনুগ্রহ দানের মাত্রাও কমে যাচ্ছিল। তখন ব্রিটিশরা নতুনতর বশংবদের সন্ধান করছিল। তারা তখন চিন্তা করছিল, পুরাতন আমলের অভিজাত শ্রেণীকে কোল দিয়ে শাসনকর্মে অংশদান করবে ও তাদের সহানুভূতি লাভ করবে। এলফিনিস্টোন বোম্বাইয়ে এই নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছিলেন; ম্যালকম বাংলা প্রদেশেও এরূপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন; ডালহৌসি তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অভিজাত শ্রেণীর মধ্য থেকেই সভ্য মনোনীত করতে আগ্রহী ছিলেন; হেনরি লরেন্স সমস্ত উদ্যম ব্যয় করেছিলেন শিখ সরদারদের পুনর্গঠনের কর্মে; ক্যানিংও ১৮৬২ সালে এই শ্রেণী থেকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত করেছিলেন এবং লিটন এ শ্রেণী থেকেই 'স্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস'-এ নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারও প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তাছাড়া নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, উপযুক্ততা ও কর্মকুশলতার সঙ্গে প্রাচীন বিধ্বস্ত অভিজাত শ্রেণীর তুলনাই হয় না।

> অন্যপক্ষে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন নিজেদের অধিকার ও দাবিদাওয়া সম্বন্ধে সোচ্চার ছিল এবং তাদের প্রবল কণ্ঠে যে অসন্তোষ ও তিক্ততার সুর ছিল, তার কিছুটা আভাস মেলে লর্ড কার্জনের উক্তি থেকে; তিনি এ মনোবৃত্তি ও স্বভাবকেই দোষ দিয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বিনীত, অসন্তুষ্ট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজদ্রোহী বলেও।[২৯]

আরও একটি কারণ ছিল, শিক্ষিত সমাজের বেকার-বৃদ্ধি এবং তদহেতু শাসকশ্রেণীর প্রতি অসন্তোষ। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হলে শিক্ষিতের সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বি-এ পাস ও ফেল সকলরই

২৯. Curzon in India, pp 315-16 :

www.pathagar.com

সমান অবস্থা দাঁড়ায়। সরকারি চাহিদার অনুপাতে উচ্চপদাভিলাষী শিক্ষিত এ দেশীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আরও একটি কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য। আঠারো শ-সাতান্নর পূর্ব-যুগে এ ক্ষেত্রটি ছিল হিন্দুদের পুরোপুরি একচেটিয়া। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা নীতি পরিবর্তন করে ইংরেজি শিক্ষা করতে ও ইংরেজের সহযোগিতা করতে থাকে। তখন চাকরি ক্ষেত্রেও নতুন মুখের আবির্ভাবে বর্ণহিন্দুরা আরও অসহায়তা বোধ করছিল। অবশ্য এ অবস্থাটা দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য হয় উনিশ শতকের শেষ পাদে। যাহোক, সরকার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য কিছুটা বিচলিত হতে আরম্ভ করে। ইংরেজ বিদ্বেষী হিসেবে দুজন প্রখ্যাত বর্ণহিন্দুর দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বহু আয়াস স্বীকার করে আই সি এস হন, কিন্তু ১৮৭৪ সালে তুচ্ছ কারণে চাকরি থেকে বিতাড়িত হন। বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ইংল্যান্ডে আই সি এস প্রতিযোগিতায় সফল হয়েও চাকরি পান নি অশ্বারোহণে অক্ষমতার অজুহাতে। সে আমলে ভারতকে বলা হতো, 'কমনওয়েলথ অব ম্যাজিস্ট্রেটস' আর আই সি এস চাকরি ছিল 'হেভেন-বর্ণ-সার্ভিস।'

> এ চাকরিতে নিযুক্ত থাকলে সর্বভারতীয় অনমনীয় জননেতা ও 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতা' হিসেবে সুরেন্দ্রনাথের কিংবা 'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের সাগ্নিক বীর' হিসেবে বোমারু বারনি ঘোষের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করতেন না; গভর্নমেন্টের অতি বশংবদ বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবেই তাঁদের জীবননাট্য অভিনীত ও পরিচিত হতো।[৩০]

অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরকারি বাঁধাচাকরি লাভের ব্যর্থপ্রয়াসের হেতু ছিল ইংরেজদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের মূলীভূত কারণ।

খ.

উনিশ শতকের আট-নয় দশক থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিপত্তি বর্ধিত হতে থাকে। ১৮৭০ সালের পর এবং পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় দুটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ প্রতিপত্তি আরও তীব্র হয়।

অবশ্য তীব্রতর হয় বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই ।এবং এর কারণটা ছিল মূলত অর্থনৈতিক। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ভূমির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে বর্ণহিন্দু শ্রেণী শিক্ষালাভ ও চাকরির মধ্যেই জীবনোপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এবং অকৃতকার্যতা হেতু সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছিল।

> এই শিক্ষিত বেকার শ্রেণীকে ১৮৯০-৯১ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'প্রফেশনাল এজিটেটর'; তারা ক্ষুধার্ত ও অসন্তুষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ক্রমেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩১]

---

৩০. 'অগ্নিবীণা'র উৎসর্গপত্র—নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

৩১. Administrative Report, 1890-91.

www.pathagar.com

এদেরকেই লক্ষ করে ডাফরিন বলেছিলেন, 'বাবু পলিটিশিয়ান।' তিনি নর্থব্রুককে এক গোপনপত্রে লিখেছিলেন :

> উপসংহারে আমি নির্ভয়ে বলতে চাই, বাঙালা প্রেস ও আপনার 'বাবু রাজনীতিকরা' তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা অকালপক্বতা ও একগুঁয়েমির জন্যে যতই উপদ্রব সৃষ্টি করুক না, বর্তমানে তাদের প্রভাব বিস্তৃত ও বিপজ্জনক নয়। এই ভারতীয় 'ককাসরা' যতই চেঁচামেচি করুক, এবং ইংল্যান্ডে যতই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে নিজেদের জাহির করুক, বর্তমানের তাদের প্রভাব কিছু মাত্র নেই। তবে একথা বলা যায় না যে, এই অংকুর থেকে শক্তিশালী মহীরুহ জন্মাবে না।[৩২]

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই আন্দোলনের কারণ ছিল ইংল্যান্ডীয় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আইনসভায় নির্বাচন হলে তারাই পরে প্রচারযন্ত্রের বলে সবকটা আসন অধিকার করবে এবং চাকরিতে প্রতিযোগিতা বলে তাদের মধ্যে থেকে প্রার্থী গৃহীত হবে। তখন নীতি ছিল ভূম্যাধিকারের ও বংশকৌলিন্যের ভিত্তিতে আইনসভায় মনোনয়ন দেওয়া এবং মনোনয়ন ভিত্তিতে চাকরিদান করা। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দাবিদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জোর আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই বছরেই বিলেতে আই সি এস প্রার্থীদের নিম্নতম বয়স ২১ বছর থেকে হ্রাস করে ১৯ বছর ধার্য করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, তার ফলে ভারতীয় প্রার্থীরা কম সুযোগ পাবে। সুরেন্দ্রনাথ এটিকে সদ্যলব্ধ মহাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সর্বভারতীয় তুমুল আন্দোলন শুরু করে দেন।

আরও একটি উপায়ে 'কভেনান্টেড' চাকরিতে বাঙালি বর্ণহিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের চেষ্ট করা হয়। ১৮৬৭ সালে লরেন্স ভারতসচিবকে জানান, 'ভারতীয়দের উচ্চ পদসমূহ থেকে বর্জন করাই হচ্ছে আমাদের আইন কর্তাদের পরিষ্কার নীতি। এটা হচ্ছে রাষ্ট্রিক প্রশ্ন'। তিনি আরও বলেছিলেন,

> নীতিগতভাবে এর পরিবর্তন আপত্তিজনক। আমরা অস্ত্রবলেই ভারত জয় করেছি, যদিও আমাদের নীতি ও উত্তম সরকার তার পক্ষে সহায়ক হয়েছে আর এরূপেই আমরা ভারতকে পদানত রাখব। ইংরেজরা সব সময়েই পুরোভাগে থাকবে সম্মান ও মর্যাদার স্থান দখল করে, কারণ এটাই হবে আমাদের শাসন অব্যাহত রাখার প্রধান উপায়।[৩৩]

লরেন্স বাঙালি হিন্দু গ্রহণ নীতির ভীষণ বিরোধী ছিলেন। কারণ 'বাঙালিরাই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগটা উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করেছে।' তিনি বাঙালির 'বীরত্ব' ও 'আত্মনির্ভরতা' সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

> এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, 'পাঞ্জাবি ও অন্যান্য বীর্যবান গোত্রসমূহ ইংরেজের চেয়ে বাঙালি অধীনে আর চাকরি করতে ইচ্ছুক নয়'।[৩৪]

---

৩২. Quoted by Misra, 348.
৩৩. I. O. Lawrance Papers, iv.
৩৪. Sels. from Des. to India, 8 April 1869.

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নীতি ব্যর্থ করতে এবং বাঙালিদের বর্জন করার উদ্দেশ্যে ভারতসচিব ১৮৬৯ সালে পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করেন ও পর বছর সেটি আইনে পরিণত হয়। এই আইনবলে ভারতসচিবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভাইসরয় নিয়ম করতে পারতেন কভেনান্টেড চাকরিতে ভারতীয়কে মনোনয়ন করতে। তখন ভারতসচিব পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন,

> প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাঠান ও শিখের চেয়ে বাঙালি বেশি সুযোগ পায়। কলিকাতার কলেজে পাস করা একজন ছাত্রকে উত্তর ভারতে যুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলোর উপরে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক নীতি হবে। ভারত সরকার উত্তর-ভারতের তালুকদারদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবেন শিক্ষায় পাসের কথাটা যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা না করে।[৩৫]

এরই নাম ছিল 'স্টাট্যুটারি সিভিল সার্ভিস'। আট বছর পর তার নিয়মাবলি রচিত হলো 'নিছক নেটিভ সিভিল সার্ভিস' হিসেবে; কতকগুলো বশংবদ ভারতীয়দের রাজনৈতিক গরজে উচ্চপদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হলেও তার বেতনের হার ছিল কম, এবং নিম্নমানের পদসমূহেই এ নিয়মে নিযুক্ত কর্মচারীদের বহাল রাখা হতো। আইনটির অবশ্য একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিল—শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দুদের বাদ দিয়ে উচ্চপদে এদেশীয় নিয়োগ করা। সুরেন্দ্র ব্যানার্জী এই আইনের বিরুদ্ধেও তুমুল প্রতিবাদ করেন। ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৮৮৬-৮৭ সালে স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস বিলুপ্ত হয়। অবশ্য আই সি এস পরীক্ষা ও নিয়োগ ইংল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকায় ভারতীয়দের পক্ষে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল। ১৯৩২ সালে ভারতেও পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

> ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের নীতি থাকলেও ইংরেজরা প্রথা হিসেবেও এদেশীয়দের উনিশ শতকে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করে নি, কারণ তখন সরকারি উচ্চপদসমূহ একটা ভিন্ন জাতের মতো বিবেচিত হতো, যা আকবর বাদশাহের মনসবদারির চেয়েও ছিল উন্নত ও সুসংবদ্ধ'।[৩৬]

গ.

১৮৯২ সালের 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন' প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে রইসরা অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীই রাজনীতিতে একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন। ১৮৫১ সালে কলকাতায় যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়, তার সকল সভ্যই ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক আমলের সদ্যসৃষ্ট জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ভারতীয়রা এবং এটি ছিল জমিদার, ব্যবসায়ী ও উচ্চবৃত্তিধারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের দুর্গ। ১৮৯৫ সালে বাংলার বড়লাট ম্যাকেঞ্জি এই সমিতি সম্বন্ধে বলেছিলেন :

৩৫. Ibid, para 7-9.
৩৬. A Sketch of the Hist. of India (1925), p 209.

www.pathagar.com

আমি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে ভারতে শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসেবে লক্ষ করে আসছি, এটির মারফতে বাংলার 'রইস' বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশিত হয়। যখনই ভারত সম্বন্ধে কোনো নীতির বিষয় বিবেচিত হয় তখন এখানে দেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত ব্যক্ত হয়। পৃথিবীর অন্য কোনোখানে এটির মতো আধুনিক গণতান্ত্রিক মেজাজ জন্মায় নি এবং এর মতো বিপজ্জনক প্রবণতাও অন্য কোথাও নেই। এজন্য এই সংস্থাটির প্রাধান্য বর্ধিত হয়েছে।

এই সমিতির সভ্যরাই আইনসভার সভ্য হতেন। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত এ সমিতির ৩৫ জন সভ্য বঙ্গীয় বিধানসভার সভ্য হয়েছিলেন এবং তাঁরাই দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও বৃত্তি বিষয়ক স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে ঠাকুর-বংশই ছিল অগ্রগণ্য—বিশাল জমিদারি, বিপুল ব্যবসায় ও অফুরন্ত ধনসম্পদের অধিকারী হিসেবে এ বংশটির ঐতিহ্যে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা মুখরিত। প্রিন্স দ্বারিকানাথের ভ্রাতা মহারাজ রামনাথ ঠাকুর এই সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন দশ বছর এবং ১৮৬৬ সালে বঙ্গীয় বিধানসভার ও ১৮৭৩ সালে ভারতীয় বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত হন। ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী নেতা হিসেবে এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সভ্য হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সরকারি ও অন্যান্য সূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও ১৮৬৩ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার সভ্য হন। মহারাজা বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় বিধানসভার ও ১৮৭৭ সালে ভারত বিধানসভার সভ্য হন। সামান্য বেনেনন্দন রামগোপাল ঘোষ বাণিজ্য লব্ধ অর্থবলে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষাসভার ১৮৪৫ সালে ও বঙ্গীয় বিধানসভার ১৮৬২ সালে সভ্য হন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উপর্যুক্ত অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সভ্য এবং ব্রিটিশ সাহায্য ও অনুগ্রহ-ধন্য কলিকাতার নব্য 'রইস'।

আরও উল্লেখযোগ্য, এই অ্যাসোসিয়েশনের ৩৫ জন বিধানসভার সভ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। তাঁদের সকলেরই আর্থিক উৎস ছিল জমিদারির আয়, আর এজন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন জমিদারি-স্বার্থের উগ্রতম ধারক ও বাহক। প্রজাকে বঞ্চিত করে জমির উপস্বত্ব ভোগের নামে সর্বস্বত্ব ভোগের উপাসক সম্প্রদায়। তাঁদের সকলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিহারের বৃহত্তম জমিদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। তিনিও ছিলেন বঙ্গীয় বিধানসভার সভ্য।

দেশের বিধানসভায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে এসব জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর ভূমিকা কীরূপ ছিল, একটি দৃষ্টান্তে তা বিশদ করা যেতে পারে। ১৮৮২ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'বেঙ্গল রেন্ট বিল' বিধানসভায় উপস্থাপিত হয়। তার মধ্যে প্রজার স্বার্থরক্ষার্থে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা ছিল : কোনো স্থিতিবান রায়ত বারো বছর কোনো গ্রামের জমি কর্ষক থাকলে তার স্বত্ব স্থায়ী হবে ও হস্তান্তরযোগ্য হবে; কেউ জমির প্রজা থাকলে তাকে আইনের চক্ষে স্থায়ী প্রজা ধরা হবে, অপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত; জমিদার ও প্রজার মধ্যে পূর্বের চুক্তিসমূহ বাতিল

www.pathagar.com

গণ্য হবে; অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ হলে প্রজা জমিদারের নিকট ক্ষতিপূরণ পাবে, দখলি স্বত্বের প্রজাকে ইচ্ছামতো উচ্ছেদ করা যাবে না; কোনো জমির খাজনা উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশের উর্ধ্বে কখনই বর্ধিত হবে না। বলাবাহুল্য, এসব প্রস্তাবিত বিধানের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণী প্রচণ্ড প্রতিবাদ তোলেন ও সব শক্তি নিয়োগ করেন বিলটি প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে। সিলেক্ট কমিটি ৬৪ দিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে দৈনিক চার ঘণ্টা বিলটি আলোচনা করে। প্রত্যক্ষভাবেই জমিদার পার্টি বিলটির বিরুদ্ধতা করে। এই জমিদার পার্টির বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, বাবু পিয়ারীমোহন ঘোষ, রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মন্দালিক ও সৈয়দ আমীর আলী। শেষোক্ত তিনজন সভ্য ছিলেন আইনজীবী। পিয়ারীমোহন ও আমীর আলী ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। আশ্চর্য এই যে, দুর্ভাগ্য প্রজাদের পক্ষে—যারাই ছিল এ বিলের প্রধান উদ্দিষ্ট এবং যাদের জীবনমরণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—কেউ-ই ছিল না এদেশীয় সভ্যদের মধ্যে। অতএব হ্যামলেটকেই বাদ দিয়ে বিধানসভার পূর্ণ অভিনয় চলল বহুদিবসব্যাপী তীব্র তর্ক কোলাহলের মধ্যে। সরকারপক্ষের স্যার বেইলি, হান্টার, গিবন প্রমুখ বিলের পক্ষে ছিলেন। এই অসম অপূর্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাইসরয় সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন :

> আমার ভয় হয়, জমিদারদের স্বার্থে বহু সংশোধনের প্রস্তাব থাকলেও আমার মাননীয় সহযোগীরা অস্বস্তিবোধ করেছেন, যদিও জমিদারদের বিশেষ স্বার্থহানি ঘটে নি। অন্যপক্ষে তাঁরাই জোর গলায় প্রতিবাদে বলছেন, বিলের দ্বারা উপযুক্তভাবে রায়তকে রক্ষা করা হয় নি।[৩৭]

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও বাবু পিয়ারী মোহন বিলটি স্থগিত রাখার সুপারিশ করেন এবং এ চেষ্টায় অকৃতকার্য হলে তাঁদের দলভুক্ত সকলে বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেন। তবু এটি পাস হয়ে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫' নামে বিধিবদ্ধ হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন উকিল ও পরবর্তী জীবনে 'স্যার' উপাধিতে ধন্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জীও বিলটির বিরুদ্ধতা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় জমিদার কমিটির পক্ষে তিনি An Examination of the Principles and Policy of the Bengal Tenancy Bill–নামাঙ্কিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এ অভিমত প্রকাশ করেন, '১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার ভূম্যাধিকারীদের যে চরম স্বত্ব দেওয়া হয়েছিল, বিলটি সেসবের চরম পরিপন্থী'।

> বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন : আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের

---

৩৭. Misra, pp. 344-47.

www.pathagar.com

অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমন কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদেরকে দিই না। যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।[৩৮]

বস্তুত প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রেণী ও শিক্ষিত বর্ণহিন্দু শ্রেণী তখন এভাবে নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে এরূপ অন্ধ হয়ে জনপ্রতিধিত্বের চিৎকার তুলে জনস্বার্থ পদদলিত করছিলেন যে, সরকার বিধানসভার সম্প্রসারণ করতেও ইতস্তত মনা ছিল। কারণ দেশস্বার্থ ও দেশের প্রতিনিধিত্ব বলতে এসব শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ও নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চাইত না। এজন্য সরকারের এ আশঙ্কাও ছিল, বিধানসভার সম্প্রসারণ করলেও এসব শ্রেণীর লোকেরই সমাগম হবে বেশি এবং তাদের দ্বারা জনগণের স্বার্থ আরও বিঘ্নিত হবে। বিধানসভার সম্প্রসারণের প্রশ্নে ডাফরিন ১৮৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতসচিবকে যা লিখেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য :

এ কাজ করা সম্ভব হলে অবশ্য অতি উত্তম হতো। কিন্তু আমি যতই এসব ব্যক্তিদের দেখছি, ততই দেশের সর্বাঙ্গীণ সুবিধা ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আস্থাহীন হচ্ছি। যারা প্রকৃত উত্তম ব্যক্তি, তাদের পাওয়া দুষ্কর, এবং পাওয়া গেলেও তারা সংখ্যায়ও এত কম যে, তাদের দিয়ে বৃহৎ বৃহৎ আইন প্রণয়ন কর্ম সমাধা করা সম্ভব নয়। সরকার অবশ্য জনসাধারণের উন্নতি বিধায়ক কর্মে আগ্রহশীল, কিন্তু আমরা আমাদের সব চেষ্টায় এসব ধনী শিক্ষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধতায় বিফল হব। যদি আরও বেশি সংখ্যক দেশীয় সভ্য বিধানসভায় থাকতেন তাহলে তাঁদের বিপুল সংখ্যার চাপে ও বিরুদ্ধতায় আমাদের সদ্যলব্ধ আইনগুলো পাস করানো অসম্ভব হতো।

দেখা যাচ্ছে, ডাফরিনের বেশি ভয় ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। কারণ তারা ব্রিটিশস্বার্থের প্রতিকূলতা করলেও এদেশের জনসাধারণের উপকারী কোনো কর্মসাধনেরও ঘোরতর বিরোধী ছিল। আর তার কারণ হলো যে, এসব শিক্ষিত ও নব্য মধ্যবিত্তদের সমাজ, দেশ ও জাতি বলতে কলকাতার গণ্ডির মধ্যেই সীমিত নিজেদের শ্রেণীকেই বোঝাত, তার বাইরে বিশাল জনগণ ছিল একেবারে হিসাবের বহির্ভূত।

এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকেই ধিক্কার দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একবার বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'তাঁদের দেশসেবায় দেশের অভিমান ছিল, কিন্তু দেশ ছিল না।'[৩৯]

ডাফরিন এ সম্বন্ধে আরও লিখেছিলেন :

সম্প্রতি আমরা খাতক মহাজনের সম্পর্কটা আইনত কিছু শিথিল করেছি এবং আরও চিন্তা করছি দেনার দায়ে খাতকের কারাদণ্ডের বিধানটা শিথিল করতে। কিন্তু এ বিষয়ে সভ্যদের বেশি সাহায্য পাব ভরসা হয় না, কারণ তাঁরা স্বভাবতই মহাজনশ্রেণীর সঙ্গে স্বার্থবশে জড়িত। এই রকম শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নে ব্রাহ্মণরা কোনোক্রমেই নিম্নশ্রেণীকে সুবিধা দিতে স্বীকৃত হবে না, অথচ আমরা তাদের বিপরীত কাজই করতে চাই।[৪০]

---

৩৮. বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ : সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ২৭৩ পৃ.।
৩৯. উনবিশ শতাব্দীর পথিক, পৃঃ ১৩৭ (উদ্ধৃত)।
৪০. Misra, p 350.

www.pathagar.com

তৎকালীন সরকারের এ আশঙ্কা জন্মেছিল ভারত বিধানসভার দেশীয় সভ্যদের প্রজার স্বার্থবিরুদ্ধ ভূমিকা থেকে এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কংগ্রেসের আচরণ থেকে। ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের প্রস্তাবাদিতে ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধিত দুঃখ-দুর্দশায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়; কিন্তু একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, তাদের দুঃখ-দুর্দশা জমিদারদের অত্যাচারপ্রবণ আচরণ বন্ধ করে কিংবা মহাজনদের সুদসংক্রান্ত কঠোরতা দূর করে লাঘব করা যাবে না, তার উপায় হলো প্রতিনিধিত্বমূলক আরও সংস্থার প্রতিষ্ঠা করা। কারণ কংগ্রেসের বিশ্বাস প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার স্থাপিত হলে জনসাধারণের অবস্থা উন্নয়নের পথ পরিষ্কার হবে। ১৮৮৮ সালের অধিবেশনে কংগ্রেস প্রস্তাব পাস করে, বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্বভারতে প্রচলিত করা হোক। অথচ তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ফলতে শুরু হয়ে গেছে এবং কীভাবে প্রজাকুল তার চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছিল ও তাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তাও সকলের নিকট পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয়, জনসাধারণকে স্থানীয়ভাবে শাসনকর্মের অংশদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত শহরবাসীরাই কুক্ষিগত করে ফেলেছে এবং নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, জনসাধারণের তার সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই, কিংবা সেগুলোর মাধ্যমে তাদের জীবনে কোনো সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ১৮৯২ সালে ভারতীয় বিধনসভা আইন পাস হয় এবং ১৮৯৩ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দেখা গেল, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিশেষত আইনজীবীদের ভাগ্যেই শক্তিসাম্য ঝুঁকে পড়েছে। এই আইনে বাংলার আসন ছিল ২০টি, তার ১০টি বেসরকারি। এই বেসরকারি ১০টি আসনের ৭টি কলিকাতা করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জিলাবোর্ড, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, বণিক সমিতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের আওতাভুক্ত। বাকি ৩টির একটিমাত্র ছিল সারা বাংলার জোতদারদের ভাগ্যে। তাও আবার গ্রামবাসী জোতদারের ভাগ্যে এ আসন লাভ ঘটত না। তার ফলে এই হতো যে, সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন গ্রামবাসী হয়েও তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার একজনও ছিল না। আরও কৌতুককর এই যে, তৎকালীন বর্ণহিন্দু 'রইস'-দের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ তোলে যে, জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর গঠনতন্ত্র এমনই বিচিত্র যে, কেবল শিক্ষিত বৃত্তিধারীরাই সেসবে স্থানলাভ করে, ভূম্যাধিকারীরা কোনো পাত্তা পায় না :

> এসব সংস্থার রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে, ক্ষুদ্র জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, স্কুলমাস্টার ও ডাক্তারদের নিয়েই সেসব গঠিত, ভালো-মন্দ যাই হোক, বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের প্রাচ্য ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তিবশত প্রায়ই

www.pathagar.com

মিউনিসিপ্যাল ও জিলাবোর্ডের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বিধানসভার প্রার্থী হন, তিনি নিশ্চয়ই উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, মহাজন ও স্কুলমাস্টারদের সমবেত শক্তির নিকট পরাজয় বরণ করবেন। জিলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কলিকাতা কর্পোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উকিল ও আইনজীবীরাই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। হয়তো মাঝে মাঝে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্য ব্যক্তিও সেসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হন, কিন্তু তাঁরা সকলেই উগ্র পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন এবং জোতদার ও রায়তদের প্রতি তাঁদের কোনো সহানুভূতি নেই এবং বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই।[৪১]

অতএব দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের শেষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বৃহৎ জমিদার সম্প্রদায় ও বিশাল কৃষক সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে। আইনজীবী, ডাক্তার, স্কুলমাস্টার, ব্যবসায়ী, মহাজনদের সমবায়ে এ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগঠিত এবং নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা অর্জনে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও উচ্চকণ্ঠ।

ঘ.

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারাই ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল। এবং কলকাতায় তার প্রাথমিক কেন্দ্রীয় অফিস ছিল এই কারণে যে, কলকাতাবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ই তার জন্ম দিয়েছিল, শৈশবে লালন-পালন করেছিল ও তার শক্তি জুগিয়েছিল। কংগ্রেসী চিহ্নিত হয়ে তারা তৎকালীন সবরকম স্বায়ত্তশাসনিক প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিধানসভায় প্রবেশ করত।

১৮৯৩ সালের বাংলা বিধানসভায় নির্বাচন শেষ হলে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করে :

নির্বাচিত ছয় জন সদস্যের পাঁচ জন কংগ্রেসী। ১৮৯৫ সালে মাদ্রাজে তেলেগু ভাষার একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছিল, কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে সরকার চার জন কংগ্রেসীকে বিধানসভায় মনোনয়ন দিয়েছেন। বর্তমান মাসের 'এডভোকেট' পত্রিকায় (লক্ষ্ণৌ) পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, ছয়জন খ্যাতনামা কংগ্রেসীকে বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অনেককে সরকারি খেতাব দান করা হয়েছে।[৪২]

বস্তুত তখন কংগ্রেসী হিসেবে বিধানসভায় নিয়োগ কিংবা সরকারি পদে নিয়োগ সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বিবেচিত হতো। ১৯০০ সালে নারায়ণজী চন্দ্রভারকর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯০১ সালে তাঁকে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করা হলে ভারতসচিব লর্ড জর্জ হামিল্টন আপত্তি তোলেন, কিন্তু লর্ড কার্জন বলেছিলেন,

---

৪১. I. O. Home (Proc) Nov. 1898, vol, 5414 ff 2327-28,

৪২. Hamilton Collections, I. O.

www.pathagar.com

> নারায়ণজী মিতবাক নরমপন্থী ব্যক্তি। তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে দুগ্ধপানি মিশ্রিত নরম সুরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়োগ করে সরকার পক্ষের বশংবদ করে রাখাই ভালো, অন্যথায় তাঁকে আরও চরমপন্থী করে বিরুদ্ধবাদী করে ফেলা হবে। আমার বিশ্বাস, কংগ্রেস এখন লোকের আস্থা হারাচ্ছে। এ সময় সুবুদ্ধির কাজ না করলে কংগ্রেসকে ক্ষমতা সঞ্চয়ে সুযোগ দেওয়া হবে এবং ফলে ভবিষ্যতে বহু গোলযোগ সৃষ্টি করবে।[৪৩]

বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি ১৮ জুলাই ১৮৯৯ সালে যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে উল্লেখ করেন, "কংগ্রেসের বর্তমান সভ্যদের অধিকাংশই আইনজীবী কিংবা তাদের মক্কেল শ্রেণী।" ১৮৯২ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ১৩,৮৩৯ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনসমূহে যোগদান করে; তার মধ্যে ৫,৪৪২ জন (অর্থাৎ শতকরা ৪০) আইনজীবী, ২,৬২৯ জন জমিদার, ২,০৯১ জন ব্যবসায়ী এবং বাকি ডাক্তার, স্কুলমাস্টার, সাংবাদিক; কিন্তু একজনও গ্রামবাসী নয়। আবার বাঙালি সভ্যদের শক্তিশালী দল ছিল আইনজীবী। অন্যান্য প্রদেশে জমিদার, মহারাজারা কংগ্রেসে চাঁদা দিতেন বা মোটা দান করতেন। দ্বারভাঙার মহারাজা বার্ষিক চাঁদা দিতেন দশ হাজার টাকা!

> মহারাজা স্যার যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ভ্রাতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কংগ্রেসে চাঁদা দিতেন, তবে কংগ্রেসের সমর্থকরূপে নয়, সংবাদপত্রের আক্রমণের ভয়ে।[৪৪]

উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এতখানি শক্তিশালী ছিল যে, রাজা-মহারাজারা তাদের সমীহ করে চলতেন। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, ভাওনগরের মহারাজা, বরোদার গাকোয়াড়, রামনাদের রাজা ও বোম্বাই-এর টাটা কোম্পানি কংগ্রেসে চাঁদা দিতেন।

ভূম্যাধিকারীদের সমর্থন করতে কংগ্রেসী সদস্যরা বিধানসভায় সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন এবং প্রজাকুলের সুবিধার্থে কোনো বিল উপস্থিত হলে তীব্রভাবে তার বিরুদ্ধতা করতেন। ১৮৯৯ সালে ভূমি হস্তান্তর বিষয়ক বিল ভারত বিধানসভায় উপস্থিত হয়, তার মধ্যে এমন কয়েকটি শর্ত ছিল, যার দরুন মামলার সংখ্যা হ্রাসের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এবং মহাজনদের শোষণবৃত্তিটাও কিছুটা সংযত হতো। কংগ্রেস সদস্যরা বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। *কংগ্রেসী সদস্য স্যার হরনাম সিং সে সময় যেসব বক্তৃতা দেন সেগুলো লাহোরের উকিলরা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।*[৪৫] তবু বিলটি পাস হয়ে যায়।

তৎকালীন বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প উন্নতিলাভ করে ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রচেষ্টায় এবং তাদের সুবিধার্থে কারখানার আইনাদি প্রণয়নের বিষয়ে কংগ্রেসী সদস্যরা অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু মজুরদের সুবিধার্থে কোনো বিল উপস্থিত হলে তাঁরা

---

৪৩. Ibid, 5101/7.
৪৪. Ibid, 5101/2.
৪৫. Ibid, 510/6, 24 Oct. 1900

www.pathagar.com

তীব্র বিরোধিতা করতেন। অথচ মজুরদের প্রতি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অবিচার ও ঔদাসীন্যে আতঙ্কিত হতে হয়। অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনের মধ্যে খাটুনি এবং বাস করায় ও জীবনধারণের মতো মজুরি না পাওয়ায় শ্রমিকদের জীবনীশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে যেত। যখন খনি বিষয়ক বিল উপস্থাপিত হয় তখন মজুরদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার, নারী ও নাবালকদের নিযুক্তি ও সে বিষয়ে নিষেধ আরোপের বিধান থাকে। কিন্তু কলিকাতার 'হিতবাদী' পত্রিকা লেখেন :

> এই বিলে কারখানা আইনের মতো খনি মজুরদের নিয়োগ ব্যাপারে নিয়মের কড়াকড়ি করার ব্যবস্থা হয়েছে। ... এ কথা সত্য, ভারতীয় মজুররা বড় গরিব, তাদের উপার্জনে অতি কষ্টেও সংসার চালানো যায় না। কিন্তু তাদের প্রতি সরকারের এমন অহেতুক অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।[৪৬]

ভারতীয় কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র। একই স্বার্থের বশে তারা একত্রিত হয়েছিল এবং পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার গরজে সমবায়ী প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের শক্তি বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালের পুণা কংগ্রেস অধিবেশনে ১৫৮৪ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৪৩৭ জন ব্যবসায়ী। এ থেকে কংগ্রেসে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা, গুরুত্ব ও প্রভাব সহজে প্রতীয়মান হয়।

ঙ.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারি ব্যয় অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায় শাসনযন্ত্রের স্ফীত অবয়বের দরুন এবং সামরিক ও নৌবলের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে। ভারতে ব্রিটিশ অধিকার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধিও হতে থাকে। ১৭৯৩ সালে সামরিক খাতে ব্যয় ছিল ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড ; ১৮৫৬ সালে দাঁড়ায় এক কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড। ভারতীয় সামরিক ও নৌবাহিনী ভারতের স্বার্থেই নিযুক্ত থাকত না, প্রাচ্যখণ্ডে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার্থেও নিযুক্ত থাকত এবং সে বিপুল ব্যয়ভার ভারতের রাজস্ব থেকে বহন করা হতো। ১৮৩৯ সালের ও ১৮৫৬ সালের চীনা যুদ্ধ ও পারস্য অভিযানের বিপুল খরচ ভারতকে বহন করতে হয়েছিল। আফগান যুদ্ধ বা বার্মা যুদ্ধ হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থে, কিন্তু ব্যয়ভার বহন করে ভারত সরকার। আফ্রিকা, চীন, স্টেটস সেটেলমেন্টস সর্বত্র ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য প্রসারক্ষেত্রে ভারতই অর্থ যুগিয়েছে। ১৮৫৭-৫৮ সালের 'মিউটিনি'-তে ২ কোটি ১০ লক্ষ ও ১৮৫৯-৬০ সালে ২ কোটি ৫৫ পাউন্ড ব্রিটিশের খরচ মিটিয়েছে ভারত। বেসামরিক প্রশাসনিক খাতে ১৭৬৫ সালে ব্যয় ছিল ৪ লক্ষ পাউন্ড, তা ১৮৫৭ সালে বৃদ্ধি পায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ডে।

৪৬. Corzon to Hamilton, 13 AP. 1899.

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে এই খরচ বৃদ্ধি পেয়ে চারগুণ দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি করে ভারতীয় বাজারে বন্যা আনয়নের উদ্দেশ্যে আমদানি কর হ্রাস বা রহিত করে রাজস্বের ঘাটতি ঘটানো হতো। ১৮৮২ সালে মদ, আগ্নেয়াস্ত্র ও লবণ ব্যতীত সর্বশ্রেণীর আমদানি পণ্যের উপর থেকে মাশুল রহিত করা হয়। তার ফলে ১২,১৯,০০০ পাউন্ড রাজস্বের ঘাটতি হয়।

১৮৭৩ সালে রুপার মূল্য কমায় ও তার দরুন মাত্র স্বর্ণমানের বৈদেশিক মুদ্রানীতি প্রচলিত হওয়ায় ভারতীয় রাজস্ব অসম্ভবরূপে হ্রাস পায়। ১৮৯৫-১৯০০ সালে ভারতীয় ব্যয় সম্বন্ধে রাজকীয় কমিশন তদন্ত করে মন্তব্য করে, সামরিক ব্যয়, বিনিময় প্রথায় লোকসান ও শুল্ক হ্রাস হেতু ভারতীয় রাজস্বের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বাণিজ্যে ও শ্রমশিল্পে অবাধনীতির ফলে করের বোঝাটা কৃষিজীবীদেরই বহন করতে হতো। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ১৮৫৮ সালে ছিল ১৫ কোটি, সেটা ১৯২৯ সালে দাঁড়ায় ৩৩.৪ কোটি টাকা। ১৮৯৩ সালে আমদানি বৃদ্ধির চেষ্টা হয়, কিন্তু ভারতসচিব সুতা ও তুলাবস্ত্রের ওপর কোনো মাশুল বসাতে স্বীকৃত হন নি।

এসব বিষয়ে ভারতের অসহায় অবস্থার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। লন্ডন ও কলকাতা কর্তৃপক্ষের সম্পর্কটা ছিল রাজস্বসদস্য স্ট্রাচির ভাষায় 'মেষ ও নেকড়ের গল্পের মতো', পূর্বেই তা দেখানো হয়েছে। লর্ড কার্জনের মতো জাঁদরেল ভাইসরয়ও এ বিষয়ে অসহায় বোধ করে বলেছিলেন,

> 'হোম গভর্নমেন্ট' আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছেন। ... দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্টকোস্ট, উগান্ডা, সোমালিল্যান্ড, মিসর, চীন, শ্যাম, যেখানেই হোক, আমাদেরকেই বলা হয়েছে সাম্রাজ্যিক ব্যয়ভার বহন করতে। আমি চুপ থেকে এখন লোকসমীপে মূর্খ প্রতিপন্ন হচ্ছি। আমরা এভাবে আর মোটেই চলতে পারি না—বিশেষ করে এসব অন্যত্র খরচের কথা বারবার 'হোম গভর্নমেন্ট'-কে বলেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছি।[৪৭]

কার্জন চেয়েছিলেন, ভারত যদি সাম্রাজ্যিক যুদ্ধবিগ্রহ চালায় তাহলে ব্রিটেনকে তার ব্যয়ভারের অংশ (অর্থাৎ সবটা নয়) বহন করতে হবে। কিন্তু মহারানীর সরকার এ আবেদনে কর্ণপাতও করে নি। কার্জন প্রতিবাদের জানিয়েছিলেন :

> 'সাম্রাজ্যিক সরকারের সঙ্গে বারবার দর কশাকশি করে আমরা এই অনবরত শোষণের বিষয়ে সম্মানজনক ব্যবহারও লাভ করি নি। দেওয়া-নেওয়ার নীতি থাকতেই হবে। মাত্র গত সপ্তাহে লান্সডাউনের নিকট থেকে তারবার্তা পেলাম, তাতে ধরেই নেওয়া হয়েছে, আমরা ইস্পাহান দূতাবাসের অর্ধেক ব্যয় বহন করব। গত কয়েকদিনে আমরা ভারতে বুয়র যুদ্ধের ৩,০০০ বন্দীকে আশ্রয় দেব, অশেষ অসুবিধা এবং খরচ সত্ত্বেও। ইতিহাসে এমন আর কখনো হয় নি, যখন ভারতকে পূর্বের চেয়ে অধিক ব্যতিব্যস্ত ও শোষণ করা হয়েছিল।[৪৮]

---

৪৭. Ibid, 510/10, 137-38.
৪৮. Ibid, 510/10, 139.

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ সরকারের এসব সামরিক নীতি ও রাজস্বনীতি পছন্দ করে নি। ১৮৯১ সাল থেকে পরবর্তীকালের কংগ্রেসী প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করলে পরিষ্কার হবে, আলোচ্য বিষয়ে ভারত সরকারের ও কংগ্রেসের কোনো নীতিগত পার্থক্য ছিল না। বরং প্রতীয়মান হবে, ভারত সরকারের ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রতিবাদটা দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসী মনোভাব চালিত হয়েছিল। এজন্য উভয়ত প্রতিবাদ জানানো হতো ভারতের এই অন্যায় শোষণ বন্ধ করতে। প্রভেদটা এই ছিল যে, কংগ্রেস প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাত, আর ভারত সরকার কাগজে-কলমে প্রতিবাদ জানিয়ে নীরব হয়ে সম্মতি দান করত বাধ্য হয়ে। তাছাড়া কংগ্রেসী মনোভাবটাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো, কংগ্রেসের রাজস্ব ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে ক্ষমতালাভের উদ্যম প্রচেষ্টা থেকে। অথচ ভারত সরকার বিধানসভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা বা অধিক ক্ষমতা দান করাটা সুবুদ্ধির হবে না বিবেচনা করত।

চ.

একটি বিষয়ে কংগ্রেস খুবই সর্তক ছিল। এই বহির্ভারতীয় বা ভারত শাসন বিষয়ক ব্যয়ের বোঝার কোনো অংশ যাতে মধ্যবিত্তদের স্কন্ধে না পড়ে এবং এসবের দরুন শোষণের আঁচ যাতে না সহ্য করতে হয় সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখত এবং এটি করত ব্যবসায়ী ও পেশাধারী ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার মানসে, যাতে সরকারের ব্যয়নির্বাহার্থে সাধারণ করভার তাদের বহন না করতে হয়। এজন্য এসব শ্রেণীর মুখপাত্র কংগ্রেস আবগারি মাশুল, আয়কর বা লাইসেন্স ফি প্রবর্তনের বিরুদ্ধতা করত। ১৮৭৭ সালে ভারতীয় সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার পর ব্যবসায়ে লাইসেন্স কর আদায়ের আইন পাস হয়। অথচ পথ নির্মাণ, রেলওয়ে স্থাপন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে ব্যবসায়ীরা বেশি লাভবান হয়েছে, তবু তারা কোনো প্রত্যক্ষ কর আদায় দিতে ইচ্ছুক ছিল না।

অনুরূপভাবে ১৮৮৬ সালে যখন আয়কর বিল উত্থাপন করা হয়, ভারত বিধান সভায় তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয়েছিল। অথচ এ করটি প্রবর্তনের উদ্দিষ্ট ছিল সেই সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা যারা চাকরি, পেশাধারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি রূপে অকৃষিসুলভ কর্মে প্রভূত অর্থোপার্জন করত। এই বিলটি উপস্থিতকালে রাজস্ব সদস্য কনভিন বলেছিলেন, এর দ্বারা তারাই কর দিতে বাধ্য হবে, যারা ব্রিটিশ শাসন আমলে অর্থ লুটেছে এবং ধন সঞ্চয় করেছে গরিব কৃষকদের শোষণ করে। অথচ যেসব শ্রেণী ব্রিটিশ সরকার থেকে বেশি নিরাপত্তা লাভ করেছে ও ভাগ্য নির্মাণ করেছে, তারা সে সরকারকে একটি পয়সাও আদায় দেয় না। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন,

www.pathagar.com

> ব্রিটিশ শাসন আমলে সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নে বহু মত আছে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধবাদীরাও এ বিষয়ে একমত যে, তার ফলে জীবনে শান্তি এবং সম্পত্তি ও ব্যবসায়ে নিরাপত্তা এসেছে, এবং ব্যবসায়ী ও বৃত্তিধারী শ্রেণীদের ভাগ্যেই এসেছে অপর্যাপ্ত সুবর্ণ ফসল।[৪৯]

বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন দুজন আইনজীবী সদস্য মান্দালিক ও পিয়ারীমোহন ঘোষ এই বলে যে, 'এদেশের আবহাওয়ার উপযুক্ত নয়' এবং 'পূর্বে কখনো এরূপ অভিনব কর ধার্য হয় নি'। কিন্তু লর্ড ডাফরিন তাঁদের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন এই বলে :

> আমি চোখ মেলে দেখি, কৃষক তার লবণের কর দিচ্ছে, এবং হারটা কিছু কমানো হলেও আমরা প্রত্যেক বছর পাই ৬০,০০,০০০ পাউন্ড। জোতদার জমির খাজনা দেয়, সে দেয়। এখানে ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স কর দেয়। কিন্তু উকিল, ডাক্তার, শিক্ষিত পেশাধারী ব্যক্তি, সরকারি কর্মচারী এবং এরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিসমূহ কোনো কর যোগায় না সরকারের খাজাঞ্চিখানায়।[৫০]

তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আয়কর আইন ১৮৮৬ সালে পাস হয়ে যায়। তার ফলে প্রায় ৮০,০০০ সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষিত পেশাধারী ব্যক্তি এবং ২,২০,০০০ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে প্রত্যক্ষ কর দিতে বাধ্য করা হয়। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এবং দেশের লোকসংখ্যা অনুপাতে তাদের সংখ্যা ৬০০ জন প্রতি ১ জন মাত্র।

১৮৯৪ সালে যখন ভারতে প্রস্তুত তুলাবস্ত্রের ওপর একটা কর বসানো হয়, তখন কংগ্রেস সংকল্প নেয় যে, 'এটা ভারতের বস্ত্রশিল্পের ক্ষতিকর।' এভাবে তখন কংগ্রেস বস্ত্রমিল মালিকদের সাহায্য করে। বস্তুত কংগ্রেস প্রথম স্তরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলেও ভারতীয় শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সব স্বার্থেরও হেফাজত করতে থাকে ও তাদের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে, ১৯০৫ সালের পর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে একটা শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং ১৯০৬ সালে বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন কংগ্রেসের মাধ্যমেই আরম্ভ হয়েছিল। এসব থেকে প্রমাণ মেলে যে, এদেশের বিদ্বৎসমাজ ও বুর্জোয়া একই স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

ছ

ইংরেজ কর্মচারীদের ও ইঙ্গ-ভারতীয় কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য এবং দেশীয় কর্মচারীদের প্রতি তাদের অশোভন ও অন্যায় ব্যবহারও এখানে উল্লেখযোগ্য। তা থেকে তাদের এ দেশীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি মনোভাবের পরিচয় মিলবে।

৪৯. I. O. Legis. Proc. Jan. 1886.
৫০. Ibid.

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, তাদের দুর্ব্যহারের ফলে এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কম ক্ষোভের ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় নি এবং তার দরুন ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটাতেও বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল।

> ১৮৮২ সালে আনকভেনান্টেড ফরাসি কর্মচারী দোসাভাই ফ্রামজী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত থাকাকালে বোম্বাইয়ের কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের বিদেশি কর্মচারীরা বিক্ষোভের ঝড় তোলে এবং ভারতসচিবের নিকট প্রতিবাদ জানায়। পূর্বে ১৮৬৬ সালের ১৭ মেরু লিখিত এক পত্রে লরেন্স ভারতসচিবকে জানান, সমগ্র দেশীয় লোকরা রেলের কর্মচারীদের ও ইউরোপীয়দের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং আশু এর প্রতিকার না হলে ভীষণ বিপদ উপস্থিত হবে।[৫১]

> বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে ১৮৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিন কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে প্রহৃত হন। মুর্শিদাবাদ পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র পালকি চেপে কোর্ট থেকে বাড়ি যাচ্ছিলেন একটা ক্রিকেট খেলার মাঠের উপর দিয়ে তখন ডাফিনসহ ইউরোপীয়রা মাঠে ক্রীড়ারত ছিল। ডাফিন বাবুর বেয়াদবিতে ক্রুদ্ধ হন এবং বাবুকে প্রহার করেন ও কয়েকটি ঘুষি মারেন।[৫২]

এই বর্ণবিদ্বেষের জন্যে প্রধানত ইউরোপীয় প্লান্টার সম্প্রদায়ই দায়ী। ১৮৬৬ সালের ৩ ডিসেম্বরের এক পত্রে ভারতসচিব স্বীকার করেন, আসামের ইংরেজ এজেন্টরা কুলিদের প্রকাশ্যে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করত, অথচ বলত 'নেটিভকে বেত্রাঘাত করার অধিকার আছে, তার জন্য শাস্তি হয় না।' ম্যাজিস্ট্রেটরাও আসামি ইংরেজ হলে ন্যায়ধর্মের লঙ্ঘন করতেন অবলীলাক্রমে। ফুলার নামে আগ্রার এক ব্যারিস্টার তাঁর কোচম্যানকে বেত্রাঘাত করে নিহত করেন। অথচ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর জরিমানা শাস্তি দেন মাত্র ৩০ টাকা। ভাইসরয় এ অন্যায় অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করলেন ভারতসচিবের নিকট, কিন্তু কিছুই ফল হয় নি। ত্রিবাঙ্কুরে দুজন ইংরেজ নীলকর একজন সহিসকে বেত্রাঘাতে হত্যা করে দু মাইল দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলে। তাদের কোর্টে পক্ষ সমর্থনের জন্যে ১,০০০ পাউন্ড চাঁদা উঠায় নীলকররা। কিন্তু এমন পরিষ্কার নরহত্যার মামলাতেও মাদ্রাজ হাইকোর্ট হত্যাকারীদের শাস্তি দেয় তিন বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। কার্জনের মতো জাঁদরেল ভাইসরয়ও কোনো প্রতিকার করতে পারেন নি। কানপুরে এক ইংরেজ এক কুলিকে লাথি মেরে মেরে হত্যা করে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীর ২০০ টাকা জরিমানা করে গর্ব করেছিলেন, তাঁর মতো বড় শাস্তি কোনো ইংরেজকে পূর্বে কেউ দেয় নি। আসামের চিফ কমিশনার কটন প্লান্টারদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন 'নেটিভদের বেত্রাঘাত, জখম ও খুন করার' এবং এজন্যে তাঁর আমলে কোনো প্লান্টারের শাস্তি হয় নি।

---

৫১. Lawrence to Crabanome, 1866.

৫২. Amrit Bazar Patrika, 4th Jany, 1874: বঙ্কিম মানস, ১৭৮ পৃঃ

www.pathagar.com

১৯০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কার্জন ভারতসচিবকে লিখেছিলেন :

চা বাগানগুলোতে বহু অনাচার, অত্যাচার ও কুৎসিত ঘৃণ্য কর্ম হয়, কুলিরা ন্যায্য মজুরি কখনো পায় না। একথা সত্য যে, কুলিদের মামলার কালে ম্যাজিস্ট্রেট, সেশন এমনকি হাইকোর্টেও ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা কুলিদের জন্যে এক এবং প্লান্টারদের জন্যে আর এক।

এই কটন সাহেবও শেষ পর্যন্ত প্লান্টারদের বলেছিলেন, 'একদল অমানুষ দানব' এবং এজন্যে তাঁর চাকুরীও খতম হয়ে যায়।[৫৩]

ইউরোপীয়দের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে ভারত সরকারকেও শ্রদ্ধা হারাতে হয়। ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিল উপস্থাপিত হয় ভারত বিধানসভায় এবং তার উল্লেখযোগ্য বিধান ছিল, দেশীয় হাকিমদের নিকটও ইউরোপীয়দের বিচার হতে পারবে। এই বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা তীব্র আন্দোলন শুরু করে এবং প্লান্টার সাহেবেরাই ছিল এ আন্দোলনের পুরোভাগে। ভারত সরকার বেশ অনুধাবন করলেন, ইউরোপীয়দের এ বিরুদ্ধতা অন্যায়, তবু নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন ও বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও তুমুল আন্দোলন তুলেছিল এবং বলা যায়, ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ১৮৮৩ সালের ন্যাশনাল কনফারেন্স স্থাপিত হয়। এটা পরে ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়। উল্লেখযোগ্য, এই আন্দোলনের সময়ই কবি হেমচন্দ্র একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির কয়েক পঙ্‌ক্তি হলো :

গেল রাজ্য গেল মান, ডাকিল ইংলিশ ম্যান.
ডাক ছাড়ে ব্রানশন, কেশুয়িক, মিলার—
নেটিভের কাছে খাড়া, নেভার নেভার!
নেভার সে অপমান, হতমান, বিবিজান,
নেটিভে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা?
দেহে প্রাণ, বিবিজান, কখনো তা হবে না।

ইংরেজের এই তীব্র বর্ণবিদ্বেষ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্বাজাত্য বোধ উন্মেষে এবং ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিতে কম ক্রিয়া করে নি। এবং নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'রুল অব ল'-এর পূজারী ইংরেজরা ভারতে এ নীতি প্রয়োগে বর্ণভেদের তারতম্য বিবেচনা করেছে এবং তার দরুন সকল মানুষের সমানাধিকার স্বীকার করে নি। ইংরেজ প্রচার করেছে আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইংরেজ মহাব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছে। কেবল রাজশক্তির অহংকার নয়, জাতির দম্ভ এবং বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বও ইংরেজ যেভাবে দাবি করেছে, তারই ফলে ইংরেজ কোনোদিন এ উপমহাদেশের জনসাধারণের চিত্তজয় করতে পারে নি। ইংরেজ বহু বিষয়ে এ

৫৩. Curzon to Hamilton, 10th June 1901

www.pathagar.com

দেশের উপকার করেছে সত্য, কিন্তু সমস্ত ঋন স্বীকার করেও বলতে হয়, ইংরেজকে আমরা কোনোদিনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করি নি। মানুষের সমানাধিকারকে ইংরেজ স্বীকার করেনি বলেই ইংরেজের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা।

এখানে আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য। এ আমলে আমরা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখেছি, পশ্চিমের খোলাদ্বার দিয়ে যেসব উপহার এসেছে, সেসব তারাই উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, নতুন ভাবধারা গ্রহণ করে আত্মীকরণ করেছে এবং সম্প্রসারণও করেছে। সারা উপমহাদেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একত্রিত এবং সংহত করেছে। নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের একটা সাধারণ ভাষা দিয়েছে, সাধারণ ভাবধারা দিয়েছে এবং সাধারণ জ্ঞানও দিয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক ট্রাডিশনের পাশাপাশি। নতুন প্রেসও বহির্বিশ্বের ভাবধারা ও কর্মধারার সংস্পর্শে এনেছে এদেশবাসীকে এবং তার প্রতিক্রিয়াও সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থায় মাদ্রাজ দিল্লির সঙ্গে যখন তখন কথা বলছে, বোম্বাই বলছে কলকাতার সঙ্গে। এভাবে নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তনের পর ইলবার্ট বিল উপস্থাপিত হওয়ার সময় পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে হিন্দু সমাজ দেহের মধ্যম স্তর থেকে এমন একটা সুসংহত একই স্বার্থডোরে জড়িত শ্রেণীর উদ্ভব হলো যারা সর্বভারতে একই শিক্ষা, একই ভাবধারা ও একই মূল্যবোধ প্রবর্তিত করল নিজেদের গণ্ডির মধ্যে। অবশ্য এ শ্রেণী ছিল বিরাট সমাজদেহের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও তেজোদীপ্ত ও বিস্ফোরণ উন্মুখ। এটিকে বলা যায় হিন্দুভারতের নতুন আত্মা। এবং এই নতুন আত্মার মুখেই অতঃপর হিন্দুভারতের প্রাণের বাণী শোনা যেত এবং সে বাণী সমগ্র হিন্দুজাতির অন্তরের কথা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করত।

বঙ্গ-বিভাগ

বঙ্গ-বিভাগ আলোচ্য কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা এবং কার্জনের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। নিন্দা ও প্রশংসা সমভাবে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে এ কর্মের জন্যে। হিন্দু সম্প্রদায় তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদের জন্যে। আর মুসলমানরা তাঁর প্রশংসা করেছে তাদের জীবন-মরণ সমস্যাটার বাস্তব সমাধানের জন্যে এবং তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ পরিষ্কারের জন্যে।

ব্রিটিশের বাংলা প্রেসিডেন্সি প্রশাসনিক দিক দিয়ে একটা সমস্যা প্রদেশ হয়ে উঠেছিল। তার প্রশাসনিক গুরুত্ব আরম্ভ হয় ১৭৬৪ সাল থেকে, যখন ক্লাইভ বাদশাহ শাহ আলমের নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পদ লাভ করেন। তারপর বাংলাকে কেন্দ্র করে এবং কলকাতাকে প্রশাসনিক স্নায়ুকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে চলল ইংরেজের অধিকার বিস্তার ভারতের বুকে। উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ইংরেজের ভারত বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ। ভারতের এ-প্রান্তে সে-

www.pathagar.com

প্রান্ত যেসব স্বাধীন রাজ্য বিরাজ করত বিশাল জমিদারির ছিটমহলের মতো, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে দু একজন দেশীয় রাজা-আমীর সদম্ভে মাথা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়েছিলেন, ইংরেজের সামরিক বল ও ততোধিক কূটবুদ্ধি সে সকল গ্রাস ও সেসব রাজা আমীরের মস্তক চূর্ণকরণে ব্যাপৃত। কিন্তু যে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ইতোমধ্যেই অধিকৃত হয়েছিল, সেখানে চলেছিল বিশাল সাম্রাজ্যিক ভিত্তিস্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনা। ১৮১০ সালের মধ্যেই দিল্লি ও শিখ সীমান্ত পর্যন্ত হয়েছিল এ অধিকারের ব্যাপ্তি। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে চতুর্থ প্রেসিডেন্সি আগ্রাকে রাজধানী করে সৃষ্ট হয়েছিল ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন বলে। তখন বাংলা পুনরায় হয়ে পড়ে মোগল বাদশাহি আমলের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সুবাসমূহের প্রধান কেন্দ্র। ১৮৫৪ সালে এসব অঞ্চলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন ভারত সাম্রাজ্য বিধায়ক গভর্নর জেনেরালের অধীনে। বলাবাহুল্য, দুজন প্রশাসনিক অধিপতির অধিবাস ছিল কলকাতাতেই। ১৮৭৪ সালে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে একজন চিফ কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে পশ্চিমে ঘাগরা ও গোদাবরীর তীর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের প্রশাসনিক সমস্যা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রবল আকার ধারণ করে। লোকসংখ্যা উঠে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নাবস্থা, যোগাযোগের দারুণ অসুবিধা প্রভৃতির অজুহাতে এদিকটায় দেড়শ বছরে কোনো উন্নতি হয় নি, অথচ পশ্চিম বাংলা ধনে-সম্পদে শিক্ষার প্রসারে ভারতের স্বর্গখণ্ডে পরিণত হয়ে চলেছে। পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাধিক এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা, এজন্য এ পার্থক্যটা আরও প্রকটভাবেই ধরা পড়ত। অথচ পূর্ব বাংলাই ছিল যুক্ত বাংলার বৃহদংশ—আয়তনে, লোকসংখ্যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারে। কিন্তু তখন পূর্ব বাংলার অস্তিত্ব বিবেচিত হতো মাত্র পশ্চাদভূমি হিসেবে, কলকাতার উন্নয়ন ও সুখৈশ্বর্যের নির্ভরশীল পাদপীঠ হিসেবে।

কার্জনের পূর্বে প্রশাসনিক সমস্যার দিকটা বহুবার বিবেচিত হয়েছে এবং বহু পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু কোনো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সৎ সাহস কারও হয় নি। কার্জন সেগুলো স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি আসাম ও চট্টগ্রামসহ পনেরোটা জেলা নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামাঙ্কিত নতুন প্রদশে প্রতিষ্ঠা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।

এ ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে বহু মত প্রকাশিত হয়েছে। কার্জন কোনো মুসলিম-প্রীতির নেশায় এ কাজ করেন নি। প্রশাসনিক সুবিধা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই তিনি চালিত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত অঞ্চলটি পৃথক করে পৃথক প্রশাসনিক বন্দোবস্ত করা হয়। পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা ও পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা অতঃপর ঘনিষ্ঠভাবে গঠিত হয়ে নিজ নিজ উন্নতি ও জাতীয় জীবনের বিকাশক্ষেত্র খুঁজে পাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ ও বিশিষ্ট সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের সুযোগ লাভ করবে।

www.pathagar.com

কার্জন একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেননি : হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লাভ লোকসান ও সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টা এবং এটিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তার উন্মাদনা ও আবেগ সৃষ্টির প্রবণতার কথাও। তিনি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবোধের সততায় সন্দেহ পোষণ করতেন। ১৯০০ সালে তিনি একবার বলেছিলেন, আমার বিশ্বাস কংগ্রেস এখন পতনোন্মুখ এবং আমার ভারতে অবস্থানকালে তার শান্তিপূর্ণ সমাধি রচনা করে যাব।

> এজন্যে বাংলার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যখন স্বার্থের তাগিদে এ কাজটিকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে রূপ দিয়ে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে এবং প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকে যে, এ কাজের ফলে বাংলার (অর্থাৎ হিন্দু বাংলার) জাগরণ ও উন্নতি ব্যাহত হয়ে তাদের শ্বাসরোধ করা হবে, তখন কার্জন সেসবে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দৈববাণীলব্ধ নির্দেশের মতো বঙ্গ-বিভাগ সম্পূর্ণ করেন।[৫৪]

হিন্দু ঐতিহাসিক মিশ্র বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন,

> এ বিষয়ে কার্জন প্রশাসনিক বিবেচনায় চালিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। ইউরোপীয় প্লান্টারদের দুর্ব্যবহারে এবং তাদের কারণে বিচারে তারতম্য হওয়ায় তিনি উত্ত্যক্ত হয়ে ১৯০২ সালে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করেন সংস্কারের নীতি নির্ধারণের জন্যে। কমিশন সুপারিশ করে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করার। বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ বহু দশক ধরে অবহেলা পাচ্ছে, এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের নিরাপত্তা হেতু এসব ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পুলিশ ব্যবস্থা একেবারে অকিঞ্চিৎকর—এসব দিকে দৃষ্টিপাত করে কার্জন দুটি কাজ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে শাসনকর্ম আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করেন এবং শাসন সৌকর্যের হেতু প্রদেশটি দুভাগ করেন। কিন্তু এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থে দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সকলেই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল; বিশেষত তখন বিধানসভাগুলোর সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীতচক্ষে দেখল, উভয় বাংলার বিধানসভায় তারা একেবারে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে—পূর্ব বাংলায় অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিম বাংলায় বিহারি ও উড়িয়াদের দ্বারা। এজন্যে তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠল।[৫৫]

এবার একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, যিনি পূর্ব বাংলার মানুষকে এই বিভাগ ক্ষণে দেখে বলেছিলেন, 'তাদের এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারে'। তাঁর বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> আগেকার বঙ্গদেশ এত বৃহদায়তন ছিল যে, একটি প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অত্যন্ত গুরুভার বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল এবং এর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল বলে প্রদেশের সাধারণ অগ্রগতির সাথে তাল রক্ষা করতে পারছিল না। সংবাদপত্রও পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে

৫৪. Oxford Hist. of India, 758-59.
৫৫. Misra, pp 394-95.

www.pathagar.com

উদাসীন ছিল। কাজেই এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। বস্তুত বঙ্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিবিধ : প্রথমত, বঙ্গদেশের বাড়তি অংশটি কেটে নিয়ে এর অবাঞ্ছিত গুরুভার লাঘব করা। দ্বিতীয়ত, এর জন্য একটি স্থানীয় বলিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা–যাতে করে পূর্ব বাংলার স্বার্থ অধিকতর নিষ্ঠার সাথে রক্ষিত হয় ও এর সাধারণ অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেই বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ও গৃহীত হয়েছিল। আগেকার প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষের উপর। অথচ মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর হিন্দু সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি উত্থাপিত করা হয়ে থাকে, সেগুলো মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, যেসব আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি একটি প্রাচীন প্রদেশকে পুরাতন বন্ধনডোরে বেঁধে রেখেছিল, এই ব্যবস্থা দ্বারা সেগুলোকে ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রদেশটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছে। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যমাত্র জ্ঞানও যাঁর আছে, তাঁর কাছেই এ যুক্তির অসারতা ধরা পড়বে। মুসলমান শাসনামলে বঙ্গদেশ কোনো ঐক্য এবং এর দীর্ঘস্থায়ী কোনো আয়তন ছিল না। পর পর যে-সব সুবাহদার এদেশ শাসনের ভার পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই রাজধানীও পরিবর্তন করেছেন। তাই শুধু নয়—তৎকালে এ-প্রদেশ যেভাবে গঠিত ছিল, তার সাথে ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের কোনো সাদৃশ্যই নেই। সে যুগে প্রায়শই বিহার ও উড়িষ্যার জন্য সরাসরি দিল্লি থেকে পৃথকভাবে সুবাহদার নিযুক্ত করা হতো। ছোট নাগপুর ও দামন-ই-কোহ, তখন প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয় নি। আবার খোদ বাংলা প্রদেশকে নায়েব-নাজিমদের (Deprty Governor) অধীনে ক্রমাগত বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের উপরে ছিলেন সুবাহদার। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার আকার বা গঠনবিন্যাস সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একটি হাল আমলের পরিকল্পনা । এবং এই পরিকল্পনা ব্রিটিশ শাসনকালে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্যকরী করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার ঐ অবয়বের বয়স ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের দিনে একশ বছরেরও অনেক কম।

বস্তুত বাংলা বিভাগ সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের অভিনন্দন লাভ করেছে। এর দ্বারা সে অদূর ভবিষ্যতে তাদের প্রভূত কল্যাণ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্ব-বাংলায় প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানগণ নিরতিশয় অজ্ঞ এবং পশ্চাৎপদ। আধুনিক অবস্থার সাথে হিন্দুরা যেমন ত্বরিতগতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা তারা পারে নি বা সে দিকে কোনো আগ্রহও দেখায় নি। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই হিন্দুদের হাতে। আন্দোলনের কুশলতা জানা না থাকায় ও নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কীভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার ফলে অপরিহার্যরূপে মুসলমানেরা পেছনে পড়ে থাকে। এখন এই নয়া প্রদেশে তারা হবে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রদেশের আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গ মাইল। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ নবগঠিত প্রদেশটিতে তাদের স্থানীয় শাসকদের কাছে পূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে।[৫৬]

---

৫৬. Bradley Bart,—Romance of an Eastern Capital: প্রাচ্যে রহস্য নগরী (বাংলা একাডেমী) ১৭-১৯ পৃ,

www.pathagar.com

এবার উদ্ধৃত করা যায় একজন মহাপ্রাণ বাঙালি হিন্দুর অভিমত, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বার্থের ধূম্রজালে বিভ্রান্ত হয় নি এবং বহু বছর পূর্ব বাংলায় বাস করে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে নিজের 'আত্মজীবনী'-তে বলেছেন :

> আমি বঙ্গভঙ্গ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস, এতদ্বারা পশ্চাৎপদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ববংগের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হইতে চলিল, পূর্বাবঙ্গবাসীদিগের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্য্যালয় সকল স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আসাম প্রদেশও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রবদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে।[৫৭]

বঙ্গভঙ্গে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের জোয়ার এনেছিল। ২২ অক্টোবর ঢাকার মুসলমানরা এক মহতী সভায় মিলিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের দরুন পরিবর্তিত শাসন আমলে কী সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করেছিল : 'বঙ্গভঙ্গের ফলে এতকাল যেসব উৎপীড়ন তারা হিন্দুদের নিকট থেকে সহ্য করেছে, সেসবের মূলোচ্ছেদ হবে।'

> ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উৎসবে মুসলমানরা মিলিত হয়ে শোকরানা আদায় করে এবং ভারতসচিব এটিকে 'সেটেল্ট ফ্যাক্ট' ঘোষণা করায় তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগ একটি সংকল্প গ্রহণ করে এই আশা প্রকাশ করে যে, ব্রিটিশ সরকার এই নিশ্চিত ব্যবস্থায় সুদৃঢ় থাকবেন।[৫৮]

বাংলা বিভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি ক্রান্তিকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা। শাসক ইংরেজরা এটিকে দেখেছিল প্রশাসনিক সৌকর্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা দেখেছিল তাদের ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাত হিসেবে, আর শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় দেখেছিল তাদের দেড়শো বছরের নির্মিত আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নক্ষেত্রের সমাধি রচনা হিসেবে। এজন্যই শিক্ষিত হিন্দুদের আঁতে ঘা লেগেছিল বাংলা বিভাগ কর্মে এবং সর্বশক্তি দিয়ে এটিকে রোধ করতে চেষ্টা করেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : ১৯০৬-১৯৪৭

১৯০৫ সালের পর থেকে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন-মানস আর্থিক ও রাজনৈতিক দিকে আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে বারেবারে। কিন্তু এই বিবর্তনের ধারা ক্রমাগত মোড় নিয়েছে স্বার্থরক্ষার কঠোর ঘাত-প্রতিঘাতে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যে ধর্মীয় সংস্কারের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল, একালে সেটা প্রশমিত হয়ে

৫৭. আত্মজীবনী : পৃ ; ১১০-১১।
৫৮. K. K. Aziz, The Making of Pakistan, p 27.

www.pathagar.com

আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোর দিকেই এ শ্রেণীর লক্ষ্য থেকেছে বেশি। এবং এ দুটি সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত হয়ে মন-মানসও ক্ষেত্রানুসারী হতে বাধ্য হয়েছে। একালে আয়ের মান হিসেবে সামাজিক স্তরের মান উঠা-নামা করেছে, জাতি বা বর্ণগত প্রশ্নটি তত প্রবল থাকে নি। এজন্য লক্ষ করা গিয়েছিল, কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, আহমেদাবাদ, জামশেদপুরে ধনিক ও মজুর শ্রেণীতে বিভাগটা বেশি প্রবল হয়েছে হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে, এমন কি বর্ণহিন্দু কিংবা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরূপে বিভাগের চেয়েও।

একালে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে, তার ফলে সমাজের নিচের তলার বাসিন্দাদেরও চক্ষুরুন্মীলিত হয়েছে আর্থিকক্ষেত্রে অসহনীয় বৈষম্যের দিকে। আর্থিক বন্টনের নিদারুণ অসমতার ফলে সামাজিক বৈষম্য আরও প্রবল হয়েছে। তবে এ বোধটা যতটা শহর এলাকায় ও শিল্প এলাকায় প্রখর, ততটা পল্লী এলাকায় হয় নি। এজন্য একালেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা পল্লীবাসীদের বঞ্চিত করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করেছে। পল্লীবাসীদের বঞ্চনা করে শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের ভাগ্য নির্মাণ করেছে, নিজেদের সুখ-সুবিধার দিক বেশি যত্নবান হয়েছে। তার ফলে শহর এলাকার যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, সে পরিমাণে পল্লী এলাকার অবনতি ঘটেছে। এজন্য পল্লী ছেড়ে শহর বাসের প্রবণতা এবং আকর্ষণও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধর্মীয় ও আর্থিক প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে এ যুগে লোকের মন-মানস রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনক্ষেত্রে কীভাবে ও কতখানি আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এবং পৃথকভাবে তার বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। তার ক্ষেত্র এখানে নয়। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন-মানসের গতি-প্রকৃতির মধ্যেই বর্তমান আলোচনা সীমিত থাকবে।

ক.

একালের প্রথমেই প্রখরভাবে যেটি চোখে পড়ে, সেটি হলো, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুর সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন, যেটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে, হিন্দু জাতীয়তাজ্ঞান বৃদ্ধি করেছে এবং শোকাবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামারও কারণ হয়েছে।

রাজনৈতিক হাঙ্গামার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বোম্বাইয়ে, যখন হিন্দু নেতা বালগঙ্গাধর তিলক দুটি হিন্দুধর্মীয় উৎসবকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু জনমত উত্তেজিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার একটি হলো, হিন্দুর হস্তিমুখবিশিষ্ট দেবতা গণপতি বা গণেশের পূজা উপলক্ষে; আর দ্বিতীয়টি হলো, মারাঠাজাতির স্রষ্টা শিবাজীর উৎসব। এ দুটিকে কেন্দ্র করে হিন্দুর ক্ষাত্রশক্তিকে জাগ্রত করা হয় যুবাদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে ও পুনার সব রাজপথগুলোকে সংগীতে-বাদ্যে

www.pathagar.com

মুখরিত করে। শীঘ্রই এ দুটি ধর্মীয় উসব রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং শক্তি প্রয়োগের দরুন দাঙ্গা-হাঙ্গামারও সৃষ্টি হতে থাকে। এসব আন্দোলনের উৎসাহদাতা ছিল ব্রাহ্মণরা এবং তারা গোঁড়া কুসংস্কারগুলো শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও পালিত হওয়ার দিকে যত্নবান ছিল। তিলক শিবাজী উৎসবের পৌরোহিত্যকালে ঘোষণা করেছিলেন ভগবদ্‌গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে, আত্ম কারণে না হলে গুরু বা আত্মীয় হত্যার জন্যও পাপস্পর্শ হয় না। তাঁর শিক্ষায় কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরাও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং গুপ্ত সমিতি গঠন করতে থাকে হিংসাত্মক কর্মসাধনের মধ্যে। বোম্বাই স্থিত নাসিকের দুই ভ্রাতা গণেশ ও বিনায়ক সাভারকর এই বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে স্থানলাভ করেন এবং গুপ্ত সমিতি গঠন করে সন্ত্রাসবাদের প্রচণ্ড শিক্ষা দিতে থাকেন।

> ১৯০৬ সালে বিনায়ক ভারত ত্যাগ করে প্যারিসে আত্মগোপন করেন এবং সেখান থেকে ব্রিটিশ বিরুদ্ধ আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৯০৯ সালে জ্যাকসন নামক একজন ইংরেজ কর্মচারীকে বিদায়-অভিনন্দন সভায় হত্যার জন্যে গণেশকে জড়িত করা হয়।[৫৯]

বাংলা প্রদেশের অবস্থা ১৯০৫ সাল পর্যন্ত শান্ত ছিল। এখানে শিক্ষিত বর্ণহিন্দুরা 'ভদ্রলোক' চিহ্নিত হয়ে শান্তিতেই বাস করত। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এবং ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক যুগের চাকরিক্ষেত্র তাদের ভাগ্যদ্বার খুলে দিয়েছিল এবং এ দুটির পূর্ণ সুযোগলাভ তাদের ভাগ্যেই ঘটেছিল। বাংলার বিশিষ্ট ভূমি বন্দোবস্তের ফলে ভূমিস্বত্বের সঙ্গেও তারা জড়িত ছিল। ভূমির যাবতীয় মধ্যস্বত্বের উপভোগী ছিল তারাই। কিন্তু কালক্রমে বাঙালি 'বাবু'-শ্রেণীর ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে যতই ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি হতে থাকে, ততই বাঙালি বাবুর চাকরিক্ষেত্রটা সংকুচিত হয় ওঠে। তার উপর ভূমির মধ্যস্বত্বটা যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকে, ততই ভূমিলব্ধ আয়ের অঙ্কটা হ্রাস পেতে পেতে অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে। এভাবে পীড়িত হয়ে অধিকাংশ বাঙালি বাবু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বা বিত্তহীন 'ভদ্রলোক'-এ রূপান্বিত হতে থাকে। বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের এই ক্রমাবনতির চিত্রটি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে ১৯১৮ সালের সিডিসন কমিটির রিপোর্টে :

> প্রথম দিকে তারা (বাঙালি ভদ্রলোক) সকল সরকারি-বেসরকারি অফিসে ও স্কুলসমূহে একচ্ছত্রভাবে বিরাজ করত। ফারসিদের মতো তাদের ছেলেরাই ইংল্যান্ড যেত উচ্চশিক্ষা লাভ করে ব্যারিষ্টার হতে কিংবা কভেনান্টেড সিভিল সার্ভিস ও মেডিক্যাল সার্ভিসের পরীক্ষাসমূহের প্রতিযোগিতা করতে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সমশ্রেণীর হিন্দুরা যখন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো, তখন বাঙালির ক্ষেত্রটা সংকুচিত হতে লাগল। আপন প্রদেশে 'ভদ্রলোক' হিন্দুরা কেরানিগিরি ও সমস্ত নিম্নশ্রেণীর চাকরিতে প্রায় একাধিপত্য লাভ করত। তারা চিকিৎসা, শিক্ষা ও আইন

৫৯. Indian Sedition Committee Report, 1918, P. 2.

www.pathagar.com

ব্যবসায়েও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। কিন্তু এসব সুযোগ সত্ত্বেও তাদের প্রদেশের বাইরে চাকরি লাভ বন্ধ হয়ে যায় এবং বেকার বৃদ্ধি হতে থাকে ... জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন ও ভূমিস্বত্ব খণ্ড খণ্ড হওয়ার ফলে ভূমির উপর তাদের অধিকারও খর্ব হতে থাকে। সংক্ষেপে তাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত লয় পেতে থাকে এবং যারা বাঁধা-বেতনের চাকরীয়া, তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কঠিনতা অনুভব করতে থাকে। ... এভাবে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই জীবনোপায়ের পথগুলো রুদ্ধ হতে দেখে তাদের মধ্যে অসন্তোষও ধূমায়িত হতে লাগল।[৬০]

তবুও সন্ত্রাসবাদ বাংলার মাটিতে আসন খুঁজে পায় নি উনিশ শতকে এবং 'ভদ্রলোক'-দের সহানুভূতিও লাভ করেনি। ১৯০৩ সালের পূর্বে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনো সহানুভূতি পাননি। উল্লেখযোগ্য যে, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাসিক্সে সর্বোচ্চ উপাধিলাভ করে তিনি আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু অশ্বারোহণে অসমর্থ হওয়ায় চাকরিলাভে বঞ্চিত হন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতায় আগমন করে বিদ্রোহবহ্নি ছড়াতে থাকেন, কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকরা মোটেই সাড়া দেয় নি। বিফল হয়ে তিনি বরোদায় বড়দাদা আরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করেন। অরবিন্দও ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষিত; তিনি তখন গায়কোয়াড় কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বারীন্দ্র বরোদায় বসে অনুধাবন করেন, রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত না করলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ হবে না। এজন্য তিনি গীতাপাঠের সঙ্গে রাজনীতির পাঠ দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'অনুশীলন সমিতি'-এর পরিকল্পনা করেন ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

সুযোগ মিলল ১৯০৪ সালে। তখন বাংলা বিভাগ পরিকল্পনা জোরদার হয়েছে এবং 'ভদ্রলোক' হিন্দুসম্প্রদায় সর্বনাশের আভাসে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বারীন্দ্র কলকাতায় আগমন করলেন ১৯০৪ সালে, অরবিন্দ এসে যোগ দিলেন ১৯০৫ সালে। বাংলা বিভাগ কার্যকরী হলো, বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে বিভাগটার ধর্মীয় রূপ দেওয়া হলো এবং সমগ্র হিন্দু বাংলা আন্দোলনে মেতে উঠল। 'স্বদেশী' আন্দোলন, ও হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন সমান উৎসাহে চলতে লাগল। বিদেশি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, বিদেশি দ্রব্য বর্জন প্রচারণাও চলতে লাগল সমান তালে। ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হলো। হিন্দু মেলা, ধর্মীয় উৎসব পালন হতে লাগল বিশেষ ঘটা করে। ১৯০৬ সালে সারা ভারতব্যাপী 'শিবাজী উৎসব' পালন করে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হলো; তাতে তৎকালীন বিশিষ্ট হিন্দু সমাজনেতা, রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী সানন্দে যোগ দিলেন। '

৬০. Reports, pp 11-12.

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য যে, এই উপলক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজি-উৎসব' লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকর্মে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন এবং 'শুভশঙ্খনাদে জয়তু শিবাজি' উচ্চারণ করেন এবং ধ্যানমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন :

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে গেল। ধর্মীয় বোধের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রাজনীতিকে জন আন্দোলনে রূপায়িত করার চেষ্টা হলো।[৬১]

একালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার বলেছেন,

> ১৯০০ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল কেবলমাত্র শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাবপ্রবণতা; কোনো সুসংগঠিত আন্দোলন ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস ছিল একটা প্রচার সমিতি মাত্র, কোনো সুগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না। গোখেল, তিলক, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, *সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ,*[৬২] ফিরোজশা মেহতার মতো নেতারা ছিলেন জাঁদরেল জেনারেলের মতো, কিন্তু কারও অনুগত বাহিনী ছিল না। কার্জনের নিকটেই কংগ্রেস পরবর্তী উন্নতির জন্যে ঋণী। ১৯০৩ সালে প্রবর্তিত তাঁর শিক্ষানীতি সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আঘাত করে; ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগে সমগ্র হিন্দু-বাংলার উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, সারা ভারতের শিক্ষিত (হিন্দু) সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পটভূমিকায় এ দুটি প্রশ্নে নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী আরও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠে একই স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে, এবং নিজেদের রক্ষার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ... অতএব লর্ড কার্জন একটা মুমূর্ষু সংস্থার শান্তিপূর্ণ সমাধি রচনার পরিবর্তে একটা জাতীয়তাবাদী সমিতিকে বিস্ফোরণ উন্মুখ রাজনৈতিক দলে রূপায়িত করেছিলেন। কিন্তু তখনও তার জনসাধারণের সঙ্গে কোনো সংযোগ ছিল না। তখনও এটি মাত্র কয়েকজনের হাতের ক্রীড়নক, মত সর্বস্ব ও অবাস্তব মাত্র।[৬৩]

বাংলার মাটিতে ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে সন্ত্রাসবাদের বীজ রোপিত হয়, তার উল্লেখযোগ্য পরিণতিতে দেখা যায় 'মানিকতলা বোমার আড্ডা' এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধৃত করে সরকার কর্তৃক ১৯০৮ সালে বিখ্যাত

---

৬১. Misra , 395. 'মনে আছে পান্তির মাঠে 'শিবাজী উৎসব' উপলক্ষে সভাপতি বালগঙ্গাধরের আবেগময় ভাষণে, রবীন্দ্রনাথের শিবাজী কবিতা পাঠে... বাঙালি হিন্দুর যে আন্তরিক উৎসাহ ও অন্তর্বিকাশ দেখিয়াছিলাম'... (যতীন্দ্রনাথ বাগচী) অবশ্য আজও 'ধর্ম নিরপেক্ষ' ভারতরাষ্ট্রে হিন্দুর এই ধর্মীয় উৎসাহ ও অন্তর্বিকাশে ভাটা পড়ে নি। ১৯৫৮ সালে ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা ও আফজল খাঁর নির্মম হত্যার মূক সাক্ষী প্রতাপগড়ে স্বয়ং জওয়াহেরলাল নেহরু শিবাজীর অশ্বারূঢ় মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন।

৬২. পরবর্তীকালের লর্ড এস. পি. সিংহ ও বিহারের গভর্নর। উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই একমাত্র ভারতীয় 'পিয়ার'।

৬৩. Oxford Hist of India, P, 782.

www.pathagar.com

আলিপুর বোমার মামলার সৃষ্টি। বিচার শেষে অন্যান্য আসামিসহ বারীন্দ্র সাত বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং *অরবিন্দ*[৬৪] সন্দেহের অবকাশে মুক্তিলাভ করেন।

বাংলা থেকে সন্ত্রাসবাদ বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সকল সময়ে সন্ত্রাসবাদ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ও বিস্ফোরণ প্রবণ। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৮৬ জন সন্ত্রাসবাদী বিচারে দণ্ডলাভ করে। তাদের মধ্যে ১৬৫ জন ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায়ের; আবার ১৫২ ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। বৃত্তি হিসাবে দণ্ডিত ১৮৬ জনের ৬৮ জন ছাত্র, ১৬ জন শিক্ষিত, ৪২ জন ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র জোতদার ২০ জন কেরানিসহ সরকারি কর্মচারী ৭ জন ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার, ৫ জন সাংবাদিক, বাকি ২৭ জনের কোনো নির্দিষ্ট জীবিকা ছিল না। তাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। *উল্লেখযোগ্য যে, তাদের সকলেই হিন্দু।*[৬৫]

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ আজন্ম ব্রহ্মচারী ও নিরামিষভোজী ডক্টর স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সন্ত্রাসবাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বোমা প্রস্তুতের কার্যকারিতায় বিশ্বাসীও ছিলেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতির নায়ক পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে তিনি গোপনে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের বিশ্বস্ত ছাত্রদের দিয়ে বিস্ফোরক অস্ত্রাদি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৬৬] আর অরবিন্দ তো এ বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিলেন যে, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কারণে ডাকাতি করায় কোনো নৈতিক অপরাধ হয় না।[৬৭] কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণ রাজনৈতিক হত্যা ততটা দূষণীয় চক্ষে না দেখলেও রাজনৈতিক ডাকাতির সমর্থন কখনো করে নি।

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্গাতা গান্ধীর ১৯২০ সালে কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পর সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে অনেকখানি ভাটা পড়ে। চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, প্রকাশ্যে লুণ্ঠন, নির্বিকার ও নির্বিচারে খুনজখম প্রভৃতি কাজের দরুন সন্ত্রাসবাদ কখনো সাধারণ মানুষ কর্তৃক সমর্থিত হয় নি, এবং সশস্ত্র বিপ্লবে নিযুক্ত বাঙালি সন্তানের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতিশীল হলেও তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ কোনো স্তরে জনগণের অনুমোদন লাভ করে নি। এজন্যেই কংগ্রেসের বিপুল ভক্তসমাজ সন্ত্রাসবাদকে মুক্তিলাভের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। গান্ধীর অসমর্থন হেতুও সন্ত্রাসবাদ বিস্তৃত আকার ধারণ করে নি। রবীন্দ্রনাথও 'চার

---

৬৪. মুক্তিলাভের পর শ্রী অরবিন্দের মত পরিবর্তিত হয়। তিনি পণ্ডিচেরিতে আশ্রম স্থাপন করেন। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন মানসে যোগ সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন।

৬৫. Sedition Committee Reports (Annexture).

৬৬. Hist. of Freedom Movement : R. C. Majumdar, vol. ii. p 474; বাংলায় বিপ্লববাদ : এন. কে. গুহ, পৃ. ৩৫৫।

৬৭. Ibid, P. 480, 482.

www.pathagar.com

অধ্যায়' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরিণতি তীক্ষ্ণভাষায় লক্ষ করেছেন : 'মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাদের কার্যকলাপ, প্রচারণা, সংগঠন শক্তি, গুপ্তশব্দ সংকেত এবং গুপ্তভাবে অর্থ ও অস্ত্রাদি চলাচলের ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করলে 'ওহাবি' চিহ্নিত উনিশ শতকের মুসলিম সশস্ত্র জেহাদিদের কথাই স্মরণে আসে। কারণ এসব ক্রিয়াকর্মে দুটি দলে অনেক মিল আছে, যা থেকে নিরাসক্ত মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে— জেহাদিদের আদর্শের অনুকরণ করে বিশ শতকের বাঙালি হিন্দু সন্ত্রাসবাদ সংগঠিত হয়েছিল কিনা। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, জেহাদিদের কর্মধারা ছিল সাধারণ মানুষের অপরাধ ও পাপাচার বোধের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এবং তাদের সব প্রচেষ্টাই ছিল প্রকাশ্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে। ডাকাতি, গুপ্ত খুনজখম, অর্থ লুণ্ঠন প্রভৃতি কর্ম ছিল জেহাদিদের স্বপ্নেরও অগোচর।

> এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ ছিল রাশিয়ার বৈপ্লবিক নীতির অনেকটা অনুসারী। যেসব দলিলপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে রাশিয়ার পঞ্চাশ বছরব্যাপী দীর্ঘ বিপ্লবের পূর্ণ বিবরণ, রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের কর্মসূচি—যার অন্তর্গত ছিল ডাকাতি ও গুপ্ত খুন—প্রভৃতির বর্ণনা মেলে, এবং এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাশিয়ার বিপ্লব ও কর্মপন্থা ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ ছিল এবং অনুপ্রেরণা লাভের উৎস ছিল।[৬৮]

এখানে উল্লেখ্য, বাঙালি সন্ত্রাসবাদের ধর্মীয় দিকটা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের শক্তি সংহারিণী দেবী কালীর নিকট মাথায় গীতা ও তরবারি ধারণ করে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয় সন্ত্রাসবাদীরা ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে পূর্ণ বিশ্বাসী। এজন্যও সাধারণ মানুষ তাদের ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয় নি।

> আর একথা বলার দরকার হয় না যে, বাংলার সন্ত্রাসবাদে মুসলমান ছিল না, এমনকি মুসলমানকে গ্রহণ করাও দলের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। এসব কারণ মূলে সন্ত্রাসবাদ দ্বারা সারা ভারতের এই দুটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানটা আরও বিস্তৃত ও বিদ্বেষাত্মক হয়ে উঠেছিল।[৬৯]
>
> শিক্ষিত বর্ণহিন্দুদের এ কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য : রাজার বরদান হিসেবে ১৯১১ সালে বাংলা বিভাগ রদ হয়েছিল।[৭০]

---

৬৮. Hist. of Freedom Movement, vol ii, p 285.

৬৯. Misra, p 396. প্রবাসী ষষ্ঠি-বার্ষিকী (১৯৬০) পত্রিকায় 'সশস্ত্র বিপ্লবে বাঙ্গালা বলি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৭০. Advanced Hist, of India, p 959.

www.pathagar.com

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের সস্ত্রীক ভারত আগমন উপলক্ষে দিল্লিতে যে দরবার হয়, সে দরবারে তিনটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয় : প্রথম বঙ্গভঙ্গ রদ, দ্বিতীয় বাংলা প্রদেশটি একজন গভর্নরের শাসনাধীন করা এবং তৃতীয় কলিকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর করা। প্রথমটিতে কলকাতাবাসী ভদ্রলোকরা অবশ্য 'নাকের বদলে নরুন' লাভ হলেও এ অস্ত্র দিয়ে আরও কিছুকাল হিন্দুর জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও তার ফলে পূর্ব বাংলাকে শোষণ কর্মটার অবাধ অধিকার লাভ করা কলকাতার পক্ষে কম লাভ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সুবিধাবাদী নীতির আর দফা প্রমাণ পাওয়া গেল, স্বার্থের গরজে ন্যায়নীতিকে কিরূপ নির্লজ্জভাবে জলাঞ্জলি দিতে হয়। পূর্ব বাংলার ভাগ্যোন্নয়ন এভাবে আরও পঁয়ত্রিশ বছরের অধিককাল স্থগিত হয়ে গেল ভাগ্যচক্রের কঠোর লীলায়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উনিশ শতকের শেষে জেহাদি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সক্রিয় সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও ইংরেজদের কঠোর হস্তে দলনের জন্যে। তবু সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, সীমান্তস্থিত মুজাহিদ বসতিতে টাকাকড়ি ও মুজাহিদ আমদানি কোনোকালে বন্ধ হয়ে যায় নি।

> ১৯১৪ সালের বিশ্বসমর চলাকালে তুরস্ক ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মুজাহিদদের মধ্যে নবজাগরণ লক্ষিত হয়। ১৯১৫ সালে সীমান্তে কয়েকবার সংঘর্ষ বাঁধে, তার মধ্যে রুস্তম ও শবকদর এলাকর যুদ্ধ তীব্র ছিল। যুদ্ধশেষে কালো পোশাক পরিহিত ১২ জন জেহাদির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।[৭১]

উক্ত সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের ১৫ জন যুবছাত্র এবং পেশোয়ার ও কোহাটের আরও অনেক ছাত্র মুজাহিদদের সঙ্গে যোগ দেয়; পরে তারা কাবুল যাত্রা করে।

> ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে দেখা যায়, রংপুর ও ঢাকা জেলার ৮ জন মুসলমান মুজাহেদিন দলে যোগ দিয়েছে। উক্ত সালের মার্চ মাসে দুজন বাঙালি মুসলমান মুজাহিদ শিবিরে ৮০০০ টাকা গোপনে বহন করার সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক ঘাঁটিতে ধরা পড়ে। তারা বহু পূর্ব থেকে জেহাদি-আন্দোলনে যুক্ত ছিল।[৭২]

এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলমান জাতির এক অংশ তখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত ছিল। জেহাদি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাড়াও আর একদল মুসলমান বিদেশি রাষ্ট্র কাবুল ও তুরস্কের সহায়তার ইংরেজ বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করত। তাদের নেতা ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার মওলানা ওবায়দুল্লাহ এবং তাঁর সহকর্মী ছিলেন মওলানা মাহমুদ হাসান। তাঁরা হেজাজে ও কাবুলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম প্রবাসীদের নেতৃত্ব দিয়ে সংঘবদ্ধ করতেন ও কাবুলের আমীরের সাহায্যে বিদ্রোহ চলানোর ষড়যন্ত্র করতেন। কাবুলে একটা

৭১. Dedition Com. Report, p 174.
৭২. Ibid, p 157.

www.pathagar.com

সাময়িক সরকারও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মওলবি ওবায়দুল্লাহ ছিলেন তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ষড়যন্ত্রের কয়েকখানি চিঠি সিন্ধের একজন মুজাহিদ নেতার নিকট প্রেরিত হয়েছিল। চিঠিগুলো পরিচ্ছন্ন ফারসিতে হলদে রঙের রেশমি কাপড়ে লেখা এবং জামার ভিতরে অতি প্রচ্ছন্নভাবে সেলাই করা ছিল। কিন্তু চিঠিগুলো ধরা পড়ে ও বিখ্যাত 'রেশমি চিঠির ষড়যন্ত্র' ফাঁস হয়ে যায়।

> এসব বিবরণ থেকে প্রমাণ হয়, প্রথম বিশ্বসমর চলাকালে একদল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান তুরস্ক, হেজাজ ও কাবুলের সাহায্যে এদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালনোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।[৭৩]

১৯২১ সালের ভারতীয় পুঁজিবাদ ও ধনতান্ত্রিকতা স্বাধীনভাবে বিকাশের পথ খুঁজে পাওয়ায় এদেশি ও বিদেশি ধনতান্ত্রিক স্বার্থ বহুল অংশে পুষ্টিলাভ করে। এবং তার দরুন শিল্পকার্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তার ফলে পুঁজিপতি-ধনসম্পদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, মজদুর সংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি পায় এবং এ দুটির পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘর্ষও প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮৯১ সালে অকৃষি কাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা হয় সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ। তাদের মধ্যে ছিল ব্যবসা ও শ্রমশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মচারীসহ বিভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তি, শিক্ষক ও সাংবাদিক।

এই সংখ্যাটি বর্ধিত হয় ঠিক বিভাগ-প্রাক্কালে–শতকরা ২৮ থেকে ৩০ ভাগে। তাদের ১০ ভাগ শ্রমশিল্পে, ৬৬ ভাগ বাণিজ্যে এবং বাকি নানাবিধ বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমজীবীর সংখ্যাও দ্রুত বর্ধিত হয়। আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পল্লীবাসীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৮৮ থেকে ৮২ ভাগে, কিন্তু শহরবাসীর হার বেড়েছে প্রায় ১১ থেকে ১৭ ভাগে। দেশ যতই শিল্পায়িত হচ্ছে ততোই পল্লীবাসীর সংখ্যা হ্রাস এবং শহরবাসীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে।

শ্রমজীবীর সংখ্যা বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার, ডিরেকটর, সুপারভাইজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থদের বাদে বেতনভোগী কর্মীর সংখ্যাও বাড়ছে এবং স্কুল-কলেজের সংখ্যা বর্ধিত হওয়ার দরুন অল্পশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। এসব অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা আর পল্লীজীবনে বা কৃষিকাজে ফিরে যেতে চায় নি; এজন্য তারা কলকারখানায় ভিড় জমাচ্ছে বেতনভোগী যেকোনো কর্মের সন্ধানে। এসব শ্রেণীর মধ্য থেকে আর এক নয়া নেতার দল উদ্ভব হয়েছে; শ্রমিক নেতা, মজদুর নেতা, নামধেয় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার উপলক্ষ করে তারা নিজেদেরও অন্নসংস্থান করছে। তারা শ্রমনেতারও এক সংঘ গড়ে তুলেছে এবং শ্রমজীবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের দাবিও তুলে ধরছে। এসব কারণে ট্রেড ইউনিয়ন

৭৩. Hist. of Freedom Movement : R, C. Majumdar, vol ii, pp 444-46.

www.pathagar.com

গঠিত হচ্ছে, শ্রম আইন বিধিবদ্ধ হচ্ছে, শ্রমিক সমস্যা বাড়ছে এবং শ্রম আদালতও স্থাপিত হচ্ছে শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য। এসব শ্রমজীবীরা ও শ্রমনেতারা বিভাগ পূর্বকালে অনেক সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে হরতাল ইত্যাদি পালন করে। অতএব শ্রমশিল্পে নিযুক্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব দেখা যায় বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের পর থেকে এবং তাদের প্রভাবও নিতান্ত অবহেলার যোগ্য ছিল না।

এইরূপ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর একটি কাজ ছিল কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা। জমিদারদের ও মহাজনদের নির্মম শোষণবৃত্তির ফলে বহু কৃষকের ফসল ফলানো জমি দেনার দায়ে ক্রোকে বিক্রয় হয়ে মহাজনদের গর্ভে ঢুকেছে এবং কৃষকরা সেজেছে ভূমিহীন দিনমজুর শ্রেণী। বাকি খাজনার দায়ে ভূমি নিলামে গেছে বিকিয়ে এবং জমিদার নিয়েছে খাস করে। এভাবেও বহু কৃষক ভূমিহীন হয়ে দিনমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। মাদ্রাজে, বিশেষত বাংলায় গরহাজির শহরবাসী জমিদার হিসেবে কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট ও ম্যানেজাররা বর্তমান শতকে জমিদার সেজেছে এবং ভূমিকৃষককে শোষণ করে জমির সবটুকু রস নিংড়ে নিয়েছে, দুর্ভাগা চাষির ভাগ্যে নুনভাতেরও সংস্থান হয় নি। এসব বিধির কারণে কৃষি আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছে বহুল পরিমাণে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে এসব সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা হয়েছে বাস্তব নীতি গ্রহণ করে : কৃষিখাতক আইন ১৯৩৬ ও মহাজন আইন ১৯৪০ সালে বিধিবদ্ধ করে কৃষিসমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দান করা হয়েছে। এসব আইন পাসকালে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখেছে—তাদের পদতল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, যেসব সূত্রে তাদের আর্থিক উন্নতির পথ বাঁধা ছিল প্রায় পৌনে দু শ বছরেরও ওপর, সেসব উৎসমূল একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তারা প্রবলভাবে এসব আইনের বিরুদ্ধতা করেছে নিজেদের জীবনমরণ সমস্যায় মরিয়া হয়ে। কিন্তু কালের গতিরোধ করতে সমর্থ হয় নি, আইনের সব সূক্ষ্ম তর্কজাল ভেসে গেছে মানবতার রক্ষার বিপুল উৎসাহের বন্যায়।

> এমনকি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান দুর্গ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধেও আঘাত এসেছে এবং এ জগদ্দল পাথর কৃষক সমাজের বুকের উপর থেকে অপসারণ করে তাদেরই সকল স্বত্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছে এ যুগে; যদিও আজাদি-পূর্ব যুগে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি।[৭৪]

১৯২০ সালের পর নাগরিক তথা গ্রামীণ আর্থিক সমস্যা নতুন নতুন অবস্থা থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং এগুলোর সমাধানকল্পে কেবল ধর্মীয় ও বর্ণগত

---

৭৪. এ কাজ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৯৫০ সালে East Bengal Estates Acquisition and Tenancy Act পাস করে। পশ্চিম বাংলাতেও জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ১৩৬২ সালের ১ বৈশাখ থেকে। পরাধীনতার এই শেষ নিদর্শন অবলুপ্ত হয়েছে যুগধর্মের বিবর্তনে। দুদু মিয়ার মৌলিক নীতি 'লাঙ্গল যার জমি তার' কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে।

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা না করে যুগের চাহিদানুযায়ী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। আর এ প্রয়োজন প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছে সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থবোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে। বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সমাজ কালের গতিরোধে সমর্থ হয় নি।

এই কালের চক্র নতুনভাবে আবর্তিত হয়েছে স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবোধের ধারায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যখন মুসলিম লীগ ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দু শ বছর ধরে মুসলমানদের স্বার্থ সর্বতোভাবেই নিষ্পেষিত হচ্ছিল, কিন্তু 'চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির।' শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের একাধিপত্য ভোগের দিন শেষ হয়ে গেল।

এ কাহিনী যথাস্থানে উন্মোচিত হবে। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একথা এখানে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভারতীয় কংগ্রেস এতদিন ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দুর প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; তাদেরই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সযত্নে লালিত এবং নিজেদেরই শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণের মুখপাত্র হিসেবে ছিল তার অস্তিত্ব। ১৯২০ সালে গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কর্মধারায় ধর্মীয় রূপ দিলেন, নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেও। বলা বাহুল্য, অতঃপর কংগ্রেসের কর্তৃত্বও বাঙালি বর্ণহিন্দুর হস্তচ্যুত হয়ে গেল। গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেন নি, সনাতন হিন্দুধর্মের রূপ দিয়ে এটির মাধ্যমে সারা উপমহাদেশের মধ্যে ধনিক ও মজুর, জমিদার ও প্রজা, হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও হরিজন বিভেদে যেসব স্বার্থগত শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব-সংঘাত উত্থিত হয়েছিল, সেসবেরও সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিলেন।

> কিন্তু জনসাধারণ এ নীতির মধ্যে ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে সমর্থ হয় নি; এজন্য সনাতন ধর্মের ধুয়া তুলে রাজনৈতিক বোধ জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে কেবল রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাই সৃষ্টি করেছিল।[৭৫]

দুটি মহাসমরে দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ ধারণা পরিষ্কাররূপে হয়েছিল, এ উপমহাদেশের অস্তিত্ব শুধু ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে, রাষ্ট্রিক অধিকার যেটুকু দেশবাসীকে দেওয়া হয়েছে, সে শুধু শিশুকে প্রবোধ দিয়ে তার হাতের মোয়া অপহরণ করার নামান্তর মাত্র। সত্যিকার রাষ্ট্রিক অধিকার মেলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ফলে। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের 'আজাদ পাকিস্তান' দাবির মধ্যে এই সর্বময় স্বাধীনতা লাভের আকুতি নিঃসংশয়ে ফুটে উঠেছিল। এবং শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়েরও মোহভঙ্গ হলো। তারা সম্যক উপলব্ধি করল, কালের গতি অপ্রতিরোধ্য, আপন গতিতেই কালের মন্দিরা বেজে ওঠে মানুষকে সচেতন ও সাবধান করে যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ ডাক অন্তরে গ্রহণ

৭৫. Misra, 398-99.

www.pathagar.com

করল। এ কথা অনস্বীকার্য, যে ভারতীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে, সেই শ্রেণীই বিশ শতকে নানা সংগ্রাম-সংঘাত করে এবং অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে উপমহাদেশের স্বাধীনতাও অর্জন করেছে এবং যারা ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল, তারাই অগ্রণী হয়ে এক দেহমন নিয়ে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগ বাস্তবায়িত করেছে। সেদিন লর্ড কার্জনের প্রেতাত্মা হয়তো অট্টহাস্য করেছে এই দেখে, স্বার্থের এই বিচিত্র গতিপথে একটা শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী জাতি কীভাবে আত্মবঞ্চনায় আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে।

এ উপমহাদেশের পরাধীনতা যাদের চক্রান্তে সতেরো শ সাতান্ন সালে সম্ভব হয়েছিল, তাদেরই বংশধররা শিক্ষিত বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে সংগঠিত হয়ে ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগ রোধ করেছিল। আবার ১৯৪৭ সালে তাদেরই সাহায্যে এদেশ আজাদি লাভ করেছে এবং তার সঙ্গে বাংলাও বিভাগ হয়ে গেছে তাদেরই সাধনায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ বিচিত্র অবদান অনস্বীকার্য। আত্মস্বার্থের তাগিদে রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ধর্মীয় অনুভূতির রূপ দেওয়ার ও জনমনকে চালনা করার কী আশ্চর্য আত্মবঞ্চনার দৃষ্টান্ত দেখা গেল ১৯০৫ সালে ও ১৯৪৭ সালে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী স্বজাতির এ মনোবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়ে রহস্যচ্ছলে বলেছেন,

> প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময় আমরা কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের ফাঁপরে পড়ি নি এবং গণদেবতার রক্ষিতা নারী প্রেস আমাদের প্রথম বিভাগের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে, যেমন করেছে একদল নির্বোধ ও বর্বর অর্বাচীনকে বর্তমান বিভাগ করার অনুকূলে। আমার এখনও বেশ মনে আছে, বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন সময়ে একটি বাংলা সংবাদপত্রে এরূপ একটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল—লর্ড কার্জন একটি জীবিত নারীকে করাত দিয়ে দু ভাগ করছেন। ... আমার চিন্তা হয়, বর্তমানে সমান মনোবৃত্তিতে চালিত হয়ে এরূপ চিত্রও প্রকাশিত হয়ে থাকবে—লড মাউন্টব্যাটেন নার্সের পোশাক পরে এক বৃদ্ধা নারীর প্রসবকালে সাহায্য করছেন ও একটি সদ্যোজাত একহস্ত ও একপদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র নবজাতককে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরছেন।[৭৬]

মুসলিম সমাজ : বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত

ক

আঠারো শ সাতান্নর পর মুসলমানদের অবস্থা হয়েছিল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভগ্নপক্ষ পাখির মতো। না, তার চেয়েও নিঃসহায় নিরুপায়। কারণ ঝড়ের পরে প্রকৃতি প্রশান্ত হয়ে ওঠে, পাখি পুনরায় নীড় বেঁধে শান্তি পায়। কিন্তু মিউটিনির পর মুসলমানদের ললাটশীর্ষে নেমে এলো বিদেশি শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন আরও নির্মম এবং অমানুষিক রূপ নিয়ে, এবং সুপরিকল্পিত শাসননীতি হিসেবে।

৭৬. The Autobiography of an Unknown Indian, pp 222-23.

www.pathagar.com

সমসাময়িক সব দর্শকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, মিউটিনির পর ইংরেজরা পৃথকভাবে এদেশীয় মুসলমানদের ওপর পনেরো বছর ধরে চালিয়েছে কঠোর উৎপীড়ন। খুনজখমের নারকীয় লীলা কীরূপভাবে চালিয়েছিল প্রথম পর্যায়ে, পূর্বে তার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে। মহারাণী ভারত শাসনভার গ্রহণ করলে রাজকীয় ঘোষণানুযায়ী মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিল, এবার হয়তো নিপীড়ন পর্ব শেষ হলো, নাগরিক হিসেবে অতঃপর মুসলমানরা বিবেচিত হবে।

কিন্তু তা হয় নি। তার পরেই শুরু হয়েছিল আর্থিক নিপীড়ন, শিক্ষা ও তাহযীবের একেবারে বিলোপ সাধন, এককথায় তাদের নাগরিকের সব অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ। ব্রিটিশের এ নীতির মূল কারণ ছিল, মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজরা এদেশ অধিকার করেছিল এবং মুসলমানরাই মিউটিনির জন্য দায়ী, কারণ তাদের স্বপ্ন ছিল মুঘলশাহি পুনরায় কায়েম করা।

> ইংরেজদের ১৮৪৩ সালে সেকালীন গভর্নর জেনারেল এলেনবরা সাবধান করে বলেছিলেন, আমি এ বিষয়ে কিছুতেই চক্ষু বন্ধ করতে পারি নি যে, ঐ জাতটা (অর্থাৎ মুসলমানরা) মূলগতভাবেই আমাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন; এজন্য আমাদের সঠিক নীতি হবে হিন্দুদের মনস্তুষ্টি করা।[৭৭]
>
> মিউটিনি শেষ হওয়ার পরই এলফিনিস্টোন বোম্বাইয়ের গভর্নর হিসেবে বলেছিলেন, রোমানদের নীতি ছিল বিভেদ বাঁধিয়ে শাসন চালাও। আমরাও সে নীতি অনুসরণ করব এবং হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব।[৭৮]

রোমান প্রবাদ বাক্যটি ইংরেজরা বাস্তব নীতি হিসেবেই গ্রহণ করেছিল।

আর একজন ইংরেজ গভর্নর স্বীকার করেছেন, 'মিউটিনির সময়ে এবং তারপর বহুকাল পর্যন্ত মুসলমানদের ভাগ্য ছিল ঘন মেঘাচ্ছন্ন। সেই ভীষণ বিপ্লবকালের সব বিভীষিকা ও দুর্যোগের জন্যে মুসলমানদেরই দায়ী করা হতো।'[৭৯]

১৮৭১ সালে হান্টার সাহেব বলেছেন,

> 'আমার সব সময়েই মনে হয়েছে, ভারতে আমাদের অবস্থিতির সবচেয়ে অব্যক্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো এই যে, দেশের উত্তম ব্যক্তিরা আমাদের পক্ষে নয়।'[৮০]

এই নিপীড়ন কোন কোন ধারায় ও কী নির্মমভাবে হয়েছিল, তার কিছুটা পরিচয় মেলে হান্টার সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে।

তিনি বলেন, 'তারা অভিযোগ তোলে আমরা তাদের শিক্ষিতদের সবরকম জীবনোপায় থেকে বঞ্চিত করেছি। তাদের অভিযোগ, আমরা এমন শিক্ষাপ্রণালি

---

৭৭. Despatch to Duke to Wellington, 18 June 1843 : The Future of Islam in India : ASIA vol. XXVIII p. 874.
৭৮. India To-day—Palme Dutt, p. 389.
৭৯. Life and Work of Syed Ahmad Khan—Graham, p. 40.
৮০. Indian Musalmans, p. 136.

www.pathagar.com

প্রবর্তন করেছি, যার দরুন সমগ্র সমাজটা বৃত্তিহীন হয়ে গেছে এবং তাদের অপমান ও ভিক্ষাবৃত্তিতে ঠেলে দিয়েছে। তারা অভিযোগ করে কাজির পদগুলো তুলে দিয়ে আমরা অসংখ্য পরিবারকে দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিয়েছি, অথচ এরাই মুসলমানদের বিয়ে-শাদি পড়াত এবং প্রাত্যহিক জীবনের সবরকম ধর্মকর্মে বিধান দিত। তারা আরও বলে, তাদের ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দিয়ে তাদের আত্মারও অবনতি ঘটিয়েছি। এসবের উপরেও তারা বলে, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আমরা ইচ্ছাপূর্বক অব্যবস্থা করেছি এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সব অর্থ আত্মসাৎ করে তাদের শিক্ষার পথও বন্ধ করে দিয়েছি'।[৮১]

তিনি আরও বলেছেন,

সংক্ষেপে বলা যায়, তারা এক বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও তাদের কোনো জীবনোপায় নেই ... তারা হতাশভাবে দেনার পাঁকে ডুবে যায়, তারপর প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন ঝগড়া বাধিয়ে দেনার দায়ে সব সম্পত্তি ডিক্রি করে নেয়, ফলে প্রাচীন মুসলমান বংশ সহসা লোপ পেয়ে যায়। ... নিম্নবঙ্গের মুসলমানদেরই আমি বেশি চিনি এবং তারা ব্রিটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে ... যদি কখনো একটা জাতি জীবনোপায় শূন্য হয়ে থাকে, সেটি হলো নিম্নবঙ্গের মুসলমানেরা ... একশ সত্তর পূর্বে বাংলার একজন ভদ্র মুসলমানের গরিব হওয়া অসম্ভব ছিল, এখন তার পক্ষে ধনী হয়ে চলাই অসম্ভব। ... সামরিক রাজস্ব, বিচার ও রাজনৈতিক বিভাগ থেকে মুসলমানদের গৃহে অজস্র ধারায় অর্থ আমদানি হতো, এখন সেসব রুদ্ধ হয়ে গেছে ... (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে) হিন্দু গোমস্তারা জমিদারের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে ও ভূমির মালিকানা পেয়েছে; তার দরুন মুসলমান আমলে যেসব অর্থ মুসলমানের গৃহে যেত, এখন সে অর্থ হিন্দু গৃহে যাচ্ছে। ... আমরা তাদের সামরিক বিভাগে নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছি আমাদের নিরাপত্তার অজুহাতে, আমরা প্রশাসনিক সব কর্ম থেকে তাদের বঞ্চিত করেছি, শাসননীতির অজুহাতে। ... বিচার বিভাগে তাদের ছিল একাধিপত্য, অন্যান্য বিভাগে সিংহের ভাগ। এখন হিন্দুদের অফিসের সর্বস্তরে নিয়োগ করা হচ্ছে। আর ভারতের প্রাক্তন প্রভুরা এখন জেলখানার দু-একটা নগণ্য চাকরি আশা করতে পারে। ... আমরা সরকারি শিক্ষাখাতে যা ব্যয় করি, তার ষোলো আনাই হিন্দুরা ভোগ করে নয়া শিক্ষানীতির ফলে। ... বাযয়াফতীকরণের পর থেকেই মুসলমান শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল ... তারপর বাংলায় শিক্ষিত মুসলমানের ভদ্র চাকরি একেবারে লোপ পেয়ে গেল; এবং এটিই হলো বাংলায় মুসলমানদের অবনতির দ্বিতীয় প্রধান কারণ। ... আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাদের শিক্ষার এই বৃহৎ মূলধনটি (মহসীন ফান্ড) আত্মসাৎ করেছি এবং তার দ্বারা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, যার ফলে মুসলমানরা একেবারে বিতাড়িত হয়েছে[৮২] ... এখন সমস্ত সরকারি অফিসে মুসলমান পর্ব উপলক্ষে ছুটির কোনো বরাদ্দ নেই ... আমাদের জনশিক্ষার সহানুভূতিহীন নীতির ফলেই তাদের মধ্যে অশিক্ষার প্রসার বেড়ে গেছে।[৮৩]

---

৮১. Indian Musalmans, p. 140.

৮২. এ টাকায় ১৮৩৬ সালে হুগলি মহসিন কলেজ স্থাপিত হয়। আমি কলেজটিতে ১৯২৫-২৯ সালে ছাত্র ছিলাম। তখন মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬-২০ জন এবং একজন মৌলবি ব্যতীত কোনো মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন না।

৮৩. Indian Musalmans. pp. 141-189.

www.pathagar.com

'দূরবীন' নামক সমসাময়িক ফারসি সাপ্তাহিক পত্রিকা সমকালীন মুসলমানদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল :

> ছোটবড় সবরকম চাকরি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দেওয়া হচ্ছে। সরকার সব শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। কিন্তু জমানা এমনই হয়েছে যে, প্রকাশ্যে মুসলমানদের বাদ দিয়ে গেজেটে চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনারের অফিসে কয়েকটি চাকরি খালি হলে সরকারি গেজেটে সে সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, পদগুলো কেবলমাত্র হিন্দুদেরই দেওয়া হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, মুসলমানরা এখন এমন নিম্নস্তরে নেমে গেছে যে, উপযুক্ততা থাকলেও সরকারি বিজ্ঞপ্তির বলে তাদের সরকরি চাকরি থেকে দূরে রাখা হয়। কেউ তাদের অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখে না; এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরা তাদের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না।[৮৪]

নির্যাতনের এ করুণ কাহিনী আরও বিস্তৃত করায় কোনো লাভ নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, কেবলমাত্র সরকারি চাকরি থেকেই বঞ্চিত করা হয় নি, শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখে—চিকিৎসা, আইন প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তিসমূহ থেকেও মুসলমানদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয়েছিল যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুরূপ কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও হয় নি এককালীন মুসলমান সম্প্রদায়ে। অথচ ঠিক এই যুগে কেরানি প্রভৃতি সরকারি বেসরকারি অফিসের চাকরিতে এবং চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দুরা শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

> ইন্ডিয়া অফিস মুসলমানদের এসব ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ দিতে ভয়কাতর, কারণ তাদের মতে মুসলমানদের মিউটিনির পর আর কোনো সুযোগ দেওয়া সুবুদ্ধির কাজ ছিল না। আরও সমীচীন ভাবত না, একই সঙ্গে দুটো প্রধান সম্প্রদায়কে অনুগ্রহ দেখানো বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় অংশ দেওয়া।[৮৫]

সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাপারে ইংরেজ কখনো মুসলমানকে বিশ্বাস করে নি; এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যা নিয়ে পাছে বহির্বিশ্বের কোনো দেশ মাথা ঘামায়, এজন্য ইংরেজ এ দেশটিকে নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার হিসেবে সবাইকে সতর্ক করে দূরে রাখত।

ইংরেজের এই ভীতিসঞ্জাত একদেশদর্শী নীতির ফলে মুসলমানরা এক শ দশ বছরেরও অধিককাল 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে' কাটাতে বাধ্য হয়েছে; পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পায় নি নির্ভরযোগ্য আসন লাভ করতে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে।

---

৮৪. দূরবীন : জুলাই ১৮৬৯ : Indian Musalmans, p. 167.
৮৫. Modern Islam in India—C. W. Smith, P. 163,

www.pathagar.com

সংক্ষেপে বলা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানের চরম দুর্দিন। তখন রাষ্ট্রক্ষেত্রে দিল্লির মুঘল বাদশাহির একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা এবং আউধের মুসলিম রাজ্য প্রায় বিলুপ্ত। ছয় শ বছরের মতো একচ্ছত্র শাসন-শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাষ্ট্রভাষা ফারসিকে উৎখাত করে ইংরেজির প্রচলন হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় সমস্ত চাকরি থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়েছে। কাজির পদ বিলোপ করে, মুসলিম আইন ব্যবস্থা রহিত করে ব্রিটিশ আইন প্রচলন শুরু হয়েছে। সেকালের নতুন.ফৌজদারি আইন মুসলিম ফৌজদারি আইনকে একেবারে রদ ও রহিত করে দিয়েছে। এই সময়ই বাংলা ও বিহারে 'বাযেয়ফতী'করণ নীতির বলে মুসলিম ওয়াকফ ও শাহি লাখেরাজ দানসমূহ সরকারে বাযেয়াফত হওয়ায় মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষাগত সবরকম পেশা থেকে বিতাড়িত করে বেকারের জাতিতে পরিণত করা হয়েছে। বালাকোটের বিপর্যয় ও তিতুমীরের পতনের পর মৌলবি মোল্লা শ্রেণীকে বিপজ্জনক জ্ঞান করে তাদের সবরকম রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আঠারো শ সাতান্ন আজাদি যুদ্ধকালে বাহাদুর শাহকে বাদশাহ হিসেবে ফতোয়া দেওয়ায় শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেই ব্রিটিশের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছেন। এভাবে মুসলমানরা নেতা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃত স্বজাতি প্রেমিকরা মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। এমন জাতীয় দুর্দিনে ও সংকটকালে নতুন নীতির অনুসরণ না করলে জাতি হিসেবেই মুসলমানের অস্তিত্ব সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

খ.

চরম দুঃখের দহনে ও নির্যাতনের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে মুসলমানদেরও চৈতন্যোদয় হয়েছিল। এ কাণ্ডজ্ঞান তাদের জন্মাল, সশস্ত্র বিদ্রোহ করে শ্বেত দ্বীপবাসীদের তাড়ানো যাবে না, নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের আজাদি লাভের উপায় চিন্তা করতে হবে। আর এ কাজের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইংরেজের সঙ্গে বৈরীভাবে না চলে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলতে হবে।

রোজ কিয়ামতের মতো অভিশাপ জর্জরিত মুসলিমজাতি ও চরম সন্ধিক্ষণে আর একবার স্মরণ করল 'হিন্দের ইমাম' শাহ ওয়ালীউল্লাহর মহৎ শিক্ষাকে। তিনি বলেছিলেন, এখনই অস্ত্রধারণ করে ভারতের মুসলমান সমাজ সংস্কার করার সময় যদি থাকত, তাহলে তিনি অস্ত্রধারণ করতেও ইতস্তত করতেন না। তাই অস্ত্রের পরিবর্তে তিনি কলম ধরেছিলেন, সমাজ মানসকে প্রভাবিত করার জন্য। সমাজ কল্যাণের যে আদর্শ তাঁর চিন্তার প্রধান বস্তু, আর তার জন্য যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মীয় উদারনীতি তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের রচনায় সেসব আরও পরিচ্ছন্ন ও বিশদ হয়েছিল। আবদুল আযীযের জীবদ্দশাতেই

www.pathagar.com

দিল্লি পর্যন্ত ইংরেজের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য তাঁর এ বাস্তব জ্ঞানও জন্মেছিল, ইংরেজ শক্তি ও তার সভ্যতা কালচারকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়, বুদ্ধিরও পরিচায়ক নয়।

> দিল্লিতে যখন কোম্পানি কলেজ স্থাপন করে, তখন মুসলমানরা কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করতে ইতস্তত করাতে তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সমর্থন করে এক ফতোয়া প্রচার করেন। ইংরেজের অধীনে তিনি চাকরি গ্রহণও সমর্থন করেন এবং এ বিষয়ে তিনি মুসলমানদের উৎসাহ দেন। কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্যে কোম্পানি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিন্তু তিনি এ পদ গ্রহণ করতে পারেন নি দিল্লি ত্যাগ করতে সম্মত হন নি বলেই।[৮৬]

যাহোক, এই পিতাপুত্রে ওলেমার শিক্ষাকে সম্বল করে সমকালীন মুসলমান নেতারা জেহাদি মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ও মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে ইংরেজের সহযোগী হওয়ার মন-মানস তৈরি করতে অগ্রণী হলেন। বাংলা প্রদেশে এ কাজে প্রথম অগ্রসর হলেন নওয়াব আবদুল লতিফ। ১৮৬৩ সালে তিনি 'মেহামেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন করে কলকাতায় মুসলমান শিক্ষিতদের একত্রিত করলেন তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নগুলোর আলোচনা করতে। এ আলোচনা হতো ইংরেজি চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের আলোকে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুকূল মন-মানস নিয়ে। ব্রিটিশ কালচার ও ব্রিটিশ আর্থিক নীতি ও শাসন নীতির প্রতি সদ্ভাবাপন্ন হলে মুসলমানদের কী সুযোগ সুবিধা লাভ হতে পারবে, সেসব ওয়াকিবহাল করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এ বোধ তাঁর জন্মেছিল যে, ব্রিটিশ শক্তি এত প্রবল যে, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব এবং যুগের পরিবেশে এত প্রয়োজনীয় যে, তাকে অবহেলা করা অসম্ভব। অতএব মুসলমানরা উন্নতিকামী হলে তার সহযোগিতা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং এই সহযোগিতার ফলেই মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠা সম্ভব। অতএব শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর চেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা হলো, বাংলার অন্যান্য স্থানে কলেজ স্থাপিত হলো এবং মুসলিম ছাত্রদের বেতনদানের জন্যে ধনী মুসলমানদের সাহায্য গ্রহণ করা হলো।

রাজনীতিক দিক দিয়ে তিনি ব্রিটিশের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং ওহাবি আন্দোলন থেকে মুসলমানদের সহানুভূতি ফিরিয়ে এনে জেহাদি মনোভাবকে প্রকাশ্যে নিন্দা করা হলো। এ উদ্দেশ্যে মুসলমান ওলেমা সমাজের ফতোয়া জড়ো করা হলো।

> মওলানা কেরামত আলী ও উত্তর ভারতের লক্ষ্মৌ, দিল্লি, রামপুর প্রভৃতি স্থানের আলেমদের ফতোয়া সংগ্রহ করা হলো; এমনকি মক্কাশরীফের হানাফি শাফি ও মালেকি মযহাবগুলোর মুফতিদেরও ফতোয়া সংগৃহীত হলো।[৮৭]

---

৮৬. ভারতে ওহাবী আন্দোলন—আ. ম. হবিবুল্লাহ।

৮৭. ফতোয়াসমূহের বর্ণনা Indian Musalmans, App. I, II ও III দেখুন ও এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে দেখুন।

www.pathagar.com

এসব ফতোয়ার প্রধান শিক্ষা ছিল 'ভারত দারুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের রাজ্য, দারুল হরব অর্থাৎ 'শত্রুর দেশ নয়।' মওলানা কেরামত আলী আরও পরিষ্কার করে বলেছিলেন, 'জেহাদ কোনোক্রমেই দারুল ইসলামে বৈধ নয়। এখন যদি কোনো ভ্রান্ত মূর্খ দুর্ভাগ্যবশত এই ব্রিটিশ ভারতের শাসনশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করে, সে জেহাদকে প্রকৃত বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হবে এবং বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব এমন যুদ্ধও অন্যায় এবং কেউ যদি এমন যুদ্ধ করে, তাহলে মুসলমান প্রজাদের কর্তব্য হবে শাসকের সাহায্য করা এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ করা। ফতোয়া আলমগিরিতে এরূপ সুস্পষ্ট বিধান আছে।' এসব ফতোয়ার বলে সাধারণ মুসলমান মানস শান্তি লাভ করল জেহাদ বর্জন করে এবং শাসক শ্রেণীও স্বস্তিলাভ করল মুসলমানদের রাজভক্তি অর্জন করে। বলা বাহুল্য, সে যুগের আবহাওয়া যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের জেহাদি মনোভাবের জন্য এবং তার দরুন ইংরেজদের মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ ও বিতৃষ্ণার জন্যে, তাতে এসব ফতোয়া প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছিল সে উত্তাপ উত্তেজনা প্রশমিত করতে, সন্দেহ-বিতৃষ্ণা দূর করতে কালক্রমে দুটি জাতিকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সহানুভূতির আকর্ষণে নিকটবর্তী করে তুলতে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে নওয়াব আবদুল লতিফের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির অধিবেশনে এই বহু বিতর্কিত প্রশ্নটির সমাধান করা, সিদ্ধান্তটিকে বহুলভাবে প্রচার করা ও মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজভক্তির প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এটিকে উপস্থিত করা। এ হিসেবে তিনি ইংরেজ রাজশক্তির ও অবস্থাপন্ন মুসলমানদের কৃতজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন।

গ.

শরিয়তি ইসলামের হেফাজতকারী আলেম সমাজের ফতোয়ার ফলে মুসলমান-মানস ধর্মীয় উদ্বেগ থেকে শান্তিলাভ করল ইংরেজি শিক্ষা ও ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলার এবং সেইসঙ্গে সামাজিক সংস্কার কর্মের ও ইসলামকে নবীকরণের ভার পড়ল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সমাজ নেতাদের ওপর। উল্লেখযোগ্য, ইসলামি ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের কর্ম শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদের হাতে এবং তার শেষ স্বার্থক রূপায়ণ দেখা গেছে আল্লামা ইকবালের দ্বারা। অবশ্য প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও রূপদানের কর্মে আজও বিরতি নেই এবং নিশ্চয়ই কোনো যুগে তা শেষ হয়ে যাবে না। মানুষ যতদিন দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকবে, ততদিনই চলবে এ সাধনা, এ অনন্ত অন্বেষা।

www.pathagar.com

এখানে আরও একটি কথা বিশদ হওয়া উচিত। ইয়ংবেঙ্গল রূপে কথিত নব্যহিন্দুরা ইংরেজি সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে যে শিক্ষা যে আদর্শ লাভ করেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এবং মিল, বেন্থাম ও টমপেইনের চিন্তাধারা থেকে যেমানসের সাক্ষাৎ পেয়েছিল, তার প্রথম প্রতিক্রিয়াতে দেখা গিয়েছিল প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতা 'যুক্তিবাদের সঙ্গে মিলিত হলো ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস, গতিহীন সমাজের জড়বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ। সমাজ জীবনে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ দেখা দিল, সমগ্র কলকাতা কম্পিত হলো। 'Age of Reason'[৮৮] আশ্রয় করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে যা নিষিদ্ধ, তাই আচরণীয়; যা বিধিসম্মত ও আচরণীয় তা নিশ্চয়ই অন্যায়, অসঙ্গত ও অনাচরণীয়। সুতরাং মুক্তির প্রথম ধাপ, হিন্দুর সামাজিক আচার বিরোধী কর্মকাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ। ... *সুতরাং হিন্দুর ধর্মকর্ম আচার-আচরণ বিসর্জিত হলো, সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি তাঁরা পালন করলেন হোমারের ইলিয়ড আবৃত্তি করে;*[৮৯] নিষিদ্ধ আহারাদি ভক্ষণ করলেন এবং উচ্ছিষ্টাংশ যেখানে-সেখানে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বিরক্ত করতে লাগলেন। রাজনারায়ণ বসুর পিতা পুত্রকে তাঁর সঙ্গে একত্রে মদ্যপানে আহ্বান করতে সংকোচবোধ করেন নি। *বিতর্কসভায়, সাময়িক পত্রাদিতে এবং আলোচনা বৈঠকে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের উপর আক্রমণ শুরু হলো।*[৯০] মধুসূদন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন ঘোষ প্রমুখ খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন। ঘরে ঘরে বিবাদ-বিসম্বাদ, পীড়ন, নির্যাতন; কেহ বিতাড়িত কেহ নির্বাসিত ত্যাজ্যপুত্র হতে লাগল।

মুসলমান নব্যনেতাদের মধ্যে কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রার্থী নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উন্মার্গগামিতা বা বেলেল্লাপনা লক্ষ্য করা যায় নি অথচ তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমীর আলী, খোদাবখশ প্রভৃতির মতো উচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের আদর্শে স্থাপিত আলিগড় কলেজের 'নিউ লাইট' আখ্যাত ছাত্রদল। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল : প্রথমত, পঞ্চাশ বছর পরে ইংরেজের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার 'গ্লামার' বা জেল্লা তখন ফিকে হয়ে গেছে, তার প্রকৃত স্বরূপ সকলের নিকট পরিচিত হয়েছে এবং তার দরুন নব্য সংঘাতের প্রথম চোট কেটে যাওয়ায় ইংরেজিয়ানার মোহমুক্তিও হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব যেরূপ ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে রাজপুরুষদের খেয়াল খুশিতে ও অনুগ্রহে হয়েছিল, সেরূপ পরিস্থিতিতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা, ত্রুটি,

---

৮৮. Tom Paine লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হিন্দু কলেজের কোন কোন ছাত্র এর এক কপির জন্য এক টাকার স্থলে আট টাকা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। Hist. of Political Thought B. B. Majumdar, p. 83.

৮৯. প্যারিচাঁদ মিত্রের উক্তি; শিবনাথ শাস্ত্রির 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'-এ উদ্ধৃত।

৯০. উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—৩৮-৯ পৃ.।

www.pathagar.com

গলদ এবং বুদ্ধিগত বর্ণসংস্কারত্ব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এবং দেখা দিয়েছিলও। উদ্বোধনের প্রথম প্রভাতে এই গলদ ও বর্ণসংস্কারত্বের ঊর্ধ্বে উঠা সে আমলের চিন্তানায়ক ও সাংস্কৃতিক অগ্রদূতদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দেশীয় হাড়-মাংসের সঙ্গে বিদেশি মনন ও মন ঠিক জোড়া লাগে নি। এজন্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পর্ক, বুদ্ধিগত বর্ণসঙ্করত্ব এবং বিকাশের অস্বাভাবিকতা ও আচরণের অন্তর্বিরোধ—যা হিন্দু সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, তার সাক্ষাৎ মেলে নি মুসলমান নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে। কারণ মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে প্রয়োজনের তাগিদে ও জীবনসমস্যার অত্যাবশ্যক পরিপূরক হিসেবে, বিদেশির প্রয়োজনে বা অনুগ্রহে নয়। সমকালীন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জৈবিক কারণে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত মুসলিম-ভারতের নবজীবনধারা ও সংস্কৃতির জনকদের চরিত্রগত ও আচরণগত এই বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। তৃতীয়ত, আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামের ও খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষায় এবং ইসলামি ও খ্রিষ্টানি সমাজ জীবনে কোনো বিপরীত মেরুর বিভেদ পার্থক্য নেই। ইসলামের একেশ্বরবাদ খ্রিষ্টানের অপরিচিত নয়, এজন্য মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের কিতাবিয়া বলে কাছে টানে, এমনকি ধর্মান্তর না ঘটিয়ে বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়েও; হিন্দুর মতো ম্লেচ্ছ ভেবে দূরে নিক্ষেপ করে না। সামাজিক আচরণে ও মেলামেশায় এবং ধর্মীয় নীতিতে ইংরেজ এজন্য মুসলমানদের নিকট কোনো নতুন জ্ঞান বহন করে আনে নি।

> এমনকি ইংরেজের মিল, বেন্থাম, টম পেইন তাঁর 'Age of Reason' নিয়েও নয়—অত্যাধুনিক বুদ্ধির মুক্তি, ধর্মবিশ্বাসে যুক্তির প্রাধান্য, স্বাধীন চিন্তা ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মহৎ শিক্ষাসমূহ ইসলামের তুলনায় কোনো নতুন বার্তা নয়, নতুন জ্ঞান নয়। এজন্য ইংরেজি শিক্ষা মুসলমান সমাজে কোনো আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয় নি।[৯১]
>
> প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবিও বলেছেন, আমরা যখন সামগ্রিকভাবে মুসলিম-খ্রিষ্টান জীবনধারা হিন্দুর সঙ্গে তুলনা করি, তখন আমাদের মুসলিম-খ্রিষ্টান পরিবারের কিংবা খ্রিষ্টানত্ব ও ইসলামের পার্থক্যটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।[৯২]
>
> ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করতে মুসলমানদের আহ্বান করে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেছিলেন, বর্তমানে যদি কোনো ভাষার শিক্ষা ভারতে জীবনোপায়ের পথ খুলে দেয়, তা কেবলমাত্র ইংরেজি ... যে মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা করেছে, তার এ বোধ জন্মেছে যে, ধন প্রাণের নিরাপত্তা নির্ভর করে ইংরেজের শাসন স্থায়িত্বের উপর।[৯৩]

---

৯১. ধর্মনাশের ভয়ে বা ধর্মীয় কারণে মুসলমানরা প্রথম যুগে ইংরেজি শিক্ষা করে নি; এ ধারণা কত ভ্রমাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণাসঞ্জাত, পরে বিশদ করা হচ্ছে।

৯২. The World and the West, p. 45, 46.

৯৩. A Minute of the Hoogly Madrassa, 1877, P. 3

www.pathagar.com

আরও তিন দশক পর অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন খুদাবখশ বলেন, ইসলামের শিক্ষায় এমন কিছুই নেই, যা আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থী।[৯৪]

'আমরা বর্তমানে আমাদের কর্মসূচি থেকে রাজনীতি বাদ দেব ... এবং সরকারকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করব রাজদ্রোহিতা ও অরাজতা নাশ করতে।'[৯৫]

'মুসলিমদের সবচেয়ে ভীষণ ব্যাধি, যাতে তারা আজও ভুগছে, তা হচ্ছে প্রথমত আলস্য, দ্বিতীয়ত ব্যবসা-বাণিজ্যে বীতশ্রদ্ধা'।[৯৬]

তিনি মুসলমানদের সরকারি চাকরির মোহ ত্যাগ করে বাণিজ্যকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯২৯-৩১ সালে আমি যখন তাঁর শেষ ছাত্রদলের অন্তর্ভুক্ত, তখন বারবার দেখেছি, ইংরেজদের গোলামির প্রতি তাঁর কী অপরিসীম ঘৃণা। তিনি তাঁর ছাত্রদের ব্যবসায়ী হতে, শিল্পী হতে এবং স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর মতে আমাদের সামাজিক দুর্নীতি, আর্থিক হীনাবস্থা ও ব্যক্তিক অসহায় অবস্থার দূরীকরণ হতে পারে রাজনৈতিক আন্দোলন করে নয়, একমাত্র সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা।[৯৭]

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ছিলেন এ বিষয়ে সবার উর্ধ্বে ও শ্রেষ্ঠতম। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রধানত উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজের সর্বস্তরে নবজাগরণের জোয়ার উঠে এবং ভারতীয় মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়। এজন্য তাঁকে বলা হয় মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের পুনরুজ্জীবন সাধনায় স্যার সৈয়দের উত্তর ভারতে যে দান, বাংলা প্রদেশে নবাব আবদুল লতিফের দান তার চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নয়। লক্ষণীয় যে, আবদুল লতিফ ছিলেন সৈয়দ আহমদের চেয়ে প্রায় এগারো বছরের ছোট; অথচ আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সাল থেকে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার দিকে জোর দেন; তিনি ১৮৬৩ সালের জানুয়ারিতে এ উদ্দেশ্যে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন করেন এবং উক্ত সালেরই ৬ অক্টোবর আমন্ত্রিত হয়ে সোসাইটিতে সৈয়দ আহমদ 'দেশপ্রেম ও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে ফারসিতে একটি বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর ১৮৬৪ সালে সৈয়দ আহমদ 'সায়েন্টিফিক সোসাইটি' স্থাপন করেন ও মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষাদানের বিষয়ে আন্দোলন জোরদার করেন। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন, আবদুল লতিফের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সৈয়দ আহমদ এ কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে উভয়ের মহৎ অবদানকে সমান মর্যাদা দিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, উভয়ের চিন্তাধারা ও কর্মধারা ছিল অভিন্ন, ভূমিকা ছিল এক; এবং উভয়েরই সমবেত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এদেশের মুসলমানদের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল।

মিউটিনির যুগসন্ধিক্ষণে আমরা পুরুষসিংহ স্যার সৈয়দ আহমদের পরিচয় পাই। বিপ্লবকালীন তাঁর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মেছিল তার ফলেই তিনি

---

৯৪. Essay : Indian and Islamic.
৯৫. Essay : Indian and Islamic.
৯৬. Essay : Indian and Islamic.
৯৭. Essay : Indian and Islamic.

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও কল্যাণাভিসারী করার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এ জ্ঞান তাঁর জন্মেছিল, ইংরেজ শাসন ভারতে আপাতত সুপ্রতিষ্ঠিত, বাহুবলে তার অপসারণ অসম্ভব। এজন্য তিনি শিক্ষা দিলেন, ইংরেজরা পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে এদেশে যে নবযুগের সূচনা করেছে, মুসলমানদেরকে তার পাঠ নিতে হবে, সে ভাবধারা গ্রহণ করে নয়াবিশ্বের যোগ্য নাগরিকের অধিকারসমূহ অর্জন করতে হবে, নতুবা তাদের কল্যাণ তো নেই-ই, তাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্য একদিকে তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে ও ইংরেজ শাসনের সহযোগিতা করতে আহ্বান করেন। অন্যদিকে ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের দূরীকরণ করে সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত লেখনী চালনা করে 'আসবাব-ই-বাগাওয়াৎ-ই-হিন্দ' ও 'হিন্দের রাজভক্ত মুসলমানগণ' পুস্তিকা রচনা করেন। প্রথমটিতে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, মিউটিনির জন্যে দায়ী মুসলমানরা নয়, ইংরেজদের হৃদয়হীন ব্যবহার, কঠোর শাসননীতি ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে এ মিউটিনির উদ্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, মুসলমানরা কীভাবে আপন ধনপ্রাণ তুচ্ছ করেও ইংরেজ পুরুষ, নারী ও শিশুর প্রাণরক্ষা করেছে। হান্টারের গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তথাকথিত ওহাবিদের সর্বরোষ উদ্যত ছিল শিখদের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়। তাঁর এ মতের সমর্থনে এখানে উল্লেখযোগ্য, কলিকাতায় থাকাকালে (১৮২০ খ্রি.) জীওয়ান বখশ নামে একজন বড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সৈয়দ আহমদকে (ব্রেলভি) ইংরেজদের এক সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ধর্মসঙ্গত ও মুসলমানের কর্তব্য কি না। উত্তরে তিনি বলেন,

> ইংরেজের মত উদার ও পরমতসহিষ্ণু সরকারের জেহাদ করা শুধু অসঙ্গত নয়, ধর্মবিরুদ্ধও। কিন্তু পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।[৯৮]

স্যার সৈয়দ আহমদের উপরোক্ত পুস্তিকা দুখানির সব মতামত আজকের দিনে হয়তো নির্ভুল না মনে হতে পারে, কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর সদুদ্দেশ্যে এতটুকু সন্দেহ নেই, এবং সমসাময়িক পরিস্থিতিতে তাঁর এ ভূমিকার অত্যন্ত উপযুক্ত ও সুবুদ্ধির হয়েছিল। ভূমিকার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের প্রতি ইংরেজের বিরাগ ও বিরূপ দৃষ্টি দূরীভূত করা এবং এ উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছিল।

১৮৭০ সালে ইংল্যান্ড সফরকালে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন,

> 'সবকিছু উত্তম স্বর্গীয় ও পার্থিব, যা মানুষের থাকা উচিত, সবই বিধাতা ইউরোপের বিশেষত ইংরেজদের উপর অকাতরে বর্ষণ করেছেন'।[৯৯]

---

৯৮. ওহাবী আন্দোলন—আ. ম. হবিবুল্লাহ।

৯৯. Life and Works of Syed Ahmad Khan—Graham.

www.pathagar.com

তিনি লন্ডন থেকে এদেশে জনৈক বন্ধুকে লিখলেন,

'ভারতবাসী উচ্চ ও নীচ, ব্যবসায়ী ও বেনে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকেই যখন শিক্ষা, আদবকায়দা ও সচ্চরিত্রতার দিক দিয়ে তুলনা করা হয়, তখন একটা অধম জানোয়ারের সঙ্গে এক সমর্থ সুন্দর মানুষের তুলনা মনে পড়ে যায়'।[১০০]

কিন্তু তিনি আশাহীন হন নি। শিক্ষার আলোক পেলেই তাঁর দেশের মানুষ সমান স্তরের কালচার পাবে।

'হিন্দুস্থানীরা শিক্ষা পেয়ে সভ্যতা অর্জন করলে ভারত তার প্রাকৃতিক সম্পদ বলে উপরে না হলেও অন্তত ইংল্যান্ডের সমকক্ষতা অর্জন করবে'।[১০১]

গাজীপুরের তর্জমা সমিতির উদ্বোধনকালে ১৮৬৪ সালে তিনি বলেছিলেন,

'তোমরা ইতিহাস শিক্ষা করো, তাহলে মিউটিনির মতো মহাভুল করবে না; বিজ্ঞান শেখো, তাহলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে; আর রাষ্ট্রিক অর্থনীতি শেখো, তাহলে জানবে, রাজস্ব আদায় হয় তোমাদের উপকারের জন্য, সরকারের জন্য নয়।'[১০২]

এসব উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি বিশদ হয় যে, স্যার সৈয়দের এ দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিই মুসলমানদের উদ্ধার প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এজন্যে তিনি সব সংকোচ ও বাধা ঝেড়ে ফেলে আলিগড় কলেজ স্থাপনে অগ্রণী হলেন। এটিতে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের মডেলে পুরোপুরি ইউরোপীয় কারিকুলাম গ্রহণ করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। মিশনারি কলেজগুলো থেকে এটার পার্থক্য এই ছিল যে, এখানে ইসলামি শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হয়, কারণ স্যার সৈয়দের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'এমন কলেজ স্থাপন করা, যেখানে মুসলমানরা ধর্মীয় বিশ্বাসে কিছুমাত্র পীড়িত না হয়ে ইংরেজি শিক্ষা করতে পারবে।' ১৮৭৭ সালের ৮ জানুয়ারি যখন কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন তদানীন্তন ভাইসরয়, তখন তাঁকে প্রদত্ত মানপত্রে একথাও সুস্পষ্ট ছিল।

'ভারতে ব্রিটিশ শাসন পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ... এর উদ্দেশ্য ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজ্যের সুযোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা'।[১০৩]

আজাদিলাভের সত্তর বছর পূর্বে আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখানের ছাত্ররাই ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ হিসেবে পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে দেশের এক শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে। বর্তমান শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রাকাশে আলিগড়ি শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা

১০০. Graham p. 125-126.
১০১. Ibid. p. 127.
১০২. Graham, p. 54.
১০৩. Graham, p.178

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ও তাৎপর্যময় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির হেতুতে এ সমাজের অবদান অপরিসীম। আলিগড় কলেজের ভিত্তি স্থাপনের মধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টিরও অঙ্কুর সুপ্ত ছিল, বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না।

খ.

আলোচ্যকালে ইসলামি ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন করা এবং জীবনের কার্যক্ষেত্রে ইসলামের প্রগতির প্রবাহ সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছিল স্যার সৈয়দ, আমির আলী, খুদাবখশ প্রমুখের লেখনী মুখে।

স্যার সৈয়দ একদিকে কোরানের নতুন ব্যাখ্যাদান করে মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তাধারা পুনর্গঠনে নিরলস লেখনী চালনা করেছেন; অন্যদিকে তিনি মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন মানসে কঠোর সাধনা করেছেন। এবং সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করে এসব ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ পুনরুজ্জীবনের জন্যে জীবনপাত করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইসলাম মুক্তবুদ্ধিনির্ভর ধর্ম, অন্ধ অনুসরণ বা তর্কসীদের কোনো স্থান নেই এবং সত্যানুসন্ধান বা ইজতেহাদের দ্বার কখনো রুদ্ধ হতে পারে না। তাঁর প্রথম কথা ছিল, কোরানই ইসলামের পরম মেরুদণ্ড, অন্য সব দ্বিতীয় স্তরের ও সহায়ক মাত্র। তাঁর দ্বিতীয় কথা ছিল, যুক্তি ও স্বাভাবিকতাই মূল মাপকাঠি। ইসলামকে যেরূপ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, সে সর্বদা প্রগতিবাদী, কারণ প্রগতিবিমুখ হলেই ইসলামের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁর চিন্তাধারা ইসলামের প্রথম যুগের মুতাজিলা সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিল। কিন্তু এ কথায় দ্বিধামাত্র নেই যে, কালের পরিস্থিতিতে দেয়ালের লিখন তিনি নির্ভুলভাবে পাঠ করেছিলেন। এজন্য অধঃপতিত মুসলমান সমাজের চক্ষুরুন্মীলন করে যুগধারার অনুবর্তী হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য পুনর্নির্মাণ করার পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু সমকালীন মুসলিম মানস প্রতিকূলতা করে তাঁকে চরম বাধাদান করেছে; কাফের ফতোয়া দিয়ে, 'নেচারী' আখ্যা দিয়ে তাঁকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু আপন সদুদ্দেশ্যের অকৃত্রিমতায় নিঃসংশয় হয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ে অটুট মনোবলে তিনি সব বাধাবিঘ্নের মোকাবিলা করেছেন; বিপক্ষতার ঘনঘটা অপসারিত করে মুসলিম মানসকে যুগাভিসারী করে কল্যাণপথে চালিত করেছেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্যার সৈয়দের মতামতের ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে সেদিন যে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে যে মুষ্টিমেয় মনীষীরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুদূর পূর্ব বাংলার ঢাকাবাসী মওলানা ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অন্যতম। এ নামটি আমরা যেন এ প্রসঙ্গে বিস্মৃত না হই।

স্যার সৈয়দ যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিল নিঃসন্দেহে সর্বপ্রকারে প্রাগ্রসর ও শক্তিশালী। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির

www.pathagar.com

অভাব ছিল না। মুসলমানরা ছিল তখন একেবারে নগণ্য, এজন্য তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় হিন্দুরা সন্দেহের কিছু দেখে নি। স্যার সৈয়দ যখন ১৮৬৩-৬৪ সালে গাজীপুরে 'সমিতি' স্থাপন করেন, তখন কিছু সংখ্যক হিন্দুও তাঁর সভ্য ছিলেন। তাঁর বক্তৃতাদি বা রচনাসমূহে মুসলমানদেরই উন্নয়ন বিষয় আলোচিত হতো, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখ থাকত না। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি থাকার আবশ্যকতাও উল্লেখ করতেন :

> 'তোমরা কি একই দেশে বাস করো না? .. মনে রেখো, হিন্দু বা মুসলমান, খ্রিষ্টান যারা এদেশের বাসিন্দা, তারা এ হিসেবে একজাতির অন্তর্ভুক্ত'।[১০৪]

হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস যখন স্থাপিত হয়, তখন তিনি মুসলমানদের তার থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন তার কার্যক্রমে হিন্দুর স্বার্থগন্ধী মনোভাবের দরুন এবং অহেতুক রাজনীতিক অপ্রীতিকর আবহাওয়া সৃষ্টি করার দরুন। এই শেষোক্ত কারণেই তিনি কলকাতায় আমীর আলীর ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশন্যাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' সাড়া দেন নি, কারণ তখন তাঁর ধারণা ছিল, মুসলমানরা এখনও অনগ্রসর, রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করার সময় আসে নি।

স্যার সৈয়দের আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি, আলিগড় সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই সমাজে যেসব পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল—তাঁদের পাণ্ডিত্য, ইসলামে নিষ্ঠা, উদারচিত্ততা ও সমাজের প্রতি সহানুভূতিতে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। চিরাগ আলীর ছিল মিশনারির মতো ইসলামের মহিমা প্রকাশে অপরিসীম উৎসাহ, সেই সঙ্গে মন ছিল গোঁড়ামিশূন্য। তাঁর 'আযম-আল-কালাম বা সংস্কার প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,

> 'হযরত মুহম্মদের প্রবর্তিত ধর্মে এতই উদার মত আছে যে, পরিবেশের সামাজিক ও রাজনীতিক বিপ্লবী ধারার সঙ্গে সহজেই খাপ খেয়ে যেতে পারে ... ইসলামি রাজনীতির ও সামাজিক নীতির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।[১০৫]

মুহসিন উল-মুলকের বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষাই মুলমানদের আশা-ভরসা। ১৯০৬ সালে তিনি বলেছেন, *'তুরস্কের সুলতানকে ভারতীয় মুসলমানদের খলিফা হিসেব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই'।*[১০৬] আলিগড় সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে 'নিউলাইটের কৈফিয়ৎ'। উল্লেখযোগ্য যে, আলিগড় সমাজকে বিদ্রূপ করে বলা হতো 'নিউ লাইট'। উক্ত পুস্তিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

> 'নিউ লাইট ইউরোপীয় সভ্যতাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাতে ধর্মবিশ্বাসে কিছুমাত্র হানি হয় নি'।[১০৭]

---

১০৪. Eminent Musalmans, p. 32.
১০৫. আযম অল্-কালাম; ভূমিকা।
১০৬. Eminent Musalmans, p. 91.
১০৭. An Apology for New Light, p. 12.

www.pathagar.com

আলতাফ হোসেন হালী ইসলামের অতীত মহিমাকে আকর্ষণীয় কবিতায় রূপ দিয়ে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন তাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন করতে। আল্লামা শিবলী ছিলেন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস। তিনি ইসলামের সমগ্র রূপটিকে ভালোবাসতেন এবং সঠিকরূপের চিত্র তুলে ধরে তার মহিমায়, ঔজ্জ্বল্যে, শুভ্রতায় পাঠকের হৃদয়মন আকর্ষণ করতেন। এভাবে আলিগড় সমাজ উনিশ শতকের শেষার্ধে সারা ভারতের মুসলিম মানসকে আবর্তিত করেছে এবং বলিষ্ঠভাবে প্রভাবিত করেছে যুগধারার অনুবর্তী হতে। এবং ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা করে নতুন দিকনির্ণয়ে তাদের চিত্তের উদ্বেগও শান্ত করেছে। তার ফলে নববর্ধমান মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ পাশ্চাত্য সমাজ ও শিক্ষার পরিবেশে নির্দ্বিধায় মিলেমিশে যেতে সাহসী হয়েছে।

কলকাতার মুসলমান সমাজ এই যুগে প্রভাবিত হয়েছে দুজন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিশারদ মনীষীর দ্বারা। তাঁদের মধ্যে আমীর আলী শ্রেষ্ঠতর। স্যার সৈয়দ বিশ্বনবীর সে জীবন চিত্রিত করেছেন, যা বাস্তবে মেলে না; আমীর আলী তার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। স্যার সৈয়দের ইসলাম ব্যাখ্যার সারমর্ম—ইসলাম প্রগতির বিরুদ্ধবাদী নয়। আমীর আলী ইসলামের যে চিত্র উপস্থিত করেছেন, সে হোল মূর্তিমান প্রগতি।

আমীর আলী যে রাসুলের জীবন এঁকেছেন, তিনি মানুষের সুনির্ভর সত্যসন্ধ চিরজাগ্রত বন্ধু, তার গর্বের ধন। এত শুভ্র, এত নম্র, এত কোমল, এত কঠোর যে, অতি আধুনিক অতি উদারচিত্তেও সে জীবন জোয়ার তুলবে। আমীর আলীর লেখনীমুখে ইসলামের সমগ্র ইতিহাস স্বর্ণযুগ—অন্ধকার মুহূর্তগুলো তাঁর লেখনীতে 'এ ইসলাম নয়' নয়—তা হলো 'দুর্নীতিকালে ইসলাম এমন হয়ে যায়'। তার পরেই তিনি তুলে ধরেন, এমন গৌরবোজ্জ্বল মহিমোজ্জ্বল চিত্র যে, মনের অন্ধকার কেটে যায়। তাঁর 'স্পিরিট অফ-ইসলাম' ধর্মজগতের এক অনন্য গ্রন্থ—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের অপূর্ব নিদর্শন। এজন্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এ মহাগ্রন্থ ক্লাসিকের মর্যাদাসিক্ত। আমীর আলীর 'হিস্ট্রি অব স্যারোসিনস' ঠিক সেই পর্যায়ের, যে পর্যায়ে বাকলসের 'হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন' ও গ্রোটের 'হিস্ট্রি অব গ্রিস'-কে ফেলা যায়। এ ইতিহাস নয়, মুসলমানের অতীত কাহিনীকে সোনার পাতে মুড়ে পাঠককে পরিবেশন করা হয়েছে তার মনের পরতে পরতে বাগদাদি হিস্পানি স্বপ্নাঞ্জল দিয়ে। তিনি এ দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন আজও সেসব শিক্ষিত মুসলমানরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করছে।

অন্যজন অধ্যাপক খুদাবখশ। অক্সফোর্ডের মেধাবী ছাত্র, চোস্ত ইংরেজি লিখিয়ে। তাঁর ছাত্র হিসেবে তাঁকে দেখেছি, পোশাকে ও চলনে-বলনে নিখুঁত অক্সোনীয়ান, কিন্তু চিন্তায় মন-মানসে খাঁটি মুসলমান। ধর্মবিশ্বাসে এত উদার, এত

www.pathagar.com

উন্নিষ্ঠ, যুক্তিতে এত শানিত, এত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল এবং মতপ্রকাশে এত অসংকোচ দুরন্ত সাহস অতি অল্পই দেখা গেছে মনীষীর ক্ষেত্রে।

> একের পর এক পাশ্চাত্য লেখকেরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুসলিম আধুনিকতার শেষ কথা হিসেবে। এবং তাঁর উদার চিন্তার জন্যে গগনচুম্বী প্রশংসাবাদ করেছেন।[১০৮]

তাঁর দৃষ্টিতে সত্য বলতে কোরান অনন্ত ধর্মীয় দিশারী ... অনুসরণীয় আদর্শসমূহের নির্দেশ দিয়েছে ... সর্বকালের বেসামরিক বিধান সংগ্রহ নয়। ...

> ইসলামের দাবি খুবই ছোট্ট, খুবই সরল—ঈমানের মূলকথা হলো—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। বাকি সব সংযুক্ত এবং অদরকারি'।[১০৯]

প্রথম দিকে রাজনীতির প্রতি অনীহা থাকলেও দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতি এবং ধনতান্ত্রিকতার নিষ্ঠুর স্ফীতি দেখে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি আস্থা হারিয়ে বলছেন 'ইউরোপবাসীর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ভুয়া ও কল্পকাহিনীমাত্র ... ওসব পুরাতন বাসি কথা ... আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে।' তিনি আমলাতান্ত্রিক সরকারের নতিস্বীকার করার চিন্তা করছেন এবং মুসলিম ধনতন্ত্রের দ্বারা পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের মোকাবিলা করার কথা বলছেন। প্রথম বিশ্বসমরের পর একটা হিন্দু-মুসলিম মিলনের তরঙ্গ উঠেছিল, তাতে তিনি উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন 'এক আশ্চর্য ঘটনা—স্বপ্নেও দেখা যায় নি, চিন্তাও করা হয় নি ... মুসলিম সংহতি ভারতের মঙ্গলের জন্য ভারতীয় সংহতিতে মিশে যাক এবং একটা অখণ্ড অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হোক'। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ তাঁর কেটে গেছে, 'আমরা প্রাচ্যপন্থী এবং প্রাচ্যেরই থাকব; ইউরোপীয় কালচার সামরিক এবং সহায়করূপে গ্রহণযোগ্য।' তিনি আরবি, ফারসি ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিচ্ছেন, মুসলিম-কালচারের পুনর্বাসন ও উন্নয়নের কথা বারবার বলছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ঔদ্ধত্যে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাবধান করে বলছেন, হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট চরম মূর্খতা, কংগ্রেস স্বপ্নচারী! ইসলামের ও তার কালচারের স্বাধীন ভারতে অবস্থা শোচনীয়।

> 'স্বরাজ হলেই আমাদের সব দুঃখ অবসান হবে চিন্তা করা বৃথা ... তেমনই বৃথা যে তার দ্বারা ন্যায়বিচার স্থাপিত হবে ... তার দ্বারা ভারতীয় জনগণ দ্বিখণ্ডিত হবে—একভাগে স্বর্গ ও অন্যভাগে নরক নেমে আসবে।'[১১০]

এ যুগে মুসলমান সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে স্বীকৃত হলেও সেখানে গেজেটেড চাকরিতে মুসলমানরা ছিল হিন্দুর তুলনায় শতকরা কুড়ি

১০৮. Modern Islam in India—p. 35.
১০৯. Essays : Indian and Islamic, p. 284.
১১০. Ibid, Various Places of the Essays.

www.pathagar.com

জনেরও কম; কভেনান্টের পদে একজনও নয়। বেসরকারি অফিসসমূহে মোটেই সংখ্যাবৃদ্ধি হয় নি। যেসব স্থানে 'বড়বাবুদের' দাপট, সেসব জায়গায় মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আইন ব্যবসায় ও ডাক্তারিতে মুসলমানরা ছিটেফোঁটার মতো বিরাজ করত। মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে, মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাদি আত্মপ্রকাশ করেছে। শহর এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু পল্লী বাংলার রূপ বিশেষ কিছুই বদলায় নি। অথচ দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেসবের উপরে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রয়েছে শহরবাসী শিক্ষিত বর্ণহিন্দু শ্রেণীর। বিশাল জনগোষ্ঠী মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কিন্তু পাষাণের ঘুম ভাঙছে। আপন অধিকার, হক-হকুক সম্বন্ধে সজাগ হচ্ছে। 'বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়।'

মুসলমান সমাজ : বঙ্গভঙ্গ থেকে পাকিস্তান

১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৬ জন মুসলমান লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বিধান সভাগুলোতে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বসহ কতকগুলো দাবিদাওয়া নিয়ে। এটি সিমলা ডেপুটেশন নামে কথিত। ভাইসরয়কে যে আবেদন প্রদান করা হয় তাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, আগা খাঁ থেকে নওয়াব, রাজা, রইস, দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী, জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উচ্চতম স্তর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত। এটিকে বলা যায় সর্বশ্রেণীর সমন্বয়।

সিমলা ডেপুটেশন নিঃসন্দেহে প্রথম মুসলমান রাজনৈতিক পদক্ষেপর। এবং তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবির স্বীকৃতি এবং তার আইনত ব্যবস্থা করা। এ দাবি স্বীকৃত হয়েছিল ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার ব্যবস্থায়।

১৯০৬ সালে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেটি ঐতিহাসিক মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে, বাংলা -বিভাগের সালে শিক্ষিত বর্ণহিন্দুরা ভবিষ্যৎ আর্থিক চিন্তায় কীরূপ দিশেহারা হয়ে পড়ে ও তার বিরুদ্ধে মরণপণ আন্দোলন শুরু করে। এ যাবৎ কংগ্রেস সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রচার করত। কিন্তু বাংলা বিভাগে তার সে মুখোশ খসে পড়ল; স্বার্থরক্ষার তাগিদে কংগ্রেসপন্থী সকল শ্রেণীর হিন্দুরা কলিকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভা ডাকল কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। এ সভায় যেসব উত্তপ্ত বক্তৃতা হয়, তাতে মুসলমানদের চক্ষুরুন্মীলন হয়, এবং তারা পৃথক রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করার কথা চিন্তা করে। উক্ত বছরের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার শাহবাগে যখন মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল, তখনও নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগ স্থাপনের প্রস্তাব আনয়ন করেন। মুসলমানের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অধিকার রক্ষা ও তার অবস্থার উন্নয়ন ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এদেশের রাজনৈতিক গগনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একুশ বছর পূর্বে কংগ্রেস স্থাপনের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছিল, তার থেকে লীগের আদর্শগত পার্থক্য বড় বেশি ছিল না। কিন্তু প্রধান পার্থক্যটা ছিল নামকরণেই পরিস্ফুট। অতঃপর কংগ্রেস চিহ্নিত হয়ে গেল হিন্দুদের এবং মুসলিম লীগ চিহ্নিত হলো মুসলমানদের শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার মিলনক্ষেত্র।

কংগ্রেসী হিন্দুরা মুসলিম লীগকে কখনো প্রীতির চক্ষে দেখে নি। তার জন্মলগ্ন থেকে হিন্দুরা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি ও ১৯০৯ সালে সে দাবির পূরণ হিন্দুদের আরও বিভ্রান্ত করে। ১৯১০ সালে নাগপুর সম্মেলনে কংগ্রেসের মুসলমান সভাপতি সৈয়দ নবীউল্লাহ্ দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং ১৯১১ সালে উভয়ের নেতাদের এক বৈঠক হয়। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ১৯১২ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলা বিভাগ রদ ঘোষিত হলে মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধটাও আরও তিক্ত হয়ে পড়ে। তখন লীগ-কাউন্সিলের সভা ডেকে লীগকে পুনর্গঠন ও প্রগতিবাদী করে তুলতে শিক্ষিত মুসলমানরা অগ্রণী হয়ে ওঠে। এই কাউন্সিলে তৎকালীন তরুণ ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ ভারতীয় মুসলমান ন্যাশনালিস্ট নেতারাও আমন্ত্রিত হন।

> কাউন্সিলে প্রস্তাব গৃহীত হয় : ব্রিটিশরাজের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্য বৃদ্ধি এবং মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করা এবং এ দুটি উদ্দেশ্যকে পীড়িত না করে ভারতের উপযোগী স্বায়ত্তশাসন লাভ করা।[১১১]

লীগে সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানরা জমায়েত হলো, এটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং বলা চলে অতঃপর মধ্যবিত্ত আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের প্রাধান্য রইল তার কর্মসূচিতে।

অতঃপর কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে পুনরায় সমঝোতার চেষ্টা চলতে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলতে থাকায় এবং ভারতের স্বার্থ তাতে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশরাজ জড়িত করায় প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে মিলনের আগ্রহ দেখা গেল। ১৯১৫ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। তাতে কংগ্রেস লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি স্বীকার করে। হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত জিন্নাহর চেষ্টাতেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটা রাজনীতিক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অতঃপর ১৯২১ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস-লীগ অধিবেশন একই সময় ও একই স্থানে অনুষ্ঠিত হতো। ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়; তাতে জনগণের দাবির কোনো স্বীকৃতি না থাকায় কংগ্রেস ও লীগ অসন্তুষ্ট হয়। ঠিক এই সময় ব্রিটিশের তুরস্ক আক্রমণকে উপলক্ষ করে খেলাফত আন্দোলনে মুসলমানরা

---

১১১. Hist. of Indian Nationalist Movement—Lovett, p. 92.

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়ে মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে। গান্ধীও এ সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ফলে সর্বভারতীয় প্রথম জন-আন্দোলন শুরু হয়। ইতোপূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জনসাধারণের সমবায়ে আর কোনো যৌথ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় নি। অবশ্য খেলাফত আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলমান একত্রে গণ-আন্দোলন চালালেও মনের মিল হয় নি। মুসলমান খেলাফত আন্দোলন করেছে বহির্বিশ্বের মুসলমানের প্রতি ধর্মীয় সহানুভূতি বশে। কিন্তু গান্ধী খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন আপন ধর্মীয় স্বার্থবশে।

তখন তিনি বলেছিলেন,

> 'আমাদের দুজনের পক্ষে খেলাফত একটা কেন্দ্রীয় ব্যাপার—মুহম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম; আর খেলাফতে আত্মদান করলেও সেটা আমার ধর্মের স্বার্থে গোরক্ষার জন্যে আমি মুসলমানদের ছুরিকা হতে গোমাতার রক্ষা করছি।[১১২]

রাজনীতিক ও ধর্মীয় নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের সমাধানে গোঁড়ানীতি অনুসরণের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং কংগ্রেস-লীগের মধ্যে ব্যবধানটা বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেঙ্গল প্যাকট সম্পাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাবে এ চুক্তি ফলবতী হয় নি। চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুর ফলে কংগ্রেস ও লীগ আরও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে বাংলার হিন্দু নেতাদের কঠোর মনোবৃত্তির দরুন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত হওয়ার আর একবার সুযোগ এসেছিল ১৯২৮ সালে, যখন এদেশের শাসন ব্যবস্থা সংস্কার সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য ছয় জন শ্বেতাঙ্গ সদস্যবিশিষ্ট সাইমন কমিশন এসেছিল। কংগ্রেস কমিশন বয়কট করল। লীগের একদল লাহোরে মিলিত হলো স্যার মোহাম্মদ শফীর নেতৃত্বে কমিশনকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে; আর একদল কলিকাতায় মিলিত হলো জিন্নাহর নেতৃত্বে কমিশনকে বর্জনের উদ্দেশ্যে। এই বছরেই দিল্লিতে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হলো দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয় বিবেচনার জন্যে এবং মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সাব-কমিটি গঠিত হলো শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের জন্যে। জিন্নাহকে ভার দেওয়া হলো, মুসলমানদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাতে। এসব দাবিদাওয়ার মধ্যে প্রধানতম ছিল, কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে মুসলমানের এক-তৃতীয়াংশ আসন স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত করা। কিন্তু নেহরু রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হলো, দেখা গেল স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থাই অস্বীকৃত হয়েছে এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থাও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মিলনকামী মুসলমান নেতারা হতবুদ্ধি হলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টা নেহরু রিপোর্ট দ্বারা চিরসমাধি লাভ করল।

---

১১২. Jinnah and Gandhi, S. K. Majumder, p. 61.

www.pathagar.com

নেহরু রিপোর্ট সবচেয়ে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করল বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজকে। উল্লেখযোগ্য, এ দুটি প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; অথচ বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের কারসাজিতে মুসলমানরা এ দুটি প্রদেশের চাকরি, ব্যবসায় বাণিজ্য, স্বাধীন বৃত্তিসমূহ সবক্ষেত্র থেকেই প্রায় বিতাড়িত। জীবন বিকাশের কোনো ক্ষেত্র তাদের জন্য খোলা নেই। এরূপ দুর্বিষহ অবস্থায় ন্যায্য দাবি ত্যাগ করে আপস-মীমাংসা সূত্রে যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল তা না বাতিল করার অর্থ হয়েছিল, মুসলমানদের একেবারে বঞ্চিত করা।

স্মরণ রাখা উচিত যে, যুক্ত-নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদার মহাজন শ্রেণীর দাপটে এবং শিক্ষিত বৃত্তিধারীদের চক্রান্তে মুসলমানকে একেবারে বিতাড়ন করা ছিল তৎকালীন পরিস্থিতিতে সহজসাধ্য। এবং হিন্দুরা এ সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। এসব হেতুতেই নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করা আর মুসলমান জাতির মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ছিল একই কথা। এই বিষম পরিস্থিতিতে শেষ চেষ্টা হিসেবে জিন্নাহ চৌদ্দ দফা পেশ করলেন। এসবের যৌক্তিকতা ছিল, মুসলমানের মরণ-বাঁচন সমস্যায় সর্বনিম্ন দাবিতে সন্তুষ্ট হওয়া। কিন্তু বারবার মিলন বৈঠক হলেও কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাবে কোনো মীমাংসা হয় নি।

পরবর্তী ছয়-সাত বছর লীগ-কংগ্রেসের কোনো সক্রিয় কর্মপন্থা ছিল না। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, এই সময়টা ছিল সবচেয়ে আর্থিক মন্দার যুগ। জিনিসপত্র অসম্ভবরকম সস্তা : ধানের দাম মণ প্রতি ১ টাকা থেকে ১$\frac{১}{৪}$ টাকা; মজুরের বেতন $\frac{১}{৪}$ থেকে $\frac{১}{৫}$ টাকা। চাকরি সংগ্রহ কঠিন সমস্যা, সামান্য ৫০/৬০ টাকা মাসিক মাহিনার চাকরির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রও পাগল হয়ে ফিরছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে অন্ন সমস্যা অত্যন্ত প্রবল। তাদের উৎসাহ উদ্যমেও কেমন ভাটা পড়ে গেছে।

এ সময়ে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবর্গকে বিলেতে আমন্ত্রণ করে তিনবার (১৯৩০-৩২) গোলটেবিল বৈঠক রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসব বৈঠক ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নটা খোলাখুলিভাবেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবেচিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ মুসলমানদের কোনো রক্ষাকবচ দ্বারা আশ্বস্ত করতে স্বীকৃত না হওয়ায় মুসলমানরা কোনো সর্বভারতীয় যুক্ত-নির্বাচন বা যুক্ত-প্রশাসন কাঠামোতে রাজি হলেন না, হিন্দু সংখ্যাধিক্যের প্রাবল্যে নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কায়। হিন্দু-মুসলিম বিরোধটার কোনো মীমাংসা হয় নি।

আলোচ্যকালে লীগপক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে লীগের সভাপতিরূপে আল্লামা ইকবালের ঐতিহাসিক ভাষণ :

> আমি দেখতে চাই, পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং সিন্ধু-বেলুচিস্তান সম্মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্রে রূপায়িত হয়েছে।[১১৩]

---

১১৩. Presidential Address to All India Muslim League, 1930 Allahabad, p. 10.

www.pathagar.com

দার্শনিক কবির এই উক্তি থেকে মুসলমানরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের একটা অবয়ব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা উপলব্ধি করল। সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা ভালো যে, কবি ইকবালের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধ্যানধারণায় বাংলা বা আসাম সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, এ দুটি প্রদেশের সমবায়ী অঞ্চলের, বিশেষত তৎকালীন পূর্ব বাংলার, মুসলমান প্রধান অঞ্চল হিসেবে তাঁর সঠিক জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তাঁর উক্তিতে এ যুক্তিটি প্রবল যে, উপমহাদেশের মুসলমান প্রধান অঞ্চলসমূহের সমবায়ে একটি শক্তিশালী স্বতন্ত্র মুসলমান সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন সম্ভব। এই উক্তিকেই সম্বল করে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনায় মেতে ওঠে।

> এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হয়ে গেল বিলেতে পর্যন্ত—সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী 'পাকিস্তান' শব্দটিরও উদ্ভাবন করেন বলে অনেকের ধারণা।[১১৪]

এখানেও একথাটি স্বীকার করা ভালো, চৌধুরী রহমত আলীর ধ্যানধারণায় ও 'পাকিস্তান' শব্দ সৃষ্টির কল্পনায় পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে কোনো আভাস ছিল না। রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরও কোনো বাস্তব জ্ঞান ছিল না। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রূপ চিত্রণে যখন শিক্ষিত সমাজ প্রবল উৎসাহ, সেই সময় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন ও নবরূপায়ণ করে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি লীগকে বিস্তৃত মুসলমান জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কৃতসংকল্প হন এবং এ জন্য ১৯৩৬ সালের ১২ এপ্রিলের লীগ সম্মেলনে তিনি সর্বপ্রথম গণসংযোগ নীতি গ্রহণ করেন। অতঃপর মুসলিম লীগ কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে এটিকে নিখিল ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলমানের গণসংস্থায় রূপায়িত করা হলো। মুসলমানদের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপতি ছিল না হিন্দুদের ন্যায়, যারা কংগ্রেসের আর্থিক খুঁটি হিসেবে কাজ করত। এজন্য তখন মুসলিম লীগের প্রধান সহায়ক ছিল শিক্ষিত বৃত্তিধারীরা এবং সরকারি চাকরিজীবী সম্প্রদায়। লীগের কর্মসূচি সক্রিয়ভাবে কার্যকরী করতে শিক্ষিত যুব সমাজ এগিয়ে এলো।

১৯৩৭ সালের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে লীগ ঘোষণা করল, 'মুসলিম লীগ ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর'। এই বছরের নির্বাচন পর্বে লীগ আশাতীত সাফল্য লাভ করে এবং তার ফলে বাংলায় মুসলিম লীগ শাসন প্রবর্তিত হয়। স্মরণীয়, ১৭৫৭-এর পর ১৯৩৭ সালেই প্রথম মুসলমানদের শাসন পরিচালনার সৌভাগ্য আসে বাংলাদেশে।

---

১১৪. 'আমি এতদ্বারা পাকিস্তানের ছয় কোটি মুসলমানের আবেদন জানাচ্ছি; তারা উত্তর ভারতের পাঁচটি অঞ্চলের বাসিন্দা : পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (আফগান) কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান–এর দ্বারা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয় দাবি জানানো হচ্ছে; তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক, সামাজিক, ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য'—Now or Never by Ch. Rahmat Ali, 1933.

www.pathagar.com

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মাসে লাহোরের লীগ অধিবেশনে মুসলমানরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করল, আজাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা। তারা স্বতন্ত্র জাতি; তারা পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে নিজেদের মুক্তির পথ, বিকাশের পথ ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পথের সন্ধান করল পাকিস্তানের মধ্যে। দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে এই ঘোষণার মধ্যে। এবং এ ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছিল সাত বছর পরেই। মুসলমান মধ্যবিত্তের স্বপ্নসাধ 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার।

অনেকে বলে থাকেন, মুসলমানদের ভীতি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের সৃষ্টি; আজাদি সংগ্রামের জন্যে এক কংগ্রেসই যথেষ্ট ছিল, দ্বিতীয় রাজনেতিক সংস্থা স্থাপনের ফলেই এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা চরমে উঠে গেছে।

কথাগুলো ভাবালু মনের অযৌক্তিক উচ্ছ্বাসমাত্র। ভীতি যদি কিছু ছিল, তা হিন্দুরই সৃষ্টি; রাষ্ট্রিক ও আর্থিক সমস্ত ক্ষেত্রগুলো বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন সার্বিকভাবেই গ্রাস করে ফেলেছিল যে, মুসলমানদের কোনো দিকে বিকাশের পথ খোলা ছিল না। তাদের অনমনীয় আচরণও মুসলমানদের এ বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে, সমগ্র মুসলমান জাতিকে বর্ণ-হিন্দুর পদতলে নিষ্পেষিত হয়েই জীবনধারণ করতে হবে বিশাল অবর্ণহিন্দু হরিজন জনসাধারণের মতোই। সবচেয়ে মুসলমানদের চোখে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল আর্থিক দিকটা। 'সারা ভারতে মুসলমানরা সংখ্যায় লঘু, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এবং আর্থিক দিক দিয়ে কোনো স্থান নেই। প্রস্তাবিত বিভাগের ফলে মুসলমানদের নিশ্চিত মুক্তিলাভ হিন্দুর আর্থিক দাসত্ব থেকে। আর্থিক প্রশ্নেই হিন্দু-মুসলমানের যত বিরোধ—যেসব পল্লী অঞ্চলে মুসলমান বাস করে, সেখানেও হিন্দু মহাজন ও বেনিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ। শহর অঞ্চলে মুসলমান মধ্যবিত্তের আর কোনো বৃত্তি নেই, অফিসে পিয়ন-চাপরাশি হওয়া কিংবা দিনমজুর হওয়া ব্যতীত।

> হিন্দুরা আর্থিক উপায়ের সব উৎস কঠোরভাবে কুক্ষিগত করে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েছে ... গ্রামীণ অঞ্চলে মুসলমান চাষির এবং শহর অঞ্চলে মধ্যবিত্তের সঙ্গে সর্বত্র বিরোধ বেঁধে আছে হিন্দু মহাজন ও বেনিয়ার সঙ্গে। ... ভারতীয় মুসলমানদের এসব দুঃখের কাহিনী অস্বীকার করা চলে না, সত্যিই তারা শোষিত ও উৎপীড়িত হতো'।[১১৫]

একদিকে জীবনধারণের প্রশ্ন, অন্যদিকে নিষ্ঠুর শোষণ ও বঞ্চনার লীলা—এ অবস্থায় মুসলমানরা আত্মরক্ষার তাগিদেই মুসলিম লীগ স্থাপন করেছিল, কোনো তৃতীয় পক্ষের উসকানিতে নয়। চলতি শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম ভাগে বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে, বঙ্গভঙ্গ রদের মতো দারুণ ক্ষত বুকে নিয়েও।

---

১১৫. Modern Islam in India : Smith, 264 (তথ্যসূত্রগুলো লক্ষণীয়)।

www.pathagar.com

১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলমানদেরই বলিষ্ঠ সংগ্রামী ভূমিকায় সফল হয়েছিল, একথা বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও স্বীকার করেন।[১১৬]

কিন্তু গান্ধী যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন এটিকে সনাতন ধর্মের রূপ দিয়ে *'এক ধর্মরাজ্যপাশে ভারতভূমিকে বেঁধে দিয়ে'*[১১৭] সব শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব সংঘাতের সামঞ্জস্য করতে সংকল্প গ্রহণ করেন।[১১৮] তারপর কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব এবং মুসলমানদের ন্যায্য দাবির আংশিক ভাগকেও স্বীকার না করার কঠোরতায় মুসলমান ন্যাশনালিস্টদেরও মোহমুক্তি ঘটে গেল। যাঁরা এ কালে কংগ্রেসের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন, সেসব মুসলমান নেতাও কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে তাকে শক্তিশালী করে তোলেন। সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল হিন্দুর মন-মানসের ও আচরণ-কর্মের দরুন। মুসলমানকে বাধ্য করেছে স্বধর্ম, স্বসম্প্রদায় ও আপন সত্তার পরিত্রাণের জন্যে স্বাতন্ত্র্যের কথা চিন্তা করতে ও পৃথক হয়ে যেতে—

'আমরাই তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছি'—এ কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী।[১১৯]

সাম্প্রদায়িকতা সারা ভারতে বিস্তৃত; এ অভিযোগও সত্য যে, কংগ্রেসীসহ সকল হিন্দু অধিক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।

এই মনোবৃত্তিই মুসলমানদের বেশি উত্তেজিত করেছে, এবং তাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়েছে মুসলিম লীগের মতো কংগ্রেসও নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।[১২০]

কংগ্রেস হিন্দুর একাধিপত্য কোনো সময়েই ক্ষুণ্ন হয় নি এবং রাজনীতিক নীতি গ্রহণে সর্বদাই ছিল হিন্দু স্বার্থপন্থী।[১২১]

আমাদের এসব আন্দোলন ছিল বাস্তবত ভারতীয় জাতীয়তা জ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র।

'এবং জাতির কর্তব্য ছিল এসবের সমন্বয় সাধন করা, যার ফলে আমাদের সব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়, সনাতন (হিন্দু) ধর্মের ও বৈদান্তিক আদর্শের শুদ্ধিকরণ ও পুনরুজ্জীবন হয় এবং আধুনিক জাতীয়তা জ্ঞানাভিসারী হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল এই মহৎ কর্তব্য সাধন করা।'[১২২]

---

১১৬. Ibid, P. 263.
১১৭. রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসবে' এ ধ্যানধারণাটিও স্মরণীয়।
১১৮. Misra, 399.
১১৯. An Autobiography of an Unknown Indian.
১২০. Major Govts. of Asia-Rahim, P. 282.
১২১. Modern Islam in India, 184-85.
১২২. History of the Congress—Pattabhi Sitaramayya, P. 16.

www.pathagar.com

এসব পরিচ্ছন্ন মতামতের ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক শ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও শানিত ও প্রখর বুদ্ধিতে এবং অন্তর্দৃষ্টিতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছে; তাদের বলিষ্ঠ কর্মপন্থা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কাছে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশক্তিও হার মেনে গেছে। ভারতকে বিভাগ করে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মদানই বর্তমান জগতের ইতিহাসে শিক্ষিত মুসলমানের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। এখানেই হিন্দু শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের চরম পরাজয়।

১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ মুসলমান ছাত্র-সমাজকে লক্ষ্য করে বাণী দিলেন :

ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামি
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তান?

কিন্তু তার দুই সপ্তাহ পূর্বে ২১ জুন তারিখে কবি ইকবাল স্বপ্নদ্রষ্টার মতো জিন্নাহকে লিখেছিলেন :

> আঙিনা ভাগ করা ছাড়া ভারত উপমহাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার ও ভারতীয় মুসলমান জনসমাজকে ও ইসলামের বিরাট অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার আর অন্য পথ নেই।[১২৩]

ভবিষ্যত জগতই প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে কে নির্ভুল। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য, যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার মোকাবিলা করার একমাত্র পথই খোলা ছিল, 'আঙিনা ভাগ করে ভারত উপমহাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহৎ রাখা।' এই রূঢ় সত্যটি বর্ণহিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী স্বার্থের বশে অন্ধ হয়ে গ্রহণ করতে চায় নি। এটাই বিভাগ পূর্ব তিক্ততা ও বিরোধের মূল কারণ।

এই বিরোধ ও তিক্ততার পরিমাণ কতখানি ছিল এবং কী তীব্রতর ছিল তার নিদর্শন হিসেবে বঙ্গভঙ্গকালীন প্রভাবশালী মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক' কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনকালের (১৯০৭) দক্ষযজ্ঞরূপ ভগ্নশিবিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

> ২২ বৎসরের কংগ্রেস তেইশে পা দিয়া যমের বাড়ি গিয়াছে। সুখের বিষয় ২/৪টা নগণ্য মুসলমান নামধারী বিকৃত স্বদেশী পাণ্ডা ব্যতীত কোনো নামজাদা মুসলমান কংগ্রেসের সেই মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না। ... তাপ্তী নদীর পানিতে কংগ্রেসের চিতাভস্ম বিধৌত হইয়াছে।[১২৪]

---

১২৩. আফ্রিকার আমন্ত্রণ—সৈয়দ শামসুর রাহমান, পৃ. V (গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতাটির প্রতিলিপি দেওয়া আছে।

১২৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—কা. আ. মান্নান, পৃ. ২১৯ (উদ্ধৃত)

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, 'ইসলাম প্রচারক'-এর কণ্ঠে সেদিনের সমগ্র বাংলার মুসলমানের অন্তরের কথাই ধ্বনিত হয়েছিল। কংগ্রেস যে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান এবং তা দ্বারা মুসলমানের কোনো স্বার্থ রক্ষিত হবে না, এ বিশ্বাস মুসলমানের জন্মেছিল প্রথম থেকেই এবং সেটি প্রখরতর হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন থেকে।

খ.

একটি বহুল প্রচারিত মত হচ্ছে, মুসলমানের ধর্মীয় সংস্কারই তাকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ থেকে দূরে রেখেছিল এবং এজন্যই তারা আর্থিক ও অন্য সর্বপ্রকার দুর্গতি ও তার ফলে সে জীবনের সবক্ষেত্রে হিন্দুর বহু পিছনে পড়ে গিয়েছিল।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ মতটি অভ্রান্ত নয় ও যুক্তিনির্ভরও নয়। এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আজাদি পূর্ব যুগের ভূমিকাকে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত, মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ সংগঠন বিলম্বিত হওয়ার কারণ প্রধানত দুটি; রাজনৈতিক ও আর্থিক। নেহাৎ সুবিধার জন্যে এ কারণ দুটিকে আচ্ছন্ন রেখে প্রচার করা হয়েছিল, ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা এবং ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহাই মুসলমানদের পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ হয়েছিল।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, হিন্দুর ধর্মীয় গোঁড়ামি মুসলমানের চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি। হিন্দুর 'ছুঁতমার্গ' বিশ্ববিদিত। ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশার দরুন রামমোহন ও ঠাকুর পরিবারকে সমাজচ্যুত হয়ে ভিন্ন সমাজ স্থাপন করতে হয়েছে। হিন্দুর সাগরপার নিষিদ্ধ এবং তার জন্যেও জাতিপাত হয়। এরূপ শত সহস্র কুসংস্কারের বেড়ায় ও প্রথা-দাসত্বের নিগড়ে হিন্দুর জীবন আবদ্ধ। 'সনাতন নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যে জাত খোয়ানোর ভয়ে অনেককে এক অদ্ভুত রীতি অনুসরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করতে দেখা যায়। তাঁরা ম্লেচ্ছ ইংরেজদের অধীনে বিষয়কর্ম করে অপরাহ্নে অফিস হতে বাড়ি ফিরে স্বদেশীয়দের মধ্যে ব্রাহ্মণের গৌরব ও আধিপত্য সংরক্ষণের জন্যে স্নানাহ্নিক করতেন এবং এভাবে গ্লানি ও পাপমুক্ত হয়ে *"দিবসের অষ্টম ভাগে" আহার করতেন'।*[১২৫] রামমোহন রায়ের মধ্যেও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান প্রচেষ্টার করুণ অভিব্যক্তি দেখা যায়।

> 'তাঁর এই নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রাতে দেশীয় প্রথা অনুসারে আসন বা পিঁড়িতে বসে মাছ ভাত খেতেন; রাত্রে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসে ইংরেজি রীতিতে খানা খেতেন।'[১২৬]

---

১২৫. রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য।
১২৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৯২।

www.pathagar.com

মুসলমানের নিশ্চয়ই এই ছুঁতমার্গ ছিল না এবং এ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে কখনো পীড়িত হয় নি। তার অতীত ইতিহাস তাকে শিক্ষা দেয়, মুসলমানরা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে বহুবার এসেছে, বহুধর্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে; গ্রিক ল্যাটিন ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করে সেসবের শিক্ষাকে উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, এমনকি সংস্কৃত ভাষাও। কিন্তু কখনো জাতিনাশ বা ধর্মনাশের ভয় তাদের পীড়িত করে নি, কিংবা এরূপ কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বও তাদের আহত করে নি। মুসলমান রাজ্য মিশর কম গোঁড়া নয় এবং তাদের ইসলামপ্রীতিও প্রগাঢ়; তবু সেখানে আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল থাকার দরুন বহুপূর্বে বলিষ্ঠ মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। ধর্ম তাদের পথের বাধা হয় নি। তবুও কি এমন কারণ ঘটেছিল, যার দরুন ভারতীয় মুসলমান পশ্চাতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল?

প্রথম কারণ রাজনৈতিক। মুসলমানদের হাত থেকে বাংলার মসনদ ও পরে দিল্লির রাজসিংহাসন বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ইংরেজরা মুসলমানদের দারুণ সন্দেহ করেছে এবং কঠোরভাবে উৎপীড়ন করেছে। আর কোনো নীতিতে চালিত হয়ে মুসলমানদের সর্বপ্রকার শাসনকার্য থেকে বহুদূরে রেখেছে, তা পূর্বেই বিশদ আলোচনা হয়েছে। হান্টার সাহেব নিজেই বলেছেন, 'আমরা মুসলমান সাম্রাজ্যের অনুগ্রহপ্রার্থী গোলামের মতো বাংলাদেশের পদস্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের বিজয়কালে আমরা তাদের প্রতি কোনো করুণা দেখাই নি এবং ভুঁইফোঁড়ের ঔদ্ধত্য নিয়ে আমাদের পূর্বতন মনিবদের পঙ্কে নিমজ্জিত করে দিয়েছি।

> এককথায়, ভারতীয় মুসলমানরা অনুযোগ করে ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতির অভাবের জন্যে, মহত্ত্বের অভাববোধের জন্যে'।[১২৭]

মুসলমানের প্রতি ইংরেজের এই সহানুভূতি ও মহানুভবতার অভাব জন্মগত, মজ্জাগত ও ঐতিহাসিক। ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় ও সংগ্রাম-সংঘাত আট শতকেরও পূর্বে থেকে, যার দরুন ক্রুসেডের সময় মধ্যযুগের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় অধিকার করে আছে। এজন্য এ বিদ্বেষ ছিল ট্রাডিশনগত।

> মনে রাখা ভালো, ইউরোপ হিন্দুত্ব ও হিন্দুর সমাজের সংস্পর্শে প্রথম আসে ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা কালিকটে অবতরণ করার পর থেকে এবং তার দরুন হিন্দুর বিরুদ্ধে কোনো পূর্ব বিদ্বেষের কারণও ছিল না।[১২৮]

বস্তুত নতুন প্রভুরা নিজেদের নিরাপত্তার রক্ষাহেতু রাষ্ট্রীয় নীতির দরুন যখন মুসলমানদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি করছে, তখন জীবন বিকাশের সুযোগ-সুবিধা

---

১২৭. Indian Musalmans, p. 141.
১২৮. A Study of History, p. 717.

www.pathagar.com

সন্ধানের অবকাশ কোথায়? রাজনৈতিক কারণে ইংরেজরাই মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা থেকে, কুঠি-হৌস থেকে বিতাড়িত করেছে, এতটুকু আশ্রয় দেয় নি'। অতএব ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রশ্নই ওঠে নি, প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা যখন ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন নীতি গ্রহণ করে, তখনও তাদের সতত উদ্বেগ ছিল মুসলমানকে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দূরে রাখার। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে তাদের সব মূলধনও ইংরেজ আত্মসাৎ করেছে। এজন্য মুসলমানরা প্রাথমিক যুগে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায় নি।

তৃতীয়ত, মুসলমানের অনুভূতি এ বিষয়ে যতটা কাজ করেছে এবং যতটা তাকে বিমুখ করেছে ইংরেজের প্রতি ও তার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি, ততটা তার ধর্ম তাকে পীড়িত করে নি। মুসলমানি শাসন আমলে হিন্দু জাতি অশেষ আগ্রহ নিয়ে তৎকালীন রাজভাষা ফারসির চর্চা করেছে। এইরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে হিন্দুরা নয়া মনিব ইংরেজের ভাষা শিখেছে ও তার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেছে। হিন্দুর পক্ষে ছিল প্রভু বদল মাত্র—মুসলমানের বদলে ইংরেজ। বরং জীবনোপায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুলে যাওয়ায় এবং সেসবের একচ্ছত্র ভোগাধিকার পাওয়ায় হিন্দুর ইংরেজপ্রীতি শতগুণে বেড়ে গেছে। আর ইংরেজও হিন্দুকে নিকটে টেনেছে সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বশংবদ শ্রেণী সৃষ্টির গরজে। কিন্তু সদ্য রাজ্যহারা মুসলমান ঠিক এত সহজে মন ও মেজাজ গড়ে তুলতে পারে নি' নয়া মনিবের দাসত্বে জীবন গড়ে তুলতে এবং নয়া মনিবের ভাষা শিখে মুখের বুলিরও পরিবর্তন করতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা ঠিক ততখানি স্বর্গীয় আলোক হিসেবে এবং ইংরেজের শাসন ততখানি বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে মুসলমানের নিকট প্রতিভাত হয় নি। এজন্যই মুসলমান মনের দিক থেকে সাড়া পায় নি এবং উৎসাহ বোধ করে নি হিন্দুর মতো ইংরেজকে দেবতা জ্ঞানে বরণ করে নিতে।

চতুর্থত, ইংরেজের আর্থিক ব্যবস্থা মুসলমানের প্রতিকূলে ছিল এবং তা ছিল প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই। আত্মরক্ষার যে নীতির গরজে ইংরেজ মুসলমানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে দূরে রেখেছে, সে গরজেই তাকে আর্থিক আয়ের সব উৎস থেকেই বঞ্চিত করে রেখেছে গোটা প্রথম শতাব্দী ধরে। ইংরেজের সরকারি অফিসে, ইংরেজের কুঠিতে, হৌসে, ফার্মে মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ, অতএব জীবনোপায়ের এ বৃহত্তম দ্বার মুসলমানের পক্ষে একেবারে রুদ্ধ। শিক্ষার পথ সংকোচ করার দরুন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনও অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানকে কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি। মুসলমানের শিল্প ধ্বংস করেই ইংরেজের বিলেতি

www.pathagar.com

শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে, মুসলমান কারিগর ও শিল্পকর্মীরা অনন্যোপায় হয়ে কৃষিকাজে নেমেছে; যে হাতে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈরি হতো, সে হাতে লাঙলের মুঠো ধরেছে। অতএব শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আরও একটি কারণ উপস্থিত করা যেতে পারে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাথমিক স্তরে গড়ে উঠেছিল দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্তরের কর্মপটু ও ইউরোপীয়দের দোভাষীরূপে কর্মতৎপর হিন্দুদের সমবায়ে। স্মরণীয় যে, এমন স্তরে কাজ করেই ঠাকুরবাড়ির আদি পুরুষ জয়রাম ও পরে দ্বারিকানাথ বিরাট ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন; রামদুলাল দে, এমনকি রামমোহন রায়ও এ পথে অর্থ উপার্জন করে জমিদারি ও কলকাতায় বহু বাড়ির মালিক হয়েছিলেন। সমকালীন যেসব তথ্য মেলে, সেসব থেকে এমন প্রমাণ মেলে না যে, মুসলমানরাও এসব বৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এর কারণ বোধ হয় এমন নিম্নস্তরের কর্মের প্রতি অনীহা এবং ইউরোপীয়দের দোভাষীস্তাবক হওয়ার প্রতি অনিচ্ছা। এ জন্যই আমরা এসব কর্মে কোনো মুসলমানের নাম পাই না, আর এই কারণেই এসব কর্মরত ব্যক্তিদের নিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

সর্বশেষে বলা যায়, ইংরেজের নয়া ভূমিনীতির ফলে বাংলাদেশে মুসলমান ভূম্যাধিকারীদের সমাধি রচিত হয়েছে এবং সে সমাধির উপর সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু ভূম্যাধিকারী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কর্নওয়ালিসি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বাযয়াফতী মামলা প্রভৃতির দরুন মুসলমান ভূম্যাধিকারীরা লোপ পেয়েছে এবং তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী শহরবাসী (বিশেষত কলকাতাবাসী) অনুপস্থিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এটিও মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠার এক বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মহাজন শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশেষ অঙ্গ। অথচ সুদ খাওয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলমান মহাজনের উদ্ভব হয় নি। এটিকেও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগঠনের পথে এক বিশেষ প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এসব কারণের সঙ্গে আর একটি অবস্থা বিবেচ্য। ব্যষ্টির মতো সমষ্টিগতভাবে মানুষ স্বকাম তথা আত্মপ্রীতি, আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রবঞ্চনায় পীড়িত হয়। তখন ভাগ্যবিপর্যয়, অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতিকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করবার মনোবৃত্তি হারিয়ে ফেলে। মুসলমানগণ তখনও বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারে নি তাদের বিশাল সাম্রাজ্য, অসীম প্রতাপ তাসের ঘরের মতো এক ফুৎকারে উড়ে গেছে এবং তাও গেছে বিদেশি বণিকের ফুৎকারে, যারা সেদিনও তাদের ফরমান শিরোধার্য করে এদেশের দানাপানি ভোগ করবার সুযোগ পেয়েছে। এজন্য প্রথম এক শতাব্দী কেটেছে মুসলমানের ইংরেজকে বিতাড়িত করার চেষ্টায়। আঠারো শ সাতান্ন পর্যন্ত

www.pathagar.com

মুসলমান এ ধ্যানধারণায় কাটিয়েছে। তারপর রূঢ়সত্য তাদের নিকট পরিচ্ছন্ন হয়েছে, ইংরেজকে শস্ত্রমুখে এদেশ থেকে বিতাড়ন অসম্ভব এবং তারপর থেকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল। মুসলমানের এ মনোভাবটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, বর্তমানকালের ইংরেজ জাতির মনোভাব বিবেচনা করলে। ইংরেজ জাতি এখনও ভুলতে পারছে না, বর্তমান পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে—তার সে সাম্রাজ্য নেই, সে ক্ষমতা নেই, তার আর্থিক ক্ষমতাও পড়ন্ত। এখন ব্রিটেন পৃথিবীর চতুর্থ-পঞ্চম শক্তিতে রূপান্তরিত এবং ইউরোপের চোখে ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক ভূমিকা হলো সর্ববিষয়ে মার্কিন প্রভাবের প্রসারণ; ইংল্যান্ড হলো যুক্তরাষ্ট্রের ট্রোজান ঘোড়াস্বরূপ। তবু ব্রিটেনের ঠাট বজায় রাখার প্রয়াসের অন্ত নেই। আমেরিকান ডলার তার আর্থিক ঠাট বজায় রাখতে ঠেকা দিচ্ছে। এখনও 'কলোনিয়াল' স্বপ্নের অঞ্জন কাটে নি, 'East of Suez' মনোবৃত্তিতে এখনও ব্রিটেন-নন্দন সোচ্চার। এখনও 'Empire'-এর স্বপ্ন ব্রিটেনের কাটে নি এবং এখনও সাম্রাজ্যবাদের উগ্রচিন্তায় ইংরেজের অন্তরমন আবিষ্ট। এমনকি তার বর্তমান ঠাটবাট, শানশওকত ও জৌলুস যে পরমুখাপেক্ষী, এ চৈতন্য এখনও সকল ইংরেজের দ্বারা অনুভূত হয় নি।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যদি কেউ চিন্তা করেন, মুসলমানের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা হিন্দুর তুলনায় কম, এজন্য ইংরেজ আমলে প্রতিযোগিতার কঠিন ক্ষেত্রে মুসলমান পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়েছিল, তাহলে ভুল করা হবে। এ সম্বন্ধে হান্টার সিভিলিয়ান হিসেবে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে ১৮৭১ সালে যা লিখেছিলেন, তা-ই উদ্ধৃত করলে যথেষ্ট হবে :

> এটা কি সত্য যে, হিন্দুরা সব সময়েই ছিল মুসলমানদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর এবং একটি নিরপেক্ষ ক্ষেত্রেরই দরকার ছিল মুসলমানদের জীবনযুদ্ধে হারিয়ে দিতে? কিংবা মুসলমানদের বেসরকারিভাবে এত বেশি জীবনোপায় খোলা ছিল, যার দরুন তারা সরকারি চাকরিতে উৎসাহী ছিল না এবং তার দরুন হিন্দুদের খোলামাঠ ছেড়ে দিয়েছিল? হিন্দুদের উচ্চস্তরের বিদ্যাবুদ্ধি আছে সত্য; কিন্তু তাদের এমন অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্ব এ যুগে দেখি নি যার ফলে তারা সরকারি সব কর্মে একাধিপত্য লাভ করতে পারে এবং এরূপ ধারণা বিগত কালের ইতিহাসেরও বিপরীত। প্রকৃত সত্য এই যে, এদেশ যখন আমাদের শাসনে আসে, তখন মুসলমানরাই ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি; তারা দারাজ দিল ও বাহুবলেই শ্রেষ্ঠ ছিল না, রাষ্ট্রিক সংগঠন শক্তিতে এবং বাস্তব রাষ্ট্র বিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ ছিল। তবুও এখন সরকারি চাকুরির সব দ্বার মুসলমানদের সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বেসরকারি বৃত্তিসমূহও তাদের জন্যে রুদ্ধ হয়ে গেছে।[১২৯]

১৮৭০ সালের পর যখন রাজনীতিক ও আর্থিক পরিবেশটা মুসলমানের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়, তখন অতি শীঘ্র ও সহজভাবেই একটা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ শ্রেণীর শুধু উদ্ভবই হয় নি,

১২৯. Indian Musalmans, p 162-163.

www.pathagar.com

আপন বিকাশের পথে রক্ষণশীল আলেমদের বাধা দূর করেছে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা করে। অতএব তাদের বিকাশের পথে নয়া চিন্তার আলোকে ইসলামেরই ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন হয়েছে। ইসলামকে তাঁরা ত্যাগ করেন নি এবং ইসলামও তাঁদের পথের প্রতিবন্ধক হয় নি।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, বিকাশের রুদ্ধদ্বার খোলা পেয়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ দ্রুতগতিতে আত্মস্থ হলো এবং আপন মুক্তির পথ খুঁজে নিল স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ এক শ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা ও সর্বদিকের অগ্রগামীতার সুযোগ সত্ত্বেও মুসলমানের গতিরোধ করতে পারে নি; রাজনৈতিক দৌড়ে হিন্দুকেই হার মানতে হয়েছে এবং পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

গ.

হিন্দু এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ধারায় সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, হিন্দুর বিকাশ হয়েছে উপর থেকে আর মুসলমানের বিকাশ হয়েছে নিচে থেকে উপরে। প্রথমটির হয়েছে শ্লথগতি আর দ্বিতীয়টি পেয়েছে দ্রুতগতি। এক শ বছরেরও উপর সময় লেগেছে হিন্দু শিক্ষিত সমাজকে নিজেদের বিকাশ পথের প্রধান ক্ষেত্র কংগ্রেস স্থাপন করতে। কিন্তু মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কালেই নিজের অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ লীগ প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের বিকাশ পথের ক্ষেত্র হিসেবে। আরও লক্ষণীয়, একজন বিদেশি অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমকে অগ্রণী হয়ে হিন্দুদের উৎসাহ দিতে হয়েছে কংগ্রেস স্থাপন করতে; মুসলমানরা নিজেরাই প্রয়োজন অনুভব করে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের একটি বহুল প্রচারিত কাহিনী হচ্ছে, হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের সাধনায় সৃষ্ট; আর মুসলীম লীগ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের—বিশেষত লর্ড মিন্টোর আশীর্বাদে ও উৎসাহ-প্ররোচনায় সৃষ্ট।

> এই কাহিনীটি বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হয়েছে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসে এবং তিনি গলদঘর্ম হয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, শিমলা ডেপুটেশন ও মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত এবং সরকারি উসকানিতে সৃষ্ট।[১৩০]

কিন্তু তিনি একেবারে চেপে গেছেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কী পরিবেশে, কার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় সৃষ্ট হয়েছিল। বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

'তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের বিশেষ উপদেশে অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস অ্যালান হিউম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু গ্রাজুয়েটদের প্রত্যেককে

---

১৩০. Hist. of Freedom Movement, Vol. ii pp 219-234.

www.pathagar.com

আবেদন জানিয়ে তাঁদের মানসিক নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন রূপায়ণের জন্যে একটি সমিতি সংগঠনের আহ্বান জানান এবং এ প্রচেষ্টায় সরকারি সাহায্য লাভ করেন। লর্ড ডাফরিন উপদেশ দেন :

> তিনি লোকমত অবগত হতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। অতএব একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে তার মারফত লোকমত অবগত হওয়ার পক্ষে সরকারের সুবিধা হবে'।[১৩১]

১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল, তার সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী স্পষ্ট করে বলেছেন,

> এটা বোধ হয় অনেকের নিকট নতুন সংবাদ যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—যা প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল, ও এখন কাজ করে যাচ্ছে—সেটি বাস্তবপক্ষে লর্ড ডাফরিনের দ্বারা হয়েছিল, যখন এই মহাপ্রাণ ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন ... লর্ড ডাফরিন হিউমের সঙ্গে এই শর্ত করেছিলেন যে যতদিন তিনি ভারতে থাকেবেন, ততদিন কংগ্রেস সম্পর্কিত তাঁর নাম সাধারণ্যে প্রকাশিত হবে না। তাঁর এ শর্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল।[১৩২]

তার চেয়েও পরিষ্কার করে বলেছেন প্রখ্যাত মুসলিম-বিদ্বেষী লেখক কৈলাস চন্দ্র :

> বোম্বাইয়ে প্রথম অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের উদ্বোধন করার কথা ছিল ভারতের ভাইসরয়ের, কিন্তু বিশেষ জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি সক্ষম হন নি এবং তাঁর স্থলে গর্ভনর উদ্বোধন করেন। পরবর্তী কয়েক বছর ভারত সরকার সরকারি কর্মচারীদের অনুমতি দেন (কিংবা সম্ভবত নির্দেশ দেন) কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকতে।[১৩৩]

বলাবাহুল্য, এরূপ কোনো সরকারি সহযোগিতা বা আশীষবাণী লাভ মুসলিম লীগের জন্মলগ্নে ঘটে নি; কোনো লাট বড়লাটের দ্বারা তার অভিষেক ক্রিয়াও হয় নি।

হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল ইংরেজদের অনুগ্রহে, সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বশংবদ হিসেবে। তাদের প্রাথমিক উৎপত্তিস্থান বিশেষত কলকাতায় এবং সামান্যরূপে বোম্বাই ও মাদ্রাজে। তাদের নেতৃবর্গের প্রায় সকলেই কলকাতার সন্তান, খাঁটি শহুরে আবহাওয়ায় লালিত, গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে কোনো সংযোগ না থাকায় প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল না বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর। কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে নিজের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে এবং নিচে থেকেও। তার দরুন লক্ষ করা গেছে, ফজলুল হকের মতো জননেতার আবির্ভাব হয়েছে সুদূর পল্লী অঞ্চল চাখার থেকে। এই বিশিষ্ট অবস্থার কারণে প্রত্যেক মুসলিম জননেতার গ্রামীণ জীবন ও সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল এবং

---

১৩১. Advanced Hist. of India, p 892.
১৩২. An Introduction to Indian Politics, W. C. Banerjee, p 29.
১৩৩. Tragedy of Jinnah, Kailash Chandra, pp 2-3.

www.pathagar.com

এই বাস্তব জ্ঞান তাঁকে সহজেই বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছিল; আর এজন্যই জনগোষ্ঠীও তাঁকে আপন মানুষ হিসেবে সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিশেষ কারণ বাংলার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষক সমাজে মুসলিম জাতীয়তার আবেদনে যত স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, ভারতীয় জাতীয়তা তা পায় নি; যেসব পল্লী অঞ্চলে পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো স্পন্দন অনুভূত হয় নি, সেখানেও জনগণ জেগে উঠল; যে কৃষক সমাজ প্রায় নিষ্প্রাণ ছিল, তারাও মুসলিম সংহতির নামে উৎসাহিত হয়ে লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল।

> লীগ ১৯৩৬ সালে গণসংযোগের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, তার দরুনই কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্দোলন করতে স্বীকৃতি লাভ করল। লীগ জনগণের প্রতিষ্ঠান হওয়ার মর্যাদা লাভ করল। এই কারণেই ১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় বিধানসভার নির্বাচনে লীগ প্রত্যেকটি মুসলিম আসন লাভ করে।[১৩৪]

এই সময়ের মধ্যেই কংগ্রেসের মুসলমান সদস্য সংখ্যা একেবারে নগণ্য হয়ে যায়। যাঁরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী হিসেবে কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, তাঁরা হয় লীগে যোগ দিলেন, না হয় কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো দু'একজন টিকে রইলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট হয়ে, কিন্তু মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের অধিকার তাঁদের ছিল না।

> আহরার পার্টি, খোদাই—খিদমতগার, খাকসার পার্টি, জমিয়াত-ই-উলেমা মুসলিম সংহতির প্রশ্নটি সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হলো এবং ক্রমে ক্রমে হয় মুসলিম লীগে লীন হয়ে গেল, না হয় নগণ্য হিসেবে বৃহত্তর মুসলমান জাতির দ্বারা উপেক্ষিত হলো।[১৩৫]
>
> বস্তুত মুসলিম কৃষকসমাজকে আপন প্রভাবে আনয়ন করা লীগের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে লীগ হয়ে পড়ল বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল।[১৩৬]

কৃষক সমাজই বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী মুসলিম সংহতির নামে এবং আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির আশায় মেতে উঠল। *কৃষকের দাবি মেটাল মুসলিম লীগ আইন পাস করে।*[১৩৭] সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারি শোষণ থেকে তাদের মুক্তির বার্তা মুসলিম লীগ নয়া জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করে এবং এজন্য লীগের জনপ্রিয়তা এত দ্রুত হয়ে ওঠে। বস্তুত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু মুসলিম লীগই সৃষ্টি করে নি এটিকে ভারতীয় মুসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে

---

১৩৪. —Modern Islam in India, p. 273.
১৩৫. Ibid, p. 290.
১৩৬. Ibid, p. 274.
১৩৭. মহাজনী আইন, কৃষিখাতক, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন প্রভৃতি।

www.pathagar.com

পরিণত করে এবং নতুন জাতীয়তা জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে। এ মহৎ কাজটি সম্ভব হয়েছিল, নিচের থেকে এবং গ্রামীণ এলাকা থেকেও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হওয়ার ফলে।

সমালোচকেরা প্রায় বলে থাকেন মুসলিম লীগের উদ্ভব হয়েছিল তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের প্রতিভূ লর্ড কার্জনের উসকানিতে এবং নবাব-রাজা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীয় মুসলমানই—যারা সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতীক—ছিল তার ধারক ও বাহক। একথা সত্য যে, স্যার-নবাব—রাজা উপাধিধারীরা ছিলেন এর প্রথম স্তরের উৎসাহী সভ্য। কিন্তু অনতিকালেই তাঁদের সকলে বিদায় হন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই লীগের কর্ণধার ও প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। জিন্নাহ, ইকবাল, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোনো সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী উদ্ভূত নন, একেবারে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তান এবং তাঁদেরই উদ্যমে ও প্রাণপাত সাধনায় লীগ বর্ধিত ও শক্তিশালী হয়েছিল। কবি ইকবালের ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে এবং জিন্নাহর কর্ম ও সাধনা যুক্ত না হলে মুসলিম লীগের শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়কর কীর্তি পাকিস্তান সৃষ্টি হতো কি না, একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।

অতএব পাকিস্তান নিঃসন্দেহে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান, কোনো সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীর অবদান নয়। যতদিন মুসলিম লীগ নবাব-রাজার মতো সর্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানের কর্তৃত্বাধীন ছিল, ততদিন এ সংস্থাটি ঠিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয় নি। তার নবজীবন লাভ ও নব আদর্শিক রূপায়ণ হয় মুসলিম উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদের নেতৃত্বে। এবং তাঁদের উদ্যমে ও আপ্রাণ সাধনায় মুসলিম লীগ নেহরুর দাবি—ভারতে দুটি মাত্র পক্ষ ; অযৌক্তিক হিসেবে নস্যাৎ করে নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করে : তৃতীয় পক্ষ মুসলিম লীগ ব্যতীত ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমাধান অসম্ভব। পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখা, পাকিস্তানের পরিকল্পনা সৃষ্টি এবং পাকিস্তান লাভের নেশায় মুসলমান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা ও সর্বশেষে দুটি প্রধান পক্ষ হিন্দু ও ইংরেজকে পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা-সমস্তই মুসলমান মধ্যবিত্ত সন্তানের অক্লান্ত সাধনায় ফলশ্রুতি।

হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের স্বরূপ

হিন্দুর জাতীয়তা জ্ঞান সম্বন্ধে তিনটি অস্পষ্ট এবং তদহেতু ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন দেখা যায় : আধুনিক যুগেই এ জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে; পাশ্চাত্য জগৎ থেকেই এ জ্ঞান সর্বাংশে আমদানি করা হয়েছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের ফলেই এ উপমহাদেশে জাতীয়তার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়েছে। প্রশ্নটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং এদেশের ইতিহাসের ধারা ধৈর্য নিয়ে অনুধাবন করলে আমাদের এ সম্বন্ধে ধারণা পরিচ্ছন্ন হবে এবং ভ্রান্তিও উপনীত হবে।

www.pathagar.com

একথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় স্বীকার্য, একটি বিশেষ রকম জাতীয়তাজ্ঞান কয়েক দশক ধরেই এদেশবাসীর মনমানস আচ্ছন্ন করেছিল এবং দেশজ জাতীয়তার ধারা বলিষ্ঠভাবেই প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রথম দুটি ধারার গতি ছিল সমান্তরালভাবে; তারপর দুটিতে সংগম ঘটেছে ও ঘাত-প্রতিঘাত ঘটেছে। পরবর্তী স্তরে পুরাতন জাতীয়তাজ্ঞান পাশ্চাত্য নবলব্ধ জাতীয়তাজ্ঞানকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে। শেষ স্তরে পাশ্চাত্যের প্রভাবটা বিশেষ কিছু নেই— আছে কেবল পাশ্চাত্য শব্দ, শ্লোগান ও লীলাকৌশল।

হিন্দু জাতীয়তা তথা জাতিত্ব জ্ঞানের প্রাথমিক দলিল হিসেবে নজরে আসে আল বিরুনীর 'তাহকীক-ই-হিন্দ'। এটি প্রায় নয় শ বছর পূর্বে লিখিত। মুসলিম জ্ঞানসাধকদের মধ্যে আল বিরুনীই প্রথম, যিনি অমুসলিম সভ্যতা, চিন্তাধারা ও শিল্পকলা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন করে গভীর অন্তদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে সেগুলোর মূল সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ লিখে গেছেন। তিনি ভারতীয়দের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতিষ স্মৃতি ও আচার-ব্যবহারের বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এজন্য তিনি প্রায় দশ বছর ভারতে বসবাস করে উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলেমিশে তাদের আচার নীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছেন। এ কারণেই তাঁর মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে নির্ভুল হিসেবে গৃহীত হয়। তিনি হিন্দু বর্ণ ও শ্রেণী সচেতনতা এবং জাতীয়তা জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বলেছেন,

> হিন্দুরা মনে করে তাদের দেশের মতো আর নেই, তাদের জাতির মতো আর নেই, তাদের রাজার মতো আর নেই, তাদের ধর্মের মতো আর নেই, তাদের জ্ঞান-দর্শন-বিজ্ঞানের মতো আর নেই। তারা উদ্ধত, মূর্খের ন্যায় গর্বিত, আত্মভিমানী ও নিষ্ক্রিয়। তাদের জ্ঞান তারা অন্যকে বিতরণ করতে স্বভাবতই কৃপণ; নিজেদের নিম্নবর্ণের নিকটে তা প্রচার করতে একান্তই অনিচ্ছুক, বিদেশির নিকটে মোটেই না।

বর্ণভিত্তিক সমাজে রক্তের বন্ধন প্রবল থাকায় হিন্দুরা নিজেদের মধ্যেই সংঘবদ্ধ থাকত, আত্মকেন্দ্রিক হওয়ায় বাইরের স্পর্শ একেবারে বর্জন করত। আল বিরুনী হিন্দু জাতীয়তার এ রূপটি আরও পরিচ্ছন্ন করে বলেছেন,

> ধর্মতাত্ত্বিকতায় মূলত তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এ বিষয়ে তারা বাকযুদ্ধেই অধিক পটু; ধর্মীয় প্রশ্নে হিন্দু কখনো প্রাণ, দেহ বা সম্পত্তি বিপন্ন করতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে বিদেশির প্রতি তাদের বিদ্বেষও সীমাহীন। বিদেশিকে তারা 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ অপবিত্র জ্ঞানে সর্বতোভাবে পরিহার করে, কিছুতেই তার সংস্পর্শে আসে না।

অতঃপর আল বিরুনী বর্ণনা করেছেন, কীভাবে হিন্দুরা বর্জন নীতি পালন করে—অন্তবিবাহ, মেলামেশা, পঙ্ক্তিভোজন এমনকি জল স্পর্শও নিষিদ্ধ করে দিয়ে। কেউ একবার এর কোনো একটি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে জাতিচ্যুত হয় এবং পরে আর জাতে ওঠে না। বিদেশিকে হিন্দু ধর্মে স্থান দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

এজন্য হিন্দুর সঙ্গে বিদেশিদের মেলামেশা অসম্ভব এবং ব্যবধানটা ক্রমাগতই বিস্তৃত হয়ে যায়।

হিন্দু ধর্মের এই বিমুখিতা ও বিরোধ বৌদ্ধ ধর্মের মতো জরথুস্থ ও মধ্যপ্রাচ্যের সকল জাতির প্রতিই সমান তীব্র। এই বিরোধভাব তীব্রতর হয়ে ওঠে যখন ইসলামের সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটে। প্রাক-ইসলামি যুগে হিন্দুর বিরোধ অন্য ধর্মীর প্রতি কী পরিমাণ ছিল, সে সম্বন্ধে আল বিরুনীর বর্ণনার সত্যতা পরীক্ষা করার উপযুক্ত তথ্যের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামের সঙ্গে বিরোধ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, সেসব ঐতিহাসিক তথ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেছেন, বিদেশির প্রতি হিন্দুর শত্রুভাব তীব্রতর হতে থাকে মুসলমানদের এদেশ আক্রমণের প্রথম যুগ থেকেই। অবশ্য এ প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। আল বিরুনীর বর্ণনায় সিন্ধুবিজেতা প্রথম আরব মুহম্মদ বিন কাসিম প্রথম ভারতে পাদস্পর্শ করার মূহূর্ত থেকেই হিন্দু বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং গজনীর সুলতান মাহমুদের বারংবার আক্রমণের ফলে এ বিদ্বেষ তীব্রতম আকার ধারণ করে। মাহমুদের বারংবার অভিযানের ফলে হিন্দুরা চতুর্দিকে ধূলিকণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত ধূলিকণাগুলো মুসলমানকে অগ্নিকণার মতোই লক্ষ করতে থাকে। হিন্দুরা মুসলিম অধিকারের বহু দূরে আত্মরক্ষা করতে থাকে শম্বুকের মতো—ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সবরকম সংস্পর্শ থেকে হিন্দুর প্রাণধর্মকে সংরক্ষণ এবং মুসলমানের প্রতি দিন দিন শত্রুতাভাব বর্ধিত আকারে পোষণ করে।

স্কুলে পাঠাভ্যাসকালে লেখককে সংস্কৃত ভাষা শিখতে হয়েছিল। তখন হিন্দু ধর্মের মহৎ শিক্ষা 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' 'বসুধৈব কুটুম্বকম' ইত্যাদি লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু বাস্তব ব্যবহার কালে হিন্দুর বর্ণপ্রীতি ও অহিন্দুর প্রতি অমানবিক আচরণ লেখককে সর্বদাই পীড়িত করত। তখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাইরে অন্য বর্ণ বা ধর্মের উপস্থিতিও সহ্য করতে পারে না। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে ও ব্রাহ্মণের কৌলিন্যে কতদূর একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রবন্ধ *'ব্রাহ্মণ'* লিখেছিলেন ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বজ্ঞান সংবলিত বিশদ আলোচনা করে, অন্যত্র সে কথা বিশদ হয়েছে। বস্তুত এটিই হলো হিন্দু জাতীয়তার চিরন্তন রূপ। *হিন্দুর সারকথা হলো রক্তে হিন্দু না হলে মানুষ মাত্রেই ম্লেচ্ছ ও অশুচি, অতএব স্পর্শেরও অযোগ্য, কারণ তার ফলে হিন্দু আত্মার পতন ঘটে।*[১৩৮] অন্যান্য ধর্মের অপর ধর্মের প্রতিই বিরোধ; কিন্তু মানুষকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, অসংকোচে তার অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসে। এখানে স্মরণীয়, মুসলমান না হয়েও খ্রিষ্টান আসতিক ছিল হযরত উমরের খাস ভৃত্য।

---

১৩৮. রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পে বিশদভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

যাহোক, এবার দ্বাদশ শতকে লিখিত একটি সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা করা যেতে পারে। এতে এদেশে মুসলমানের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুর জাতীয়তা কী রূপ নিয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত মিলবে। এটি ঐতিহাসিক কাব্য, পৃথ্বিরাজ-চৌহানের কাহিনী তার উপজীব্য। কাব্যটির প্রস্তাবনায় শোক প্রকাশ হয়েছে আজমীঢ়ের নিকটবর্তী হিন্দুদের তীর্থরূপে পরিগণিত পরম পবিত্র পুষ্কর হ্রদটি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছদের (টিকাকার বলেছেন তুর্কি মুসলমান) হস্তে অপবিত্র হওয়ার দরুন। তার প্রতিটি চতুষ্পদী স্তবকের প্রথমার্ধে হ্রদের কোনো পৌরাণিক মাহাত্ম্যের উল্লেখ করে দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানের হস্তে কীভাবে কলুষিত হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, তার প্রতিটি কাহিনীই হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গস্বরূপ। বর্ণিত আছে : পুষ্কর একদা ব্রহ্মার আবাসভূমি ছিল এখন মুসলমান ভীতিতে আক্রান্ত। মহাযজ্ঞের পর ব্রহ্মা পুষ্করে অবগাহন করে ক্লান্তি দূর করেছিলেন, কিন্তু এখন অস্পৃশ্য বিদেশিরা দেবালয় ধ্বংস করে সেখানে স্নান করে। একদা পুষ্কর ছিল বিষ্ণুর আনন্দাশ্রুর আধার, কিন্তু এখন অপবিত্র বিদেশির উচ্ছিষ্ট সেখানে নিক্ষিপ্ত হয়। একাদশ রুদ্রের নয়নবহ্নিতে একদা পুষ্কর উত্তপ্ত হতো, কিন্তু এখন বন্দী ব্রাহ্মণের নয়ন জলে পুষ্কর ভারাক্রান্ত। স্বর্গের দেবতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল পুষ্করে, এমনকি স্বর্গরানি শচীদেবীরও সেখানে অবগাহন বিধেয় ছিল না, কিন্তু এখন বিদেশি অপবিত্র রজঃস্বলা রমণীকুল তার জলে নিত্য স্নানবিহার করে (টিকাকার এখানে তুর্কি রমণী বলেছেন)। পূর্বে স্বর্গের দেবকুলের পানীয় ছিল পুষ্করের পূতবারি, কিন্তু এখন বর্বর ম্লেচ্ছরা তার বারিপান করে; ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব পাঠান্তে হিন্দুমনে যে আবেগ উত্থিত হয়, মুসলমানকে বিদেশি ও অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ ভেবে যে পরিমাণ ঘৃণা-বিতৃষ্ণা-বিদ্বেষরাশি হিন্দুচিত্তে জাগ্রত ও সঞ্চিত হয় তা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই ছিল সে যুগের বাস্তব চিত্র।

আলোচ্য কাব্যটনিতে যে শোকোচ্ছ্বাস আছে, তাতে জ্ঞানচর্চার অভাবে আত্মিক হীনম্মন্যতাই প্রকটিত হয়েছে। মুসলমান কেন বিজেতা হলো, তার একটা যুক্তিসহ কারণ অনুসন্ধান না করে কবি এই পরাজয়কে পৌরাণিক কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছে। তিনি বলেছেন , বর্তমান পাপপূর্ণ কলিযুগে ব্রাহ্মণরা আর জপতপ করেন না যাগযজ্ঞও আর হয় না; এজন্য ইন্দ্রদেব অর্ঘ্য না পাওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দ্বিতীয়ত, রণদেব কার্তিকেয় বাহনের দুর্বলতা গতিহীন হয়ে পড়েছেন—তাঁর বাহন ময়ূরটি মাত্র বৃষ্টিধারা পান করে, কিন্তু যাগযজ্ঞের অভাব বরুণদেব আর বৃষ্টিবর্ষণ করেন না। তৃতীয়ত, সূর্যবংশে পুরাকালে বিষ্ণুদেব রামাবতাররূপে আবির্ভাবে হওয়ায় ক্ষত্রিয়রা বীর্যবান ছিল, কিন্তু বুদ্ধাবতাররূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবে বর্তমানে হীনবীর্য হয়ে পড়েছে। এখন শ্রীবিষ্ণু মুনিরূপে হরিণকে আশ্রয় করেছেন। এজন্য পুষ্করে মদকলের (মদহস্তী : মুসলমান) আক্রমণ ঘটেছে। এখানে লক্ষণীয় যে, বৌদ্ধদের অহিংসনীতির দরুন হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির পতনের প্রতি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু কবির আক্ষেপ থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, বারো শতকে হিন্দু-

www.pathagar.com

শক্তি বীর্যহীন হয়ে পড়েছিল এবং বলদৃপ্ত মুসলমানের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

উপরে দুটি মুসলিম ও হিন্দু পণ্ডিতের বর্ণনা থেকে পাঁচশ বছর ধরে হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের কিছুটা পরিচয় মিলবে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উত্তর ভারতে মুসলমানরা সহসা একদিন উদিত হয়ে জয়লাভ করেনি। উত্তর সীমান্তে মুসলমানরা বহু দশক ধরেই বারে বারে হানা দিয়ে ভারতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রয়াস পেয়েছে এবং আরব ও তুর্কির হানা পূর্ব-রোমকরাজ্য যেমন ইউরোপে অনুপ্রবেশের পথে সার্থকভাবে বাধাদান করেছিল, ঠিক তেমন কঠিন বাধা না দিলেও ভারতীয় হিন্দুরা প্রাণপণে প্রতিরোধ করেছে। এই সংগ্রাম-সংঘাত চলেছে প্রায় দু-শতকেরও বেশি—প্রতিরুদ্ধ বারিধারার মতো, মুসলমান রণধারা ভারতীয় প্রতিরোধের ওপর বারংবার নির্মম বেগে ফেটে পড়েছে; শেষে প্রতিরোধ কোথায় ভেসে গেছে, জলধারার মতো মুসলমান বাহিনী উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে হিন্দু মন-মানস মুসলমানের বিরুদ্ধবাদী হয়েছে এবং শেষে জাতবিদ্বেষে রূপ নিয়েছে। নৈরাশ্য ও হীনম্মন্যতা বোধের দরুন যে, ঘৃণা-বিতৃষ্ণা-বিদ্বেষ হিন্দুমনে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, পরবর্তীকালে বংশধররা কয়েক শতাব্দী ধরে আঙিনার পাশাপাশি বাস করেও সে বেদনা-বিদ্বেষ ভুলতে পারে নি। এটিই হিন্দুমানসের অবধারিত প্রতিক্রিয়া। এজন্যই ভারতের মাটির গুণ, যেখানে হিন্দুর ঘরে জন্ম নিলে তাকে মুসলমানবিদ্বেষী মানসিকতায় ভুগতেই হয়, আর মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে এ বিষম বিষজ্বালা সইতেই হয়।

এদেশে মুসলমানের আবির্ভাবের দরুন হিন্দুর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমে ক্রমে রূপায়িত হতে লাগল। আক্রমণের ফলে এক-এক জাতীয় জীবের একরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আক্রমণ ও অধিকার বিস্তার যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তখন বন্য জন্তুরা ও আদিবাসীরা আক্রমণকারীর নাগালের বাইরে বহুদূরে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে থাকে। একটি বিখ্যাত ফরাসি কবিতায় পড়েছিলাম, পুরুষ নেকড়েটি শিকারিদের হাতে নিহত হলে স্ত্রী নেকড়ে বাচ্চাগুলোকে গুটিয়ে নিয়ে কিভাবে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তার চমৎকার বর্ণনা। ইংরেজরা আফ্রিকায় অভিযান করলে বুয়রেরা ঠিক এমনিভাবে দূরতিক্রম্য নিবিড় জঙ্গলে আত্মরক্ষা করত। মুসলমানেরা অভিযান করে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক হিন্দুও একই পন্থা অবলম্বন করেছিল। তারা পাহাড়ি অঞ্চলে, জঙ্গলে অথবা মরুপ্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল ম্লেচ্ছ সংস্রব পরিহার করতে। কিন্তু অধিক সংখ্যকই আধুনিক সভ্য মানুষের আচরণ গ্রহণ করেছিল এবং সেজন্য অবশ্য প্রথমে পতিত গণ্য হয়েছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকাবাসী হিন্দুরা মন-মানসের সঙ্গে একটা আপস-রফা করে মুসলমানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে শারীরিক নিরাপত্তা ও আত্মিক পবিত্রতা রক্ষার একটা আশ্চর্য রীতির অনুসরণ করত।

www.pathagar.com

'হিন্দুর এ মনোবৃত্তি মুসলিম শাসকের উদার বা অনুদার নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল না। কারণ উদারতা কিংবা অনুদারতা, আকবর বা আওরঙ্গজেব নির্বিশেষে হিন্দুরা কখনো মুসলিম শাসন বা শাসককে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি এবং অবর্জনীয় পাপ হিসেবেই মৌখিক মেনে নিতে ও সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল, যতদিন পাপ বিদেশি শক্তিমান ও দণ্ডধর ছিল।'[১৩৯]

এজন্য যতদিন ভারতে মুসলিম শাসন বলিষ্ঠ ছিল, ততদিন হিন্দু জাতির কোনো বিদ্রোহ প্রতিরোধ বিক্ষোভের কোনো আশঙ্কা ছিল না, হিন্দুরা দলে দলে মুসলমানের দাসত্ব করে পার্থিব ঐশ্বর্য মর্যাদা আহরণ করেছে নিরীহভাবে। মুসলমান সুলতান বাদশাহরা হিন্দুদের নিয়োগ করেছেন প্রশাসনিক কর্মে, রাজস্ব আদায়ে ও অন্য হিন্দু রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্যে সিপাহসালার হিসেবেও। ক্ষত্রিয় রাজপুত ও অন্যান্য গোত্র মুসলমান ক্ষাত্রশক্তির সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা মন্ত্রী ও দরবারি সভাসদরূপে মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে, হিন্দু কবি ও ভাটেরা 'শ্রীযুত হসন জগতভূষণ', 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো·বা' ইত্যাদি প্রশস্তি রচনা করেছেন। এরূপ নানা প্রকৃতির হিন্দুর সেবা লাভে মুসলমান শাসকরা কখনো বঞ্চিত হন নি বা অভাবে বোধ করেন নি।

কিন্তু এসবের উর্ধ্বে কখনো হিন্দু-মুসলমান মিলন ঘটে নি। জাতিত্বের কঠিন বৃত্ত রচনা করে হিন্দু কখনো তার ভিতরে মুসলমানকে প্রবেশ করতে দেয় নি। এমনকি রাষ্ট্রিক মর্যাদা ও ক্ষমতা লোভে হিন্দু কখনো কখনো মুসলমানকে কন্যাদান করলেও সে সূত্র ধরে আত্মীয়তা স্বীকার করে নি। কন্যাকে মৃতা জ্ঞানে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আরও কৌতুককর এই যে, এসব কন্যা বহু ক্ষেত্রেই মুসলমান স্বামীর হেরেমে হিন্দুর আচারে জীবন কাটিয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবপূজা করেছে এবং পৃথক পাকাহারে বিশুদ্ধ হিন্দুর জীবনযাপনের অদ্ভুত প্রহসন সৃষ্টি করেছে জাতিত্ব রক্ষার অন্ধ বিশ্বাসে। বহু হিন্দু সাহিত্যিক ও কবি এই জাতিত্ব রক্ষার হাস্যকর প্রয়াসকেও মহিমারূপে চিত্রিত করেছেন। জাতিত্ব রক্ষার এই কৌতুকাভিনয় সম্বন্ধে যদি পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বর্ণিত নন্দ মিস্ত্রি ও তার বিশ বছরের সেবিকা টগরের কাহিনীটি স্মরণ করতে বলি। কৈবর্তনন্দন নন্দ যখন টগরকে 'পরিবার' রূপে পরিচিত করতে চেয়েছিল, তখন 'টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বছর! পোড়া কপাল! জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি আমি হলুম কৈবর্তের পরিবার। কেন কিসের দুঃখে?'

"বিশ বছর ঘর করছি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি! সেকথা কারও বলবার যো নেই! টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাত-জন্ম খোয়াবে না"।[১৪০]

---

১৩৯. Nirod C. Chaudhuri : Autobiography of an Unknown Indian, p 504.
১৪০. শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব : তিন।

www.pathagar.com

আমি আরও একটি গল্পে পড়েছিলাম, এক বাল-বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতী তার সখীকে প্রণয় কাহিনী বলার সময় গর্ব করে বলছে, সে গো-খাদক প্রণয়ীকে দেহভোগের অধিকার দিলেও মুখ চুম্বনের অধিকার দেয় নি, পাছে জাতিনাশ হয়! রবীন্দ্রনাথও একটি গল্পে বলেছেন, এক আধুনিক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান হোটেলে গিয়ে সবরকম খাবার গ্রহণ করতেন, কিন্তু অন্ন নয়, কারণ বাবুর্চির রান্না ভাত তাঁর গলায় নামে না! বলাবাহুল্য, হিন্দু জাতিরই এটি সনাতন সংস্কার। অন্য সর্বনাশ তার সইতে পারে, কিন্তু জাতিনাশ সইবে না।

মুসলিম শাসন আমলের সুদীর্ঘকালে হিন্দু বিধানকর্তারা হিন্দু সমাজকে সর্বোতাভাবে বেঁধে মুসলমানে নাড়ির বা হাড়ির সম্পর্ক কোনোক্রমেই স্থাপিত না হতে পারে। দুই সমাজের মেলামেশার ক্ষেত্রও সীমিত করা হয় এবং নতুন বিধি নিষেধে নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্থিব স্বার্থের কারণে মুসলমানের অধীনে চাকরি করা কিংবা মুসলমানের পোশাক পরিধান করা যদিও উপেক্ষিত হতো, হিন্দুকে গৃহপ্রবেশকালে বিদেশি পোশাক ও বিদেশির সব চিহ্ন বাহির দ্বারে ত্যাগ করতে হতো এবং গঙ্গাজলে সর্বদেহ সিক্ত ও পবিত্র করে অন্দরে প্রবেশাধিকার মিলত। যদি কোনো হিন্দু এসব কঠিন বিধি লঙ্ঘন করে মুসলমানের সামান্যতম চিহ্ন বা আচরণ গ্রহণ করত তাহলে তাকে জাতিচ্যুত হতে হতো। সম্ভবত অনেকে অবগত নন যে, বিখ্যাত ভারতীয় কবি ঠাকুরও (রবীন্দ্রনাথ) এক বাঙালি ব্রাহ্মণ গোত্রের সন্তান ছিলেন, যে গোত্রটিকে জাতিচ্যুত করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কোনো গোঁড়া বাঙালি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বংশের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন নি। ঠাকুর বংশের অপরাধ ছিল, তাঁদের কোনো পূর্বপুরুষ (জয়রাম?) কোনো এককালে মুসলমানি পদার্থের অতি নিকটে এসেছিলেন,

> কাহিনীতে বলে যে, তিনি বিখ্যাত ইসলামি খানা 'পোলাও'-এর ঘ্রাণ গ্রহণ করেছিলেন।'[১৪১]

'ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনং' নীতিতে ঠাকুর বংশকেও জাতিচ্যুত হতে হয়েছিল।

> 'ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক ইতিহাসে জানা যায় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে ঠাকুর বংশ কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলে বাস করতেন সেখানকার চিরাচরিত বাসিন্দাদের-পোদ, মালো ও জালিয়া কৈবর্তদের প্রতিবেশী হয়ে, কারণ তাঁরা ছিলেন পিরালি বা পতিত ব্রাহ্মণ এবং নীচ শ্রেণীর প্রতিবেশীদের সম্বোধন 'ঠাকুর বংশের উৎপত্তি।'[১৪২]

হিন্দুর অনুভূতি, আবেগ ও চিন্তাধারা মুসলমানের অনুকূল হওয়া স্বাভাবিক ছিল না এবং বাস্তবপক্ষে কোনোকালেও ছিল না। বাহিরে হিন্দু মুসলমানের যত সংস্রবে এসেছে, যত দাসত্ব ও সেবা করেছে পার্থিব স্বার্থবশে, ভিতরে দিকে ততই হিন্দু মুসলমান থেকে দূরে সরে গেছে, হিন্দু নিজের অভেদ্য বৃত্তে নিজেকে গুটিয়ে

১৪১. Nirod C. Chaudhuri, পূর্বোক্ত, p 414.
১৪২. History of Bengal (1757-1905), C. U. p. 391 : রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৪।

www.pathagar.com

নিয়েছে। হিন্দু মুসলমানকে বরাবর বিদেশি তথা সামাজিক স্তরে মিলনের অযোগ্য ভেবেছে। মুসলমান শাসক যতক্ষণ শক্তিশালী ও অপরাজেয়, ততক্ষণ হিন্দু রাজা-মহারাজা থেকে নিম্নতম কর্মচারী তাঁর হুকুম বরদার হয়েছে, তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার মুহূর্তেই তাঁর প্রতি হিন্দুর আনুগত্য ছিন্ন তুষারের মতো বিলীন হয়ে গেছে। হিন্দুর আনুগত্য ছিল কর্ম করার প্রায়শ্চিত্তের মতো, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ছিন্ন হলেই আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা থাকত না। তখন পাপ-গ্লানি মুক্ত হয়ে হিন্দু স্বর্গীয় আশীষ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ত। এভাবে আল বিরুনীর কথিত হিন্দুবিদ্বেষ সারা মুসলিম শাসন আমলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এজন্য হিন্দু জাতীয়তা মুসলমান আমলে এমন স্তরে বিস্তৃত ও বিরাজমান ছিল, যার দমন বা উৎপাটন সামরিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। এ জাতীয়তা নীরবে পোষণ করা হয়েছে শামুকের মতো ধীর-মন্থর গতিতে ও নিজের বৃত্ত মধ্যেই এ আশা নিয়ে যে, বিদেশির ক্ষমতা একদিন দুর্বল হবেই, শাসন শিথিল হবেই; তখন আনুগত্যের বাহ্যিক মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে মুসলমানের শির লক্ষ করে হিন্দুর খড়্গ উদ্যত করা হবে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে হিন্দুরও জাতীয়তাবাদ বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মতো উত্তর ভারতকে প্লাবিত করে ফেলল, তার রাজনৈতিক উত্থানও আরম্ভ হলো। মারাঠার স্বপ্ন 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহি' সাম্রাজ্যবাদ হিন্দু-জাতির নিকট প্যান-হিন্দু জাগরণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ ধারণ করল। হিন্দুর বহু শতাব্দীর শানিত 'খর করবাল' মুসলমান শিরে উদ্যত হলো। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকরা তখন শক্ত জমিনে আসন গ্রহণ করেছে এবং তুলাদণ্ডের অন্তরালে শানিত অস্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক দাবা খেলায় তুখোড় খেলোয়াড় হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে বাঙালি হিন্দুর অস্ত্রবল না থাকলেও কূটবুদ্ধি বল ছিল এবং এই কূটবুদ্ধির খেলায় ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ শ বছরেরও অধিককালের মুসলিম শাসনের যবনিকা টেনে দিল। রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে গেল বটে, কিন্তু প্রভু বদলের সুযোগ তো মিলেছিল : ব্রিটিশ সাম্রাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে হিন্দুর আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও নবরূপায়ণের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল। এক্ষেত্রের সদব্যবহারও হিন্দু কীভাবে ও কোন কোন ধারায় করেছে, সে ইতিহাস পূর্বেই বিশদ্‌ভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

ইংরেজ শাসন আমলে হিন্দুরা ইংরেজকে ত্রাণকর্তা 'কলির দেবতা' ভেবেছে, ইংরেজ শাসনকে ভেবেছে বিধাতার আশীর্বাদ। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য ভাবধারাকে উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করেছে এবং এই নবলব্ধ জ্ঞানসম্পদকে বিধাতার করুণাশীষ বিবেচনা করে তার সঙ্গে একাত্মবোধে সমন্বয় সাধনে আত্মসমর্পণ করেছে। একটি হিন্দু বাংলা পত্রিকা মন্তব্য করেছে :

www.pathagar.com

'ইংরেজ কলির দেবতাস্বরূপ। তাঁহাদের কত উইলবার ফোর্স, হ্যামডেন, মিল, ব্রাইট, মেটকাফ, মেকলে প্রভৃতি শত শত মহাত্মা আছেন, যাঁহাদের উদারনীতি আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে, আমরা তাঁহাদের সাধুতার মডেলরূপে জ্ঞান করি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হই।'[১৪৩]

কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'আমাদের বাল্যকালে ইউরোপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেম তার অত্যুচ্চ সভ্যতা ও বিরাট বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্যে; বিশেষত ইংল্যান্ডের, কারণ সে-ই এসব জ্ঞান আমাদের দ্বারদেশে এনে দিয়েছে'।[১৪৪]

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন,

'১৮৩৩ সালে কি ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর হবে—না ... তখন বাঙালি নেতারা, রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন অন্যান্য ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশের জয় লাভের জন্যে। ... ১৮৩৩ সালে বাংলা দেশে দুটি জাতের মানুষ ছিল, হিন্দু ও মুসলমান। যদিও তারা একই দেশের বাসিন্দা ছিল, তবুও এক ভাষা ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ছয়শ বছর ধরে বাস করেছে যেন দুটি ভিন্ন পৃথিবীতে। ... রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ মুসলিমদের জ্ঞান করতেন হিন্দুদের যত দুর্গতি ও অসম্মানের মূল উৎস হিসেবে—যা হিন্দুরা নয়শ বছর ধরে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আর ব্রিটিশ শাসনকে জ্ঞান করতেন বিধাতার আশীর্বাদ, যার প্রসাদে হিন্দুরা কুখ্যাত মুসলিম শাসন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে ও পত্রপত্রিকায় মুসলমানদের উল্লেখ করা হতো 'যবন' হিসেবে ... তখন ব্রিটিশকে বিতাড়িত করে হিন্দু বা ভারতীয় শাসন স্থাপনের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। এমনকি রাজা রামমোহন রায়েরও এমন ইচ্ছা জন্মে নি এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট নাগরিক প্রকাশ্যে বলতেন যে, যদি ঈশ্বর তাঁকে 'স্বরাজ' ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে বেছে নিতে বলেন, তাহলে তিনি শেষেরটিই বিনা দ্বিধায় বেছে নেবেন।'[১৪৫]

ড. মজুমদার আরও বলেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে যে জাতীয়তা জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তা ছিল মূলত শিক্ষিতদের আন্দোলন। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই তা সীমিত ছিল এবং তাঁরা ছিলেন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, বিপ্লবে নয়।

এজন্যই এ সম্প্রদায় ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না এবং তাদের কোনো সাহায্য দেয় নি।[১৪৬]

সিপাহি মিউটিনির সময় আমাদের জাতীয় প্রেস বিদ্রোহীদের কোনো সহানুভূতি দেখায় নি।

---

১৪৩. Hist. of Bengal, C. U. p 207.
১৪৪. Ibid, p 207.
১৪৫. Ibid. p 193.
১৪৬. Ibid. p 197.

www.pathagar.com

> ...তখন সমস্ত প্রেস ব্রিটিশ শাসনের সুফলের গুণগান করেছে এবং বিদ্রোহীদের সমাজের ইতর শ্রেণীর লোক বলে গালাগালি দিয়েছে। প্রায় সব সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা এ ভূমিকা পালন করেছে, কারণ তখনকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিদ্রোহ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না।'[১৪৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে তার প্রকৃত রূপ ছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন, যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, 'রামরাজ্য' স্থাপন। তখন বাংলাদেশে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠায়, পুণায় সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজে মহাজন সভা প্রতিষ্ঠায় মূলত প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয়েছিল। দয়ানন্দের ১৮৮২ সালে 'গো-রক্ষিণী সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও ১৮৯৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠান একই অনুপ্রেরণাপ্রসূত। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাও একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর 'আনন্দ মঠ' গ্রন্থ ও 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র সমস্বরে প্রচারিত করেছে—হিন্দুর ধর্ম, জাতি ও জাতীয়তা জ্ঞান একই অবিভাজ্য বিষয়—এ তিনের একই চিন্তাধারার অভিব্যক্তি।

> এজন্য মুসলিম শিরে তাঁর অভিশাপ, গালাগালি ও বিদ্বেষ বিষ বর্ষণে কিছুমাত্র কৃপণতা ছিল না।[১৪৮]

'সেকালে বাংলায় আমাদের মহৎ বীরদের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায়, রাজপুত মারাঠা ও শিখ বীরদের জীবনী আমদানি করতে হয়েছে। রাণা প্রতাপের দেশপ্রেম ও শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মসমূহ তখন আমাদের ঘরে ঘরে কীর্তিত হতো।

> অন্য কোনো সাহিত্যে এমন বীর রসাত্মক কবিতার সাক্ষাৎ মিলবে না, যেমন কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শিবাজীর উপর এবং শিখগুরু বন্দা ও গুরুগোবিন্দের উপর'।[১৪৯]

বস্তুত জাতি বৈরিতার যে তীব্র আন্দোলন সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রসমূহের মারফত উত্থিত হয়েছিল ও তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, পৃথিবীর কোনো দেশের সাহিত্যেই তার তুলনা নেই। তৎকালীন হিন্দুর 'শক্তি' পূজায় ও 'স্বদেশী' আন্দোলনে কোনো পার্থক্য ছিল না এবং বলাই বাহুল্য যে, মুসলমানের তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দূরে থাক, তাকে অস্পৃশ্য বিদেশি বিজাতি জ্ঞানে তার শির লক্ষ্য করে অভিশাপ ও বিদ্বেষ বিষই বর্ষিত হতো।

পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের ফলে যদিও দুটি জাতির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগ একই সমতলে কিছুকাল কাজ করেছে এবং খেলাফত আন্দোলনে হিন্দুও যোগ দিয়েছে, তবুও হিন্দুর মন-মানস কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে গান্ধীর সমকালীন একটি উক্তির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে আলোচনা কালে এস. কে. মজুমদার বলেছেন,

---

১৪৭. Ibid, by Benoy Ghose, p 227-28.
১৪৮. Ibid, by R. C. Majumdar, p 202-203.
১৪৯. Ibid, p 205.

www.pathagar.com

খিলাফত আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসিলম ঐক্য কোনো সবল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মুসলিম জনগণের নিকট এটা ছিল একটা ধর্মীয় আন্দোলন, ভারতীয় স্বাধীনতার কোনো চিন্তা এতে ছিল না। আর গান্ধীর নিকট এটা ছিল নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রবল হাতিয়ার। তখন গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, খেলাফত আমাদের দুজনের নিকট কেন্দ্রীয় বিষয় মওলানা মোহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার নিকট হচ্ছে, খেলাফতের জন্যে জীবনপাত করে আমি গো-নিরাপত্তা নিঃসংশয় করছি, অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি।"[১৫০]

ড. রমেশ মজুমদার বলেন,

'জাতীয়তাবাদী নেতাগণ রাজনৈতিক গরজে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে জনমনকে বিভ্রান্ত করতেন। এমনকি শিবাজী উৎসবে মুসলমানকে টেনে আনার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে ইতিহাসের ভুল উপস্থপনা করতেন ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিতেন, যদিও মুসলমানরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই শিবাজীকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকারী মোগলের জাতশত্রু হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।... তিলক ইতিহাসের সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, "শিবাজী মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি, সমকালীন অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।" ... কিন্তু একথা বিশ্বাস করতে পারি নে যে, তিলক ভুলে গিয়েছিলেন যে, 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহির' স্লোগানেই মারাঠা শিবাজীর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, কিংবা চিৎপবন ব্রাহ্মণ পেশোয়ারা যে গোত্রের সন্তান তিলক ছিলেন ; মোগল সাম্রাজ্যের উৎখাত করে মারাঠা প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার দুর্মদ বাসনায় যুদ্ধ করেছিলেন, কেবলমাত্র উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো বিমূর্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। শিবাজী উৎসবের নাম নিয়েও মুসলমানকে দলে টানার সূত্র প্রসারিত করা একটা প্রশংসনীয় চিন্তা বটে, তবে এটা ছিল বালির সূত্র।[১৫১]

এই ছিল হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের স্বরূপ। তার কোনো বৃত্তে মুসলমানকে ভাইয়ের মতো স্নেহে উদারতায় আকর্ষণ করার স্পৃহা ছিল না, থাকতেও পারে না। জাতি বৈরিতার তীব্র দহনে জর্জরিত হিন্দু মন-মানস মুসলমানকে সর্বস্তরে দূরে নিক্ষেপ করেছিল 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বিশ্লেষণ দিয়ে।

একজন বিশিষ্ট ফরাসি সাহিত্যিক (La Rochefoucald) বলেছেন, এমন নারীরও সাক্ষাৎ মেলে যার প্রেমের কাহিনী নেই। কিন্তু এমন নারীর সাক্ষাৎ প্রায় মেলে না, যার একটি মাত্রই প্রেমের কাহিনী আছে। অনুরূপভাবে বলা যায়, এমন মানুষ বা মানুষ গোষ্ঠী আছে যার ঘৃণা-বিদ্বেষ করার ক্ষেত্র হয় নি, কিন্তু যার জমিনে এ বিষাঙ্কুর একবার উপ্ত হয়েছে, সে ঘৃণা করা ছাড়া বাঁচতে পারে না। যতদিন মুসলমান হিন্দুস্তান শাসন করেছে, ততদিন হিন্দু মুসলিম রাজশক্তিকে ঘৃণা করেছে, যখনই মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়েছে, তখনই হিন্দু জাতীয়তা 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর' স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। তারপর ব্রিটিশ এলে হিন্দু ব্রিটিশকে ঘৃণা করেছে।

১৫০. S. K. Majumdar : Jinnah and Gandhi, p 61.
১৫১. History of Freedom Movement, vol. II, pp 150-151.

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো হিন্দুর এ বিদ্বেষ-ঘৃণা এখন ব্রিটিশের অন্তর্ধানের পর মুসলমান ও পাকিস্তানের উপরে বর্ষিত হচ্ছে।[১৫২]

মুসলিম শাসন শেষ হয়ে গেছে দু শ বৎসরেরও উপর। মুসলিম শাসন উৎখাত করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারও সমাপ্তি ঘটেছে দুই দশকের বেশি দিন হয়ে গেল। আজ পাঠান-মোগল; সুলতানি-বাদশাহী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্রীড়াপটে বিরাজ করছে। কিন্তু আজও কি এই বিদ্বেষ দুষ্ট হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে? স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সমানাধিকার ভিত্তিতে আজও কি হিন্দু মুসলমানকে একই সমতলে গ্রহণ করতে পারছে? সব শেষ হয়ে গেলেও কি বিদ্বেষ বিষ নাশ হবে না?

মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ জনমত

ক.

ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে ব্রিটিশ আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে ওঠে আঠারো শ সাতান্নর পর থেকে এবং জনমতও ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে। তার পূর্বে এ দেশ সম্বন্ধে জনগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল না। একটা বিজিত কলোনি রয়েছে এবং সেখান থেকে অজস্র ধারায় ধনসম্ভার দেশে আসছে, যার ফলে তাদের শিল্প ও জাতীয় সম্পদ অভাবিতরূপে সমৃদ্ধ ও স্ফীত হয়ে উঠছে; এরূপ একটি চিন্তা-ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত আত্মতুষ্টি ছিল। আঠারো শ সাতান্নর বিপ্লবে তাদের এ মোহনিদ্রা ভেঙে গেল। এই বিপ্লবে ইংল্যান্ডের প্রায় এমন কোনো পরিবার ছিল না, যার কোনো প্রাণহানি হয় নি, যেখানে শোকধ্বনি ওঠে নি। এজন্য ব্রিটিশ রাজের অধীনে ভারত সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে এদেশ সম্বন্ধে যেমন শাসন ব্যবস্থায় নয়ানীতি অনুসৃত হয়, তেমনি ব্রিটিশ জনগণও এদেশবাসী সম্বন্ধে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকে।

ব্রিটিশ জনমত গঠিত প্রভাবিত ও চালিত হয়েছিল প্রধানত চার শ্রেণীর ব্যক্তির উদ্যমে। তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা যায় পার্লামেন্টের সভ্যদের ও রাজনীতিকদের। তাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এবং এদেশ সম্বন্ধে উল্লেখ্য বিষয়ে নিজেদের মতামত সোচ্চারে প্রকাশ করতেন। তাঁদের পীঠস্থান ছিল পার্লামেন্ট এবং রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও তাঁরা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতেন, প্রচারপত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁদের মতামত প্রধানত বিধৃত হয়ে আছে পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীতে, শ্বেতপত্রে, সরকারি ঘোষণা পত্রে এবং রাজনীতিক দলসমূহের বার্ষিক ও সাময়িক অধিবেশনকালের বিবরণীসমূহে। এদিক দিয়ে উপকরণের পরিমাণ পর্বত প্রমাণ হলেও সেসব দলগত নীতিরই প্রতিধ্বনিতে বেশি আবিষ্ট ও সোচ্চার।

১৫২. N. C. Choudhuri, op. cit-p 415-16.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায় সাংবাদিকদের। ইংল্যান্ডে সাংবাদিকতা বিশিষ্ট রূপ নেয় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। বিখ্যাত দৈনিক 'দি টাইমস' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৪১ সালে, 'ম্যানচেস্টার গার্জেন' ১৮৭১ সালে। 'ডেইলি হেরাল্ড' ১৯১৩ সালে আত্মপ্রকাশ করেই ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। তাছাড়া সাপ্তাহিক 'ইকনমিস্ট' (১৮৮৩), 'নিউ স্টেটসম্যান' (১৯১৩), 'অবজারভার' (১৯০৮), 'স্পেক্টেটর' (১৮৯৭), 'সানডে টাইম' (১৯০১), মাসিক 'কন্টেম্পরারি রিভিউ' (১৮৬৬), 'এম্পায়ার রিভিউ' (১৯০১), ফোর্টনাইটলি রিভিউ' (১৮৬৫), 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' (১৮৭৭), 'ন্যাশনাল রিভিউ' (১৮৮৩) এবং 'এশিয়াটিক রিভিউ' (১৮৬৬), 'কোয়াটার্লি রিভিউ' (১৮৬৭), 'রাউন্ড টেবল' (১৯১০) প্রভৃতি ত্রৈমাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাও ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকে। এখানে 'সাংবাদিক' শব্দটা কিছুটা বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং পেশাদার সাংবাদিক ছাড়াও যেসব পার্লামেন্টের সভ্য, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে লিখতেন এদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে, তাঁদেরও ধরতে হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও মতামতের মূল্যায়ন করতে হবে দলগত আনুগত্য ও নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এবং প্রকাশের টেকনিক, কৌশল এবং ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা বিবেচনা করে। আরও বিবেচনা করে যে, দলগত নীতি ও স্বার্থের বেদিতে সংবাদপত্র কীভাবে সত্যকে হত্যা করে, ক্ষতবিক্ষত, সংকুচিত ও স্ফীত করে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদও সৃষ্টি করে। ১৯৪৮ সালে যখন ইংল্যান্ডে প্রেস সম্পর্কিত 'রয়াল কমিশন' তদন্ত হয়, তখন কমিশন সমক্ষে সাক্ষ্য দানকালে 'ডেইলি স্কেচ' পত্রিকার জনৈক সহ-সম্পাদক বলেছিলেন : প্রাগে হিটলারের ১৯৩৯ সালে প্রবেশ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আসছে না, অথচ সংবাদ ছাপাতেই হবে, অতএব তাঁকেই আদেশ দেওয়া হয়েছিল 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' হিসেবে একটা চাঞ্চল্যকর বিবরণ প্রস্তুত করে দিতে। 'ম্যানচেস্টার' অফিসের অধিকর্তা লিওনেল বেরি সাক্ষ্যে অসংকোচে বলেছিলেন,

'আমার তো মনে হয়, সব সংবাদপত্র অফিসেই এমন রকম হয়ে থাকে'।[১৫৩]

গত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত যখন পাকিস্তান আক্রমণ করে, তখন 'লাহোর অধিকার' প্রভৃতি আজগুবি সংবাদ প্রচার করে ভারতীয় সাংবাদিকরা মিথ্যা প্রচারণার যে কুকীর্তি করেছিলেন, সেসব কারো অজানা নয়। অতএব আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'আমাদের নিজস্ব ভারতীয় সংবাদদাতা প্রেরিত' শীর্ষক সংবাদসমূহের কী পরিমাণ লন্ডনের ফ্লীট-স্ট্রিটে ও ম্যানচেস্টারের ক্রস স্ট্রিটে শিল্পকর্মরূপে প্রস্তুত হয়েছিল, তার হিসাব নির্ণয় করা সহজকর্ম নয়।

---

১৫৩. Report of Royal Commission on Press : 1949 p 129.

www.pathagar.com

তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায় সেসব ভারত-প্রবাসী কর্মরত ব্রিটিশ নন্দনদের, যাঁরা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে এদেশে বহুবর্ষ অতিবাহিত করে অগাধ অর্থসহ 'হোম'-এ প্রত্যাবর্তন করে অবসর জীবনযাপন করতেন। তাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠকাল এ দেশবাসীর সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন; এ দেশের আবহাওয়া ও মানব প্রকৃতি তথা নানাবিধ সমস্য সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মেছে, এজন্য এদেশের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা মতামত প্রকাশের উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। তাঁদের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করত। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাক্তন আই সি এস এবং প্রশাসনিক বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ভাইসরয়, গভর্নর, কমান্ডার ইন চীফ, বিচারপতি ইত্যাদি। তাঁদের অধিকাংশই আত্মজীবনী, রোজনামচা, স্মৃতিচারণ প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করে এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ রচনা করে উত্তপ্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত ও মতামত প্রকাশ করতেন।

চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলা যায় পণ্ডিত ও গবেষকদের। তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করেও ভারতবিদ পণ্ডিত হিসেবে অধীত বিদ্যার মাধ্যমে এদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিবেচিত হতেন এবং সমকালীন উত্তপ্ত বিষয় বা সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মত প্রকাশের অধিকারী বিবেচ্য হতেন। আলোচ্যকালে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতের ইতিহাস উচ্চস্তরে পঠিত হতো ও গবেষণা করা হতো, এজন্য এসব জ্ঞানী পণ্ডিতের সংখ্যাও ছিল অতি অল্প এবং তাঁদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রও ছিল অত্যন্ত সীমিত।

খ.

আমাদের আলোচ্যকাল প্রায় নব্বই বছর, ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত। এ সময়ে প্রায় তিন শতাধিক ইংরেজ ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ্যে লিখিতভাবে ব্যক্ত করেছেন, যদিও আন্তরিক ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দেড়শতের অধিক হবে না। সংখ্যাটা এক শতকের প্রেক্ষিতে খুব বেশি নয় এবং এর কারণ হলো ইংল্যান্ডের ঘরোয়া সমস্যা, বিদেশ নীতি এবং প্রধানত ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক উন্নাসিকভাবজনিত অজ্ঞতা ও উদাসীনতা। এজন্য সামান্যমাত্র জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্বল করে নিজস্ব স্বার্থ ও ঘৃণ্যভাবের দ্বারা চালিত হয়ে এসব 'ভারত বিশারদরা' এমন সব কথা বলতেন ও এরূপ মত প্রকাশ করতেন, যা বাস্তবে মিলত না; বল্গাহীনভাবে কল্পনা কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে উদ্ভট বিষয়কে সত্য ঘটনা হিসেবে অতিরঞ্জিত করে নিরঙ্কুশ আজগুবি মতামত প্রকাশ করতেন। তাঁরা পার্লামেন্টে বড় বড় আবেগময় বক্তৃতা দিতেন, সংবাদপত্রে জোরালো বিবৃতি দিতেন, প্রতিষ্ঠাবান সাময়িক পত্রিকায় চমকপ্রদ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতেন, ভারতবাসী বন্ধুদের পত্র দিতেন; আপন আপন সামাজিক বৈঠকে, ক্লাবে বক্তৃতা দিতেন ও গল্প বলতেন—এমনি নানাপ্রকারে সাধারণ জনমত গঠিত ও

www.pathagar.com

প্রভাবিত করতে প্রয়াস পেতেন। রাজনীতিবিদরা ও সাংবাদিকরা আলোচ্য বিষয়ের সর্বদিক বিবেচনা করে নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্ত মতামত ব্যক্ত করতেন, এমন কল্পনা করাও দুরাশামাত্র। তাঁদের বিশিষ্ট দল আছে ও নীতি আছে, সেসবের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য রেখে নিজস্ব মনমেজাজ রুচিনির্ভর মত প্রকাশই তাঁদের পরম নীতি। তাঁদের উদ্দেশ্য দলীয় নীতিনির্ভর শ্রোতাদের শ্রবণরোচক বক্তৃতা দিয়ে আসর মাৎ করা ও জনমতকে নিজেদের অনুকূলে আনয়ন করা; এজন্য বাস্তবসত্যকে পেঁচানো, দোমড়ানো ও খণ্ডিতকরণে তাঁদের বিবেক বিসর্জনে কিছুমাত্র সংকোচ হতো না। তাঁরা বক্তৃতাকালে বা সংবাদপত্রের 'লিডার' রচনাকালে তথ্যপঞ্জি পুস্তকাদি নিয়ে নির্ভুলতার জন্যে মাথা ঘামাতেন না, উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অসংকোচ মতামত ব্যক্ত করতেন; শ্বেতপত্র, ইতিহাস, কিংবদন্তি ও কল্পনা সমান মর্যাদায় তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হতো। সাংবাদিকরা তো গবেষক পণ্ডিত নন, অতএব গবেষক পণ্ডিতের নির্ভুলতা সাংবাদিকের কলমে আশা করা যায় না। তাঁরা লেখেন কাগজের জন্য, সাধারণ পাঠককে খুশি করার জন্য এবং ফলশ্রুতিতে অর্থের জন্য; অতএব পণ্ডিতের নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্ত উক্তি ও গবেষকের নির্ভুলতা ও যথার্থ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করাও অযৌক্তিক।

এসবের ফল এই হয়েছিল যে, ব্রিটিশ জনমত নৈতিকতার ভিত্তিতে বাস্তব সত্য নিয়ে গঠিত হয় নি। এসব 'ভারত বিশারদদের' মনগড়া কাহিনী ও বিবরণীকে কেন্দ্র করে বারবার সেগুলোকে সাধারণ্যে প্রচারণার ফলে 'মিথ' বা অতিকথারূপে রূপায়িত হয়েছিল এবং আশ্চর্য, প্রত্যেক নতুন ঘটনা বা সমস্যাকে এই অতিকথাসমূহের কোনো একটির অভিব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতো।

ব্রিটিশ জনমত এভাবে পাঁচটি মিথের নির্ভরশীল ছিল। তাদের প্রথমটি ছিল 'রাজভক্ত মুসলমান। বলাবাহুল্য, এটির জন্ম হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ রক্ষণশীল (কনজারভেটিভ) দলের মধ্যে। সার উইনস্টন চার্চিল লিখিত 'ম্যালখন্দ ফিল্ড রেজিমেন্ট' থেকে শুরু করে মাত্র সেদিন প্রকাশিত সার ওলাফ কারো লিখিত 'দি পাঠান্স'-এ একসুরে কীর্তিত হয়েছে আফ্রিদি, পাঠানদের দুর্মদ উদ্ধত স্বভাব, তাদের আতিথেয়তা ও বন্য সারল্য—যেসব গুণ ইংরেজদের আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে। এই অতিকথার সমর্থক ভারত প্রবাসী ইংরেজ কর্মচারীরা, যাঁরা পাঠানদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে এসেছেন। তাঁরা পাঠানদের রাজভক্তির কথায় পঞ্চমুখ হয়ে সমস্বরে বলেছেন, 'আমরা এদের অবহেলা করতে পারি নে; কারণ একবার এই যুদ্ধপ্রিয় জাতিটা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমাদের ভারত শাসন শেষ হয়ে যাবে ... পাঠানকে সমর্থন করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে ও আমাদের ওপর খুশি রাখতে হবে, কারণ পাঠানরাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৌলভিত্তি এবং তার ওপরেই এ শাসন টিকে থাকা নির্ভর করছে।' বলাবাহুল্য, মাত্র কয়েক হাজার পাঠানের চরিত্র থেকে আট-দশ কোটি মুসলমানের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে হাজার উক্তি বা ধারণা যেমন হাস্যকর তেমনি অযৌক্তিক। আশ্চর্য যে, এ মিথের এখনও মৃত্যু;

www.pathagar.com

এখনও 'দি টাইমস' পত্রিকায় দু-একটি চিঠিতে কিংবা স্মৃতিচারণে পাঞ্জাবি মুসলমানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দিনগুলো যাপনের স্মৃতি রোমন্থনকালে ভারতপ্রবাসী ইংরেজ কর্মচারীরা এ অতিকথার পুনরুক্তি করে থাকেন।

'লেফট' বা বামপন্থীরা যে মিথের ভক্ত ছিল, সেটা হলো, ভারত শাসনে ব্রিটিশ নীতি 'বিভেদ এনে শাসন করো' (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) ভারতের অভিশাপস্বরূপ এবং এই কূটনীতির মৌলভিত্তিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অটুট রাখা হয়েছিল। এ দলের বদ্ধ ধারণা ছিল হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পারসি-মারাঠা সব মিলে এক দেশের বাসিন্দা, অতএব এক জাতি এবং কংগ্রেসই সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যার সব ভারতবাসীর পক্ষে কথা বলার অধিকার আছে। কেবল প্রশাসনিক ইংরেজরা চক্রান্ত করে মুসলিম লীগের সৃষ্টি করেছে, পৃথক নির্বাচনের সমর্থন করেছে এবং এভাবে অখণ্ড হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞান বিপন্ন করে দেশটাকে ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেছে। বলাবহুল্য, এ মিথটির জন্ম পাক-ভারতের মাটিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কল্যাণে এবং তাদেরই এজেন্টরা বিলেতে রীতিমতো প্রচারকার্য চালিয়ে বামপন্থী রাজনীতিকদের এ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। উল্লেখযোগ্য, স্বয়ং গান্ধী প্রচার করতেন, 'হিন্দু-মুসলমান একজাতি, শয়তান ব্রিটিশ শাসকরাই দুই সম্প্রদায়ে ভেদবুদ্ধির জন্ম দিয়েছে।' এখনও এ মিথেরও মৃত্যু হয় নি এবং এখনও বামপন্থী ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের উল্লেখকালে বলে থাকেন, সাম্প্রদায়িকতা এমনকি পাকিস্তানের সৃষ্টিও ইংরেজের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির ফলশ্রুতি মাত্র।

বামপন্থীরা আরও প্রচার করতেন, জাতীয়তা ও আত্মসচেতনতা প্রাচ্যকে ইংরেজরাই শিক্ষা দিয়েছে। ভারত একটিমাত্র জাতি, অতএব এই জাতিরই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে ইংরেজদের সহায়তা করা উচিত। ভারত স্বাধীন হতে চায়, অতএব তার জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ইংরেজদের এশিয়ায় একটি বলিষ্ঠ ও সহৃদয় মিত্রশক্তির সৃষ্টি করা উচিত, অন্যথায় সেখানে কেবলই সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রদ্রোহ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ডানপন্থীরা বলতেন, ভারতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে রক্ষা করা আমাদের গুরুদায়িত্ব। ভারত একটি দেশ নয়-উপমহাদেশ। সেখানে একটি জাতির অস্তিত্ব নেই, জাতিসমূহের সমাবেশ আছে। ইংল্যান্ডের, জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো একধর্মী, এক ভাষাভাষী, এক বর্ণের মানুষ ভারতে বাস করে না—বর্ণের, ধর্মের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণে ভারত একটি বহুজাতির দেশ। তার একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। কিন্তু তারা তো হিন্দুত্বের মধ্যে বিলীন হতে রাজি নয়। মুসলমান, অস্পৃশ্য, শিখ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতিকে জিজ্ঞাসা করো, কেউ হিন্দু-জাতিত্বে মিশে যেতে প্রস্তুত নয়। আমরা বহু আয়াসে উপমহাদেশটায় শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছি। এখন একটিমাত্র সংখ্যাগুরু জাতির কৃপাপাত্র হিসেবে বাকি সব জাতিকে ফেলে দিলে আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে

www.pathagar.com

এবং একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বাকি জাতিসমূহকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হবে। আমরা এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারি না।

এসব মিথের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সর্বভারতীয় সংহতি ও ঐক্যের অতিকথা। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে, রাষ্ট্রিক শাসনের দিক দিয়ে এবং জনসমষ্টির তথা নৃতাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে এ উপমহাদেশ কখনো সংহত, এক ও অভিন্ন থাকে নি। ব্রিটিশ শাসন আমলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক শাসন প্রচলন করা হয়েছিল, যদিও দেশীয় রাজ্যের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু শাসকদের সাম্রাজ্যবাদের সুবিধার্থে যে এক শাসনের সৃষ্টি, তার দ্বারা উপমহাদেশের বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু বর্ণ ও সংস্কৃতি ধর্মের বিলোপ ঘটে নি। প্রত্যেকটিই আপন আপন স্বতন্ত্রসত্তা সযত্নে রক্ষা করে চলেছিল। সেক্ষেত্রে এক ভারতীয় সংহতি ও ঐক্যের ধুয়া ছিল সত্যের অপলাপ মাত্র। আশ্চর্য যে, এ মিথের অন্ধভক্তি ব্রিটিশ জনমতকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়, তখনও ব্রিটিশজাতির সর্বদলই—বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, উদার ও রক্ষণশীল, মধ্যমপন্থী, লেবার ইত্যাদি—দুঃখ প্রকাশ করেছে ভারতীয় অখণ্ডতার হানিতে। কিন্তু মিথের মৃত্যু সহজে হয় না এবং বাস্তবতার কঠিন কষ্টিপাথরে শত ঘর্ষণেও সত্যের উজ্জ্বল দিকটা মিথ-বিশ্বাসীরা সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। এ এক বিচিত্র মানবীয় মনোবৃত্তি।

অবশ্য ব্রিটিশ এ মনোবৃত্তির সপক্ষে দুটি কারণ নির্দেশ করা যায় : প্রথম, ব্রিটেনে তথা ইউরোপে জাতিত্ব তথা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে ভাষা ভিত্তিতে; সেখানে সংখ্যালঘুর প্রশ্ন ওঠে নি, হিন্দু বা মুসলমানদের মতো দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সমস্যা দেখা দেয় নি। এ জন্যে ইংরেজমানস বর্ণভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা চিন্তাও করতে পারে না। ব্রিটেনে জাতীয়তা জ্ঞান গঠিত হয়েছে কালক্রমে, কোনো সংঘাত বা বিরোধের মুখে ইংরেজের জাতীয়তা জ্ঞান দানা বাঁধে নি। এজন্যে ইংরেজের মানস ধর্ম বা ক্রিডকে জাতীয়তা জ্ঞানের মৌলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল্যায়ন জ্ঞানে পার্থক্য ফলে পাশ্চাত্যবাসী প্রাচ্যবাসীর জাতীয়তা তথা রাষ্ট্রীয় রূপরেখার ধ্যানধারণা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না।

তাছাড়া মুসলমানেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তার অবশ্য কর্তব্য ছিল, নিজের দাবিদাওয়া নিজের সমস্যাসমূহ ব্রিটিশ জনসমক্ষে তুলে ধরা, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ প্রচারণার দ্বারা নিজের কথা ইংরেজকে বারবার অবগত করানো ও তার পক্ষে ইংরেজ জনমত সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই হয় নি এবং তার অস্তিত্বও ইংরেজের চোখে পরিচ্ছন্ন ও বলিষ্ঠরূপে কেউ তুলে ধরে নি। আমীর আলী লন্ডন মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে মাঝে মাঝে চা-নাস্তার সভা ডাকতেন; আগা খান সুবিধা ও সুযোগক্রমে উচ্চ মহলে মুসলমানের কথা বলতেন। এছাড়া মুসলমানের আর কোনো মুখপাত্র ছিলেন না। তার কোনো

www.pathagar.com

মুখপত্রও ছিল না প্রচারকার্য চালাতে। অন্যপক্ষে হিন্দুর প্রচার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল ইন্ডিয়া লীগ, ইন্ডিয়া ডিফেন্স লীগ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কমিটি প্রভৃতি, প্রত্যেকটি সংবাদপত্র ছিল তার প্রতি সহানুভূতিশীল, তাছাড়া ইন্ডিয়ান কমিটি ১৮৯০ সাল থেকে 'ইন্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ব্রিটিশ জনসাধারণকে ভারত সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুর বক্তব্য জ্ঞাপন করতে। হিন্দুরা ব্রিটিশ প্রেসে নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে, লন্ডন ও নিউইয়র্কে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, পার্লামেন্টের সভ্যদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালিয়েছে, বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের সময় কিয়ের হার্ডির মতো কট্টর হিন্দুঘেঁষা সাংবাদিকদের ভারত পরিদর্শনে এনে নিজেদের কথা ও কাজের বলিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করিয়েছে এবং নিজেদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রচারকর্মে সহানুভূতি লাভ করেছে। ব্রিটিশ মালিকদের সংবাদপত্রে এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায় হিন্দু সাংবাদিকদের নিয়োগের ফলে ভারেত বিষয়ক সংবাদসমূহে হিন্দুর কথাই প্রচারিত হয়েছে; তার ফলে ভারতীয় সংবাদ ও 'ডেসপ্যাচ'-এ মুসলমান ও মুসলিম সমস্যা কোনো উল্লেখ্য স্থান পায় নি। হিন্দু প্রতিষ্ঠান লেখক ও সাংবাদিকরা অজস্র পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করে হিন্দুকেই চিত্রিত ও প্রতিফলিত করেছেন ইংরেজ মানসকে প্রভাবিত করতে।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ১৯১৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের লন্ডন সফর উল্লেখ করা চলে। তখন তিনি 'হোমরুল'-এর দাবিতে বিলেতে প্রচারণা করতে গিয়ে কংগ্রেসের তথা হিন্দু জাতীয়তার যে ছবি তুলে ধরেছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের চোখে, তার মোহ ইংরেজরা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তখন তিলক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছেন হেন্ডরসন, ওয়েজউড, ল্যান্সবেরী, বেনস্পুর, হিন্ডম্যান প্রভৃতির সঙ্গে। ব্রিটিশ ও ইন্ডিয়ান ফেবিয়ান সোসাইটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি ক্লাব প্রভৃতির সভায় তিলক বক্তৃতা দিয়েছেন; লেবার পার্টি ফান্ডে ২০০ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছেন এবং সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের কংগ্রেসী মূলমন্ত্রে শিক্ষা দিয়েছেন ও তাঁদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সেক্রেটারি বিথলভাই প্যাটেল বলেছেন,

> 'লোকমান্য তিলকের প্রচেষ্টায় আমরা সমগ্র লেবার পার্টির সমর্থন লাভে সমর্থ হই'।[১৫৪]

গ.

একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়ে গেছে, ভারত-প্রবাসী ইংরেজরাই কংগ্রেসের সবচেয়ে বিরোধিতা করেছেন ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে। তাঁরা ভুলে যান, ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালেন হিউমই কংগ্রেসের জন্মদাতা। তিন জন ইংরেজ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং ইংরেজরাই ব্রিটেনে কংগ্রেসের বেশি প্রচারকার্য চালিয়েছে। কংগ্রেসের

১৫৪. Hist. of Freedom Movement : R. C. Majumdar, vol. ii p 533-34.

www.pathagar.com

জন্মের দুই বছর পূর্বে জন ব্রাইট ইন্ডিয়ান কমিটি গঠন করেন ও পঞ্চাশ জন এম-পিকে সভ্য করেন। ১৮৮৮ সালে চার্লস ব্রাডলো কংগ্রেসের বেতনভুক কর্মচারী নিযুক্ত হন; উইলিয়ম ডিগবি ছিলেন লন্ডনের খাস প্রচারকর্মী। ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল এজেন্সি স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৯ সালে ২৫০০ পাউন্ড প্রচারকার্যে ব্যয়িত হয়। 'ইন্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করে কংগ্রেসের কর্মসূচি ও ভারতীয় বিষয় বিশেষভাবে ইংরেজ জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। ডিগবি প্রচার করতেন 'কংগ্রেস সব জাতি, শ্রেণীর মুখপাত্র, এমনকি মুসলমানেরও। তাদের একটি অংশমাত্র বৃদ্ধ স্যার সৈয়দ আহমদের অনুসারী'। *উইলিয়াম হান্টার*[১৫৫] ছিলেন কংগ্রেসের বড় সমর্থক এবং তাঁর জীবনীকার বলেছেন, 'ব্রিটিশ জনমত প্রভাবিত করার পক্ষে হান্টারের কৃতিত্বই একমাত্র কার্যকরী'। ওদেরবার্ন বলেছেন, 'সরকারের জবরদস্ত কর্মচারীরাই মুসলমানকে কংগ্রেস থেকে দূরে রেখেছে।' কেউ কংগ্রেসের বিপক্ষে কোনো কথা বললে তার জন্মদাতা হিউম তার প্রতি ড়ুগহস্ত হয়ে উঠতেন ও বলতেন, 'মাত্র কয়েকজন অবিবেচক কর্মচারীর জন্যেই মুসলমানরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করে।' আবার স্যার লেসলি গ্রিফিন বলেছেন, 'এটা একটা বাজে প্রতিষ্ঠান, জনকয়েক অখ্যাত স্বার্থলোভী মুসলমান সেখানে ভিড়েছে।' কর্নেল ওয়ার্ড বলতেন, 'এটা আইরিস প্রসাদলোভীদের মতো প্রতিষ্ঠান; উইলিয়াম লিলির নিকট ছিল, 'অবিবেচক ভুইফোড়দের আড্ডা।' স্যার অকল্যান্ড কলভিন কংগ্রেসের নামই বরদাস্ত করতে পারতেন না। অধ্যাপক সিলি অক্সফোর্ডের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, ইংল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের তুলনা হয় না, ইউরোপের বহু জাতির মতো ভারতে বহু জাতির বাস। লর্ড ব্রাইসের মতে 'প্রাচ্যে ধর্মই প্রবল, জাতীয় ভাব সেখানে নেই।' স্যার হেনরী জেমসের মতে 'ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্যে হিন্দুর ধর্মীয় আচরণই দায়ী।' বেক বলতেন, 'নব্য হিন্দু হিংসা ও প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে মুসলমানকে ধ্বংস করছে। ওয়ার্ড বলতেন, হিন্দুর এ শত্রুতার কারণ চারটি—মুসলমানের পূর্ব শাসন, হিন্দুর ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতা লোভের মনোবৃত্তি, কংগ্রেসের জন্ম ও রিপন কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক নীতি। স্যার থিওডোর মরিসন বলেছেন, 'মুসলমানরা ইউরোপীয় সংজ্ঞায় জাতি না হলেও অন্য ভারতীয় থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাবছে ও জাতি হিসেবে গড়ে উঠছে।'

১৮৭০ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত যেসব হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে, তার খতিয়ান বিবেচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, পরিস্থিতি কি ভীষণ হয়েছিল। তার একটি কারণ হলো, প্রথম চার বছরে হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্মীয় উৎসব (দুর্গাপূজা ও কোরবানি) একই দিনে পড়ত। কিন্তু ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম আকস্মিক নয়, অথচ তার দ্বারা তিক্ততা সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটেনের ইন্ডিয়া কমিটি কংগ্রেসের সুরে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে, 'ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন

১৫৫. Indian Musalmans গ্রন্থের লেখক।

www.pathagar.com

আছে।' স্যার হেনরী কটন প্রচার করতে থাকেন, 'ধর্মনির্বিশেষে একই জাতিত্বে সব ভারতীয় গৌরব বোধ করে।' লাহোর ও কার্নালে যখন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর গলা কাটাকাটি করছিল এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে হিন্দুরা লুটতরাজ করে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তখনও হেনরী কটন বলতেন, 'সুরেন্দ্র নাথের নামে মুলতান থেকে ঢাকা পর্যন্ত নব্যদের মধ্যে তীব্র উৎসাহ জাগে' এবং 'মুসলমানের স্বার্থ হিন্দু সংবাদপত্রের চেয়ে অন্য কোথাও সমর্থিত হয় না।'

ঘ.

চলতি শতকের প্রথম দশকে ব্রিটিশ জনমতকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে বঙ্গ-বিভাগ প্রসঙ্গ।

১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে ভারতসচিব হ্যামিলটনকে কার্জন প্রথম লিখিতভাবে জানান, 'বাংলা নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তির প্রশাসনিক কর্তৃত্বের পক্ষে অসম্ভবরূপে বৃহৎ প্রদেশ।' বাংলার এককালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়ট বলেছিলেন, 'প্রশাসনিক একটি ক্ষেত্র হিসেবে বাংলা অতি বৃহৎ, এ স্বতঃসিদ্ধ কথা।' ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে কার্জন বঙ্গ-বিভাগের খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করেন। ১৯০৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সফর প্রাক্কালে তিনি পত্নীকে লিখেছিলেন, 'পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হইচই পুরোদমে চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো যুক্তি দেখান হয় নি।' চট্টগ্রাম, মোমেনশাহী ও ঢাকা সফর করে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। তাঁর পরিকল্পনা বিলেতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়। ১৯০৫ সালের জুন মাসে ভারতসচিব জন ব্রড্রিক সেটি মঞ্জুর করেন; সেপ্টেম্বর মাসে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির সরকারি ঘোষণা করা হয় ও পূর্ব বাংলা-আসাম প্রদেশ জন্মলাভ করে ১৬ অক্টোবর।

কিন্তু এই বঙ্গ-বিভাগকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় যে তুমুল আন্দোলন করে, তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলো ও বেতনভুক সাংবাদিকরা। নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র ও ডেসপ্যাচসমূহে যেসব পরস্পরবিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হতে লাগল 'দি টাইমস' ও 'ম্যানচেস্টার গার্জেন'-এ, তাতে ব্রিটিশ জনমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অশক্ত হয়ে। টাইমস পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে ও কার্জনের কার্যাবলিকে পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে সুন্দর সুন্দর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; 'ম্যানচেস্টার গার্জেন'-এ বিভাগকে নিন্দা করে গরম গরম গরম প্রবন্ধ বের হতে থাকে, নিজস্ব সংবাদদাতার লোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে আন্দোলন সম্পর্কে ও বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে। কটন, নেভিন্সন ও হার্ডি বিক্ষোভকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন। নেভিন্সন ছিলেন 'ম্যানচেস্টার গার্জেন'-এর কলকাতাস্থ রিপোর্টার ও কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ লোক। তিনি বিলেতে এক কৌতুকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করেন :

www.pathagar.com

জাতীয় অন্যায়ের বার্ষিকী পালনটা ভারতের 'ভস্ম বুধবার'-এ পরিণত হয়েছে। ঐ দিন সহস্র সহস্র ভারতীয় কপালে ভস্মের তিলক ধারণ করে। প্রভাতে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নীরবে গঙ্গাস্নান করে, ও উপবাস করে। গ্রামে, শহরে, বাজারে সব দোকানপাট বন্ধ করে; স্ত্রীলোকেরা রান্না করে না ও অলঙ্কার প্রসাধন ত্যাগ করে। পুরুষরা পরস্পর হাতে হলদে সুতার রাখিবন্ধন করে লজ্জার এ দিনটিকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে এবং সারাদিনটি প্রায়শ্চিত্তে শোক পালনে ও উপবাসে কাটায়।[১৫৬]

নেভিন্সন অবশ্য কলকাতায় বসে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্র কল্পনা করেছেন এবং হিন্দু ভারত বিশেষত কলকাতাকে 'ইন্ডিয়া' ও হিন্দু সমাজকে 'ইন্ডিয়ানস' হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের সুরে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতেন যে, মুসলমানরাও বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। অবশ্য *ব্যারিস্টার আবদুর রসুলসহ*[১৫৭] কয়েকজন মুসলমান অন্য স্বার্থবশে কংগ্রেসের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সমগ্র মুসলমান জাতির প্রতিনিধি ধরা যায় না এবং তাঁরাও নেভিন্সন বর্ণিত অনুষ্ঠান দ্বারা 'ভস্ম দিবস' পালনে নিশ্চয়ই শরিক হতেন না। আর 'বাবুরা বিপদে ঠেকিয়াছে' এ সত্যটি উপলব্ধি করে মোমেনশাহীর 'চাষিরা' যে আন্দোলনে যোগ দেয় নি, একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন।

১৯০৭ সালের শেষার্ধে কিয়ের হার্ডি এদেশে আসেন সরেজমিনে আন্দোলনের গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করতে। তিনি সুরেন্দ্রনাথের জামাতা জে চৌধুরীর রক্ষণাবেক্ষণে বোম্বাই ও বাংলাদেশ সফর করেন। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ তাঁকে স্বাগতম জানায়, অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে, 'লোকে তাঁকে দেখে আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে এবং ঈশ্বর তাঁকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে প্রেরণ করেছেন।' পূর্ব বাংলা সফর করে কলকাতায় ফিরে হার্ডি বিবৃতি দিলেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বঙ্গ-বিভাগের তীব্র বিরুদ্ধে। সিরাজগঞ্জে মুসলমানরা 'বন্দে মাতরম' গান গেয়েছে, বরিশালে উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে এ গান শুনিয়েছে। কিন্তু 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে যখন মুসলমানদের নাম করতে বলেন, তখন তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত গোপনীয়, আমার সততায় বিশ্বাস করা উচিত'। বিলেতে ফিরে তিনি বিবৃতি দেন, ভারতে কোনো ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ নেই এবং এটাও আশ্চর্য। বঙ্গ-বিভাগ 'ভুল বিবেচনাপ্রসূত' ও 'মস্ত বড় ভুল।' কিন্তু টাইমস তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে ও অন্যান্য সংবাদপত্রে তাঁকে 'মূর্খ', 'হাস্যাস্পদ', 'বিদূষক' ও 'পাগল' উপাধি দেয়। হেনরি কটনও হার্ডির সুরে সুর মিলিয়ে বলতে

---

১৫৬. The New Spirit of India, pp 1-67-70.

১৫৭. মিঃ রসুল ১২৫ টাকা, নোয়াখালীর লিয়াকত হোসেন ৬০ টাকা ও মাদারীপুরের জনৈক দিলওয়ার আহমদ ৪০ টাকা মাসিক ভাতায় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের নিকট আন্দোলন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন, সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্ট দেখা যায়। রিপোর্ট স্পষ্টভাবে লেখা ছিল : Mr. Rasul is a Muslim Leader of the Hindus (মি রসুল হিন্দুদের মুসলমান নেতা)।

www.pathagar.com

থাকেন, ভারতে উভয় সম্প্রদায়ই বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানরা যে এ আন্দোলনের পক্ষে নয় একথা তিনি বিশ্বাস করতে রাজি ছিলেন না।

বস্তুত বঙ্গ-বিভাগ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ জনমত ছিল দ্বিধাবিভক্ত—টাইমস পত্রিকার পাঠকরা এর পক্ষে ও ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান বিপক্ষে এবং তার পাঠকশ্রেণী ও বহু এম.পি. ও কংগ্রেসভক্ত ইংরেজ ছিল ঘোরতর বিরুদ্ধে। অনেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তও হয়েছিলেন। উয়েডডারবার্ন ১৯০৪ সালে ভারতে আসেন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে; ড. রাদার ফোর্ড ১৯০৭ সালের অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯১১ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু সহসা স্ত্রী বিয়োগ ঘটায় সক্ষম হন নি। হার্বার্ট রবার্টস ভারতসচিব মোর্লের নিকট সুপারিশ করেন ভারতের এই শাসনতান্ত্রিক দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে।

লন্ডনের উদারনৈতিক দল ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে বড় বেশি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছিল। প্রথমে চরমপন্থীদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গকে নিশ্চিত অবস্থা হিসেবে আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু শেষে তারাই বঙ্গভঙ্গ রোধ করেছে। আবার পাকিস্তান পরিকল্পনার তারাই সর্বান্তকারণে প্রতিরোধ করেছে। এই দলের দুজন সভ্যের বিপরীতমুখী নীতিও কৌতুককর—একজন স্যার হেনরি কটন ও অন্যজন স্যার জনরীজ। দুজনই আই সি এস হিসেবে ত্রিশ বছরেরও উর্ধ্বকাল এদেশে প্রবাস জীবন অতিবাহিত করে দেশটা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তারপর চাকরি শেষে 'হোম'-এর প্রত্যাগত হয়ে 'লিবারেল' টিকিটে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু হেনরী কটন ছিলেন কংগ্রেসের একান্ত ভক্ত এবং পার্লামেন্টে কংগেসের প্রত্যেকটি কর্ম নির্বিচারে সমর্থন করেছেন। তিনি ১৯০৪ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন; জোর গলায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেছেন এবং তার রোধকল্পে হিন্দুদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সর্বাংশেই সমর্থন করেছেন। শেষে বঙ্গ-বিভাগ রদ হলে উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি কংগ্রেসকেই ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র ন্যায্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরে মুসলিম লীগকে 'কম্যুনাল' ও সরকার-পোষ্য প্রতিষ্ঠান বলে ব্যঙ্গ করেছেন। অন্যদিকে স্যার জনরিজ বরাবর কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছেন স্বার্থান্ধ হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডা বলে। তিনি বঙ্গ-বিভাগ ও মর্লি-মিন্টো সংস্কার নীতির সমর্থন করেছেন, ন্যায্য ও যথার্থ এবং বিচারসহ বলে; বঙ্গ-বিভাগ রদ হলে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন অন্যায় ও অবিচার বলে এবং স্বার্থান্ধদের অন্যায় আবদারের নিকট নীচ নতিস্বীকার ও দুর্বল নীতি বলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রভাবশালী ইংরেজদের চাপে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-বিভাগ রদ করে 'ভারতে শান্তির বাণী প্রেরণ করতে' বাধ্য হয়। স্পেকটেটরের মতে পূর্ব বাংলার ছোট লাট ফুলারকে বড় লাট মিন্টো পদত্যাগে বাধ্য করায় মারাত্মক ভুল করেন :

www.pathagar.com

'আমাদের কখনই উচিত নয় এক ব্যক্তিকে নেকড়েগুলোর মুখে ফেলে দেওয়া, কারণ নেকড়েগুলো চিৎকার করছে ও দন্তঘর্ষণ করছে।'

ভারতসচিব মর্ল একটি 'আসের' চিন্তা করেন, কারণ তিনি 'হিন্দুদের বিরাগভাজন হতে চাইনে; মুসলমানদের বেছে নিতে যেয়ে যেন আমরা হিন্দুদের ফেলে না দেই।' তিনি গোখেলের প্রভাবে পড়ে গোখেলের ফর্মুলা অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করতে মনস্থির করেন। ফলে স্বতন্ত্র নির্বাচন সম্বন্ধে মুসলমানরা প্রতিশ্রুত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তারপর দিল্লির দরবারের মাধ্যমে ভারত-সম্রাটের মুখ দিয়ে বঙ্গ-বিভাগ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়, যাতে শাসনতান্ত্রিক নিয়মে সম্রাটের উক্তির বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি তুলতে সাহস না করে। টাইমস পত্রিকাও 'সম্রাটের মুখের ঘোষণা' সমর্থন করল। ম্যানচেস্টার গার্জেন বাংলার পুনরায় সংযোজনকে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু সাবধানবাণী উচ্চারণ করে, 'পূর্ব বাংলার মুসলমানের সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।' নিউ স্টেটসম্যান বলে, 'এটা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের জয়।' লেবার লিডার বলে, 'ভারতীয় সংস্কার পন্থীরা তখনই স্বায়ত্তশাসন অর্জন করবে, যখন ব্রিটেনকে তা দিতে বাধ্য করবে।' কেবলমাত্র কোয়াটার্লি রিভিউ বলেছিল, "পূর্বে কখনো আর 'বন্ধুকে পদাঘাত করে শত্রুকে খুশি করার' মতো মেকিয়াভ্যালী নীতি এমন নির্লজ্জভাবে অনুসৃত হয় নি।"

সম্রাটের একটি উল্লেখযোগ্য মহৎ দানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে আগা খাঁ, আমীর আলী ও ভিকার-উল-মূলক মুসলমানদের নিষেধ করেন। ফলে তাঁদের মতো রাজভক্তদের মুসলিম লীগ থেকে অপসারিত করে উগ্রপন্থীরা লীগের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। অতঃপর কয়েক বছর ধরে চলে লীগ-কংগ্রেসের সমন্বয় চেষ্টা; খেলাফত-অসহযোগের যুক্ত আন্দোলন; হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট ইত্যাদি। তখন দি টাইমস বিরক্তি প্রকাশ করে মন্তব্য করে, 'মুসলিম শক্তি আত্ম-উন্নয়নমূলক সুস্থ কর্মসূচী ত্যাগ করে সস্তা বিশেষ অনুভূতিতে চালিত হচ্ছে।' ন্যাশনাল রিভিউ-তে একজন ইংরেজ মন্তব্য করেন, 'মুসলমানদের এ মনোবৃত্তি স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও ভিকার-উল-মূলককে তাঁদের কবরে অস্বস্তিদান করবে।' দক্ষিণপন্থী ইংরেজরা এ সমন্বয়কে অভিনন্দন জানায়। হেনরি কটন উল্লসিত হয়ে বলেন, তাঁর মতামতই নির্ভুল ছিল এবং মুসলমানরা অশিক্ষাবশত বিপদগামী হয়েছিল। ম্যানচেস্টার গার্জেন বলে, অতঃপর একথা বলা নিরর্থক যে ভারতীয়রা দুটি ধর্মে বিভক্ত।' নিউ স্টেটসম্যান বলে, 'যুদ্ধের সময় ভারতে শান্তি রক্ষা করা যাবে মুসলমানদের আমাদের দিকে রাখায় এবং প্রাচ্যে আমাদের সর্বোত্তম স্বার্থ হচ্ছে এ মুহূর্তে ইসলামের অনুভূতি আমাদের অনুকূলে আকর্ষণ করায়।'

কিন্তু এসব প্যাক্ট ও মিলন প্রচেষ্টার শেষ পরিণতিতে দেখা গেল সারা ভারতীয় উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত। পাটনায় প্রায় চল্লিশ মাইল এলাকাজুড়ে ভীষণ দাঙ্গা বাধে ও সমগ্র এলাকাটি হিন্দু

www.pathagar.com

দাঙ্গাকারীদের হাতে চলে যায়। ১৯২১ সালে গান্ধীর অসহযোগী-সেনাদের দুর্ব্যবহারে মালাবারের মোপলারা ক্ষেপে ওঠে। ১৯২০ সাল থেকে সাত-আট বছর হাঙ্গামায় সারা দেশটা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে ১১টি, ১৯২৪ সালে ১৮টি, ১৯২৫ সালে ১৬টি, ১৯২৬ সালে ৩৫টি ও ১৯২৭ সালে নভেম্বর পর্যন্ত ৩১টি বৃহৎ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালের অবস্থা এমন শোচনীয়ভাবে চরমে ওঠে যে, ভারতসচিব স্বীকার করতে বাধ্য হন, পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে ক্ষমতা, সুবিধা ও আত্মস্বার্থ আদায়ের দ্বন্দ্বের দরুন এবং কর্তৃপক্ষের শিথিল নীতির দরুন। তখন চিরলও স্বীকার করতে বাধ্য হন, হিন্দু-মুসলিম কখনো একপ্রাণ ছিল না এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের সম্ভাবনায় বিভেদটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। মুশকিল হয়েছে যে স্বাধীন ভারতে যে শাসনই প্রবর্তিত হোক তা হিন্দু-শাসন হতে বাধ্য এবং এটাই হয়েছে মুসলমানের দুঃস্বপ্ন। ফোর্টনাইটলি রিভিউ-তে জনৈক ইংরেজ লেখেন, 'হিন্দু জাতিতে লীন হয়ে যাওয়া, না হয় দৈহিক শক্তিবলে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করা।' নিউ স্টেটসম্যানের মতে এসব গোলযোগের সৃষ্টি হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতির উপস্থিতির দরুন এবং মুসলমানের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে গেছে যে স্বরাজ অর্থে হিন্দুর আধিপত্য।' 'টাইম-এন্ড-টাইড' পত্রিকা জানায়, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতে শান্তি স্থাপন একেবারে অসম্ভব হবে। স্পেক্টেটরে লিও স্ট্রাচি লেখেন, 'সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলোতে এ ধারণা বলবৎ হয় যে, ভারতে শান্তিরক্ষার জন্যে ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি অপরিহার্য, কারণ সব সময়েই মুসলমান ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যানচেস্টার গার্জেন সোসিয়ালিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে সদা প্রস্তুত থাকে ও হিন্দুর সুরে প্রচার করতে থাকে, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন তুলে দেওয়া হোক, কারণ এসব কংগ্রেসের জাতীয় দাবি পূরণের পথে অন্তরায়।

ঙ

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে সরকার গঠন করে। তার ফলে হিন্দু জাতীয়তা কীরূপ উগ্র রূপ ধারণ করে ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পায়, সে সম্বন্ধে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা লেখে : প্রত্যেক ভারতপ্রেমিক বিচলিত হবেন এই দেখে যে, প্রাদেশিক অটোনমি স্থাপিত হওয়ার দরুন কী ভীষণ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইকনমিস্ট পত্রিকা মন্তব্য করেন, প্রদেশগুলোকে সোজাসুজি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—মুসলিম ভারত ও কংগ্রেস ভারত। টাইমস অব ইন্ডিয়ার একজন প্রাক্তন সম্পাদক লেখেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৯ সালে আবার ভারতসচিব বেসরকারিভাবে ভারত ভ্রমণ করে বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কেবল ধর্মীয় কারণে নয়; জীবনধারায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ পার্থক্য

www.pathagar.com

আছে। কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলো সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে শাসন চালাতে থাকে, এজন্য এমন সার্বিক কংগ্রেসী প্রতাপের অভিব্যক্তিতে ব্রিটেনস্থ কংগ্রেস সমর্থকরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

> কংগ্রেসের হিন্দুকরণ নীতি, বন্দে মাতরম সংগীত ও গান্ধীর ফটো-পূজা শিক্ষায়তনে প্রবর্তন ইত্যাদি সহজেই প্রমাণ করে যে, নতুন শাসন ব্যবস্থায় পুরোপুরি হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।[১৫৮]

বহু ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক যেমন ক্রেরার, এমেরি, রাশব্রুক উইলিয়ামস, স্যার লভেট ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার সংস্কারকর্মে সদিচ্ছা দেখাতে গিয়ে কংগ্রেসকে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠারই পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভাগ অনিবার্যভাবেই রাজনীতিক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ সম্বন্ধে উৎসাহী ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকরা ঐক্যমত প্রকাশ করেন, কংগ্রেস সরকারসমূহ যখন পদত্যাগ করে তখন মুসলমানের ধৈর্যসীমা চরম বিন্দুতে পৌঁছেছিল এবং যেকোনো ভীষণ পরিস্থিতি উপস্থিত হতে পারত। দেশ যেন একটা আতঙ্কিত 'সিভিল ওয়ার'-এর মধ্যে ছিল এবং ব্রিটিশ সামরিক শক্তি বলেই শান্তি বজায় ছিল। ফ্রান্সিস ইয়েটস ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত 'বেঙ্গল লান্স' পুস্তকে বলেন, 'দুই বছরের কংগ্রেসী শাসনকালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দ্বিগুণ হয়, সশস্ত্র ডাকাতি ও নরহত্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়।' ক্যুপল্যান্ডের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলেছিলেন, '১৯৩৯ সালের শেষের দিকে এমন ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে, আরও কিছুদিন কংগ্রেসী শাসন স্থায়ী হলে সাম্প্রদায়িক, হাঙ্গামা অসম্ভব বৃদ্ধি পেত। ব্রিটিশ শাসনে 'গৃহযুদ্ধ' অচিন্তনীয়, কিন্তু এখন অনেকে মনে করেন, তার আর দেরি নেই। কংগ্রেস শাসনের পক্ষে ভাইসরয় শ্বেত পত্রিকা প্রকাশ করে বলেন, কংগ্রেসী সরকার 'অত্যন্ত সফল' হয়েছে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এবং লেবার এম.পি.'রা বলেন, 'মুসলমান, হিন্দু ও সকল সম্প্রদায় এ সাক্ষ্যই দেয় যে, প্রাদেশিক সরকারগুলো ভালোভাবেই শাসন চালিয়েছে।' বেলফোর্ড, হেনরি পলক ও হোরেন আলেকজান্ডার অবশ্য দ্বিধান্বিত ছিলেন। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান বলে, নেহরুর মুসলিম জনসংযোগের দরুন কিছু সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও তিক্ততা বেড়েছিল; কিন্তু মুসলমানের ভয়ভীতি সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করে নি।

দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভের কিছু পূর্বেই ক্রিপস, এটলি ও নেহরু একটা 'কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি'-এর খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন এবং তার বাস্তবায়নের জন্যেই বামপন্থী ইংরেজরা উৎসাহী ছিলেন। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পরিকল্পনাটি সমর্থন করে। নিউ স্টেটসম্যান বলে, মুসলমানের ভেটোতে সমস্ত

---

১৫৮. The British Achievement in India : A Survey—Raw-linson, p 214.

www.pathagar.com

ভারতীয়কে বাধ্য করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। হ্যারল্ড লাসকি বলেন, যুদ্ধ শেষ হলে তিন বছরের মধ্যেই ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হোক, জিন্নাহ ও তাঁর বন্ধুরা তখন নিশ্চয়ই কংগ্রেসের সঙ্গে আপসরফায় বাধ্য হবেন।' প্রাক্তন ভারতসচিব ওয়েজউড বেন কংগ্রেস পরিকল্পনা সমর্থন করে বলেন, 'কংগ্রেস কখনো সংখ্যালঘুদের সমস্যা উপেক্ষা করে নি। একজন লেবার এমপি পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেন, মুসলমানরা কেবল কংগ্রেসের সমর্থনই করছে না, অনেক প্রদেশে একাত্ম হয়ে কাজও করছে।' নিউ স্টেটসম্যান বলে, 'জিন্নাহর মুসলিম লীগ চরম রক্ষণশীল এবং সমস্ত মুসলমানের মুখপাত্র নয়।' এডওয়ার্ড থম্পসন বলেন, মুসলিম লীগ এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানেরও প্রতিনিধিত্ব করে না এবং কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী লীগের চেয়ে বেশি মুসলমান কংগ্রেসের সভ্য।

চ.

অতঃপর ব্রিটিশ জনমতকে ভীষণভাবে আকর্ষিত ও আন্দোলিত করেছে পাকিস্তান প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে একদল ব্যক্তি সমস্যাটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন এবং নিরপেক্ষভাবে বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। প্রায় চৌদ্দআনা প্রেস ও রাজনীতিবিদ সাংবাদিক প্রসঙ্গটির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু যে দুই আনা প্রায় অংশ পাকিস্তানের স্বপক্ষে ছিলেন তাঁদের মতামতের পরিমাণ কম হলেও তার ভার ও ধার ছিল অত্যন্ত বেশি। এখানে একটি বহু প্রচলিত মতের উল্লেখ দরকার। সেটি হচ্ছে, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগসহ সরকার গঠনের ঘোর অস্বীকৃতিই পাকিস্তান সৃষ্টির প্রধান কারণ। কথাটায় আংশিক সত্য আছে। পাকিস্তানের স্বপ্ন মুসলমান দেখেছে আরও কয়েক বছর পূর্বে এবং প্রসঙ্গটা চর্চিত হচ্ছিল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের অস্বীকৃতি ও পরে মুসলমানের চোখ খুলে যায় এবং সবরকম সমঝোতার প্রশ্নে একেবারে হতাশ হয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি সাধনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের কার্যাবলীতে স্বপ্নটার বাস্তবায়নের উদ্যম প্রখর হয়ে ওঠে।

১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্যার মুহম্মদ ইকবাল প্রথম স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা উচ্চারণ করেন। দি টাইমস বলে, 'একথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁর কল্পিত মুসলিম ভারত ছিল বৃহৎ ভারত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। এবং কোনো অর্থেই তাঁর উক্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান কল্পিত হয় নি।' ১৯৪০ সালে এডওয়ার্ড থম্পসন সর্বপ্রথম প্রচার করেন, ইকবাল নিজে তাঁকে বলেছিলেন, ইকবাল পাকিস্তান পরিকল্পনার সমর্থন করেছিলেন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে এবং বস্তুত, ইকবাল জানতেন যে,

www.pathagar.com

> পাকিস্তান ভয়াবহ হবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে, হিন্দুর পক্ষে এবং মুসলমানের পক্ষে।[১৫৯]

লক্ষণীয় যে, ইকবাল ১৯৩৮ সালে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় থম্পসন এমন আজগুবি কথা বলেন নি। তাছাড়া ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লিখিত ইকবালের পত্রাবলি পাকিস্তানের সমর্থনই প্রকাশ করে। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে; তখন তো ইকবাল দুই বছর গতাসু হয়েছেন।

যাঁরা বলেন, কংগ্রেসের হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যমই মুসলমানকে পৃথক হয়ে যাওয়ার মতে সুদৃঢ় করেছিল, তাঁরা দেখান যে, পাকিস্তানের দাবি সোচ্চার হয়েছিল হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতে। ন্যাশনাল রিভিউতে জে সি ফ্রেঞ্চ, দি টাইমস-এর ভারতীয় সংবাদদাতা, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান-এ জে কোটম্যান, লিফোর্ড এবং ক্যুপল্যান্ড এ মতের প্রচারক। ভারতের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা রক্ষার্থে কয়েকজন বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গ্যারাট প্রস্তাব দেন প্রাদেশিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে এবং পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করতে। সমকালীন ভারতসচিব আমেরি বলেন, প্রাদেশিক সীমানা হেরফের করে আঞ্চলিক রাজ্য গঠন, প্রাদেশিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কেন্দ্রের ক্ষমতা যথাসম্ভব হ্রাস করে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা উচিত। আর্থার পেজ বলেন, ভারতকে হিন্দুবহুল ও মুসলিম জেলাসমূহে বিভক্ত করে সেগুলোকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হোক। কোটম্যান প্রস্তাব দেন প্রাদেশিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে প্রাদেশিক অটোনমি দেওয়া হোক এবং কেন্দ্রে একজন মুসলমান বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করা হোক মুসলমান স্বার্থের খবরদারি করতে। ক্রেমেন্ট ডেভিস যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

পাকিস্তান প্রসঙ্গটা যখন ইংরেজ জনমনকে চিন্তায় ফেলেছে, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে বললেন, সর্বনাশকর কিছু তার মধ্যে নেই। ইয়েটস ব্রাউন বলেন, 'ভারত কখনো অখণ্ড দেশ ছিল না, বহু সভ্যতা ও কালচার ভাষা ও ধর্মের উপস্থিতির ফলে সব সমন্বয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার বিভক্ত করেই সমাধান করার চেষ্টা হোক।' জর্জ সুস্টার পাকিস্তান প্রস্তাবে সমাধানের বাস্তব রূপ দেখেছিলেন। গ্রে পাকিস্তান প্রস্তাবকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে বলেন এই জিজ্ঞাসা করে : উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানি কালচার প্রধান অধিবাসীদের হিন্দু রাজের অধীন করায় সর্বনাশ হয় না? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিত ক্যুপল্যান্ড বলেন, 'হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমান নির্যাতনটা মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দু নির্যাতন দ্বারা প্রতিরোধ করার ধারণাটা আদিম বৃত্তি এবং সভ্য রাষ্ট্রের বিপরীত হলেও আমাদের এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, প্রতিশোধের সম্ভাবনা

১৫৯. Enlist India for Freedom (1940). P 58.

www.pathagar.com

নিবৃত্তিমূলক হিসেবে কাজ করে; এ প্রস্তাবে বর্বরতাকে নিজের অস্ত্রেই রোধের আশ্বাস আছে, উত্তেজনা সৃষ্টির নয়।' অন্য পণ্ডিত এনসর দেখেছিলেন, মুসলমানকে হিন্দুর নিরঙ্কুশ শাসন শৃঙ্খলে রাখার কংগ্রেসী নীতি অসম্ভব। কিন্তু মুসলমানের পাকিস্তান নীতিকে অসম্ভব বলা চলে না; অতএব সমঝোতা যেখানে অসম্ভব সেখানে যেটা অসম্ভব নয় সেটাই গ্রহণযোগ্য। সাংবাদিকদের মধ্যে বিভারলি নিকলস 'ভারডিকট অন ইন্ডিয়া' লিখে জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা উজ্জ্বলভাবে ব্রিটেনবাসীর চক্ষে তুলে ধরেন। তাঁর মতো পাকিস্তানের স্বপক্ষে জোরালো ওকালতি আর কারো লেখনী মুখে হয় নি। স্পেক্টেটরের বহুকালীন সম্পাদক ভারতে ঐক্যের একেবারে শূন্যতা দেখে সুপারিশ করেন, মুসলিমবহুল অঞ্চলসমূহকে পৃথক ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার; তাঁর মতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়িত্ব আনয়ন করবে। জন ফিলবি বলেন, 'পাকিস্তান হতাশার কারণ নয়, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো সমাধান না হলে মুসলমানের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার আছে।' প্যাট্রিক লেনি পাকিস্তানের জোরালো সমর্থন করেন ও ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, মুসলমানরা সার্বভৌম কর্তৃত্ব চায় না, শুধু এ নিশ্চয়তা চায় যে, হিন্দুর সহযোগিতা লাভ অসম্ভব হলে তাদের শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা যেন অক্ষুণ্ন থাকে।

দক্ষিণপন্থী দল ছিলেন পাকিস্তানের ঘোরতর বিরোধী। সমকালীন ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ডের মতে দাবির পটভূমিতে সত্য থাকলেও প্রস্তাবটা হতাশার কাছাকাছি, কারণ রাজনৈতিক ঐক্য একেবারে নস্যাৎ করা হয়েছে। লর্ড স্যামুয়েল বলেছিলেন, পাকিস্তান প্রস্তাব ইতিহাস ও ভূগোলের বিপরীত, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি মোটেই নেই। এটা একটা হতাশাব্যঞ্জক প্রস্তাব এবং এর ফলে গৃহযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরিত হবে। বামপন্থীরা হয়েছিলেন উদ্যত খড়্গ। লর্ড স্নেল এমন খণ্ড-বিখণ্ডের দরুন অন্তহীন বিরোধের রূপ দেখেছিলেন। লর্ড ফারিংডন অধোগতির লক্ষণ দেখেছিলেন এবং তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে তিন জন এম.পি. পার্লামেন্টে কঠোর সমালোচনা করেন। বামপন্থীদের জাঁদরেল সাংবাদিক ব্রেলস ফোর্ড পাকিস্তানকে 'গর্হিত' ও 'সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

লাহোর প্রস্তাবটিকে ব্রিটেনের সংবাদপত্রসমূহে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। টাইমস কেবল মন্তব্য করে, কংগ্রেস নীতিই এ প্রস্তাবের জন্যে দায়ী এবং এর ফলে ভারতীয় ঐক্যের সমাধি রচিত হবে। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান গালিবর্ষণ করতে থাকে 'প্রস্তাবটিতে জিন্নাহ ভারতীয় রাজনীতিতে অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন; এর দ্বারা ভারতীয় জাতীয় জাতীয়তার মূলে কুঠারঘাত করা হয়েছে।' নিউ স্টেটসম্যান বলে 'ভারত ধর্ম-ভিত্তিতে বিভক্ত নয়, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদটা

www.pathagar.com

শাসকরা নিজেদের গরজে স্ফীত করে তুলেছেন।' ইকনমিস্ট ও অবজারভার ভাসা-ভাসা সমালোচনা করে।.কিন্তু সবচেয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করে নেচার পত্রিকা :

> আট কোটি বা তারো বেশি মানুষের কণ্ঠস্বর, সাম্প্রদায়িক বিভেদ যা একদা ভুলে যাওয়া হয়েছিল, সেসব অবহেলা করা হলেও সাংস্কৃতিক বিভেদটার উপরেই এর বুনিয়াদ; আর এ কথাটি ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্ররাও জানে। মুসলিম ট্র্যাডিশন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে হিন্দুর আধিপত্যের ভয় তার প্রতি বিদ্বেষের কারণ হলো স্মরণাতীতকালের জাতিত্বের ট্র্যাডিশন যা কার্যত কয়েকজনের শাসনেই নামান্তর। মুসলিম দাবি যতই অবাস্তব হোক, কালচার ও ট্র্যাডিশনকে উপেক্ষা করে ভারতের বৈদেশিক বা আভ্যন্তরিক সমস্যার অন্যভাবে সমাধান ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুভ হবে না।

রাউন্ড টেবিল পত্রিকাটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারবার মত প্রকাশ করে ও বলে : এ পরিকল্পনা ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরোধী, কারণ ভারতীয় ঐক্য বজায় রাখতে ব্রিটিশ বাধ্য; এর ফলে সংঘাত ও ধ্বংসের সূচনা হবে এবং শিল্পোন্নতি ব্যাহত হবে। পাকিস্তান আর্থিক বিষয়ে কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না এবং তার প্রতিরক্ষাও দুর্বল হবে; তার দরুন পাকিস্তানের সংহতি কখনো দৃঢ় হবে না।

ছ

১৯৪১ সালের শেষের দিকে অক্ষ শক্তির পক্ষে মহাসমর অনুকূল হয়ে উঠলে ভারত বিষয়ক জল্পনা-কল্পনা তীব্র হয়ে ওঠে। তার দরুন কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব সাগর পার থেকে আসতে থাকে। একটা আপসরফার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, 'সার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপসকে একটি খসড়া ঘোষণা নিয়ে ভরতে পাঠানো হচ্ছে, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্যে।' ক্রিপস নেহরুর পূর্বতন বন্ধু এবং কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সুবিদিত। এজন্য মুসলমান নেতারা অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। কিন্তু ১০ এপ্রিল কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং মুসলিম লীগও সমান পন্থা অবলম্বন করে। তারপর কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৪৪ সালের শরৎকালে জিন্নাহ গান্ধীর একটি আলোচনাও হয় অচলাবস্থা দূরীকরণে, কিন্তু তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন নিউ স্টেটম্যান গান্ধীর প্রশংসা করে তাঁর উদার ও লিভ শাখা ও বাস্তব আপসমূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে এবং তাঁর শান্তির ওলিভ শাখা প্রসারণের পরও জিন্নাহর বক্তৃতা ও দৃঢ় মনোভাবকে ধিক্কার দেয় 'শকিং' বলে। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড ওয়াভেল বিলেতে যান ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে এবং ১৪ জুন ফিরে এসে এক নয়া প্রস্তাব ঘোষণা করেন। কিন্তু জিন্নাহ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন 'পাকিস্তান প্রস্তাবকে

www.pathagar.com

হিমাগারে পাঠাবার সম্ভাবনা' দেখে। তখন অবজারভার, ইকনমিস্ট ও ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান জিন্নাহকে দোষারোপ করে বলে, 'আমাদের শীঘ্রই তাঁর এমন ভেটো দেওয়া ক্ষমতাটার মোকাবিলা করতে হবে।'

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে লেবার পার্টি ব্রিটেনে সরকার গঠন করে। তার ফলে শ্রমিক দলের কংগ্রেস প্রীতির দরুন ভারতীয় কংগ্রেসীরা সম্ভবত, উল্লসিত হয়ে উঠে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় বলেন, 'সংখ্যাগুরুর প্রগতির পথে সংখ্যালঘুর এ ভেটোদান আমরা আর বরদাস্ত করতে পারি না।' ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ পাশা একেবারে উল্টিয়ে দিয়ে প্রায় সমস্ত আসন অধিকার করে বসে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৭-৪৩ সালের মধ্যে ৬১টি প্রাদেশিক মুসলিম আসনের পুনঃনির্বাচন হয়, তার মধ্যে মুসলিম লীগ ৪৭টি, স্বতন্ত্র ১০টি ও কংগ্রেস ৪টি আসন লাভ করে। ১৪টি কেন্দ্রীয় আসনের লীগ ৭টি, স্বতন্ত্র ৫টি ও কংগ্রেস ২টি পায়। ১৯৪৩-৪৫ সালের মধ্যে ১১টি প্রাদেশিক আসনের লীগ ৮টি ও স্বতন্ত্র ৩টি এবং কেন্দ্রীয় ৪টার, সবই লীগ দখল করে। তখন কংগ্রেস শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানবিরোধীরা বেকায়দায় পড়ে গেলেও কংগ্রেসী অখণ্ড ভারতের জিগিরে কণ্ঠস্বর মেলাতে থাকে। দি টাইমস অখণ্ড ভারত সমর্থন করেও বলে যে, বিভাগ অনিবার্য হলেও সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক সংহতি রক্ষা করা উচিত। রাউন্ড টেবিল পত্রিকা পুনরায় বলে, পাকিস্তান বাস্তব নীতির প্রতিকূলে। গডফ্রে নিকলসন ও সার জন অ্যান্ডার্সন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেন। ম্যানচেস্টার সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে : ব্রিটিশ জাতির নিকট ভারত বিভাগ অগ্রহণীয় প্রস্তাব; কালবিলম্ব না করে নেহরুর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হোক, কংগ্রেস ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭)। মে মাসে পাকিস্তান সৃষ্টি অপ্রতিরোধ্য দেখে পত্রিকাটি বলে, ভারত বিভাগ করা না করা ব্রিটিশ সরকার কিংবা ভাইসরয়ের কাজ নয়, নেহরু রাজি হলে 'আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেব ও তাঁকে সমর্থন করব' (৩ মে ১৯৪৭)। কিন্তু পুনরায় তিন সপ্তাহ পরে চিৎকার করে : 'নেহরু সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তাঁর উপরে ভারত বিভাগ করা না করার দায়িত্বটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।' নিউ স্টেটসম্যান অভিযোগ তোলে, জিন্নাহ চার্চিলের পুনরায় ক্ষমতা লাভের আশায় ভারতের স্বাধীনতা লাভে বাধা দিচ্ছেন। ব্রেলসফোর্ড, সোরেনসেন, কভ, ওয়াট সকলেই বলেন, কংগ্রেসকেই ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। কমিউনিস্ট পার্টি লেবার পার্টির সঙ্গে হাত মিলায়। তাদের মুখপাত্র গল্লাচার বক্তৃতা করেন, কংগ্রেসকে ক্ষমতা এখনই দেওয়া হোক। উন্টার্টন প্রশ্ন করেন : মুসলমানদের কী হবে? কমিউনিস্ট নেতা জওয়াব দেন : গত নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে, টোরিরা কোথায় আছে?

www.pathagar.com

লেবার সরকার ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। তখন এটলি সরকার একটি খসড়া প্রস্তাব দিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে পরবর্তী ভাইসরয় নিযুক্ত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়। মাউন্টব্যাটেন নেহরুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, এজন্য কংগ্রেস পুনরায় উল্লসিত হয়। লর্ড ইসমে, স্যার জর্জ অ্যাবেলসহ বহু ইংরেজ মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ সমর্থন করেন নি। নতুন ভাইসরয়কে মুসলমানরা সন্দেহ করতে লাগল। ১০ মে তারিখে মাউন্টব্যাটেনের নতুন প্লান মাত্র নেহরুকে দেখান; নেহরু ক্ষিপ্ত হয়ে পরিবর্তন দাবি করেন। ভাইসরয়ের ঘনিষ্ঠ ভি পি মেনন কংগ্রেসের দাবি পূরণ করে চার ঘণ্টার মধ্যে নতুন প্লান তৈরি করেন ২১ মে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই। লর্ড ইসমে ও স্যার জর্জ অ্যাবেল তার বিরোধিতা করেন ভাইসরয়ের পরামর্শদাতা হিসেবে।

> কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাঁর জিদই প্রবল হয় এবং 'কমা পর্যন্ত পরিবর্তন না করে' এটলি সরকার মাত্র পাঁচ মিনিট বিবেচনায় সেটি মঞ্জুর করেন।[১৬০]

পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, কিন্তু জিন্নাহ পাঞ্জাব ও বাংলাবিভাগে রাজি হতে চান না। তখন মাউন্টব্যাটেন ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন,

> প্রদেশ দুটির বিভাগ সম্ভাবনায় তাঁর (জিন্নাহর) হৃদয়ে যে অনুভূতি জেগেছিল তেমন অনুভূতি আমার হৃদয়ে ও কংগ্রেসের হৃদয়ে জেগেছিল ভারতবিভাগ প্রসঙ্গে।[১৬১]

এ থেকেই পরিচ্ছন্ন, মাউন্টব্যাটেন কতোখানি কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। এ জন্যই জিন্নাহ তাঁকে পাকিস্তানের যুক্ত গভর্নর জেনারেল নিয়োগের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার জন্যে এটলি সরকারের বিস্ময় ও ক্ষোভের অবধি ছিল না। পাকিস্তানবাসীরাও মাউন্টব্যাটেনকে কখনো ক্ষমা করে নি। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ফার্স্ট সী লর্ড' হিসেবে নিয়োগের পর যখন তাঁর পাকিস্তান সফরের প্রস্তাব আসে তখন তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানে এরূপ বিক্ষোভের ঝড় উঠে যে, প্রস্তাবটি বাতিল করে দিতে হয়েছিল।

জ

ব্রিটিশ রাজনীতিকরা মুসলমানের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করতে কখনো চেষ্টা করেন নি, তার একটি উদাহরণ হলো, পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁরা আফসোসের বন্যায় ভেসেছেন ও আশা করেছেন, পাকিস্তান ভবিষ্যতে ভারত ইউনিয়নে যুক্ত হবে। নির্বোধের স্বর্গ এর চেয়ে আর কিছু নেই।

---

১৬০. The Last Days of British Raj—L. Mosley, p 120; Memoirs of General The Lord Imay, p 421.

১৬১. Asiatic Review, Oct. 1948.

www.pathagar.com

তাঁদের এ আফসোস অবশ্য কংগ্রেসের খেদোক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৯৪৭ সালের ১৪ জুলাই তারিখে ভারত-বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করে এই আশা(!) নিয়ে যে, সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হলে ভারত আবার এক ও অখণ্ড হয়ে যাবে। প্রথম আজাদি দিবসে গান্ধী ঘোষণা করেন, সময় একদিন আসবে যখন বিভাগ রদ হবে। শেষ পরিকল্পনার স্রষ্টা মেনন বলেছিলেন, বিভাগ চিরস্থায়ী হবে এমন ইচ্ছায় তা করা হয় নি। এসব প্রামাণ্য তথ্যাদি থেকে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে, পাকিস্তানের শেষ রূপরেখাটি স্থিরীকৃত হয়েছিল মাউন্টব্যাটেন-নেহরু-মেনন গুপ্ত চক্রান্তের ফলশ্রুতি হিসেবে এবং জিন্নাহকে মাত্র অবগত করে তাঁর সম্মতি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। আর 'উইয়ে-খাওয়া বিকলাঙ্গ' পাকিস্তানের চেহারা কল্পিত হয়েছিল এই হীন মনোবৃত্তি ও পাপবুদ্ধি নিয়ে যে, পাকিস্তান স্বয়ংসম্পূর্ণ চিরস্থায়ী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। 'বিদায়-অভিশাপের' (রবীন্দ্রনাথ) দেবযানীর মতো এই নেহরু চক্র অভিশাপ দিয়েছিল, 'সম্পূর্ণ হবে না বশ; শুধু ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ।' কিন্তু কালই জলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, 'কী আত্ম-প্রবঞ্চিত মূর্খ' ছিল এই চক্রীর দল।

হিন্দু ভারতের এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছে ব্রিটিশ জনমত। দি টাইমস পাকিস্তানকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু এরূপ ক্ষীণ আশাও প্রকাশ করে, একদিন ভারতের সঙ্গে কোনোরকমে মিলিত হবে (১৫ আগস্ট ১৯৪৭)। ম্যানচেস্টার গার্জেন বলে, বিভাগের দরুন এত অসুবিধা ও কর্ম ক্ষতি হবে যে, অভিজ্ঞতার আলোকে মিলন ঘটবে এবং পাঠানরা নিশ্চয়ই হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে, কারণ তাদের দারিদ্র্য মোচনে ভারতের বেশি অর্থ আছে (৫ জুন, ১৯৪৭)।

লর্ড হ্যালিফ্যাকস আশা করেন, বাংলার ও পাঞ্জাবের মুসলমানরা প্রথমে মিলন ঘটাবে, তার দরুন ভারত আবার অখণ্ড হবে। স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন বিশ্বাস করেন যে, বিভাগ স্থায়ী হবে না এবং একদিন দিল্লি অখণ্ড ভারতের হৃদয়কেন্দ্র হবে। লর্ড ইসমেও এমনি আশা প্রকাশ করেন প্রথম আজাদি দিবসে দিল্লিতে বসে। ১৯৪৭ সালের ১০ জুলাই যখন ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পার্লামেন্টে আলোচিত হচ্ছিল, তখন প্রায় সকল বক্তাই এরূপ মনোভাবে পীড়িত হয়েছিলেন। স্বয়ং এটলি আশা প্রকাশ করেন, আবার দুটি রাষ্ট্র এক হবে।

ম্যাকমিলান, রিচার্ডসন, সোরেনসেন সমান আশা প্রকাশ করেন। ক্রিপস দুঃখ প্রকাশ করেন সরকার অখণ্ড ভারতের বিল উপস্থিত করতে অক্ষম হয়েছে বলে। বাটলার তাঁকে প্রবোধ দেন, ইতিহাসের ধারায় আবার এক ভারত চিন্তা জেগে উঠতে পারে। এটলি, মলসন, লর্ড জনহোবা, স্যার স্ট্যানলি রিড উচ্চারণ করেন, 'আমেন।' লর্ড সভায় বিলটি যখন আলোচিত হয় তখন ভারতসচিব লর্ড লিস্টওয়েল আশা প্রকাশ করেন, বিভাগের অসুবিধা যখন অনুভূত হবে, তখন দুটি

www.pathagar.com

রাষ্ট্র 'ভারত রাষ্ট্রে' রূপায়িত হবে। টেম্পলউড, স্যামুয়েল, পেথিক-লরেন্স, স্যালিসব্যারী প্রভৃতি লর্ডগণ বলেন, 'আমেন।'

একুশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এ বিভাগ চূড়ান্ত হয়েছে, পাকিস্তান সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘে নিজের মর্যাদা লাভ করেছে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই নয়—শ্রেষ্ঠতম মুসলিম রাষ্ট্র ও এশিয়ার বিশিষ্ট সমীহযোগ্য রাষ্ট্র হিসেবে। যেসব আত্মপ্রবঞ্চিত ইংরেজ 'ভারতবিশারদরা' নির্বোধের মতো উক্তি করেছিলেন ১৯৪৭ সালে,

> তাঁরাই আজ লালায়িত হয়ে পাকিস্তানের প্রশংসায় মুখর হন ও পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সহৃদয়তা বারবার প্রার্থনা করেন। ইতিহাসই আজ জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেয়, মুসলমান ভুল করে নি, করতে পারে না ও ভবিষ্যতেও করবে না।[১৬২]

১৬২. এই অধ্যায়টি প্রণয়নে K. K. Aziz প্রণীত Britain and Muslim India থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক রূপান্তর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইংরেজদের আচার-ব্যবহার : ইন্ডিয়ান নেববস

সতেরো শতকের মাঝামাঝি এঁদেশে জনবুল কোম্পানির ইংরেজ সন্তানরা এসেছে পণ্যভার নিয়ে বণিকের বেশে। তখন এদেশের মুসলমান সুবাহ্দারের অনুগ্রহপত্র ফরমান শিরোধার্য করে তারা বাণিজ্য করেছে কুঠি স্থাপন করে; শাহি শাসনের ছত্রছায়ায় নিরীহ প্রজার ন্যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং একদিন 'পোহালে শর্বরী বণিকের তুলাদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'

এই এক শ বছরেরও অধিক এদেশে বসবাসকালে ইংরেজরা এদেশবাসীর জীবনের সঙ্গে মিশেছে অন্তরঙ্গভাবে। বাণিজ্যিক কারণে এদেশের নিভৃততম অঞ্চলেও তাদের ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং এজন্য এদেশের আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি অনেকটা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। বহুকাল এদেশে বসবাসকালে এদেশি স্ত্রী গ্রহণ করে সন্তানোৎপাদন করেছে নির্বিচারে। এসব সন্তানই এদেশের অতি ক্ষুদ্র ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়।

> জাব চারণক একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন ... জাব চারণক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে আরাম করিতেন ও তামাক খাইতেন ... লোকে বলে ইংরেজের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাহার (ব্লাকিয়ার সাহেবের) জন্ম হইয়াছিল।[১]

'... নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া বিলাতি পানি ফটাস করিয়া ব্রান্ডি দিয়া খাইয়া 'তাজা বতাজা' গান করিতে লাগিলেন। কোথাও পাদরী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলাচ্ছেন ...

> পান্টালুন ট্যাংট্যোঙে চাপকান মাথায় কালোরঙ্গের চোঙ্গাটুপি। আদালতি সুরে হাতমুখ নেড়ে খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করছেন'।[২]

---

১. আলালের ঘরের দুলাল।
২. হুতোম প্যাঁচার নকশা।

www.pathagar.com

এই ছিল এদেশের আদিবাসী ইংরেজের রূপ ও রুচি। এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর বহু বছরও তার এই রূপ ছিল। কর্নওয়ালিস যখন এদেশের গভর্নর জেনারেল হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন ও আমূল প্রশাসনিক সংস্কার করেন, সেই ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ সাল—যখন কোম্পানির নিকট থেকে ব্রিটিশ শাসককুলের সন্তানদের এদেশবাসীর সঙ্গে ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল।

'আঠারো শতকে এদেশবাসী ইংরেজরা দেশীয় আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছে, শক্তির অপব্যবহারও করেছে এবং এদেশীয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছে; তাঁদের বঞ্চনা করেছে, শোষণও করেছে। উনিশ শতকে তাদের চারিত্রিক নীতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্তির ফলে বাংলাদেশে প্রথম দিকের ইংরেজের যে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছিল, নতুন নীতির ফলে তার সংশোধন হলো। তখন ইংরেজ সিভিলিয়ানরা শাসনশক্তিকে একটা 'পাবলিক ট্রাস্ট' বিবেচনা করতে শিখেছে, ব্যক্তিগত ভাগ্যনির্মাণের ক্ষেত্র হিসেবে নয়। কিন্তু শাসনকর্মে নৈতিকতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ ব্যক্তিগত সম্পর্কটাও একেবারে লোপ পেয়েছে। ফলে প্রথম যুগের দেশিভাবাপন্ন সহৃদয় ইংরেজ 'নেবাব'-দের পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে কর্মসংক্রান্ত দোষলেশহীন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে একেবারে সম্বন্ধবিহীন অনধিগম্য ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। এরা এদেশকে কখনো 'হোম'-এ পরিণত করে নি এবং এদের হাত থেকেই পাকিস্তান ও ভারত এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে'।[৩]

এই ঝানু সিভিলিয়ানরা এদেশের সবকিছুই 'নেটিভ' ভেবে তুচ্ছ করেছে, ঘৃণা করেছে; সামাজিক ব্যাপারে দেবতার মতো উর্ধ্বলোকবাসীর নিঃসঙ্গতা শুচিতা নিয়ে এদেশবাসীকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তারা নিজেদের সমাজ গড়েছে ক্লাবে, অ্যাসোসিয়েশনে—খেলার মাঠে, নাচের মজলিসে—যেখানে শাসকের ঔদ্ধত্য নিয়ে নিষেধবাণী উঁচিয়ে রেখেছে—ডগস এন্ড ইন্ডিয়ানস নট অ্যালাউড : কুকুর ও ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার কারণ, ১৮০৩ সালে প্রায় এবং ১৮৪৯ সালে একেবারে সম্পূর্ণভাবে উপমহাদেশটা গ্রাস করে শাসকের শক্তিমাদকতায় তারা পুরাতন বেনিয়ার অবস্থা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছে। ১৭৮৪ সালের 'ইন্ডিয়া গেজেট' সংবাদ দিচ্ছে, কোম্পানির কাউন্সিলের সভ্যরা পায়জামা, মসলিনের সার্ট আর সাদা টুপি ব্যবহার করতেন। হুঁকায় তামাক খাওয়া সুপ্রচলিত ছিল—এমনকি মেম সাহেবদের মধ্যে। অথচ উনিশ শতকে ইংরেজের বর্বর বিলাসিতা এত দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল যে ম্যাক্রাবি সাহেব লিখেছেন : চারটি লোকের একটি ছোট পরিবারে দাস-দাসীর সংখ্যা ছিল ১১০ জন। ইংরেজের চারিত্রিক বিবর্তন সম্বন্ধে পারসিভ্যাল স্পিয়ার যা বলেছেন উদ্ধৃতির যোগ্য।

আঠারো শতক শেষ হলো, সামাজিক আবহাওয়াও পরিবর্তিত হয়ে গেল। ঘনঘন দুই জাতে খানা-পিনার মজলিস কমে গেল, ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো বন্ধ হলো। ... সরকারি মেজাজ সাম্রাজ্যিক, রুক্ষ ও বিষম হয়ে উঠল। যে ব্যবধানটা মুসলমান নবাবরা ও রসিক ইংরেজরা, কূটনীতিক পণ্ডিতরা ও ইংরেজ জ্ঞানী

৩. A Study of History—A. J. Toynbee : Abridgement. p ~21-22.

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে দূর করেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আবার সেটা দুস্তর হয়ে উঠল ... একটা উচ্চমন্যতা জন্মাতে লাগল যে, ভারতের সবকিছু খারাপ এবং মানুষগুলো অসৎ এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে ভালো হতেই পারে না ...

ইন্দো-ইউরোপীয় সম্পর্কের একটা করুণ দিক হলো, যতই তার প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়েছে, ততই বর্ণবিদ্বেষটা তীব্র হয়ে উঠেছে। যে যুগে কোম্পানির ইংরেজ দুর্নীতিবশে অসদুপায়ে অনেক অর্থ উপার্জন করেছে, রায়তদের পীড়ন করেছে, জেনানা রেখে অবৈধ যৌনসংসর্গে মেতেছে, সেকালের ইংরেজই ভারতীয় কালচারে আকৃষ্ট হয়েছে, ফারসি কবিতা লিখেছে, পণ্ডিত মৌলবি ও নবাবদের সঙ্গে একাসনে বসেছে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। বেদনার কথা এই যে, কর্নওয়ালিস যেমন দুর্নীতির নব উৎস রুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি সামাজিক ভারসাম্যটাও নষ্ট করে ফেলেছিলেন, অথচ এটি ব্যতীত পারস্পরিক চেনা-জানা অসম্ভব। ... কর্নওয়ালিস সব উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের বিতাড়িত করে এক নতুন শাসকশ্রেণীর সৃষ্টি করলেন।[৪]

এই ছিল প্রথমকালের বণিক ইংরেজের ও পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যগর্বী শাসক ইংরেজের এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব। এই ইংরেজই 'হোম'-এ ফিরে গেছে পাততাড়ি গুটিয়ে কিন্তু অসংখ্য চিহ্ন রেখে গেছে আমাদের সমাজ জীবনে, সভ্যতায় কালচারে, যার সামগ্রিক অপনয়ন কোনোকালেই সম্ভব নয়।

বাবু শ্রেণীর উদ্ভব

এই ইংরেজদেরই সৃষ্টি আজব শহর কলকাতা। ১৬৯০ সালে তার জন্ম, ১৭৫৭ সালে ইংরেজের শাসনশক্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত এবং ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্নায়ুকেন্দ্র। সারা ভারত অর্থ যুগিয়েছে কলকাতার সমৃদ্ধিকল্পে। সমগ্র পূর্ব বাংলা ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল এই কলকাতার 'হিন্টারল্যান্ড'—পশ্চাদভূমি; অর্থাৎ তার প্রাকৃতিক সব সম্পদকে সামগ্রিকভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে কলকাতার শ্রীসম্পদ বর্ধনের জন্যে। জনস্রোতে আর স্বার্থের তরঙ্গে প্লাবিত এই মহানগরী আজাদির পূর্বদিন পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তীর্থভূমি কল্পলোক।

'একাধারে রাজ্ঞী ও গণিকা। এই কলকাতা ছিল সারা ভারতের শরণ ও সমস্যা, আশা ও আতঙ্ক। এই দানবীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে রাজা হয়েছে ফকির; আবার এরই কল্যাণে ভিখারি হয়েছে ধনিক। এর গলিত দেহের অসংখ্য শিরা-উপশিরার মতো পথে আর গলিতের জীবাণুর মতো মানুষের সংঘাতময় জীবনে প্রতি মুহূর্তে রচিত হচ্ছে ভবিষ্যতের অজস্র বীজ। ইংরেজের আশীর্বাদ অভিশাপ এই আজব শহর কলিকাতা'।[৫]

---

৪. The Nabobs : A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century—P. Spear, pp 136-37.

৫. বাঙ্গালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ১০৮।

www.pathagar.com

অথচ আঠারো শতকের মধ্যভাগে কলকাতা ছিল নিঃসন্দেহে বেনিয়ানের শহর—যত দালাল, মুৎসুদ্দি, ও দেওয়ান—ইংরেজের বাণিজ্যিক কাজকর্মের মধ্যবর্তীর দল। এই শ্রেণীর লোকেরাই এই কলকাতাতে সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ও বশংবদ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে। এই বর্ণসংকর সমাজের যে চিত্র নিপুণ তুলিকায় এঁকেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রথমেই তার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা যায় না। তিনি ছিলেন কলকাতার লোক, এজন্য তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক 'বাবু'-দের জীবনযাত্রা তাঁর লেখনীতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে :

> নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মতো অস্ত গ্যালো। মেঘান্ত রৌদ্রের মতো ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠল। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছেদ হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগল। ... পুঁটে তেলি রাজা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘরে উৎসন্ন যেতে লাগল ... হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ করে। ... পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকাতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠল। ... আজকাল শহরের ইংরেজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছে, প্রথমদল 'উঁচুকেতা শহরের গোবরের বষ্ট' দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ' ... শহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙালির ছেলে, ইটি স্বীকার করতে লজ্জিত হন। বাবু চুনাগলির অ্যানডরু পিদ্রুসের পৌত্তুর বললে তাঁরা খুশী হন ... পূর্বের বড় মানুষরা এখনকার বড় মানুষদের মতো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত থাকতেন না। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল ... তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘন্টা লাগতো ... সেই সময় বিষয় কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সইমোহর চলতো ... রামমোহন রায়, গোপিমোহন দেব, গোপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ সিংহের আমল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হলো।[৬]

ব্রিটিশ বিজয়ের প্রথম থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং তারাই নতুন সংস্কৃতির পত্তন করে। ভারত প্রবাসী ইংরেজদের যে দুর্নীতি ছিল, অনুকরণপ্রিয় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই জাতীয় হীনচরিত্র ইংরেজকেই আদর্শ হিসেবে সম্মুখে স্থাপন করেছে। ব্রিটিশ আমলে এই সমাজের নৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল তার পরিচয় এরূপ :

> তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল, মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইতে। ... পূর্বে গ্রিসদেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল ... সন্ধ্যার পর দেড়প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষত পর্বোপলক্ষে

৬. হুতোম প্যাঁচার নকশা।

www.pathagar.com

লোকের সেখানে স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, তেমনি বিজয়ার রাত্রিতে বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।[৭]

নতুন মনিবরা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে 'বাবু' নামে সম্বোধন করত। তিনি যতই ইউরোপীয় জীবনাযাত্রার অভ্যস্ত হোন এবং বিলেত-ফেরতই হোন, তিনি বাবু।[৮]

বাবু রামমোহন, বাবু দ্বারিকানাথ, বাবু রামদুলাল দে হিসেবে তাঁদের ইংরেজ মহলে পরিচয় ছিল। এই বাবুদের রূপ ও স্বভাব এভাবে অঙ্কিত হয়েছে :

এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা ফারসি ও স্বল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ভ্রু মুখের পার্শ্বে ও নেত্র কোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালা পেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগলস সম্বলিত চিনে বাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আখড়াই পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাটাইত।[৯]

এ ছিল অল্প শিক্ষিত বাবুর সামাজিক জীবন। যেসব বাবুরা গোঁড়া ছিল, অথচ ইংরেজি অফিসে হৌসে চাকরি করত, তাদের জাত খোয়ানোর ভয় ও তজ্জনিত আচরণের অসঙ্গতির কথা পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। আবার যারা হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করত এবং ইয়ং বেঙ্গল নামে আখ্যাত হয়ে কথায় ও আচরণে, আহারে ও পানীয়তে হিন্দুধর্মের মুণ্ডপাত করত, তাদেরও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারে ও মদ্যপানে কী পরিমাণ বিলেতি ফ্যাশন তারা অনুকরণ করেছিল, তারও ইঙ্গিত পূর্বে দেওয়া আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পোশাকে বিলেতি বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারে মুখের বুলিতে ও হাবেভাবে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এরূপ ইংরেজিয়ানা রপ্ত করে ফেলেছিল যে, হিন্দুত্বের বা ভারতীয় বাঙালির অতি অল্প চিহ্নই তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অশনে-বসনে, চলনে-বলনে এতখানি বিলেতি ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল এই সমাজ যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে কান্তকবি রজনীকান্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন, কী বিষম বিলেতি হাওয়া এল এদেশটায়। এদেরই জীবনে অসঙ্গতি আচরণে জগাখিচুড়ি ও ভাষা বাংলা-ইংরেজির হাস্যকর মিশ্রণ দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' গ্রন্থ দুটিতে বহু বিদ্রূপাত্মক ও ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন।

এসব দোষত্রুটি সত্ত্বেও হিন্দু নব্য সংস্কৃতির বিধায়কগণ অচল ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। হিন্দুর সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি,

---

৭. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, ৪১ পৃ.।
৮. আফলাতুন কন্ভোলাটেড আকুরে চাকুরে 'মিষ্টার'; বাকিসব 'বাবু কিংবা 'মণ্ডলী'।
৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৫৫-৫৬।

www.pathagar.com

ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা, সামাজিক বা নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলনে ছিল তাঁদের সক্রিয় কর্ম-ভূমিকা। তার ফলশ্রুতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ-সমৃদ্ধির সহায়তা করলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এসব কর্মে এমন সামাজিক পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়েছিল, যার সৃষ্টিধর্মী প্রভাব হিন্দু গণজীবনেও কিছুটা অনুভূত হয়েছিল। ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যাপক তাৎপর্য স্মরণ করলেই একথাটি সম্যক উপলব্ধি হবে।

এ সংস্কার মানস নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই এ মানস প্রস্তুত হয়েছিল। অপ্রাকৃত সংস্কার ও অমানবিক প্রথাদাসত্বের নিগড় চূর্ণ করে ইউরোপের নতুন মানুষ তখন সবে জেগে উঠেছে। শিল্পবিপ্লবের দরুন সে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে; আর বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থেকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহৎ শিক্ষায় হয়েছে পুনরুজ্জীবিত। মানুষের আকুতি, মানুষের অপরাজেয় মহিমার বাণী হয়েছে নতুন সুরে ঝংকৃত। যতই অসম্পূর্ণ ও অপরিণত হোক এবং যতই স্বার্থগন্ধী হোক, তৎকালীন ইংরেজের কণ্ঠে ছিল সেই আকুতি, সেই আদর্শবাদের সুর। ইংরেজ কেরী, মার্শমান, ডেভিড হেয়ারের পরার্থপরতার মধ্যে, ডিরোজিও, রিচার্ডসনের বৈপ্লবিক শিক্ষার মধ্যে এবং বেন্টিংকের সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে হিন্দু নব্য শিক্ষিত সমাজ শিক্ষা করেছিল সেই সুর; বিশেষ তরঙ্গ সৃষ্টিতেই জেগেছিল তার বিস্ময়কর চেতনা।

আর এই সুরের অনুভাবে এবং তরঙ্গের অভিঘাতে হয়েছিল হিন্দু ব্যক্তিমনের উদ্বোধন। ডিরোজিওর শিক্ষা 'thinking for themselves' শিষ্যদের ব্যক্তিমনে অবাধ স্বাধীনতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয় এবং কৌলিন্য-অকৌলিন্য প্রথা বিসর্জন দিয়ে বর্ণহিন্দুদের বর্ণবিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণের মধ্যে এই চেতনার প্রকাশ। অতঃপর তার কর্মপরিধি সুবিস্তৃত, কোনোদিকে ধর্মীয় বা সামাজিক বেড়ায় সীমিত নয়। ব্যক্তিমনের এই বিস্তৃতির ফলে সমাজমানসও সমান্তরালভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, এবং পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে বেঁধে রাখার সামর্থ্য রইল না। শতসহস্র বছরের সমাজ কূপমণ্ডূকতার ও কঠোর ধর্মান্ধতার অচলায়তন ভেঙে হিন্দু ব্যক্তিমনের আবির্ভাব সাময়িক হলেও শুভলক্ষণ, সন্দেহ নেই।

হিন্দুর ধর্ম সংস্কৃতি

ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবণতা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মদের বড় বেশি সেক্যুলার মনোবৃত্তি তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি বেদান্ত শিক্ষার উপর জোর দেন এবং হিন্দুত্বে মিশে

www.pathagar.com

যাওয়ার আকুলতাও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। তার ফলে ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙন ও কেশব চন্দ্রের নতুন সমাজ 'নববিধান' সৃষ্টি প্রভৃতির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রাহ্মসমাজকে গোঁড়া হিন্দুরা হিন্দুত্বের সীমানার বাইরেই গণনা করত এবং খ্রিষ্টান সমাজের সমতুল্য ধরত। কালক্রমে ব্রাহ্মদের মধ্যেও হিন্দুত্বের গণ্ডিতে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা জাগে এবং বর্তমানে ব্রাহ্ম হিসেবে একটি সমাজের অস্তিত্ব দেখা গেলেও কার্যত তারা হিন্দুসমাজের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে। সেন্সাস রিপোর্টে তার আর অস্তিত্ব নেই এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে একজন বর্ণহিন্দু ও একজন তথাকথিত ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনো পৃথক চিহ্ন নেই। রামমোহনের ব্রাহ্মমত যেমন সর্বভারতীয়রূপে গৃহীত হয় নি, তেমনি সাময়িক আলোড়ন তুলে হিন্দুদেহে বিলীন হয়ে গেছে; তাঁর প্রভাবে বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে যুক্তিবাদের ক্ষীণরশ্মি যা-ও দেখা গিয়েছিল, তা-ও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কোনোদিনই প্রসার লাভ করে নি, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষে তা নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) পাঞ্জাবে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর উদার মত ছিল এবং কলকাতায় ১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ও ১৮৭৪ সালে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজের সঙ্গে কিছুকাল ধর্মালোচনা করেন। কিন্তু শেষে ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সনাতন হিন্দুত্বেরই মহিমা প্রচারে জীবনপাত করেন। যে ধনতান্ত্রিকতা পাশ্চাত্য জগতে ধর্মীয় বন্ধনসমূহ একেবারে ছিন্ন করে ফেলেছে, ভারতের মাটির গুণে সেই ধনতান্ত্রিকতা ধর্মের গোঁড়ামি আরও বিচিত্রপথে সহগামী হয়েছে। দয়ানন্দের আরও একটি দান হলো গো-রক্ষা সমিতি এবং তাঁর এ সম্বন্ধে চিন্তাসমূহ বিধৃত হয়েছে 'গো-করুণানিধি' গ্রন্থে। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টান, মুসলমান ও খ্রিষ্টান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, কারণ এদের গোহত্যা সম্বন্ধে কোনো সংকোচ নেই।

> এভাবে দয়ানন্দ সনাতন হিন্দুত্বের মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু কালচারেরই অন্ধ ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং উপমহাদেশের আরও দুটি ধর্ম ইসলাম ও খ্রিষ্টানত্বকে অস্বীকার করে এক হিন্দুভারতীয় কালচারের প্রচার করেন।[১০]

দয়ানন্দের আর্যসমাজ হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধটা যত বিচ্ছিন্ন করেছে, যত সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে এদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। আর কোনো হিন্দু ধর্মসমাজ তার সমকক্ষতা করতে পারে না।

> আর্য সমাজের 'শুদ্ধীকরণ' 'গোরক্ষিণী' এবং 'হিন্দুর ভারত হিন্দুর হবে' আন্দোলন যে তীব্র বিষক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, আজও তার গলিত পুঁজ-রক্তে হিন্দুমন বিষাক্ত হয়ে আছে।[১১]

---

১০. Misra, p. 382-83.
১১. ১৯৬৬ সালে দিল্লিতে ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীদের ' গোরক্ষিণী' হাঙ্গামা স্মরণীয়।

www.pathagar.com

এই বিষক্রিয়ায় হিন্দুর মন-মানস কতদূর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তার নজির হিসেবে এক অধ্যাপকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

সঠিক কাজ করতে কোনো দেরি সমীচীন নয়। হিন্দুদের কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা—যেমন হিন্দু মহাসভা কিংবা এ উদ্দেশ্যে আহূত সর্বভারতীয় হিন্দুসম্মেলন—অবিলম্বে একটি সুপ্রীম কাউন্সিল গঠন করুক এদেশের সব বিদেশি ধর্মকে 'হিন্দু' রূপাদান করতে। এই কাউন্সিলের কাজ হবে, চারটি বিদেশাগত ধর্মকে 'হিন্দু' করতে সঠিক নামকরণ করার। আমাদের প্রস্তাব, ইসলামকে 'নিরাকার সমাজ', খ্রিষ্টধর্মকে 'ইশ পূজক সমাজ' ও ইহুদি ধর্মকে 'পবিত্র সমাজ' নাম দেওয়া যেতে পারে। ...

> হিন্দুনেতারা যদি এসব ধর্মকে এদেশে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু' করে ফেলতেন, তাহলে এসব ধর্মনুসারীরা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে 'হিন্দত্বে' লীন হয়ে যেত এবং 'হিন্দুজাতি'র অন্তর্গত হতো।[১২]

অবশ্য উনিশ শতকের মধ্যভাগেই বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এ বলেছিলেন, জৈন ও শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষরূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবনা।

> বালগঙ্গাধর তিলক হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসকে মূলধন করে হিন্দু যুবকদের সন্ত্রাসবাদে উত্তেজিত করেছিলেন এবং এপথেই হিন্দু ধর্মের উজ্জীবনের সন্ধান করেছিলেন।[১৩]

লালা লাজপত রায় রাজনীতিকে দেখতেন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর নেতৃত্বে আর্য সমাজ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতের এক প্রধান ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হয়।

> 'যখন তাঁর এ ধারণা জন্মাল যে আবেদন নিবেদনে, জপতপে, প্রস্তাবে বিক্ষোভে ইংরেজ রাজকে টলানো যাবে না, তখন তিনি বিলেতি বর্জননীতিটা জোরদার করেন।'[১৪]

বাঙালি হিন্দুনেতা বিপিনচন্দ্র পালও ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তাঁর রাজনীতিক জীবন ভূমিকায়। রাজনীতি ও কালচার সম্পর্কিত ধ্যানধারণায় বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে। তিনিও বিশ্বাস করতেন মারাঠা শিবাজী হিন্দুভারতের জাতীয় বীর। তাঁর মতে ধর্ম মানুষের জীবনে ও কর্মে বহুর মধ্যে একটি বৃত্তি নয়, ধর্মই মানবীয় সব কর্মধারার আদর্শিক একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ভারতীয় রাজনীতিক জীবনধারার বিচিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে, সব ধর্মেরই এতে অধিকার আছে।

---

১২. The Hindu–Muslim Riots —Ratish Mohan Agarwala, p. 85.
১৩. Misra, pp 383–84.
১৪. Ibid.

www.pathagar.com

তিনি বলেছিলেন,

> ভারতে জাতীয় জীবন বহুর মিশ্রণে গঠিত। এতে হিন্দু, মুসলমান, জরথুস্থিয়ান খ্রিষ্টান সকলেরই অংশ আছে। আমাদের নাগরিক জীবনের মূলসূত্রগুলো কোনো একটি বিশেষ ধর্মাশ্রিত নয়। ... এসব সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সেসবের সংযোগ আছে।[১৫]

এসব ধর্মীয় সংস্কার পরিক্রমার শেষে আমাদের সন্দেহমাত্র থাকে না, উদ্দেশ্য মহৎ হলেও পরিণতিটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; সংস্কারের দরুন পরিচ্ছন্ন ও ক্লেদমুক্ত স্রোতোধারার পরিবর্তে আরও গোঁড়া, অন্ধবিশ্বাসাকীর্ণ ও উগ্র সনাতনী হিন্দুত্বের প্রকাশ হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধানে আমাদের মনে যেসব চিন্তার উদয় হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলো এই :

প্রথমত, নব্য হিন্দু সমাজের হীনম্মন্যতা বোধ। ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে যে মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম হয়েছিল, তার কোনো প্রতিষ্ঠা ছিল না অভিজাত হিন্দু-সমাজে ও কুলীনসমাজে। এজন্য আত্মভিমানে জর্জরিত নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ বিদ্রোহী শিশুর মনোভাব নিয়ে বিশাল হিন্দুত্বের বটবৃক্ষ বঙ্কলে প্রাণশক্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও বেগবান করতে সক্ষম হয় নি। তার ফলে কালক্রমে উপরের আচারগুলো লুপ্ত হয়েছে; ঘরের ছেলে ফিরে গেছে পুরনো জরাজীর্ণ ঘরের প্রতি আরও অবুঝ মায়ায় সঞ্চারিত হয়ে।

দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্ম মতের উদ্ভব হয়েছিল 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের উৎকট খ্রিষ্টধর্মপ্রীতি ও খ্রিষ্টান হওয়ার প্রবণতার গতিরোধ করতে এবং খ্রিষ্টান মিশনারির কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার মানসে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এদুটি বিভীষিকা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এজন্য ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়ত, ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ও প্রয়োজনে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারের সদিচ্ছার প্রতি উত্তরোত্তর আস্থা হারাচ্ছিল; রাষ্ট্রশাসনে যে অংশ ইংরেজের সমকক্ষতা আশা করেছিল, তা পূরণ হয় নি। অধিকন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের পরিধির মধ্যেই এই শ্রেণীকে সীমাবদ্ধ রাখতে যত্নবান হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই শুরু হয় স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত এবং অনুগৃহীত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মোহভঙ্গ হয়ে যায় ও তারা জাতীয় জাগরণের নামে সনাতন হিন্দুত্বের প্রবল আকর্ষণে প্লাবিত হয়ে যায়। একথাটি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন একজন হিন্দু লেখক :

> এই জাগরণের মুখেও পশ্চাতের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হয়। অস্বীকৃত বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাংলার শিক্ষিত সমাজ আত্মশক্তি লাভের প্রেরণায় পশ্চাতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং বিদেশি শাসনকর্তার নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া অতীতের শ্রেষ্ঠতা বর্তমানের ক্ষুদ্রতা ঢাকিবার চেষ্টা

১৫. The New Spirit,—B. C. Pal, pp 196-7,

www.pathagar.com

করিতে থাকেন এবং একটা উগ্র ধর্মমত ও সম্প্রদায়গত দম্ভ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। তাই চৈত্র মেলার অপর নাম জাতীয় মেলা না হইয়া হইল 'হিন্দুমেলা'; আর প্রথম জীবনের অসংযত ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুকে ১৮৭২ সালে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে দেখা যায়। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুরাজ পুনঃসংস্থাপনের প্রচেষ্টা দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে।[১৬]

তা হোক, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের শুভচিন্তায় কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এই শুভচিন্তার কালে সাম্প্রদায়িকতার যে অশুভ চিন্তায় মত্ত হয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দুসমাজ এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে কদর্য ও গ্লানিকর পঙ্কের আবর্ত সৃষ্টি করেছিলেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে বেদনার দিক। উনিশ শতকের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাবিদরা এই কদর্য ঘূর্ণাবর্তের স্রষ্টা এবং আজাদি-উত্তরকাল পর্যন্ত ছিল তার মলিনতা-আবিলতার প্রাধান্য। চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার ফলে এই স্বদেশীর উগ্রভক্তরা কী পরিমাণে চিন্তাশক্তিরও অধোগতি ও অসঙ্গতি দেখিয়েছেন, 'ঋষি'-আখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মচিন্তাতেই তা সুপরিস্ফুট :

> মুসলমানদের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোনো দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।[১৭]

এই অনুক্ত কারণটি অত্যন্ত প্রকটিত এবং বঙ্কিম-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্ষুদ্রতম হিন্দুর মানসে সে কারণটি এভাবে ক্রিয়া করেছে : ভারতীয় জাতীয়তার চিন্তায় মুসলমানের স্থান নেই, 'একধর্ম রাজ্যপাশে' যে ভারতকে বেঁধে দেওয়ার স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছে, সে ভারতে ইসলাম নিতান্তই অস্তিত্বহীন, অস্বীকৃত। মুসলমানকে ভাইরূপে, প্রতিবেশীরূপে চিন্তা করা দূরে থাক; মুসলমানকে বিদেশি আক্রমণকারী ব্যতীত অন্যকিছু ভাবতেই প্রস্তুত হয় নি হিন্দু মানস। সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি 'হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোনো দ্বেষ নাই'—যত দ্বেষ, যত হিংসা, যত শত্রুতা হাজার বছরের প্রতিবেশী এদেশের মাটিতে জাত, সর্বাংশেই ভারতীয় উপমহাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানের প্রতি। সাম্প্রদায়িকতার এমন উন্মত্ত ও দাম্ভিক প্রকাশ জগতের ইতিহাসে খুবই দুর্লভ।

ধর্মীয় সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার আর একটি কারণের দিকে আর এক হিন্দু চিন্তানায়ক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি হয়েছে কেরানি-কর্মচারী ও আমলা বাহিনীর উৎপাদনে।

---

১৬. বঙ্কিম-মানস—অরবিন্দ পোদ্দার, ৬৮ পৃ.।
১৭. ধর্মতত্ত্ব (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—১১৬ পৃ.।

www.pathagar.com

সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার মর্মান্তিক ব্যর্থতা ঘটেছে। মেকলে যে ভারতীয় মেটে রঙের চামড়ার অন্তরালে ইংরেজের সংযমী ও বিজ্ঞানী মনটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়েছে। পাঁশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার কোনো আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজম কোনোকিছুই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে বাঙালি বা ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পারে নি। তার কারণ দেশের জলবায়ু ও মাটির গুণ বলায় নি। মেকলে কতকটা লর্ড লি ভঙ্গি বলেছেন,

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকরী হয়, তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি সমাজে কোনো মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না এবং আমাদের তরফ থেকে কোনোরকমের ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দরকার হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য সাধন করা যাবে।[১৮]

কিন্তু মেকলের হিসেবে ভুল ছিল, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। কী ধরনের উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়, তাঁর তা অজানা ছিল। কোনো নীতি বা আদর্শ বা পরিকল্পনা, তা যত বড় অতিমানবের মস্তিষ্কপ্রসূত হোক না কেন, উপর থেকে উপলখণ্ডের মতো সমাজের বুকে নিক্ষেপ করলে সামান্য জলতরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে হয়তো, কিন্তু সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে না। সেরকম আলোড়ন ব্যতীত সমাজের স্থায়ী পরিবর্তনও হয় না। মেকলের ত্রিশ বছর হিসেবের কথা উপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। এক শ ছত্রিশ বছর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মেকলে রোপিত আমগাছে আমড়া ফল ফলেছে। বাংলার শিক্ষিত বিদ্বৎসমাজে বরং আজ এমন একটি লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী নন। যাবতীয় মৃত কাল্টের কঙ্কালকে মহাসমারোহে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহ তাঁদের মধ্যে প্রবল।

> মৃত কাল্টের শ্মশানে ঘুরপাক খেয়েই অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী অতীতের মৃত আদর্শের শ্মশানের পথের যাত্রী।[১৯]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন :

> হিন্দুজগতের পাশ্চাত্যকরণ নীতি দৃশ্যত; দুটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমত, পাশ্চাত্য ও হিন্দু সভ্যতার মধ্যে কোনো মিল ছিল না। দ্বিতীয়ত, যে হিন্দুরা পাশ্চাত্যে বিদেশি কালচার জ্ঞানের দিকে অনুশীলন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বিশাল ভারতীয় অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষক সমাজের তুলনায় অতি নগণ্য অংশমাত্র। এজন্য তাঁদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য কালচার ভারতের জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। তার দরুন বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।[২০]

---

১৮. G. O. Trevelyan : Life and Letters of Lord Macaulay, vol I p 425.
১৯. বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যা—বিনয় ঘোষ (চতুরঙ্গ : ১৩৬৪ বৈশাখ, ৮১-৮৩)।
২০. Study of History (পূর্বে দ্রষ্টব্য) 720.

www.pathagar.com

ভারতীয় হিন্দু সমাজ ও আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের ব্যবধানটা বৈচিত্র্যগত নয়—একেবারে বিপরীত মেরুর মতো। এজন্য ভারতীয় ধর্মীয়তাকে বাদ দিয়ে যেকোনো সংস্কারই উপর থেকে উপলখণ্ড বৃষ্টির মতো কেবল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, স্থায়ীভাবে ফলপ্রসূ হয় নি। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হিন্দুর শিক্ষা বিস্তার : স্ত্রীশিক্ষা

সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। যেসব মারাত্মক ব্যাধি মানবতার কলঙ্করূপে হিন্দু সমাজেদেহে বিরাজ করত, সেগুলো চিরকালের মতোই দূরীভূত হয়েছে। সতীদাহ, গঙ্গাজলে সন্তান নিক্ষেপ, রথচক্রতলে আত্মাহুতি, অন্তর্জলি, নরবলি বন্ধ হয়েছে দণ্ডবিধি আইনের বলে ও বিভিন্ন রেগুলেশানবলে। বিধবা বিবাহও আইনসঙ্গত হয় ১৮৫৬ সালের বিধবার পুনর্বিবাহ আইনবলে। বহু বিবাহ নিষেধকল্পে আইনের বিল উপস্থাপিত হয়েও পাস হয় নি, তবে কালক্রমে বহু বিবাহ অভিশাপ লোপ পেয়ে গেছে। বাঙালি হিন্দুর মধ্যে প্রথার বিলোপ ঘটেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হঠাৎ-বাবুদের গৃহে অভিজাত কুলীনের সন্তানদের বিবাহের ব্যাপকতায়। কিন্তু তার ফলে কন্যাদায়ের জন্ম নিয়েছে পণপ্রথার অভিশাপে। এটি এখনও সমাজদেহে বিষাক্ত ক্ষতের মতো বিরাজ করছে।

লক্ষণীয়, সামাজিক ব্যাধিগুলো নিরাময়কল্পে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টা এককভাবে সফল হতে পারে নি; ইংরেজরাজের সাহায্যে আইনও প্রবর্তন করার প্রয়োজন হয়েছে। এ থেকেই পরিচ্ছন্ন, হিন্দু সমাজ কতখানি গোঁড়া ছিল এবং প্রথাদাসত্বের কী মর্মান্তিক নিগড়ে শৃঙ্খলিত ছিল। তুলনামূলকভাবে এখানে এ কথাটিও স্মরণীয়, মুসলমানের সমাজ জীবনে কোনো সংস্কার বা কুপ্রথা প্রতিরোধের জন্য সরকারি আইনের প্রয়োজন হয় নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিল একচ্ছত্র ভোগাধিকার এবং এ ভোগাধিকারে যেমন তাদের নিরঙ্কুশতা পীড়িত হয় নি, তেমনি তার প্রসারবৃদ্ধিতেও আলস্য থাকে নি। পূর্বেই উক্ত হয়েছে, বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী কতখানি উৎসাহ দেখিয়েছে।

স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের সাধারণ বিশ্বাস এই ছিল যে, 'যে নারী শিক্ষাগ্রহণ করিবে সে বিধবাক হইবে।' তবুও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নবসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কম আগ্রহী ছিল না। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কলকাতার গৌরীবেড়েতে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সে সময়ের সংবাদপত্রের একটি সংবাদ :

> ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর কলকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল। তাহাতে অনেক সাহেব ও বিবি লোক ছিলেন। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্বশুদ্ধা প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়াছে।

www.pathagar.com

১৮০০ সালের প্রারম্ভে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না বললেই চলে। সাধারণ্যে নারীর গতিবিধি নিষিদ্ধ ছিল, পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমান ছিল। কালচারের দিক দিয়ে স্ত্রীজাতির কোনো ভূমিকাই ছিল না। সংগীত ও নৃত্যাদির চর্চা ভদ্র গৃহস্থের নারীর পক্ষে পাপাচার হিসেবেই গণ্য হতো। এসব ছিল দেবদাসী, সেবাদাসী বা বারনারীর বৃত্তি। বলাবাহুল্য, দেবদাসী ও সেবাদাসী ছিল হিন্দুসমাজ ও ধর্মানুমোদিত দেবমন্দিররাদির নর্তকী ও পরিচারিকা এবং হিন্দু ধর্মনেতার সেবিকা। তারা আজীবন কুমারী থেকে নৃত্য সংগীতাদি চারুকলার পরিচর্যা করত। ১৮৩০ সালের পূর্বে বাংলাদেশের কোনো বালিকা স্কুল ছিল না, নিম্নশ্রেণীর দুচারটি পাঠশালা কলকাতায় কোনো কোনো পল্লীতে দেখা যেত। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বেথুন স্কুল স্থাপিত হয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালিকাদের জন্যে। পরে এটি কলেজে উন্নীত হয়। এখানেও ছাত্রীরা কড়া পর্দাঘেরা পালকিতে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করত। উনিশ শতকে এই একটিমাত্র মহিলা কলেজ ছিল সারা বাংলাদেশে।

ডাক্তারি শিক্ষার দিকে নারীদের আগ্রহ প্রথম দিকেই অনুভূত হয়। 'ডাক্তার ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভূত হয় শিক্ষক বা স্কুলের চেয়েও।' কিন্তু বাংলাদেশে বিভাগ-পূর্বকালে কোনো মহিলা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় নি। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৩৩ সালে শিক্ষা বিষয়ক নয়া নীতি প্রবর্তিত হলেও নারীশিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয় নি। ভারতে প্রথম মহিলা ডাক্তার আগমন করেন ১৮৭৪ সালে মার্কিন মহিলা ক্লারা সোয়েন। দ্বিতীয় মহিলা ডাক্তার ইংরেজ তনয়া ফ্যানি বাটলার আসেন ১৮৮০ সালে। অতঃপর নারীশিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি কল্পে কাউন্টেস ডাফরিন ফান্ড স্থাপিত হয় ১৮৮৫ সালে। মহিলা মেডিকেল সার্ভিস চালু হয় ১৯১৪ সালে এবং প্রথম মহিলা ডাক্তারি কলেজ ১৯১৬ সালে দিল্লিতে স্থাপিত হয় লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ নামাঙ্কিত হয়ে। ইউরোপীয় মিশনারিরা কয়েকটি প্রসূতিসদন ও হাসপাতাল স্থাপন করে।

ভারতে বিশেষত কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইউরোপীয়দের ও ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করলে তাদের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং মহিলা বৃত্তিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাদের দেখাদেখি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ ও স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের স্পৃহাও বর্ধিত হয়। এভাবে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষালাভ ও সামাজিক জীবনে অংশলাভের প্রসার বৃদ্ধি পায়। তখন নারীরা প্রকাশ্যে বের হতে থাকে ও নারী বৃত্তিধারীর সংখ্যাও বেড়ে ওঠে।

শিক্ষিতা নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নারীরা পুরুষের সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনেও অংশগ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯২৬ সালে প্রথম সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার প্রচেষ্টায় নয়া দিল্লিতে লেডি আরউইন কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সালের মুদিম্যান কমিটির সুপারিশ ক্রমে মন্টফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং পুরুষের ন্যায় নারীরও ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

www.pathagar.com

অতঃপর অসহযোগ আন্দোলনে এমনকি সন্ত্রাসবাদেও হিন্দুনারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ মহিলা রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করে।[২১]

বস্তুত শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মহিলারাও জনজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং তাঁদের দানও সম্ভ্রমের সঙ্গে অবশ্যই স্বীকার্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও বেগম শাহ্ নওয়াজের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

মুসলিম ধর্ম সংস্কার

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র নাম। কারণ আঠারো শতকের মাঝামাঝি তিনিই প্রথমে এ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শরিয়তি ইসলামের প্রতি সুফিদের উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ইসলাম ও মুসলমান সমাজ জীবনের শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল, তাঁদের আচরিত বহু অনাচারের ও প্রচারিত ইসলামবিরুদ্ধ মতবাদের অনুপ্রবেশ মুসলিম ধর্মজীবনকে কলুষিত করেছিল। পেশাদার সুফির প্রাদুর্ভাব ও কবরপূজার প্রথাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। ওয়ালিউল্লাহ্ অবশ্য তাসাউউফের উচ্ছেদ চান নি, তাঁর লক্ষ্য ছিল সুফিবাদের সংস্কার।

> 'যাতে জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, অথচ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে একটা আপস করা যায়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। ... তিনি সুফিবাদকে সংস্কার করে তা সমাজের কল্যাণের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন; ওহাবীদের মতো নেতিবাচক বিরুদ্ধাচরণ করেন নি যার ফলে কেবল দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি হয়। পেশাদার পীর-ফকির ও কবর পূজা, কেরামতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর 'ওসিয়তনামায়' বহু যুক্তি ও নির্দেশ আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে জোরজবরদস্তি করা তিনি অন্যায় মনে করতেন'।[২২]

ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'তফ হিমাতে ইলাহিয়া' গ্রন্থে মুসলমান সমাজের কয়েকটি কদাচারের নিন্দা করেছেন। সেগুলো দূর করবার উপায় নির্ধারণ করেন ওয়ালীউল্লাহ্র সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজ। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মীয় উদার নীতির শিক্ষা দিয়ে শাহ্ আবদুল আজীজ সমাজ সংস্কারের দিকে জোর দেন। ধর্মসাধনার ও সমাজ সংস্কারের আজন্ম ব্রতী এই আলেম-শ্রেষ্ঠের মন যে গোঁড়ামির মলিনতায় আচ্ছন্ন হয় নি তার পরিচয় মেলে ইংরেজদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত তাঁর উপদেশাবলিতে। তাঁর উদার ধর্মমতের আর পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে। গীতার ফারসি তর্জমাও তাঁর পড়া ছিল।

২১. Oxford Hist. of India, p 725-27.
২২. ভারতে ওহাবী আন্দোলন—আ. ম. হবিবুল্লাহ।

www.pathagar.com

শাহ্ আবদুল আজীজের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত সৈয়দ আহমদ যে 'তারগিব-ই-মুহম্মদীয়া' নামধেয় সংস্কার-আন্দোলন করেন, তার বিস্তারিত কর্মসূচি মেলে 'সিরাতুল মুসতাকীম' নামক পুস্তকে। এখানি মওলানা আবদুল হাই ও শাহ ইসমাইল শহীদ সম্পাদিত ও ১৮১৮-১৯ সালে প্রকাশিত। ফারসিতে লেখা গ্রন্থখানির এখন প্রচার আছে। 'সৈয়দ আহমদ প্রথমে মুরিদদের বহু প্রচারিত চারটি প্রধান সুফি পন্থাতে—চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশ বন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া—দীক্ষা দিয়ে পরে মুহম্মদী তরিকাতে দীক্ষা দিতেন। তাঁর তরিকার অনুসারী লোক এখন আছে। সৈয়দ আহমদ ঈমানের দৃঢ়তা সাধনের ও ধর্মাচরণের সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছিলেন 'সিরাতুল মুসতাকীম'-এ। এই আদর্শের ব্যাখ্যাসহ সংস্করণযোগ্য বিষয়গুলোর একটি তালিকাও আছে। বিষয়গুলো মোটামুটি এই : ঈমানকে দুর্বল করে এমন সব অভ্যাস, যেমন শরিয়তের আইনকে উপেক্ষা করা বা অবজ্ঞা করা, পৌত্তলিক ও নাস্তিকসুলভ কথাবার্তা বা আচরণের প্রশ্রয়, আল্লাহ ও নবী সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথাবার্তা, কর্মফলের জন্যে মানুষ ও স্রষ্টার দায়িত্ব নিয়ে চুলচেরা তর্কবিতর্ক, কদাচারী শিথিল-বিশ্বাসী সুফিদের প্রভাবে পীরপূজা, কবরপূজা, শিরনি দেওয়া প্রভৃতি আচরণ, যা থেকে ঈমানের ক্ষতি ও অপব্যয় হয় প্রচুর। সামাজিক কুসংস্কারেরও উল্লেখ আছে। বিবাহ, শিশুর নামকরণ, সুন্নত পালন বা খাৎনা, ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব আড়ম্বর করা অনাবশ্যক—কারণ তাতে অর্থের অপব্যয় হয়। মৃতের সৎকার (দাফন) উপলক্ষে নানারকম ব্যয়বহুল ও নিরর্থক অনুষ্ঠান।

> ইসলামি শাস্ত্রানুমোদিত বিধবা-বিবাহের প্রসারে সমাজের আপত্তি ও বিরুদ্ধাচারণ; এই শেষোক্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে সৈয়দ আহমদ স্বয়ং বিধবা বিবাহ করেন'।[২৩]

এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য, উত্তর-ভারতের নাগরিক ও সামন্তপ্রধান অভিজাত মুসলমান পরিবারেই হিন্দুদের অনুকরণে বিধবা-বিবাহ হেয় গণ্য হতো, সাধারণ স্তরে এ অনিয়ম ছিল না।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে তিন জন মহাপ্রাণ মুসলমান সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের নাম শহীদ তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও মাওলানা কেরামত আলী। তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্মভূমি ছিল নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষক ও কারিগর মুসলমান সমাজে—তিতুমীরের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরে এবং অন্য দুজনের সারা পূর্ব বাংলায়। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কাহিনী বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ। একদিকে ধর্মীয় সংস্কার করে তাঁরা ইসলামের আদি শুচিতা পুনর্নির্ণয় করেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক ভূমিকায় তিতুমীর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ করেন। তাঁদের অর্থনৈতিক

২৩. ভারতে ওহাবী আন্দোলন—আ. ম. হবিবুল্লাহ।

www.pathagar.com

আন্দোলনও মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সূচিত করে। এখানে প্রধানত ধর্মীয় সংস্কারই আলোচিত হবে; অন্য দুটি পর্বেই এ বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে।

এই ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হলে আমাদের ইতিহাসের আরও পশ্চাতে তাকাতে হবে। বাংলা যখন মুঘল বাদশাহির সুবাহ হিসেবে ঢাকাস্থ নওয়াব-নাজিমদের শাসনাধীনে ছিল (১৬১২-১৭০৪ খ্রী), তখন তাঁদের নিয়োজিত কাজি, মুফতি ও মুহতাসির নামাঙ্কিত বিশেষ কর্মচারীরা থাকতেন। তাঁদের বিশেষ কর্তব্য ছিল মুসলমান জনসাধারণের ধর্মীয় জীবন শরিয়ত মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের শিক্ষা ও কালচার উন্নয়ন করা। তাঁদের অধীনে পল্লী অঞ্চলে নায়েব থাকতেন; তাঁরা মুসলমানদের ধর্মসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতেন; বিয়ে-শাদি পড়াতেন; জানাজা, জুম্মার নামাজে ইমামতি করতেন। এভাবে তাঁরা মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর এসব পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় ইংরেজ শাসন-আমলে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নামে কাজিদের অস্তিত্ব রাখা হলো, কিন্তু তাঁদের আর সমাজের পর পূর্বের কর্তৃত্ব রইল না। পীর, ফকির ও খন্দকার নামে মুসলমান ধর্মনেতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটল, কিন্তু তাঁদের প্রভাব রইল নিজ নিজ শিষ্যদের মধ্যেই সীমিত। আরও দুঃখের কথা, তাঁরা আপন ডালরুটি রোজগারেই ব্যস্ত রইলেন; মুসলমান জনগণের ধর্মীয় জীবনের খবরদারী করার মহৎ কর্তব্যটা বিস্মৃত হলেন। তার ফল এই হলো যে, মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে বহু বেদাতের অনুপ্রবেশ হলো এবং আরও আক্ষেপের কথা এসব পীর ফকির খন্দকার স্বার্থান্ধ হয়ে এসব ইসলাম বিরুদ্ধ আচার-নীতিরও প্রশ্রয় দিতে থাকেন।

এরূপ বেদনাদায়ক উপস্থিতি ছিল পলাশীর পর তিন পুরুষ ধরে ষাট বছরেরও উপর। বাংলার মুসলমান বিপথগামী হলো, প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাবে ও অনুকরণে বহু কুসংস্কার ও শরিয়তবিরুদ্ধ প্রথার তারা অনুসারী হয়ে পড়ল। বহু হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচার প্রচ্ছন্নভাবে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং কালক্রমে তাদের ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। অনেক নও-মুসলমান দুর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে পূর্বের দেব-দেবীর পূজায় ও কুসংস্কার পালনে অভ্যস্ত থাকে; আবার অনেকে সুবিধামতো সেগুলোকে ইসলামি পোশাক পরিয়ে ধর্মীয় মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে। মা-বরকত, ওলা-বিবি, শীতলা বিবির পূজা দেওয়া, শিরনি দেওয়া (হরিলুটের মতো), তবররুক (প্রসাদ) বিতরণ করা মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। কোরানের আয়াত লিখিত কিংবা হিন্দু ধর্মের মন্ত্র তাবিজ (কবচ) পরার প্রথা, কলেরা বসন্ত মহামারীর সময় হিন্দুর অনুকরণে মাটির পাত্রে এসব আয়াত বা মন্ত্র লিখে বাড়ির দরজায় টাঙান, তেলপড়া, নুনপড়া পানিপড়া, কালিজিরাপড়া প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ

www.pathagar.com

প্রচলিত হয়ে ওঠে। ইসলামের উপর হিন্দুধর্মের এই প্রভাবকে লক্ষ করে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন,

> যদিও হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে তফাতটা দিন থেকে রাত্রির পার্থক্যের মতো, তবুও হিন্দু ধর্ম অন্য যে ধর্মেরই সংস্পর্শে এসেছে, সেটিকে আশ্চর্যভাবে নিজের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। এর একটা সুন্দর উপমা হচ্ছে, মুসলমানের মসজিদকে হিন্দুর ঘন জঙ্গলে দেখার মতো। ক্রমে ক্রমে বুনো লতা-পাতা মসজিদের সুন্দর থামগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, আল্লাহর ঘরটি ঘন আগাছায় ভরে গেছে। মসজিদের সদা সাবধানী তদারককারীর হেফাজতেই তার পবিত্রতা রক্ষা সম্ভব। এরকম অবস্থা ভারতে বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল এবং ইসলামের পরিচ্ছন্ন সহজ সরল ধর্মবিশ্বাসে বহু শতাব্দীর হিন্দু প্রভাবে মালিন্য জন্মেছিল।[২৪]

এসব হিন্দু কুসংস্কার ও আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করে কীরূপ চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুহম্মদ ইকবালের এ উক্তি থেকে :

> নিশ্চয়ই আমরা হিন্দুয়ানীতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দুরকমের জাতিভেদের কবলে পড়েছি—মজহাবি বিভেদ করেছি, না হয় উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি। এটিই হচ্ছে একটি নীরব উপায় যার ফলে বিজিত জাতির বিজেতার উপর চরম প্রতিশোধ নেয়।[২৫]

বাংলার মুসলমান যখন এসব ইসলামবিরুদ্ধ প্রথা ও অনুষ্ঠানের অনুসারী হয়ে অনুগামী হয়ে, বিপথগামী হয়ে পড়েছিল তখন হাজী শরীয়তুল্লার আবির্ভাব হয়।

> বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে শরীয়তপুর) বন্দরখোলায় এক অখ্যাত পরিবারে তাঁর জন্ম হয় এবং সম্ভবত আঠারো বছর বয়সে তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং কুড়ি বছর সেখানে বসবাস করে আরবি ভাষা, তফসির, হাদিস, ফিকাহ্ পাঠ করে একজন মশহুর মুহাদ্দিস নামে পরিচিত হন। শাফেয়ি মজহাবের মুফতি শেখ তাহির অস-সুনবুল অল-মক্কীর ছাত্র হিসেবে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৮০৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।[২৬]

প্রথমে স্ব-জেলায় তাঁর প্রচারক্ষেত্র ছিল, পরে ঢাকা জেলার নয়াবাড়িতে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার মুসলমান কৃষক এবং হস্ত ও কুটিরশিল্পী সমাজে তাঁর শিক্ষা প্রচারিত হতে থাকে। হিন্দু জমিদাররা তাঁর অর্থনৈতিক আন্দোলনে ভীত হয়ে তাঁকে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু আপন কর্তব্যে নিষ্ঠা ও সংকল্পে দৃঢ়তার জোরে তিনি এসব বাধা তুচ্ছ করে সংস্কারকর্মে জীবনপাত করেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা ছিল, মুসলমানদের 'ফরজ'

---

২৪. Verdict on India—Beverley Nichols, p 65n.

২৫. Quoted from Hindustan Review in Indian Census Report 1931.

২৬. শরীয়তুল্লাহর জন্ম সন ও মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন সন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা একমত নন। আমি তাঁর মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন সন ধরেছি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে, কারণ মক্কা থেকে ফেরার পর তাঁর বিবাহ হয় ও পুত্র মহসিন ওরফে দুদু মিয়ার জন্ম হয় ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য ধর্মানুষ্ঠানের অনুসারী করা। এজন্য তাঁর শিষ্যদের বলা হয় ফরারেজি, অর্থাৎ ফরজগুলোর একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি পীরমুরিদের বদলে ওস্তাদ-সাগরেদ সম্বন্ধ প্রবর্তন করেন ও 'বয়েত' গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। মহররম মাসে শিয়াদের অনুকরণে তাজিয়ার উৎসব করা, গীতবাদ্য করা, বিবাহে-উৎসবে অনর্থক অর্থব্যয় করার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা ছিল 'তওবাহ' অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপাচার ও ইসলাম-বিরুদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্তিই প্রধান কাম্য।

তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ওরফে মুহম্মদ মহসীন পিতার আরব্ধ কাজ আর বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধরূপে আরম্ভ করেন। তিনিও মক্কায় কিছু কাল বাস করে আরবি ভাষা এবং তফসীর, হাদিস, ফিকাহ উত্তমরূপে আয়ত্ব করেন। মক্কায় ওহাবি নেতাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, এজন্য তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল প্রধান। তাঁর সংগঠন শক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, তাঁর আদেশ পালনে ষাট হাজার কর্মী সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। তাঁর প্রাথমিক আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক—অত্যাচারী জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সমবায় চেষ্টায় সরকার তাঁকে দমন করতে উদ্যত হলে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা তৎপর হয়ে ওঠে। হিন্দু জমিদার ও নীলকররা তাঁর অনুগামী মুসলমান কৃষকদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালাতো, তার তুলনা নেই। দরিদ্র কৃষকদের দাড়িতে-দাড়িতে বেঁধে নাকে মরিচের গুঁড়ো দেওয়া হতো; শ্যামচাঁদের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করত। দাড়ি রাখার জন্যে ও শাদি, খাৎনা উৎসবকালে পৃথক আবওয়াব আদায় দিতে হতো। কিন্তু মুসলমান রায়তকে দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চাঁদা দিতে বাধ্য করা ও জমিদারির মধ্যে গো-কোরবানি নিষিদ্ধ করার মতো জমিদারদের অত্যাচার ছিল দুদু মিয়ার চোখে একেবারে অসহ্য। তিনি এসব অন্যায় ও ইসলামি নীতিবিরুদ্ধ আবওয়াব আদায় দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ করেন। তিনি আরও শিক্ষা দেন 'লাঙল যার, জমি তার'; জমিন আল্লাহর অফুরন্ত দান এবং যে কেউ জমি চাষ করে ফসল ফলাতে পারে বিনা বাধায় ও বিনা করে। তিনি খাস মহলের জমি দখল করার নির্দেশ দেন শিষ্যদের এবং এ থেকে সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ছয়বার তাঁকে নানা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারারুদ্ধ করা হয়, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অপরাধ কোর্টে সাব্যস্ত হয় নি। এ থেকেই তাঁর ন্যায়সম্মত উপায়ে আন্দোলন চালানোর নীতি প্রমাণিত হয়। আজও তাঁর নাম মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, নদীয়া, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী জেলার ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

তিতুমীরের ভূমিকা ছিল প্রধানত সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিদ্রোহের পটভূমিকায় ছিল ধর্মীয় সংস্কার। তিনিও মক্কায় যান এবং সেখানে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মক্কায় বাসকালে তিনি আবদুল ওহাবের অনুসারীদের সংস্রবে এসেছিলেন। দেশে প্রত্যাগমন করে তিনি প্রথমে সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং শিষ্যদের দাড়ি

www.pathagar.com

রাখতে ও শরিয়তের অনুসারী হতে শিক্ষা দেন। রায়তদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট তাঁর প্রাণে বাজে, এজন্য তিনি জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

> পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণরায় যখন দাড়ি রাখার জন্যে জনপ্রতি আড়াই টাকা কর ধার্য করেন, তখন তাঁর সঙ্গে তিতুমীরের প্রত্যক্ষ বিরোধ বাধে। সে বিরোধ পরে নীলকরদেরও সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়। তাঁর শিষ্যদের বলা হতো মওলাবি ও হিদায়েতি।[২৭]

মওলানা কেরামত আলীর জন্ম জৌনপুরে এবং তিনি ছিলেন শাহ আবদুল আজীজের প্রত্যক্ষ ছাত্র। সৈয়দ আহমদের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগ দেন। বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদ হলে কেরামত আলী বাংলাদেশে আগমন করেন ১৮৩৫ সালে। এখানেই বাকি জীবন ধর্মসংস্কারে অতিবাহিত করেন। রংপুর তাঁর কর্মকেন্দ্র হয় এবং এখানেই তাঁর সমাধি আছে (মৃ : ৩০ মে, ১৮৭৩ সাল)।

ভারত দারুল-ইসলাম কি না এ বহুতর্কিত প্রশ্নে তাঁর ফতোয়া পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। হাজী শরীয়ত উল্লাহর সঙ্গে কেরামত আলীর সাক্ষাৎ হয় কলকাতায় ১৮৩৬-৩৭ সালে। তখন দুজনের মধ্যে সংস্কারবিষয়ক মতাদর্শে কোনো বিরোধ হয় নি। ১৮৫৫ সালে বরিশালে তৎকালীন স্থানীয় ফরায়েজি নেতা আবদুল জব্বারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয় জুমার ও ঈদের নামাজ ভারতে জায়েজ কি না এই প্রশ্নে। ফরায়েজিরা ছিল এর বিরুদ্ধে, কিন্তু কেরামত আলী ছিলেন জায়েজ ঘোষণার পক্ষে। কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নে কখনো এ দুটি পন্থীর মধ্যে বিরোধ ছিল না।

কেরামত আলী ছিলেন শুদ্ধচিত্ত সাধুপুরুষ; ইসলামি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর সংস্কার কর্ম ছিল শান্ত ও বিরোধ-নিরপেক্ষ। ধর্মীয় সংস্কারই ছিল তাঁর একমাত্র ভূমিকা এবং এ সাধনয় তাঁর ছিল দ্বিমুখী কর্মপন্থা; প্রথমত, পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে যেসব ইসলামবিরুদ্ধ হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ঢুকে পড়েছে, সেগুলোর নিঃশেষে নির্মূল করা। এজন্য তিনি 'রদ্দে বিদা' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয়ত, বাউল প্রভৃতি যেসব সম্প্রদায় ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, সেগুলোকে সুশিক্ষা দিয়ে সংশোধন করে পুনরায় ইসলামের গণ্ডিতে আনয়ন করা; এজন্য তিনি 'হিদায়াত অল-রাফিদীন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমানদের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মীয় বিধানসমূহ 'মিফতাহুল জান্নাত'-এ বিধৃত আছে। তৎকালীন যুক্ত বাংলায় এমন কোনো শিক্ষিত মুসলমান নর-নারী নেই যিনি বাল্যে এ গ্রন্থটি পাঠ করেন নি। আজও গ্রন্থটি উর্দু-জানা প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে প্রতিষ্ঠিত। জীবনে মওলানা সাহেব প্রায় ৪৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের

২৭. ফারায়েজি আন্দোলন ও তিতুমীরের আন্দোলন আমার লিখিত "A Fascinating Chapter of the History of Islam in Eastern Pakistan" (The Islamic Review, June 1951) থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

সবগুলিই উর্দুভাষায় ও ধর্মসম্বন্ধীয়। এ ছাড়া মওলানা সাহেব দিবারাত্র পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে ফিরেছেন নিজের নৌকারোহণে, প্রতিটি মুসলমানকে হেদায়েত অর্থাৎ ধর্মোপদেশ দেওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি নিরলসভাবে এ মহৎ ব্রতে অবিচলিত থেকেছেন। তিনি 'ওহাবি' ছিলেন না, যদিও তিনি এ বিশ্বাস করতেন যে,সৈয়দ আহমদ একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন। এই অজাতশত্রু, নিরভিমানী, ন্যায়দর্শী উদার মহৎপ্রাণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে মুসলমানদের নিয়ামতস্বরূপ ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বর্তমান শতকের প্রথমদিকে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম কর্মবীর মুনশি মেহেরউল্লাহ। এই সময়ে নিম্নস্তরের মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টান মিশনারিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার দরুন এসব মুসলমানের খ্রিষ্টান হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মুনশি মেহেরউল্লাহর অক্লান্ত কর্মসাধনায় এ প্রবণতার গতিরোধ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশকে ও বিংশ শতকের শুরুতে তিনিই ছিলেন মুসলিম বাংলার রামমোহন। এ অল্পশিক্ষিত মহাপ্রাণ মানুষটি সেদিন বাংলার গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের আত্মসচেতন করার জন্যে বক্তৃতা ও সমাজ সেবার যে প্রবল ঝড় বইয়েছিলেন তার যথাযথ মূল্য আজও নিরূপিত হয় নি। তাঁর সান্নিধ্যে এসে সেদিনের পাদ্রি জমিরুদ্দীন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুনশি জমিরুদ্দীন নাম নিয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্যরূপে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

> ত্যাগী পুরুষ বাগ্মীপ্রবর মুনশি মেহেরুল্লাই মুসলমানদের জাতীয় চেতনামূলক ইসলামের নিজস্ব স্বরূপ ও পরিচয় বহনকারী সাহিত্যসেবায় মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।[২৮]

মুসলমান ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পরিক্রমা শেষে আমরা দেখতে পাই, যাদের সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হয়েছিল তারা এবং সংস্কারকরা কেউ-ই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারায় নয়া আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নয়। এসব মুসলমানরা নিতান্তই মাটির কাছাকাছি মানুষ এবং তাদের সংস্কারকর্মের দরকার হয়েছিল তাদের ইসলাম বিরোধী মানস হেতু নয়, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে পথ ভুলে যাওয়ার দরুন। আর যাঁরা তাদের সংস্কার ব্রতে জীবনপাত করেছেন, তাঁরা ও তাদেরই মধ্য থেকে উদ্ভূত মাটিরই কাছাকাছি মানুষ। এজন্য এসব সংস্কারক চিরবঞ্চিত সর্বহারা দরদ দিয়ে সেগুলোর প্রতিবিধান করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। অথচ নেহায়েত সুবিধার জন্যে তাঁদের সংস্কারকর্মকে সাম্প্রদায়িকতায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং বলা হয়ে থাকে, তাঁদের কর্মতৎপরতায় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধটা তিক্ত হয়েছিল এবং 'সমন্বয়করণ' প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল। এ অপবাদ

---

২৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—মু. আ. হাই ও সৈ. আ. আহসান (প্রথম সং) : ১৬-১৭ পৃ.।

www.pathagar.com

স্বার্থপ্রণোদিত। দীর্ঘ দু শ বছরের ইতিহাস পাঠ করে এ শিক্ষাই দৃঢ় হয় যে, যখনই বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ পীড়িত হয়েছে, তখনই মুসলমানকে অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে সাম্প্রদায়িক বলে। যখনই শ্রেণী স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন হয়েছে, তখন তার রূপ দেওয়া হয়েছে স্বদেশের স্বার্থ বলে; জাতীয়তাবাদের রূপ দেওয়া হয়েছে শ্রেণীবিশেষের বিকাশকে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বৃহৎ জনসমষ্টি স্বার্থচিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও চিন্তা-ভাবনা বিকাশের দিকটা বরাবরই কঠিন আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। এটাই ছিল হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সবচেয়ে করুণ চিত্র।

হিন্দু ধর্মসংস্কার সীমিত থেকেছে কলকাতার মধ্যেই নব্য বাবুদের ধর্মসংকট হেতুতে—বৃহত্তর হিন্দুগোষ্ঠির সনাতন ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ আচারনীতির সংস্কার করে ধর্মজ্ঞান সংশোধনের উদ্দেশ্যে নয়। আবার উনিশ শতকের শেষ কয় দশকে দেখা গেছে, জাতীয়তা জ্ঞানের নব উন্মেষে সনাতন হিন্দু ধর্মে ফিরে যাওয়ার জাগরণ। ১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছে, আই সি এস পরীক্ষা ভারতে প্রবর্তন করতে, কারণ সাগরযাত্রা করলে কিংবা ইউরোপ গেলে জাতিচ্যুত হতে হয়। এ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের 'একঘরে' কবিতায় মর্মবেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৮৯৭ সালে যখন মহামারি আকারে প্লেগ বোম্বাইয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখনও উচ্চবর্ণ হিন্দুরা নিম্নবর্ণ হিন্দুর দ্বারা গৃহে রোগনাশক ওষুধ ছড়ানোর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। ১৮৯৯ সালের ২৫ মার্চ তারিখের 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা হয় 'নিম্ন জাতীয় হিন্দু কর্তৃক হিন্দুদের গৃহে রোগনাশক ওষুধ ছিটানো কখনো কর্তব্য নহে।'

> একজন নিম্নজাতীয় হিন্দু বেলগ্রামের এক ব্রাহ্মণের গুহে প্রবেশ করেছিল রোগনাশক ঔষধ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তার দরুন জাতিনাশ হওয়ার দুঃখে ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করে।[২৯]

অতএব একথাটি পরিচ্ছন্ন যে, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয় নি, তার প্রয়োজন হয়েছিল বাবুদের ধর্মীয় সংকট উদ্ধার মানসে এবং কলকাতার নব্যশিক্ষিত বাবুদের মধ্যেই তা সীমিত ছিল, বৃহত্তর হিন্দুসমাজে তার তরঙ্গ ওঠে নি। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারের সব প্রচেষ্টা চলেছে বৃহত্তর গ্রামীণ এলাকায় এবং সমগ্র মুসলমান সমাজে। কলকাতা শহরে তার কর্মক্ষেত্র ছিল না এবং প্রয়োজনও ছিল না।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব যে ধর্মের কারণ নয়, অন্যবিধ কারণেই এ বিষের ব্যাপ্তি, তার আর একটি প্রমাণ হলো বর্তমান শতকে যতগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে, সেসবের প্রথম সূত্রপাত হয়েছে শহর অঞ্চলে–বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, কলকাতা ও ঢাকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাম্প্রদায় থেকে। কোনো হাঙ্গামার উৎপত্তি পল্লী অঞ্চলে হয় না। অতএব এটিও সপ্রমাণ করে, মুসলমান ধর্মীয় সংস্কার

২৯. Misra, pp 376-77.

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে নি, বৃদ্ধিও করে নি এবং তার প্রকৃত কারণও নয়। তলিয়ে দেখলে তাই সন্দেহ থাকে না যে, ভারতীয় উপমহাদেশে যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, তা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শক্তি ও সুবিধার ঝগড়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। বাংলাদেশে প্রায় দেড় শ বছর হিন্দু মধ্যবিত্তের ভাগেই জাতীয় সম্পদের দুধ-সর জুটেছে। নবগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত তার ভাগ চায় এবং হিন্দু আপত্তি করে বলেই বাংলায় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। এই সংঘর্ষের সর্বপ্রধান কারণ চাকরি, সরকারি কর্তৃত্ব ও আইনসভার আসনের ভাগাভাগি নিয়ে। সর্বত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণশক্তির ব্যবহারে আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়।

> জনসাধারণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তারো মূলে তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরস্পরের দ্বন্দ্ব। রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহারও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে, আর সেজন্য ভারতীয় উপমহাদেশের সংকুচিত, নিষ্পেষিত ও দরিদ্র জীবনই এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ।[৩০]

মুসলমান শিক্ষা বিস্তার

পূর্বের আলোচনা থেকে বিশদভাবেই দেখানো হয়েছে, ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সংকীর্ণ এবং মুসলমানরা কোম্পানি আমলে তার কোনো অধিকার পায় নি।

> ১৮৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে সমগ্র উপমহাদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতে পার্লামেন্টে এক রিপোর্ট পেশ করা হয়। তাতে দেখা যায় সর্বশ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে—কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭,৩৬০। তার মধ্যে ১,৬৩৬ জন মুসলমান ও ১৩,৬৯৯ জন বর্ণহিন্দু। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ছিল ৭,০৩৬ জন; তার মধ্যে ৯০৭ জন মুসলমান ও ৪,১৮৬ জন বর্ণহিন্দু। সংখ্যায় মুসলমানদের কলকাতা মাদ্রাসায় ১৫২ জন ও হুগলি মাদ্রাসায় ২৮০ জন ধরা আছে। ঢাকা কলেজে ৩০১ জন হিন্দু ও ২৪ জন মুসলমান; কুমিল্লা স্কুলে ১১৯ জন হিন্দু ১৮ জন মুসলমান; চট্টগ্রামে ৭২ জন হিন্দু ১৪ জন মুসলমান; সিলেটে ৪৫ জন হিন্দু ৩ জন মুসলমান, যশোরে ৯৬ জন হিন্দু ৩ মুসলমান।[৩১]

১৭৮১ সালে হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন মুসলমান কাজি ও মুফতি পদসমূহের কর্মচারী সরবরাহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কয়েক বছর পরই যখন কর্নওয়ালিস এসব পদ বিলোপ করে দেন, তখন মাদ্রাসা শিক্ষিতদের চাকরি প্রাপ্তির আশাও বিলুপ্ত হলো; তারা মোল্লা ও আলেম হিসেবে পল্লী অঞ্চলে ভিড় জমাতে লাগল মুসলমানদের হেদায়েত করে অন্নসংস্থান করতে। ১৮২৬ সালে মাদ্রাসায় কয়েকটি ইংরেজি ক্লাস জুড়ে দেওয়া হয় ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শীঘ্রই তা পরিত্যক্ত হয়।

৩০. মোসলেম রাজনীতি : হুমায়ুন কবির, পৃ. ২২-২৩।
৩১. Parl. Papers, 48 (20) of 1847-48.

www.pathagar.com

১৮৬৩ সালে খানবাহাদুর আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' স্থাপন করেন মুসলমান সমাজে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে। এখানে আলোচনার ভাষা ছিল আরবি, উর্দু, ফরাসি ও ইংরেজি, এজন্য বাংলাভাষী মুসলমানরা বিশেষ উৎসাহ পায় নি। ১৮৬৮ সালে খানবাহাদুর সাহেব বেঙ্গল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ইংরেজিতে; তাতে মুসলমান সমাজে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় ও মুসলমানদের ইংরেজি ভাষার প্রতি বিতৃষ্ণার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। তিনি তাদের জন্যে পৃথক কলেজ স্থাপনের আবেদন জানান। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতির জন্যে তাঁর উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার অন্ত ছিল না। *তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়*[৩২] ও মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করে ইংরেজি শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা করা হয়। বাংলার মুসলমান তাঁর নিকট অশেষভাবে ঋণী; উত্তর ভারতের মুসলমানরা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নিকট যতদূর ঋণী, তার চেয়ে বেশি না হলেও কম হবে না। তাঁর দৃষ্টি ছিল দিগন্তপ্রসারী এবং নীতি ছিল বলিষ্ঠ; তিনি শিক্ষা ও কালচারের মাধ্যমে ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

> তারই ফলশ্রুতিতে আমাদের মধ্যে এত মুসলমান গ্রাজুয়েট, জজ, ব্যবহারজীবী, ডাক্তার ও জননেতার সাক্ষাৎ পাই—যা পূর্বে দেখা যায় নি। তাঁর দাবি ছিল সোচ্চার, এবং যাদের জন্যে তিনি জীবনপাত পরিশ্রম করেছেন, তারা নির্দ্বিধায় তাঁর আনুগত্য স্বীকার করত।[৩৩]

সৈয়দ আমীর হোসেন নামক পাটনার একজন মুসলমান ১৮৭৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের স্থলে বাংলা বিধানসভার সভ্য নিযুক্ত হন। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে তাঁরও উৎসাহের অন্ত ছিল না। ১৮৮০ সালে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাদের শিক্ষার বিস্তৃতির জন্যে বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন,

> মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় কোনো উন্নতি হচ্ছে না। সরকার এ বিষয়ে উদাসীন। ইংরেজি শিক্ষা না করায় ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। অথচ মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী, পূর্বের বিতৃষ্ণা আর নেই। অনেক আরবি-ফারসি শিক্ষিত ব্যক্তিকে দুঃখ করতে শোনা যায় তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পান নি, এজন্য তাঁদের কোনো জীবনোপায় নেই। মহসীন ফান্ডের টাকায় হুগলি, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে যে ধরনের মাদরাসা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, তার দ্বারা কোনো উপকার হয় না। অতএব হুগলি মাদ্রাসা তুলে দেওয়া হোক ও রাজশাহী

---

৩২. হিন্দু কলেজ ১৮৫৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামাঙ্কিত হলেও ১৮৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ ভবনটির প্রতিষ্ঠা হয় ও মুসলমানদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৩৩. Devaprasad Sarbadhikari, V. C. C. U. 1915 (আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন উৎসবে)।

www.pathagar.com

এবং চট্টগ্রাম মাদরাসার ব্যয়সংকোচ করা হোক। এভাবে মহসীন ফান্ডে যে ৯৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হবে, তার দ্বারা কলকাতা মাদ্রাসার গৃহে স্বতন্ত্র ডিগ্রি কলেজ খোলা হোক। এর ফলে মুসলমানদের মদেধ ইংরেজি উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধি পাবে, অথচ সরকারের পৃথক খরচ হবে না।

কিন্তু এমন সদযুক্তি সরকারের গ্রাহ্য হয় নি। তদানীন্তন গভর্নর আমীর হোসেনের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি এই অজুহাত দেখিয়ে :

এখনও মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে নি; ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে নি। সারা বাংলাদেশে গড়ে ৩২ জন মুসলমান ছেলে বছরে এন্ট্রান্স পাস করে, তাদের মধ্যে বড়জোর ২০ জন কলেজে পড়ে। এত কম সংখ্যক ছাত্র দিয়ে প্রেসিডেন্সির মতো কলেজ খোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। কলকাতার কলেজগুলোতে মুসলমান ছাত্রদের এক-তৃতীয়াংশ বেতন দিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে.।

সেদিনের সে প্রস্তাব গৃহীত হলে মুসলমান সমাজের কী উপকার হতো এবং তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা কী দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হতো সহজেই অনুমেয়। তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ইসলামিয়া কলেজ স্থাপিত হয় এ অভাবটি দূরীকরণের মানসে। এবং প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ঘরের কাছাকাছি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। উল্লেখযোগ্য যে, সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের মতোই তুমুল বিক্ষোভ তুলেছিল তাদের তীব্র বিরোধিতায় তখন ডাক্তারি ও কারিগরি শিক্ষা তার আওতাবহির্ভূত ছিল এবং তার এলাকাও ঢাকার মধ্যে সীমিত ছিল। এভাবে মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা বিলম্বিত করার কী গূঢ় রহস্য ছিল কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন, কিন্তু একথায় সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই যে, এমন স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে মুসলমান সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সব চেয়ে বেশি।

যে যুগে মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগলাভের পথ ছিল প্রায় রুদ্ধ, সে যুগে নওয়াব আবদুল লতিফ ও আমীর হোসেনের এরূপ ঐকান্তিক ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ আমাদের স্পর্শ করে এবং সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় চিত্ততল ভরে ওঠে। তবু তাঁদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে হীনচক্ষে দেখা হয়েছে, যেহেতু 'নতুন শিক্ষাকে সত্যই কার্যকরী করার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির, সে বিষয়ে তাঁরা আদৌ সচেতন হন নি।'

এমনকি সমগ্র মুসলমান সমাজকে কটাক্ষ করে এমন উক্তিও করা হয়েছে, 'ক্ষুধার তাড়না কি এই যুগের মুসলিমদের জন্য এত বড় হলো যে তাতে তলিয়ে গেল তাদের অন্তরাত্মার সূক্ষ্ম নবজীবনসঞ্চারী অনুভূতি!'[৩৪]

---

৩৪. বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ, ১২৫ + ১৩০ পৃ.।

www.pathagar.com

বেদনার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, দৃষ্টিশক্তির খর্বতা হেতু ও অন্য স্বার্থবশে আচ্ছন্ন মানস হেতু বাস্তব অবস্থাটা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েই এরূপ উক্তি করা সম্ভব হয়েছে। একদিকে বিদেশি রাজশক্তির বিরূপ মনোভাব হেতু নিপীড়ন, ঔদাসীন্য ও অবহেলা; অন্যদিকে সেই শক্তিরই অনুগ্রহপুষ্ট প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন বঞ্চনা ও স্বার্থরক্ষার তাগিদে মুসলমানকে শিক্ষা তথা জীবনোপায়ের সবক্ষেত্র হতে সুপরিকল্পিত বিতাড়ন—এই সাঁড়াশিদগ্ধ অবস্থায় যার জগৎ ও জীবনই আঁধার হয়ে গেছে, সে কোনো স্বর্গীয় অনুভূতিতে 'জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি' লাভ করতে পারে? আর ক্ষুধার তাড়না যে কী সর্বগ্রাসী, যার অভিশাপে মানুষ পশুত্বের হীনপর্যায়ে নেমে যায়, সে যন্ত্রণা সে কী করে বুঝবে যার প্রাচুর্যের পরিতৃপ্তিতে উদ্‌গাড় তোলার বিলাস মুহূর্ত সূক্ষ্মজীবন সঞ্চারী অনুভূতি আবেশে কেটে যায়! জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনধারণ করাই তৎকালীন পরিস্থিতিতে যে মুসলমানের চরম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার এমন পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির বা সূক্ষ্ম অনুভূতির দারিদ্র্যটাকে বুড়ো করে দেখার বা কটাক্ষ করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না।

বরং বুদ্ধিটাকে কিছুটা মুক্তি দিয়ে যুক্তিটা কিছু বাস্তবানুগ নিরপেক্ষ ও উদারভাবে প্রয়োগ করলে প্রকৃত সত্যটা চোখে ঠেকত অন্য স্বার্থবশের কুয়াশামুক্ত হয়ে এবং দেখা যেত, মুসলমান যেখানে বাঁচার সমস্যায় আত্মরক্ষার সমস্যায় মাথা খুঁড়ে মরছে, সেখানে তার আঙিনার পাশের প্রতিবেশী হিন্দু যদি মানবতার ও সহৃদয়তার টানে মুসলমানকে কিছুটা অংশ ছেড়ে দিত আর্থিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ও সংস্কৃতির ভোজে অপাঙ্‌ক্তেয় করে না রেখে সামান্য পাত পাড়ারও আসন ছেড়ে দিত; হিন্দু সমাজ কিছুটা উদার, সহিষ্ণু ও হৃদয়বান হতো, তাহলে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক বিরোধ-সংঘর্ষের হয়তো উদ্ভবই হওয়ার কারণ ঘটত না। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এত তিক্ততা বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতো না। যা হয় নি তার জন্য অনুশোচনা নয়। কিন্তু যে পরিস্থিতির জন্য মুসলমান প্রস্তুতই ছিল না, তার জন্যই তাকে দায়ী করা ও দোষারোপ করায় অন্তত বুদ্ধির মুক্তির দম্ভ সাজে না।

পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থাই যখন এমন কণ্টকাকীর্ণ, তখন নারীশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই আশা করা যায় না। নিম্ন পাঠশালায় দু-একটি মুসলিম বালিকার মুখদর্শন সম্ভব হতো, কিন্তু তার উচ্চতর কোনো শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। অনুমিত হয়, এ যুগের মুসলমান নারী হিন্দু নারীর মতো পর্দার অন্তরালে থেকে সামান্য কিংবা বিনা শিক্ষাতেই জীবন কাটিয়ে দিত। কলকাতায় ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলেও সেখানে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৭০ সালে আবদুল লতিফ বেঙ্গল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে যে ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার আলোচনাকালে মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কীভাবে চেষ্টা চলছে।, সেকথাও উঠেছিল। তখন আবদুল হাকিম নামক জনৈক উর্দুভাষী যা বলেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমান নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে বাইরে থেকে কোনো তোড়জোড়ের

www.pathagar.com

প্রয়োজন অনুভূত হয় নি; পুরুষের শিক্ষার উন্নতি হলে নারীর শিক্ষাও এগিয়ে যাবে, এটিই ছিল মত।

অতঃপর নারীশিক্ষা সম্পর্কিত কোনো বিশেষ তথ্য মেলে না। 'মিহির' ও 'সুধাকর' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ 'মুসলমান স্ত্রী-সমাজে ইংরেজি শিক্ষা' এরূপ লিখেছিল :

> আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই ১৯০১ সালের আদমশুমারি আমাদের নিকট ৪০০ (চারিশত) মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরেজি শিক্ষার কথা প্রচার করিবে। একথা প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের কর্তব্য কি? যদি অন্তঃপুরে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যে-সব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি? কলিকাতার বেথুন স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার নাই বেথুন কলেজ ছাড়া অন্যান্য স্কুলে তাহারা পড়িতে পারে। বিশেষ আমাদের বালিকা মাদরাসাগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়।[৩৫]

অবস্থাদৃষ্টে অনুমিত হয়, মুসলিম বালিকার শিক্ষা অত্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। ১৯১১ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ভাগলপুর হতে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করেন ও ১৯৩২ সালে মৃত্যু পর্যন্ত নারীশিক্ষার চিন্তায় জীবনপাত করেন। এই মহীয়সী মহিলার প্রযত্নে প্রথম মুসলিম বালিকা স্কুল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' কলকাতায় স্থাপিত হয়। বেগম রোকেয়ার নাম স্মরণ হলেই সেবামূর্তির প্রতীকবর্তিকাধারিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে—জ্ঞানের একটি প্রদীপ ধরে রোকেয়া যেন অন্ধ কারায় বন্দিনী নারীজাতির সম্মুখে আলোক জ্বেলে দিচ্ছেন। তারপর ব্রেবোর্ন কলেজ স্থাপিত হয় আজাদি লাভের কয়েক বছর পূর্বে।

সমাজ জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে মুসলমান নারী সবেমাত্র অংশগ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছিল আজাদি পূর্ব কালে। বি-আম্মা ও বেগম শাহনওয়াজকে এ যুগে দেখা গেছে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। তাঁরাও সমাজ-সংস্কারে ও আজাদি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পুরুষের পাশে পাশে। ১৯১৪ সাল থেকে নিখিল-ভারত মুসলিম নারী সম্মেলন হতে থাকে। ১৯১৯ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম নারী সম্মেলন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে। ভূপালের রাজমাতা ১৯২৮ সালের সম্মেলনে সভানেতৃত্ব করেন এবং সংস্কার-প্রস্তাব আনয়ন করেন।

বলাবাহুল্য, স্ত্রীশিক্ষার যা কিছু প্রসার ঘটেছে মধ্যবিত্ত সমাজে, হিন্দুদের মতোই। গ্রাম অঞ্চলে কোনো শিক্ষায়তন স্থাপিত হয় নি বালিকাদের জন্যে। বালকেরাই যেখানে গণনার ঊর্ধ্বে, সেখানে বালিকাদের কথা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করবে, আশা করা বৃথা।

---

৩৫. ২৩ মাঘ, ১৩০৯ : মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্রে উদ্ধৃত, ৫২ পৃ.।

www.pathagar.com

বাবু কালচার : বাংলা গদ্যের জন্ম : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য

এ পর্যন্ত আমরা ব্রিটিশরাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা নব্য বাবুদের বাণিজ্যিক ও ভূমিভিত্তিক আর্থিক পরিচয় পেলাম, বাবু রাজনীতির আদর্শ ও তার পরিণতি লক্ষ করলাম; বাবুদের ধর্মীয় সংকট ও তার প্রতিকার এবং হিন্দু সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যুক্তিসম্মত ও বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বর্ণহিন্দু সমাজ কাঠামোর রূপায়ণও দেখলাম। এবার উচিত হবে তাদের সৃষ্ট নতুন সংস্কৃতির আলোচনা করা।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এই নতুন সংস্কৃতিকে 'বাবু কালচার' বলাই প্রশস্ত। এ কালচার যেমন নব্য বাবুদের সৃষ্টি, তেমনি তার বিস্তৃতি ছিল বাবুসমাজের গণ্ডির মধ্যেই এবং শহর অঞ্চলেই ছিল সীমাবদ্ধ। বস্তুত এ কালচার ছিল ইংরেজাশ্রিত বেনিয়ান, দালাল ও মুৎসুদ্দিদের কালচার।

ভাষা ও সাহিত্যই হচ্ছে কালচারের দৃঢ় বুনিয়াদ এবং এ দুটির মাধ্যমেই জাতির নিজস্ব প্রতিভা ও স্বকীয়তার পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব। অতএব কালচারের কথায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপান্তরই আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হবে।

এদেশের নয়া শাসকদের কৃতিত্ব, তারা নব্য গঠিত মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক বুনিয়াদেরই ব্যবস্থা করে নি, এ সমাজের মুখের ভাষার রূপায়ণ ও তার সাহিত্যিক বুনিয়াদ ও রচনা করে দিয়েছিল এবং এই বাবু কালচারের বুনিয়াদ স্থাপনকালে মুসলমান আমলের চলিত ভাষা ও সাহিত্যকেও নির্বাসিত করে নতুন ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির পথও নির্মাণ করে দিয়েছিল।

কথাটা আরও বিশদ করে বলি, ইংরেজের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল তার মধ্যে অজস্র আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ ছিল এবং সাহিত্যের বিকাশ ছিল পদ্যেই, গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন ছিল না। ইংরেজদের এদেশে আবির্ভাবের পূর্বে ইংরেজি ভাষায় গদ্যসাহিত্যের প্রভূত সমৃদ্ধি হয়েছিল কথাসাহিত্য ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি রচনায়। এমনকি ইংরেজের বাইবেলও রচিত হয়েছিল 'অথারাইজড ভার্সন' হিসেবে ইংরেজি গদ্যে। ইংরেজরাই বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রচলন করে এবং তাদের মিশনারি সম্প্রদায়ের এটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

বাংলা গদ্যের জন্ম ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় বাংলাভাষী খ্যাতনামা পণ্ডিতরা আত্মনিয়োগ করেছেন। এখানে তার ক্ষেত্র নয় এবং সে চেষ্টা করাও হবে না। এখানে একথাটি বলাই যথেষ্ট হবে যে, উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের একটা কাঠামো থাকলেও তার রূপসজ্জা ছিল না এবং সাহিত্যে তার প্রকাশও ছিল না। চিঠিপত্রে বা দলিল-দস্তাবেজে একটা ধারাবাহিকতা ছিল ভাষার এ রীতির এবং সে রীতিই ছিল বাংলা গদ্যের মূলধারা।

www.pathagar.com

> এই ধারাই পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদের ও বঙ্কিম কর্তৃক পরিপুষ্ট হয়ে বর্তমান গদ্য-বাংলা সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হয়েছে।[৩৬]

পণ্ডিতরা বলেন, ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দই বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বছর। কারণ এই বছরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত A Grmmar of the Bengali Language প্রকাশিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোম্পানিরই অন্যতম কর্মচারী হ্যালহেড সাহেব এই বাংলা ব্যাকরণখানি প্রণয়ন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে এটিই প্রথম, যাতে প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক তিন শ বছর পূর্বে ১৪৭৭ সালে উইলিয়ম ক্যাকসটন ইংল্যান্ডে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করেছিলেন। সেই হ্যালহেড-উইলকিন্স-জোন্সের আমল থেকে শুরু করে শ্রীরামপুর খ্রিষ্টান মিশনের কেরী-মার্শম্যান—ওয়ার্ড আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং তাঁদের অনুকূল-প্রতিকুল বাঙালি গদ্য লেখকদের উদ্যমের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বাংলা গদ্য নেমে এসেছে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরে; অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার পাশাপাশি বয়ে গেছে টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহের ধারা; বঙ্কিম নানারকম গদ্য লিখেছেন; বঙ্কিমের পর মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও নবীনতার অন্যান্যরা এ গদ্যধারার কীর্তিবহ।

এখানে হ্যালহেড সাহেবের আরও একটু পূর্বে যাওয়া শিক্ষাপ্রদ। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভূষণার এক জমিদার-পুত্রকে মগ-দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। এক পর্তুগিজ পাদ্রি তাকে ক্রয় করে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করেন; তিনি তাকে রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তার নাম রাখেন দোম আন্তনিও। এই দোম আন্তনিও পরবর্তীকালে নিজেও পাদ্রি হয়েছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামাঙ্কিত প্রশ্নোত্তর পর্যায়ের একখানি বাংলা বই লিখেছিলেন গদ্যভাষায়। এখানি আঠারো শতকের প্রথমদিকেই পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ করেন পাদ্রি ম্যানুয়েল-দ্য আসসুমপসাম। দোম আন্তনিওর ভাষা আঞ্চলিক নয়, সেটা ছিল 'সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা'। অবশ্য তাতে পূর্ব বাংলার কথ্যভাষামূহের ছাপ আছে এবং অনুমিত হয়, এই ভাষাকেই তৎকালীন শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষা বলা হতো! এই অনুবাদক ম্যানুয়েলই ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে কিছুকাল বাস করেন এবং স্থানীয় ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করে ১৭৩৪ সালে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে একখানি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। পরে ১৭৪৩ সালে লিসবন শহর থেকে রোমান হরফে সে বইখানি ছাপা হয়েছিল। সজনীকান্ত দাস বলেছেন, যদিও এখানি প্রথম মুদ্রিত

---

৩৬. বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, ১৭ পৃ.।

www.pathagar.com

বাংলা বই, তবু তা একটি প্রাদেশিক কথিত ভাষায় রচিত এবং মূলধারার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত,

'সুতরাং ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দকেই আমরা গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলিব'।[৩৭]

শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এমতটি গ্রহণীয় নয়। ভাষার কোনো যুগের আরম্ভ কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণে হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। আপন গতিবেগেই ভাষার প্রগতি এবং সে প্রগতির ধারা নির্ণয়ে আলোচনার সুবিধার্থে একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সনকে সে ধারার শুভ মহরতের বছর ধরা যায় না। ব্যাকরণের নানা ত্রুটি এবং আরবি-ফারসি শব্দ-কণ্টকিত' হওয়া সত্ত্বেও এখানি ভাওয়ালের জীবন্ত ভাষায় রচিত এবং সে হিসেবে প্রচলিত ভাষার প্রতীক; এজন্য এ ভাষাকে মূলধারার সম্পর্কবিহীন ভাবা যায় না। যাহোক বাংলা হরফে না হলেও এখানি আমাদের প্রথম ছাপা বাংলা বই।

হ্যালহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছিলেন, 'এ যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে অজস্র আরবি ফারসি বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।' অতএব 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' থেকে ও হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমান পাওয়া গেল, আঠারো শতকের মার্জিত বাংলা কথ্যভাষা এবং গদ্যভাষার কাঠামোতে ছিল 'অজস্র আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ'। সে বাংলা গদ্যের নমুনা ছিল এই রকম :

> শ্রীরাম। গরিব নেওয়াজ শেলামত। আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম শীকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাকালে একবেরাপুরের শ্রী হরে কৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে শরকার হইতে আমিও এক চোপদার সরেজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি সন ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবী জগতাধিব রায়।[৩৮]

এই চিঠিখানির উল্লেখ করে সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর সজনীকান্ত দাস এরূপ মন্তব্য করেছেন :

> এক হিসেবে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি তাহা বাংলাদেশে মুসলমান প্রভাবের ফল। ... পরবর্তীকালে হেনরী পিটার ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবি-ফারসির অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতী করিয়াছেন।[৩৯]
>
> কিন্তু ইংরেজের আগমন না ঘটিলে আজিও আমাদিগকে 'গরিব নেওয়াজ শেলামত' বলিয়া শুরু করিয়া 'ফিদবী' বলিয়া শেষ করিতে হইতে। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইতে, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই। ... ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এই আরবি

---

৩৭. ঐ—পৃ. ২৭।

৩৮. এই অতিপ্রাচীন চিঠিখানির ইংরেজি তারিখ হবে ১৭৭৮ সালের ২৬ জুলাই।

৩৯. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ৬২ পৃ ;।

www.pathagar.com

ফারসি নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানির সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবি ফারসির পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজির প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আরবি ফারসিকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবি ও ফারসির বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল।[৪০]

সজনীকান্তের মতো গোঁড়া হিন্দুর কলম থেকে এরকম উদার অসাম্প্রদায়িক উক্তি বিস্ময়কর। সেজন্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বর্তমান কালে আমরাও বলি, বাংলাদেশে মুসলমানের দান হিসেবে যে বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল, কেরীপ্রমুখ 'মহাত্মা'-দের কল্যাণে তার উৎখাত না হলে মঙ্গলের কি অমঙ্গলের হতো, আজ সে বিচার করে লাভ নেই। কিন্তু নির্মম কর্মের ফলে বাংলার হতভাগ্য মুসলমান সেদিন নিশ্চয়ই ফরিয়াদ জানিয়েছিল : আমায় সর্বপ্রকারে কাংগাল করেছ গর্ব করেছ চুর! আমার রাজ্য ও আমার মসনদ গ্রাস করেছে বিদেশি বণিক কোম্পানি, আমার অর্থসম্পদ, ভূমি জমিদারি ও জীবনধারণের সব উৎস লুট করেছে কোম্পানি-সৃষ্ট নব্য বাবুসম্প্রদায়; এবার মুখের ভাষা সংস্কৃতিও কেড়ে নিল কোম্পানির ভল্পীবাহক মিশনারিরা!

মুসলমান প্রভাবের ফলে যে বাংলা ভাষায় অস্তিত্ব ছিল ইংরেজ আগমনের প্রাককালে, এবার তার অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার জন্মসূত্র যেসব ধারা থেকেই চিহ্নিত হোক না কেন পণ্ডিত সমাজের গবেষণার ফলে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দশম শতকে এ ভাষায় উৎপত্তি শুরু হয় এবং আধুনিক রূপরেখা গড়ে ওঠে দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। তেরো শতকের গোড়াতেই তুর্কিরা এদেশে হানা দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তারপর বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা যেমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি এদেশের ভাষা এবং সংস্কৃতিতেও তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ধর্মান্তরিত এবং বিদেশাগত ও উভয়ের সংমিশ্রণে নবউৎপাদিত মুসলমানরা এদেশেই জন্মেছে, মরেছে এবং এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে আপন করে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল থেকে এসে ভাষা এবং যেসব উচ্চ পদস্থ অভিজাত মুসলমান বিদেশ থেকে এসে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকতেন তাঁদের ভাষা ফারসি বা উর্দু হলেও স্থানীয় ভাষায় মিশ্রণে [illegible] সাধারণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন; যেমন ইউরোপীয়রা এসে ভাঙা ভাঙা স্থানীয় ভাষা অভ্যাস করে তেমন একটা আরবি, ফারসি ও উর্দুমিশ্রিত কথ্য বাংলা ভাষা বাংলাদেশের অগণিত মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভব হওয়া ও প্রচলিত থাকা বিচিত্র নয়।

৪০. ঐ—৩২ পৃ.।

www.pathagar.com

১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পর ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শ বছর মুসলমানরা একাদিক্রমে একচ্ছত্রভাবে বাংলাদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছে, তার মধ্যে প্রায় দু শ বছর ছিল স্বাধীন সুলতানি আমল। এসব মুসলমান সুলতান এদেশে জন্মেছেন, রাজ্য শাসন করে এদেশের মাটিতেই অনন্তে মিশে গেছেন। তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হয়েছে এদেশেরই জলবায়ুতে এবং তাঁদের কর্মধারা কেন্দ্রীভূত ছিল এদেশের মধ্যে। এজন্য এদেশের প্রচলিত মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল জলবায়ুর মতো; তার পরিচর্যা ও তার উৎকর্ষের জন্যে তাঁরা উৎসাহ দেবেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। স্বাভাবিক তাগিদেই, করুণা বা কৃপাবশত নয়।

> আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাল্যজীবনে বাঙালি-পরিবারে লালিতপালিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর বাংলা ভাষাপ্রীতি জন্মানো অত্যন্ত স্বাভাবিক। এজন্যই তাঁর শাসন আমলে উদার নীতির অনুসরণ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে 'বাঙালির যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি ছিল, সে প্রতিভা অবরোধমুক্ত হয়ে বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত হয়েছিল এবং চরম উন্নতিলাভ করেছিল'।[৪১]

তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদানে কখনো কার্পণ্য করেন নি। সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান কবিদের কবিতার ভণিতায় ও পদাবলিতে এই দুই পিতা-পুত্রের বাংলা ভাষার প্রতি অসীম প্রীতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করছে। স্বাধীন মুসলমানি আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক পরিচর্যা মুসলমানদের হাতে কেন ও কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, তার আলোচনা কালে প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিদ পণ্ডিত মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন,

> স্বাধীন মুসলিম-বঙ্গের গোড়া হইতেই সুলতানদের বাঙালি রমণী বিবাহের সূত্র ধরিয়া বাংলা ভাষা মুসলিম রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাহার উপর গৌড়ের হেরেমে বাঙালি পরিচারিকা নিযুক্তিতেও এই ভাষা বাদশাহদের (সুলতানদের পরিবারে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাংলার হিন্দু-মুসলিম কর্মচারীর ব্যাপক নিযুক্তিতে, বিশেষ করিয়া শাহী দরবারে বহু শিক্ষিত ও পদস্থ হিন্দুর আমদানিতে বাংলা ভাষা গৌড়ের শাহী দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তদুপরি খাঁটি বাঙালি মুসলিম সুলতানদের স্বাভাবিক মাতৃভাষা-প্রীতি এই ভাষাকে শাহী দরবারে যে প্রতিষ্ঠা দান করিল, তাহা হুসেনী বংশের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প ও সাহিত্য-প্রীতির সহিত মিশিয়া বাংলাসাহিত্য চর্চাকে দেশময় ছড়াইয়া দিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় সুলতানদের এই দানকে পরোক্ষ দান বলা চলে না। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষদানে গৌড়ীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাও অন্যতম। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিলে বনফুলের ন্যায় লোক চক্ষুর অন্তরাল ঝরিয়া পড়িত।[৪২]

---

৪১. Hist. of Bengal, vol. II (D. U. 1948), pp 143-144 (Dr. A. B. M. Habibullah).

৪২. মুসলিম বাঙ্গালা-সাহিত্য, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

বস্তুত যেকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্কৃত ভাষাপ্রীতি এরূপ অত্যধিক ছিল যে, তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করা পাপকর্ম জ্ঞান করতেন এবং কেহ *এরূপ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হলে অভিশাপ দিতেন,*[৪৩] সেই যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শৈশব অবস্থায় মুসলমানরা তার শুধু লালন-পালনই করে নি, তার পুষ্টিসাধন করে ভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যেমন ভাষাবিজ্ঞানে মুসলমানের শ্রেষ্ঠদান হচ্ছে উর্দু ভাষা, সেই রকম পূর্ব ভারতে মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বাংলা ভাষা। পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে যেমন মুসলমানরা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে উর্দু ভাষা সৃষ্টি করেন, সেইরকম বাংলায় মুসলমানরা নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি করেন এবং সর্বতোভাবে তার উন্নতি সাধন করেন'।[৪৪]

মুসলমান সুলতানদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর ধর্মকাহিনী কাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে পণ্ডিত সমাজ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, 'কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুনঘেঁসে এ তিন সর্বনেশে।' অথচ কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে বাংলা ভাষায় হিন্দুর এ দুটি ধর্মীয় মহাকাব্যের মুক্তিদান করায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'অমৃতসমান কথা শুনে পুণ্যবান।' এ অমৃতধারার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছে মুসলমান সুলতানদেরই কল্যাণে। 'বাংলার মুসলমান শাসকরাই পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত তর্জমা করতে, কারণ সুলতানরা বাংলা বুঝতেন ও এ ভাষায় কথা বলতেন। গৌড়ের সুলতান নসরত শাহ মহাভারত বাংলায় তর্জমা করিয়েছিলেন। বিদ্যাপতি এই সুলতানের ও সুলতান গিয়াসউদ্দীনের অজস্র প্রশংসা করেছেন।

'কৃত্তিবাসের রামায়ণের বাংলা তর্জমাকে অনেকে বাংলার বাইবেল বলে থাকেন; এই কৃত্তিবাস একজন গৌড়ীয় সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ধন্য হয়েছিলেন'।[৪৫]

মধ্য যুগে প্রাকৃত ভাষাগুলোর চর্চা ও উৎকর্ষলাভ সম্বন্ধে আলোচনাকালে পান্নিকর বলেছেন,

ইসলাম আরও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে হিন্দু ধর্মের তথা হিন্দু ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ... বিশেষ লক্ষ করলে দেখা যাবে, উত্তর ভারতের বৃহৎ ভাষাগুলোর

---

৪৩. এ কালের পণ্ডিতগণ অশিষ্ট প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষাকে কি হীনচক্ষে দেখতেন, তার প্রমাণ এ শ্লোকটি :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ,
ভাষায়াং মানবাশ্রুত্বা রৌরবং নরবং ব্রযেৎ।

'ভাষায় অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি যে মানব শুনবে, তার ব্যবস্থা রৌরব নরকে।

৪৪. পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন (১৯৪৪ জুলাই) ইতিহাস-শাখার সভাপতি আবদুল মওদুদ : মাসিক মোহাম্মদী—শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৫১ সাল।

৪৫. Advanced Hist. of India, pp, 408-409.

www.pathagar.com

উন্নয়ন এই যুগে হয়েছিল। সংস্কৃত অতঃপর সরকারি দলিলপত্রে ব্যবহৃত হতো না, এজন্য সাধারণ প্রাকৃত বা ইতর ভাষাগুলোই মর্যাদার আসন লাভ করল। এ যুগের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম কবি আমীর খসরু হিন্দিকে আরবি-ফারসির চেয়ে ভাবপ্রকাশে বেশি সমৃদ্ধ ও নমনীয় ভাষা বিবেচনা করতেন। বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি ভাষাও মুসলমানি আমলে উৎকর্ষ লাভ করে। মৈথিলি ভাষায় বিদ্যাপতির গীতাবলি, বাংলায় চণ্ডীদাস-পদাবলি, রাজস্থানীতে মীরার ভজন এবং মারাঠীতে নাপস্বামীর কবিতাকর্ম কেবল লোকপ্রিয়ই হয় নি, উন্নত ভাষা হিসেবেও প্রত্যেকটিই খ্যাতি লাভ করেছিল। সংস্কৃত ধ্রুপদী কাব্যসমূহের দেশি ভাষাসমূহে তর্জমা, বিশেষত বাংলায়, মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত, ইসলামের আবির্ভাবে যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়, তার ফলে ধর্মটায় আর বিদ্বৎসমাজেরই একচেটিয়া অধিকার রইল না, ক্রমে ক্রমে জনগণের ভাষায় তাদেরই বিষয় হয়ে দাঁড়াল।[৪৬]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মধ্যযুগে মুসলমান সুলতান ও আমীরদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভেই ধন্য হয় নি, মুসলমান কবিদের প্রত্যক্ষ দানেও পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আর মুসলমান কবিরা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদিগকে দেশীয় ভাষার সাহায্যে মুসলিম ধর্মীয় উপাখ্যান শোনাবার ও ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। বাংলা ভাষায় মুসলমান আদি কবি শাহ মুহম্মদ সগীর 'যুসুফ-জলিখা' কাব্য রচনা করেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শাসন আমলে (১৩৮৯-১৪০৯) এবং তিনি 'দেশি ভাষায় পয়ার রচিত' করেছেন বাংলাভাষী মুসলমানদের লক্ষ্য করেই। উল্লেখযোগ্য, ফারসি ভাষায় আবদুল রহমান জামীর (১৪১৪-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) লিখিত অমর মহাকাব্য 'ইউসুফ-ওয়া-জুলায়খা' রচিত হওয়ার অন্তত আশি বছর পূর্বে শাহ সগীরের 'যুসুফ-জলিখা' রচিত হয়েছি। তারপর জৈনুদ্দীনের 'রসুলবিজয়' রচিত হয় সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৪৭-১৪৮১) শাসনকালে। অতঃপর উল্লেখযোগ্য কবি সারিবিদ খান লিখেছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুল বিজয়', 'হানিফা ও কয়রাপরী'। সারিবিদ খাঁ যে সংস্কৃত ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর নাট্য কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'-এর প্রত্যেকটি প্রস্তাবের গোড়ায় সংস্কৃত শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ের আভাস দান থেকেই প্রমাণিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়, তেরো শতক থেকে আঠারো শতকের ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল হিন্দুদের মঙ্গল কাব্যের ধারা নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিজয়কাব্য নামে কয়েকখানি কাব্যের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দুটি মৌলিক ধারাই ছিল হিন্দু কবিদের অবগাহন-ক্ষেত্র—মঙ্গলকাব্যের ধারা ও বৈষ্ণব কাব্যের ধারা। বৈষ্ণব কাব্য একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাবের বাহন, কিন্তু মঙ্গলকাব্য আত্মনিরপেক্ষ ও বস্তুধর্মী।

৪৬. A Survey of Indian History, K.M. Pannikar, p 132.

www.pathagar.com

> বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুকাল পর পর্যন্তও মঙ্গলকাব্যই ছিল এদেশের উচ্চতর হিন্দু সম্প্রদায়ের কবি প্রতিভা বিকাশের একমাত্র অবলম্বন।[৪৭]

ব্রতকথা ও পাঁচালি মৌখিক ধারা অবলম্বন করে অগ্রসর হলেও তাদের সমৃদ্ধি হয় নি। তাছাড়া হিন্দু উচ্চতর বিদগ্ধসমাজের দ্বারা আদৃত না হওয়ায় এ দুটি সাহিত্যের পর্যায়ে মর্যাদাসিক্ত হয় নি।

আরও একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের কোনো হিন্দু কবি মঙ্গল কাব্যে বা পদ কবিতায় কোনো মুসলমানি উপাখ্যান বা ধর্মসম্পর্কিত কোনো বিষয়ের আলোচনা করেন নি। সাহিত্যের এই 'ছুঁতমার্গ' ধারাটি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও অব্যাহত আছে। অবশ্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কিন্তু সনাতন ধারার অনুসরণ প্রায় নিষ্ঠার সঙ্গেই হয়ে আসছে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা হিন্দুদের থেকে বহুলাংশেই স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

> মুসলমানের ধর্মীয় উদারভাব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই তাকে সাহিত্য সাধনার পথেও বিচিত্রগামী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৪৮]

মুসলমান কাহিনী কাব্য লিখতে বসে মুসলিম কাহিনীকাব্য তো লিখেছেই অজস্র ধারায়, হিন্দু কাহিনীকাব্য 'মধুমালতী' ও 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছে প্রথম যুগ থেকে। ধর্মীয় কাব্য লিখতে বসে 'শরাশরীয়ত'-সংবলিত কাব্য লিখেছে; মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্য লিখেছে এবং হিন্দুর 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যও লিখেছে। মর্সিয়া বা শোকগাথা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র এমনকি সংস্কৃতি-সমন্বয় সঞ্জাত কাব্য লিখতেও মুসলমানের সংকোচ জন্মে নি। আর পদাবলী কবিতা রচনায় প্রায় শতাধিক মুসলিম কবির নাম এ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে এবং তাঁদের পদাবলী সংগ্রহে একাধিক মুসলমান ও হিন্দু গবেষক আত্মনিয়োগ করেছেন। *সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা দেখা যায়, আহমদ শরীফের 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' সংকলনে।*[৪৯] এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মুসলমান কবিদের উদার মনোভাবের পরিচয় ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রসাদগুণে হৃদয়-মন শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে ভরে ঠে।

মুঘল শাসন আমলেও মুসলমান কবিদের বাংলা ভাষায় সাধনা অব্যাহত ছিল এবং তাঁদের অকৃপণ দানে ভাণ্ডার সমৃদ্ধ উঠেছিল। সুদূর আরাকানে বা রোসাঙ্গ রাজসভাতেও মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে অমৃতময় ফসল আহরণ করেছেন :

---

৪৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য (৪র্থ সং), ১৭ পৃ.।
৪৮. মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য—মুহম্মদ এনামুল হক, ১০৫ পৃ.।
৪৯. মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য—আহমদ শরীফ : সাহিত্য পত্রিকা : ১৩৬৭ বর্ষা সংখ্যা।

www.pathagar.com

এই মুসলমান কবিগোষ্ঠী ভাষারীতি ও উপমা প্রয়োগের দিক দিয়া সংস্কৃতানুসারী প্রাচীন কাব্যধারার অনুবর্তন করিলেও ধর্ম প্রভাব মুক্ত প্রণয়কাহিনীর প্রবর্তনে ইঁহারা নতুন বিষয়বস্তু ও আখ্যানভঙ্গির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বলিতে গেলে প্রণয় রোমান্সের বর্ণ বৈভব ও চমকপ্রদ সংঘটন ইঁহারাই প্রথম বাংলা কাব্যে আনয়ন করিয়াছেন।[৫০]

তাঁদের মধ্যে দৌলত কাজী ও আলাওল মহাকবির মর্যাদায় উন্নীত এবং শতাব্দী পরেও তাঁদের নাম বাংলা সাহিত্যের দিকপাল হিসেবে সর্বজনবন্দিত। 'দৌলত কাজী (অ.১৬০০-১৬৩৮) শুধু বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর কবিত্বশক্তি অসাধারণ, তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্যানুভূতি তীক্ষ্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। বাংলা ও ব্রজবুলি—এই উভয়বিধ ভাষায় তাঁর ক্ষমতা তুলনাবিহীন।[৫১]

মহাকবি আলাওল (১৬০৭-১৭৮০) সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। আলাওল বহু ভাষাবিদ ও সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভাবসম্পদে, রচনা পারিপাট্যে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং কবিতা-সৃষ্টি অজস্রভাবে মধ্যযুগের খুব কম কবিই তাঁর সমকক্ষতার যোগ্য।

মুঘল আমলকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। তখন কৈশোরের জড়তা কাটিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যৌবনের দৃপ্ততেজে বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত ও মহিমাণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ যুগে সৃষ্টিকর্মের বিশালতায়, বিষয় বৈচিত্র্যে ও মননশীলতার উচ্চ কোটিতে আরোহণ করে বাংলা সাহিত্য হয়েছে সর্বভারতীয় ভাষাগুলোর শ্রেষ্ঠতম। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রাচ্যের ফরাসি ভাষা ফারসার ভাষা সম্পদের সঙ্গে বাংলাভাষী মুসলমানদের আরও নিবিড় ও আন্তরিক যোগ সাধিত হওয়ার কল্যাণে। ক্লাসিক ভাষাসমূহের মধ্যে ভাবের ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যের প্রসাদগুণে ফারসি ভাষা বিশ্ববিদিত। একথা অনস্বীকার্য, মুঘল আমলে ফারসি রাজভাষা হওয়ার কারণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয় ও শিক্ষণীয় ভাষা ছিল এবং উনিশ ও বিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের বাসিন্দারা যতখানি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার চর্চা করে আসছে, মুঘল শাসন আমলে ফারসিরও তেমনি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার আসন ছিল। কিন্তু ফারসির চর্চা বাংলা ভাষাকে কোণঠাসা করে ফেলেনি। বাংলাভাষী মুসলমানরা ফারসির ভাবসম্পদকে উজারভাবে আত্মসাৎ করে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিসাধন করেছে, বিচিত্রভাবে বাংলা সাহিত্যকে উন্নত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ সুলতান বিভিন্ন পথে কাব্যসাধনা করে বাংলা ভাষাকে বিচিত্রগামী করে তুলেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠতম ও একালের বৃহত্তম কবিকীর্তি 'নবী-বংশ'। বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিপুলাকারে এখানি সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেও হার মানায়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যজগতের এখানি

৫০. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৪র্থ সং) পৃ. ১৬।
৫১. মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য—২৪১ পৃ.।

www.pathagar.com

মধ্যমণি। মুসলিম ধর্মসম্পর্কিত কাহিনী ও প্রেমোপাখ্যান রচনার এটি ছিল স্বর্ণযুগ। ইসলামি শরাশরীয়ত, সৃষ্টিতত্ত্ব, মর্সিয়া, ঐতিহাসিক কাহিনী, রূপক কাহিনী পদাবলি, মারফতি, রাগমালা, ধ্যানমালা প্রভৃতি বিষয়ে সাহিত্য রচনায় এ যুগের মুসলমান কবিরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কালের কবলে এসব মহৎসৃষ্টির অনেকাংশই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যে সম্পদ আজও অবশিষ্ট আছে, তারও সযত্ন সংগ্রহ ও সম্যক মূল্যায়ন হচ্ছে না অনুসন্ধিৎসা ও সহৃদয়তার অভাবে।

মুসলমানি শাসন আমলের সাড়ে পাঁচ শ বছরে বাংলাভাষী মুসলমান কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের কী বিপুল সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল এবং আহৃত ভাবসম্পদের কী আশ্চর্য সমারোহ, তার কিছুটা পরিচয় আমরা পেলাম। আফসোস এই যে, এই সুবর্ণ ফসলের দিকে মোটেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। আমাদের অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, মুসলমানরা বাংলা ভাষার চর্চা করে নি এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের কোনো দান নেই। মুসলমানের উচ্চশ্রেণী আরবি-ফারসিরই চর্চা করেছে এবং তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকেছে ইরান-তুরানের দিকে, হেজাজ-মিসরের দিকে এবং আরবি-ফারসি-উর্দুর চর্চা করাই জীবনের কাম্য ভেবেছে, বাংলা ভাষার দিকে কখনো তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। এ ধারণা কত মিথ্যা, কত অসার উপরের আলোচনা থেকেই তা প্রতিপন্ন হবে।

আসলে আমাদের অনুসন্ধিৎসা নেই। আমরা নিজেরা পরিশ্রম করে, সাধনা করে আমাদের পূর্বপুরুষের মনমানসের তথা জীবনচর্চার কোনো সংবাদ নিই না, পরিশ্রম স্বীকার করে তাঁদের সমাহৃত সম্পদের খোঁজ করি না, লোকচক্ষে সেসবের মূল্য তুলে ধরি না। নব্য বাবু কালচারের গুরুমশায়রা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন

> 'যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা বাংলা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসির চালনা করিবেন, ততদিন জাতীয় ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা'।[৫২]

অমনি আমরা হাত-পা ছুড়ে অবোধের মতো বিলাপ করতে শুরু করেছি, আমাদের পূর্বপুরুষরাই আমাদের সর্বনাশটা করে গেছেন,

> 'নিজেদের অভারতীয় ভেবে ও বিদেশি বলে জাহির করবার প্রবণতা থেকে বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দ কৃত্রিমভাবে আমদানি করে তাকে ধর্মশালায় পরিণত করার তাড়না' করে গেছেন।[৫৩]

তার ফলেই 'জাতীয় ঐক্যের' সাধনা করি নি। কিন্তু গুরুমশায়দের প্রচারণাকে বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ না করে যদি পরিশ্রম স্বীকার করে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খোঁজ নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, সে প্রচারণা কতদূর মিথ্যা ও বিদ্বেষদুষ্ট।

---

৫২. বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি : সাহিত্যসাধক চরিতমালা ২৮-২৯ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৫।
৫৩. মুসলিম সংস্কৃতি—বদরুদ্দীন উমর, পূর্বমেঘ ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

মুসলমান কখনো নিজেদের অভারতীয় বা বিদেশি ভাবেনি এবং বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি-ফারসির কৃত্রিমতা আমদানি করে ভাষাটাকে বা এদেশটাকে 'ধর্মশালায়' পরিণত করার স্বপ্ন দেখেনি। মুসলমানরাই বাংলা ভাষার চর্চা করেছে উদার দৃষ্টি নিয়ে এবং বিচিত্রপথে তার বর্ণনা করেছে, তাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ যুগের যে বিপুল সাহিত্য সম্পদের কথা বলা হলো, সেসব 'আরবি-ফারসি কণ্টকিত' নয়, অবিমিশ্র বাংলা ভাষাতেই রচিত। আমাদের আরও একটি দোষ, গুরুমশায় না শিক্ষা দিলে আমরা আমাদের ভাণ্ডারের দিকেও তাকাইনে, তার মূল্যায়ন করিনে। আলাওলকে মহাকবি না বলে দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ নিইনি, লালন শাহকে পরিচিত করে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর মর্যাদা করতে শিখিনি। এ আত্মবিস্মৃতি ও জড়তা না কাটলে হীনমন্যতা ব্যাধিও কাটবে না। মধ্যযুগের হিন্দু সাহিত্যিকদের গুটিকয়েক মঙ্গলকাব্য নিয়ে গবেষণা করে বিরাট বিরাট মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচিত হতে পারে, অথচ শত শত বাংলাভাষী মুসলমানের রচিত বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্যের একটা তালিকা প্রস্তুতের পরিশ্রম স্বীকার করারও সাধ্য আমাদের নেই। পল্লবগ্রাহিতা ত্যাগ করে ও গুরুমহাশয়দের শেখানো বুলি চর্বিতচর্বন না করে নিজের সম্পদকে না চিনলে আমাদের কল্যাণ নেই। এ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা হবে এবং দেখানো প্রচেষ্টা হবে 'জাতীয় ঐক্য' সাধনায় মুসলমানের কী দান আছে, অথচ কীভাবে স্বার্থান্ধরা তাকে সংশয়িত করে জাতীয় ঐক্যের মূলে কুটারাঘাত করেছে।

পুঁথিসাহিত্য

পণ্ডিতদের মতে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর পর প্রায় একশতাব্দী কাল এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে শূন্যতা বিরাজ করছিল। জাতির এরকম মানসিক দেওলিয়া অবস্থায় কবিগানের প্রচলন হয়, কতকটা মধুর অভাবে গুড় দিয়ে লোকের সংস্কৃতি পিপাসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। এসম্বন্ধে দুটি অভিমত উদ্ধৃতির যোগ্য বিবেচনা করি :

> 'বাংলাদেশের এক কালের রাজনীতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় সাহিত্যক্ষেত্রে যখন শূন্যতা বিরাজমান তখনই কবিগানের প্রচলন হয়। আনন্দের অন্য কোনো সাহিত্য সম্পদ যখন ছিলো না, তখনই সাধারণলোক সমভাবে কবিগান নিয়ে মেতে উঠল। ... ইংরেজ আমলে শিল্প ও সাহিত্যের আনুকূল্য করবার লোক যখন রইল না, তখন পূর্বতন জমিদারদের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বিলাসী সন্তানরা কবিওয়ালার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হলো। অরুচিকর এবং অশ্লীল কাব্যেই এদের প্রধান আনন্দ ছিলো। এদের দ্বারাই আঠারো শতকের শেষভাগে এক বিকৃত রুচিপূর্ণ নাগরিক সংস্কৃতি কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।[৫৪]

৫৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান), পৃ. ৩৩-৩৪।

www.pathagar.com

> (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে) জীবনের নিশ্চিন্ত অবসরের দিন চলে গিয়েছে। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে এল প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম আর যাঁরা অলস অবসরে মঙ্গলকাব্য শুনবেন, তাঁদের দুর্দশাও চরমে এসে পৌঁছল। ... জমিদারদের প্রতিপত্তিকে নিজেদের মতো করে ফিরিয়ে আনলো। এইসব দেওয়ান ও বেনিয়ানদের অর্থ সঞ্চিত হতে থাকলে সমাজের সংস্কৃতি রক্ষার ভার তাঁদের হাতেই চলে গেল। ... ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন কৃষিবঞ্চিত নীচু শ্রেণীর একদল ব্যক্তি কোম্পানির প্রাসাদপুষ্ট ধনীদের সন্তোষ বিধানে কবিগানের প্রবর্তন করেন।[৫৫]

অতএব দেখা যাচ্ছে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলছেন, আঠারো শতকের শেষাংশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির শূন্যরাজ্যে এবং প্রাণহীন কাব্যচর্চার পটভূমিকায় কবিগানের রূপবন্ধে বিত্তবান সম্প্রদায়ের স্থূল রস-পিপাসা চরিতার্থ হয়েছিল। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, এ যুগের প্রতিভূ ছিলেন 'সংবাদ-প্রভাকর' খ্যাত ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি গ্রাম্য পাঁচালি ও শহরে কবিগান থেকে আপন বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। এজন্য তিনি কবিগানের অমার্জিত উত্তরাধিকার অস্বীকার করেন নি—তিনি নিজেও ছিলেন কবি ও আখড়াই গানের বাঁধনদার। কবিগানের এভাবে মূল্যায়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় :

> বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের স্থান। ইহা এক নতুন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নতুন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প। হঠাৎ একদিন গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও একসময় বঙ্গ-সাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।[৫৬]

একথা অনস্বীকার্য যে, ১৭৬০ সালে ভারত রায়গুণাকরের মৃত্যুর পর ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত কোনো প্রতিভাবান হিন্দু কবি বা সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নি। পলাশীর পর দেশে যে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক বিপ্লব চলেছিল, সে সময় বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান শ্রেণীর লোকেরই প্রাধান্য বর্ধিত হয় এবং কোম্পানির প্রসাদ-পুষ্ট এই হঠাৎ বাবুদের অর্থকৌলীন্য থাকলেও মার্জিত রুচি বা শালীন মন-মানস ছিল না; সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা দূরে থক, তার ধারা অমলিন রেখে বহন করার মন-মেজাজও তাদের গঠিত হয় নি। এজন্য এই বাবুশ্রেণীর নতুন কালচার জন্মলাভের প্রাক্কালে তাদের স্থূল রুচির পরিচর্যার্থে কবিগান ও হাফ-আখড়াই গানের প্রবর্তন হয়েছিল এবং এই বিকৃত রুচির স্থূল সংস্কৃতির জের চলেছিল ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকাল পর্যন্ত, যদিও ইতোমধ্যে বাংলা গদ্যের নির্মাণ হয়েছে এবং 'নবজাগরণের' বন্যায় বাবু কালচার তথা সাহিত্যও অনেকখানি ভূমি অধিকার করে নিয়েছে।

---

৫৫. ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবিজীবনী-ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

৫৬. লোকসাহিত্য (কবি সংগীত)—রবীন্দ্রনাথ; পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

কথাটা আরও খোলাসা করে বলা যাক। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উনিশ শতকে নবজাগরণ বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমান সমাজকে বাদ দিয়ে হয়েছিল এবং কলকাতাবাসী এক বিশেষ বর্ণ হিন্দুগোষ্ঠীর—যাদের 'হঠাৎ-বাবু' বলেই নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা যায়—মধ্যেই সীমিত ছিল। নবজাগরণের এই বৈতালিক শিক্ষিত সম্প্রদায়—যাদের অধিকাংশই ছিল মধ্যবিত্ত—ইংরেজ শাসকের শোষণকারীর ভূমিকাটা আদৌ লক্ষ করে নি, কিংবা লক্ষ করলেও পরোক্ষ সমর্থনকারী ছিল। কারণ ত্রাণকর্তারূপে ইংরেজ শাসকের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল অসামান্য; এমনকি ঈশ্বরগুপ্তের মতো স্বদেশপ্রেমীরূপে কীতিত কবিও মিউটিনির সময় ব্রিটিশের জয় কামনা করে পদ্য বেঁধেছিলেন 'দিল্লীর যুদ্ধ' বিষয়ে—'মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।'

এবং একথাটিও নিঃসন্দেহ যে, ইংরেজের মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই উনিশ শতকে নব্যবাবু শিক্ষিত সম্প্রদায় চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন, তার ফলে রেনেসাঁসুলভ বহু গুণ-বৈশিষ্ট্য সেদিন তাঁদের সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার বা 'ইয়ং বেঙ্গল'-খ্যাত সভ্যগণ নিঃসন্দেহে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রমূর্ত প্রতীক। সমকালীন গ্রন্থাদিতে ও পত্র-পত্রিকাসমূহে তাঁদের নবীন মানসিকতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু নব্য বাবু কালচারের এই উজ্জ্বল দিকটার পাশাপাশি কালো দিকটাও সমানভাবে বিরাজমান ছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রবল ব্যক্তিত্ব বা ধীশক্তি যতখানি সত্য, ততখানিই সত্য ভবানীচরণ-ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিক্রিয়াশীল ও অমার্জিত প্রাচীনপ্রিয়তা। সাহিত্য প্রসঙ্গে বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্য-রুচির দুটি সুস্পষ্ট মেরু-বিপরীত ধারা প্রবহমান ছিল।

> রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের জ্ঞানবিতরণী গ্রন্থসমূহের সঙ্গে 'নব বিবিলাস', 'দূতীবিলাস', 'রসতরঙ্গিণী' প্রভৃতির মতো কামায়ন পর্যায়ের গ্রন্থগুলোও নব্য বাবুমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[৫৭]

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাশে 'সম্বাদ-রসরাজ'-এর মত হীনরুচির পত্র-পত্রিকার অশ্লীলতায় বাবু শ্রেণীর কম আগ্রহ ছিল না।

> 'একদিকে যেমন রামমোহন ও তাঁর বিরোধীদল তর্কবিতর্কের দ্বারা বাংগালীর বহুকাল সুপ্ত ধীশক্তিকে খরতর করিয়া তুলিতেছিলেন ... ঠিক তেমনি আবার তাহার পাশে সমান্তরাল রেখায় আদিরসের পূতিগন্ধ দূষিত পঙ্কস্রোতও বহিতেছিল'।[৫৮]

সামাজিক ক্ষেত্রে অপব্যয় ও দুর্নীতি কতখানি ছিল তার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকায় ১৮৫৫ সালে আক্ষেপ : 'কেহ কোনো সৎকর্মানুষ্ঠানার্থে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাঁহারা স্বীয় বারাঙ্গনা ও সুরাসেবন প্রভৃতি উপলক্ষে

---

৫৭. ১৮১৫-৫৫ সালের পুস্তকাদির ক্যাটালগ—লং সাহেব সংকলিত।
৫৮. উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩২।

www.pathagar.com

দিনদিন অকাতরে ব্যয় স্বীকার করেন'। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ১৮৩০ সালে নদীয়ার রাজা ঈশ্বচন্দ্র বানারের বিবাহে এক লক্ষ টাকা খরচ করেন। নবকৃষ্ণ রাজা উপাধি গ্রহণ করে মাতৃশ্রাদ্ধের উপলক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করেন।

এই ছিল নবজাগরণের প্রাক্কালে ও প্রভাতকালে নব্য বাবু সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির আসল রূপ। কিন্তু এই নবজাগরণের মন্ত্র যাদের বাদ দিয়ে উদ্‌গীত হয়েছিল, সেই বাঙালি মুসলমান সমাজ নবজাগরণের বহির্ভূত থেকেও আর একটি সাহিত্র সৌধ নির্মাণ করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পিপাসা চরিতার্থ করেছিল প্রায় দেড় শ বছরেরও উপর—আঠারো শতকের শেষার্ধও সারা উনিশ শতকে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সাহিত্য ভদ্র বাবু সমাজের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় হিসেবে 'বটতলার সাহিত্য' নামে নির্দেশিত হয়েছে; আমরাও বাবু মশায়দের অনুকরণ করে সে সাহিত্যকে মর্যাদা দিইনি এবং আজও তার যথার্থ মূল্যায়নে উদাসীন রয়েছি।

এই সাহিত্যকে আধুনিককালে পুঁথিসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এ সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁদের দুজন মালে মুহম্মদ ও মুহম্মদ দানিশ এ সাহিত্যের রীতিকে বলেছেন 'চলিত বাংলা' এবং রেজা উল্লা (১৮৬১) বলেছেন 'এসলামী বাংলা'। ১৮৫৫ সালে পাদ্রি লং তাঁরা গ্রন্থতালিকায় এ ভাষাকে বলেছেন 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য'। এ সাহিত্যের প্রতি হান্টার সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৮৭১ সালে এবং এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন,

> আজ পর্যন্ত ব-দ্বীপ অঞ্চলের কৃষক-সমাজ মুসলমান। নিম্নবঙ্গে ইসলাম এতই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এটি এক নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে। হিরাতের ফারসি ভাষা থেকে উত্তর-ভারতের উর্দু যতখানি পৃথক, 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত এই উপভাষাটি উর্দু হতে ততখানি পৃথক।[৫৯]

'মুসলমানী বাংলা' কথার একটা ইতিহাস পাওয়া গেল। উল্লেখযোগ্য, মুসলমান লেখকদের লিখিত এই শ্রেণীর পুঁথিগুলো যখন একশ্রেণীর মুসলমান প্রকাশক প্রথম প্রচার করতে থাকেন, তখন তাঁরা এর নাম দিতেন 'সহি বড় ... পুঁথি' এবং এভাবে হাতেলেখা 'কলমী-পুঁথি' থেকে এগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতেন। সাধারণ্যে আর একটা নামও শোনা যেত। মুসলমানি আমলের অবিমিশ্র বাংলায় রচিত পুঁথি থেকে মিশ্র আরবি-ফারসি ভাষা রীতিতে লিখিত পুঁথির পার্থক্য বোঝানোর জন্যে মিশ্রীতিতে লিখিত পুঁথিগুলোকে বলা হতো 'দোভাষী পুঁথি'। 'এই নাম কবে চালু হলো, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না—তবে মুনশি রিয়াজউদ্দিন আহমদ ও মীর মশাররফ হোসেনকে 'দোভাষী পুঁথি' কথাটি যেভাবে ব্যবহার করতে দেখি, তাতে মনে হয়, উনিশ শতকের শেষ দশকেও তা নিত্য উচ্চারিত নাম।

---

৫৯. Indian Musalmans, p 146. উল্লেখযোগ্য যে, হান্টার সাহেব 'নিম্নবঙ্গ' বলতে হুগলী, হাওড়া, চব্বিশপরগণা ও সমগ্র পূর্ববাংলা বা বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানকে বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

অবশ্য পাদরী লং-এর নাম দিয়েছিলেন 'মুসলমানী বাংলা'। ক্রমহার্ট, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ মৃত ও জীবিত অমুসলমান বিদ্বানেরা এই নামেই এ রীতির উল্লেখ করেছেন, আজো করেন"।[৬০]

আজাদি উত্তর কালে কলকাতায় 'আজাদ' পত্রিকা অফিসে যে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গড়ে উঠে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে, তাঁরা আধুনিক রীতির বাংলা সাহিত্য থেকে দোভাষী পুঁথির পার্থক্য নির্দেশ করতে 'পুঁথিসাহিত্য' নামটি চালু করেন। আমরা অতঃপর পুঁথিসাহিত্য নামেই আলোচ্য সাহিত্যরীতিকে উল্লেখ করব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এনামুল হক আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুসলমান কর্তৃক সামগ্রিক বাংলা সাহিত্য সাধনার নামকরণ করেছেন 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য'।

মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের মানসিংহ-জাহাঁগীর আদির কথোপকথনে মিশ্ররীতির বাংলা ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই অনেকের অনুমান, ভারতচন্দ্রই মিশ্ররীতি বাংলার স্রষ্টা। এ অনুমান নির্ভুল নয়। প্রথমত, ভারতচন্দ্র স্বেচ্ছায় বা প্রীতির বশে মিশ্ররীতি ব্যবহার করেছেন মনে হয় না। তিনি তো বলেছেনই, 'মানসিংহ পাদশার হইল যে বাণী; উচিত সে ফারসি আরবি হিন্দুস্থানী; কিন্তু কেবল আরবি-ফারসি হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহৃত হলে সকল লোকের বোধগম্য হবে না এবং তাতে 'না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল'। 'তাই কহি ভাষা আমি যাবনী মিশাল।' দ্বিতীয়ত, মিশ্রিত রীতির ভাষা ব্যবহারে প্রচুর রসসৃষ্টির সম্ভাবনাও তিনি অনুভব করেছিলেন, এজন্য এ সুযোগ তিনি ত্যাগ করেন নি। কারণ কবি হিসেবে এ প্রত্যয়ে তিনি দৃঢ় ছিলেন 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' ভারতচন্দ্রের পূর্বেও কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গলে, বিদ্যাপতি পদাবলিতে মিশ্ররীতি ব্যবহার করেছিলেন।

প্রকৃত কথা এই যে, বাংলা ভাষায়-আরবি ফারসি শব্দের প্রচলন মুসলিম যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল; ইসলামি কাব্য রচনায় ধর্মীয় বিষয় ও মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহারকে স্পষ্ট করার জন্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হতো। অতি প্রাচীন কবিতা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-তেও মুসলমানের অতি প্রচলিত ধর্মীয় শব্দসমূহের একটা ইসলামি পরিবেশের রূপ ফুটে উঠেছে। তাছাড়া রাজভাষা ফারসি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কথ্যভাষাতে বহু ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হতো। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড সাহেব বলেই ছিলেন, 'এযুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে অজস্র আরবি-ফারসি বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।' আমরা প্রথমেই দেখিয়েছি, ১৭৩৪ সালে ম্যানুয়েল সাহেব 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক যে পুস্তক রচনা করেন, সেটি 'আরবি-ফারসি কণ্টকিত' হলেও ভাওয়ালের জীবন্ত ভাষায় রচিত ছিল। তাছাড়া চিঠিপত্রের ভাষাতে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত

---

৬০. পুঁথির ফসল—আহমদ শরীফ, পৃ. (ক) + (খ), সুকুমার সেনের 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হতো। হিন্দুর সত্যনারায়ণ পাঁচালিতে, মুসলমানের মর্সিয়াতে, তাজিয়ার উৎসবকালে আরবি-ফারসি শব্দের অবাধ ব্যবহার হতো। আদালতে ফারসি ভাষা ব্যবহৃত ছিল এবং তার দরুন আদালত-মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় শব্দের আরবি-ফারসি রূপ নিরক্ষর গ্রামবাসীদের অতিপরিচিত ছিল। মিশ্ররীতির কথাবার্তার ব্যাপক প্রচলন ছিল শহর ও বন্দর এলাকায়। ঢাকা ও পরে মুর্শিদাবাদ সুবাহদারের রাজধানী হওয়ায় এ দুটি শহরে এবং তাদের পার্শ্ববর্তী শহরেও আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত মিশ্রভাষা মার্জিত লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হতো। বন্দর ও ব্যবসায় কেন্দ্রসমূহে যারা ক্রয়-বিক্রয় করত, তাদেরও ভাষা ছিল নিঃসন্দেহে আরবি-ফারসি শব্দবহুল। এভাবে ভারতচন্দ্রের বহু পূর্বেই মিশ্ররীতির বাংলার প্রচলন ছিল এবং তার একটা সাহিত্যিক রূপও গড়ে উঠেছিল।

এই মিশ্ররীতির বাংলা ভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদণ্ড হলো রাজদণ্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পিবাহক মিশনারিরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষার মোড় পরিবর্তন করে। তার দরুন যে বিরাট সম্ভাবনাটার সূত্রপাত হয়েছিল, সেটা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোটাকেও নতুন ছাঁচে তৈরি করে দিলেন বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হলো যে ভাষায়, তা কেবল সংস্কৃতঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। আর এটিও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়—হিন্দু পণ্ডিতরা উল্লসিত হলেন তার দরুন সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নবপ্রবর্তনের সম্ভাবনায় এবং মিশনারিকুল তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কালচারের দিক দিয়েও নিঃস্ব করে দিতে।

কিন্তু বিতাড়িত বিজিত বাংলার মুসলমান একেবারে সাংস্কৃতিক শূন্যতায় ডুবে যায় নি। তাকে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিতাড়িত করার ফলে সে যেমন গ্রামীণ শান্তি খুঁজতে চাইল, সেই রকম আপন-সৃষ্ট মুসলমানি বাংলা ভাষাতেও সাহিত্যচর্চা করে মনের দিক থেকে সান্ত্বনা খুঁজল। এজন্যই পাই, এ কালে শত শত মুসলিম শায়েরের নাম ও হাজার হাজার পুঁথি। শাহ গরিবুল্লাহর (১৭৬০-৮০) প্রতিভার বলে ও পরিচর্যার প্রসাদগুণে পুঁথিসাহিত্যের হলো বহুল প্রচলন ও অসম্ভব জনপ্রিয়তা; তাঁর সবকয়টি পুঁথিই দোভাষীরীতি বাংলায় রচিত। তাঁর কৃতিত্ব শুধু নতুন রচনাশৈলীর প্রবর্তনেই নয়, ইসলামের উন্মেযুগের কাহিনী অবলম্বনে কাব্যসৃষ্টির প্রথারও তিনি পথপ্রদর্শক। তাঁকে অনুসরণ করেন সৈয়দ হামজা (১৭৮৮-১৮০০)। আয়তনের দিক দিয়ে এবং মহাকাব্যের বিস্তৃতি ও গাম্ভীর্য গুণে সৈয়দ হামজার কাব্যগুলো সুখপাঠ্য। সৈয়দ হামজা অবিমিশ্র রীতিতে 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন। তারপর মালে মুহম্মদ, জনাব আলী, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ দানিশ প্রভৃতি আড়াই শ শায়েরের নাম ও তাঁদের রচিত প্রায় দশ হাজার পুঁথির নাম পাওয়া গেছে। এসব পুঁথির আকার অতি ক্ষুদ্র কয়েক পৃষ্ঠ থেকে

www.pathagar.com

বিপুলাকার কয়েক খণ্ডের মধ্যে বিস্তৃত। ধর্ম, ইতিহাস, যুদ্ধবিগ্রহ, জীবনী, প্রেম, কল্পনা প্রভৃতি পুঁথিসাহিত্যের উপজীব্য।

এই বিরাট পুঁথিসাহিত্যের মূল্যায়নে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী একেবারে উদ্যত খড়্গ। পুঁথিসাহিত্যের নামোচ্চারণেই তাঁদের উন্নাসিকতা প্রখর হয়ে ওঠে; সাহিত্যের পর্যায়েই স্থান দিতে তাঁদের অস্বীকৃতি। যেহেতু এ সাহিত্য 'আরবি ফারসি কণ্টকিত' অতএব রসবিবর্জিত ও প্রাণহীন। আরবি-ফারসি শব্দবহুল হিসেবে ছুঁতমার্গগামী পণ্ডিতদের অনুসরণ থেকেই এ সাহিত্যের ওপর প্রাথমিক বিতৃষ্ণা জাগ্রত হয়েছে, সহৃদয় অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিচার করা হয় নি, এ ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য।

> আরবি-ফারসি শব্দবহুল হলেই রসবিবর্জিত হয় না—এ উক্তি ভারতচন্দ্রের। আবার 'বাংলা সাহিত্য থেকে আরবি ও ফার্সি শব্দ বহিষ্কার করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না'—এ উক্তি বীরবলের।[৬১]
>
> তবু মর্মান্তিক সত্য এই যে, রবীন্দ্রনাথও বাংলা সাহিত্যে 'খুন' দেখে আঁতকে উঠেন,[৬২]
>
> এবং নজরুল ইসলামকে 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' বলে খেদোক্তি করতে হয়।[৬৩]

এবং বীরবলের মতো জাঁদরেল ব্যারিস্টারকেও রবীন্দ্রনাথকে 'ডিফেন্ড' করার জন্যে 'বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলায়' অবতীর্ণ হতে হয়।

এর কারণ বোধ হয় যে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সরস্বতীর কমলবনে আরবি-ফারসি শব্দ দেখেই আমিষের গন্ধ অনুভব করেন এবং ষাঁড়ের লালরঙ দেখার মতো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। অথচ তাঁরা এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাংলার মুসলমানের জন্মগত অধিকার। অতএব তার জন্মগত অধিকার আছে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এ ভাষার মাধুর্যবৃদ্ধি করবে, আপন মন-মানসের অলঙ্কারে, উৎপ্রেক্ষায় তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। এই সহজ সত্যটা গায়ের জোরে অস্বীকার করার ফলেই রবীন্দ্রনাথকেও বাংলাসাহিত্যে 'খুনোখুনি' ব্যাপারে নামতে দেখা যায়। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

আরও একটি কারণ হলো ইংরেজ মিশনারিদের কল্যাণহস্তে সংস্কৃতসমাজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে বাবু কালচারের বোধন হয়েছিল, সেই শ্বেতবর্ণ গুরুমশায়দের শিক্ষার দোষেই বাংলা সাহিত্য থেকে আরবি-ফারসি শব্দের নির্বাসন বিধি প্রবর্তিত হয়েছিল। এসব গুরুমশায়ের প্রসাদপুষ্ট বর্ণহিন্দুজাতি সাত শ বছরের আত্মীয়তাও ভুলে গিয়ে গুরুবাক্যকে বেদবাক্য হিসেবে পালন করে আসছে; বাংলা সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিভোজে মুসলমানকে পাত পাততে দেওয়া হচ্ছে না তার মুসলমানিত্ব স্বীকার করে।

---

৬১. বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা—বীরবল : নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত, ৬৫৯ পৃ.।

৬২. রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড (বিশ্বভারতী সং), ৪৯২ পৃ.।

৬৩. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২২।

www.pathagar.com

পুঁথিসাহিত্য যে প্রাণহীন নয় তার বড় প্রমাণ হলো, দু শ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নরনারীর প্রাণে এ সাহিত্য তরঙ্গ তুলেছে পদ্মার ঢেউয়ের মতো। এত দীর্ঘকাল যে সাহিত্য এত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মন-মানসকে আবর্তিত করেছে, তাদের চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তার প্রাণশক্তি কতখানি, সহজেই অনুমেয়।

> 'মুসলমানী সাহিত্যের গল্পভাণ্ডারও নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। 'আরব্য উপন্যাস', 'হাতেম তাই', 'লায়লা মজনু, 'চাহার দরবেশ', 'গোলে বকাওলী' প্রভৃতি আখ্যায়িকাগুলো নিশ্চয়ই বাঙালি পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তিত-পূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগৎ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ... উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল ... তখন এই শ্রেণীর মুসলমানী গল্পের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। উহারা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ ও রুচি আকর্ষণ করিতে না পারিলে আমাদের সাহিত্যিক উদ্যমের একটা মুখ্য অংশ কখনোই উহাদের অনুবাদে নিয়োজিত হইতে পারিত না। অন্তত এই সমস্ত গল্পের মধ্যে একটা চমকপ্রদ (Sensational), বর্ণবহুল (romance), একটা নিয়ম, সংযমহীন সৌন্দর্য-বিলাসের অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, তাহাই আমাদের এক শ্রেণীর ধর্মশাস্ত্রাস্বাদক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত রুচিকে অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করিয়াছিল'।[৬৪]

পুঁথিসাহিত্য বিরাট জনগোষ্ঠীর; পুঁথি-রচয়িতারা লোকসভার কবি। ড্রয়িংরুম অভ্যস্ত বৈদগ্ধ্যাভিমানী স্বল্পসংখ্যক মানুষের কবি নন। পরিশীলিত মানসের শিল্পরুচি কিংবা উচ্চ ও সূক্ষ্ম জীবন জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ মেলে না তাঁদের রচনায়— এমন দুঃখও কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু একথা কী করে ভুলি যে, 'শিল্পরুচি', 'জীবন জিজ্ঞাসা' এসব গালভরা কথার আপেক্ষিক অর্থ হয়; যার দ্বারা বহুর মন-মানসের তরঙ্গ ওঠে, তা নিশ্চয়ই তাদের মন ও মেজাজের পরিচর্যাকারী এবং যার দ্বারা সমষ্টির জীবন ও লৌকিক মানস তৃপ্তি পেল, তাকে রুচি বিগর্হিত বললে উন্নাসিকতা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু মানবিকতার অসম্মান করা হয়।

> 'মুসলমানী কাব্য কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আছে সুফি মতবাদের প্রভাব ও ছদ্মবেশী রূপকাভিপ্রায়; ও ইহার ঘটনাবলিও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিবিম্ব নহে; জীবনোদ্ভূত এক উচ্চতর আদর্শ কল্পনার সুকুমার ভাবরঞ্জিত ও অসাধারণত্বের স্পর্শদীপ্ত'।[৬৫]

পুঁথিসাহিত্যের মূল্যায়ন করতে হবে সমকালীন যুগধর্মের মাপকাঠিতে। যে যুগে পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়েছিল, সে যুগে নবগঠিত বাবু কালচারেরও পাশ্চাত্য উচ্চভাবধারাসম্মত ও উন্নতমানের চিন্তা-ভাবনার বিকাশ হয় নি। বরং একথা নিশ্চয়ই বলা যায় চিন্তাশক্তির বিশালতা ও উদারতায় এবং মানব মনের আকুতি প্রকাশে এ সাহিত্যের দান উচ্চতরই ছিল। আমার এ যুক্তি সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' স্মরণ করে।

৬৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৪র্থ সং) পৃ. ১৮-১৯।
৬৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭।

www.pathagar.com

আর বড় কথা, পুঁথিসাহিত্যের ভাষা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষার অভিসারী। এজন্যই একে বলা হতো মুসলমানি ভাষা। সে যুগের মুসলমানের বাংলা কথায় ও বাবু শ্রেণীর বাংলা কথায় ছিল আসমান-জমিন তফাৎ এবং এ যুগের শহরবাসী শিক্ষিত মুসলমানদের তুলনাতেও। এ যুগে রাষ্ট্র গণকল্যাণাভিসারী, অতএব এ যুগের সাহিত্যকেও হতে হবে গণকল্যাণমুখী, আর এজন্য সাহিত্যকে হতে হবে সমষ্টির মুখের ভাষানুগ, কৃত্রিম ভাষার নয়। এদিক দিয়ে পুঁথিসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে আমরা আদর্শ পেতে পারি, মালমশলাও পেতে পারি। মুসলমানি ভাষার এ সম্ভাবনা তখন যে স্বার্থবশে নস্যাৎ করা হয়েছিল, এখন সে স্বার্থবুদ্ধি নেই এবং সে পরিবেশও নেই। এ জন্যেই এনামুল হক সাহেবের ধ্যানধারণার অনুসারী 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য' আরও পরিচ্ছন্ন আরও বিশিষ্ট অবয়বে গঠিত হওয়া আসম্ভব নয়।

এই সম্ভাবনার কথাটি আহমদ শরীফের মনেও উদ্রিক্ত হয়েছিল পুঁথির ফসল মূল্যায়নকালে এবং এ সম্ভাবনা উনিশ শতকে দানা বেঁধে ওঠে নি বলে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথাগুলোও প্রণিধানযোগ্য :

> দেশ, জাতি ও ধর্মের ইতিকথা এবং সমাজ-সংস্কৃতির একটি প্রাকৃতবোধ ও রূপ এ সাহিত্যে প্রতিফলিত। অতএব, আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানস তথা জীবনচর্চার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ। এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ (?) থেকে আজ অবধি, শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামি জীবন ও ঐতিহ্য-চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি গণকল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে, দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন-ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিমেয়। এ ভাষা উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারতো—এ উল্লাসবোধ। কিন্তু হলো না—এ ক্ষোভ দোভাষী পুঁথি চিরকাল স্বজাতি ও সংস্কৃতিপ্রিয় ঐতিহাসিকের মনে জাগিয়ে রাখবে।[৬৬]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাধনা : সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি

ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রিক বিজয় ইংরেজরা সম্পূর্ণ করেছিল ক্লাইভ থেকে ডালহৌসির হাত দিয়ে এবং আর্থিক বিজয়লাভ করেছিল কর্নওয়ালিস থেকে শুরু করে। কিন্তু পলাশীর বিজয়ের পর পরই এদেশে ইংরেজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিজয়াভিযান শুরু হয়ে যায় মিশনারিদের দ্বারা। প্রাচ্যখণ্ডে ইউরোপের বিজয়াভিযান হয়েছিল সুপরিকল্পিত তিনটি উপায়ে : পণ্যবাহী বণিকরূপে, তার পিছনে অস্ত্র নিয়ে পণ্য নিরাপত্তার অজুহাতে এবং তাদেরও পিছনে মিশনারি নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে।

---

৬৬. পুঁথির ফসল—পৃ. (ঝ)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান করার ভার নিয়েছিল শ্রীরামপুরের মিশনারি সম্প্রদায়। ধর্মক্ষেত্রে সাফল্য ততটা অগ্রসর হয় নি। মাঝপথে রামমোহন রায় প্রভৃতির কল্যাণে হিন্দুরা এ আক্রমণ যোগ্যভাবেই প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিজয়টা হয়েছে আশাতীতভাবে সফল; আর এর কারণ এই যে, এক্ষেত্রে নব্যগঠিত ইংরেজের প্রসাদ-পুষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছে নতুন বাবু কালচার প্রবর্তনের আগ্রহে। এ কালচারের বহু চিহ্ন আজাদি উত্তর যুগেও পাকিস্তানে এবং ভারতে প্রবলরূপেই বর্তমান এবং এর কল্যাণ প্রসাদের বর্ণনায় আজও আমাদের পণ্ডিতদের মধ্যে উৎসাহে বিরাম নেই।

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা প্রথমেই অগ্রহী হন বাংলা ভাষার নবরূপায়ণে এবং ভাষাটার গদ্যরূপ নির্মাণে। এ কাজে তাঁদের আগ্রহের অবশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা ছিল প্রবল, কিন্তু পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারায় প্রগতি লাভও হয়েছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য। আজকের দিনে আমরা বাংলা সাহিত্যে যে আশাতীত প্রগতি লাভ করেছি এবং ভাষাটিকে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছি, সেটাই হচ্ছে এই পরোক্ষ ফলশ্রুতি।

খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের তাগিদের সঙ্গে মিলেছিল কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর প্রয়োজন। কোম্পানির ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হন এ বিভাগের অধ্যক্ষ এবং তাঁর অধীনে আট জন পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই পণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও রাম রাম বসুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদের সহায়তায় কেরী বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। প্রথমে রচিত হয় 'কথোপকথন' ও পরে 'ইতিহাসমালা'। বলাবাহুল্য, গ্রন্থ দুটির ভাষা ছিল সংস্কৃত স্টাইলের এবং বিষয়বস্তুও ছিল মুসলমান বর্জিত। প্রতাপ আদিত্য, রূপসনাতন ও বীরবল ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। অতএব ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পণ্ডিতদের সাধনায় সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র। একদিকে মিশনারিদের ছিল একটি অসভ্য জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাওয়ার দম্ভ, আর অন্যদিকে ছিল পণ্ডিতদের সংস্কৃতের তনয়ারূপে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশের অসীম উদ্যম ও আগ্রহ। এ দুটি উদ্দেশ্যের ধারা সম্যকভাবেই প্রতিফলিত দেখা যায়, এই কেরীর সৈনাপত্যে পণ্ডিতদের রচিত এ সময়ের গ্রন্থগুলোর ভাষা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন কালে। এখানে অবশ্য বলা যেতে পারে, এদেশের প্রতি মিশনারির মধ্যে শ্রদ্ধার ভারে অভাব কতখানি ছিল। এ সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস বলেছেন,

> বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনারিদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলো সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব।[৬৭]

---

৬৭. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

বহু হিন্দু পণ্ডিতদের আখ্যাত 'মহাত্মা-কেরীর' একটি উক্তি থেকেই পরিস্ফুট হবে এই অবজ্ঞার পরিমাপ কতখানি ছিল :

> হিন্দুরা স্পষ্টত পাপের পঙ্কে ডুবে ছিল। একথা সত্য যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মতো তারা হিংস্র নয়, কিন্তু নীচ চতুরতা ও শঠতায় তারা এ অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছে। তাদের ধর্ম ব্যবস্থায় নৈতিকতার বালাই নেই মোটেই। অতএব কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় যে তারা গভীর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত আছে।[৬৮]

ব্যক্তিগতভাবে কেরী সম্বন্ধে বলা যায়, বাংলা সাহিত্য থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, যদিও তিনি স্বয়ং ভাষার কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করতে পারেন নি; মুনশি ও পণ্ডিতদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেই ভাষাটার গদ্যরূপ নির্মিতির সৈনাপত্য করেছেন, তাঁর নিজের কৃতিত্ব অতি সামান্য।

কেরীর নিযুক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে রাম রাম বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'প্রতাপাদিত্য' ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনাশৈলী ও ভাষারীতি সংস্কৃত হলেও আশ্চর্যভাবে প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। এ থেকে অনুমান হয়, ফারসি ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতকুলের অধিক শিক্ষিত ও মর্যাদাবান। তাঁর লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে 'রাজাবলি' (১৮০৮) ছিল চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্রবীর্য থেকে বাংলাদেশে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। মুসলমানি আমলটা অত্যন্ত অযত্নের সঙ্গে বিদ্বেষদুষ্ট ভঙ্গিতে লেখা, অবশ্য এ অংশে আরবি-ফারসি দু-চারটি শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু বিশুদ্ধ সংস্কৃতভঙ্গির একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন তিনি।

অতঃপর রাজা রামমোহনের নাম স্মরণীয়। প্রধানত হিন্দু সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে তিনি বাংলা গদ্য রচনায় হাত দেন, এজন্য হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজপতিদের প্রতি বিদ্রোহীর ভাব তাঁর সব রচনায় সম্পৃক্ত। কিন্তু বাংলা গদ্যের মধ্যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ধারণক্ষম শক্তি তাঁর লেখনী মুখেই প্রকাশিত, এজন্য সমকালীন পটভূমিকায় তাঁর গদ্যরীতি ছিল বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। একথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহনই সর্বপ্রথম ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি হতে বুদ্ধি ও মননশক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। বাঙালি হিন্দু যে কেবল ইংরেজের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের বাহনমাত্র নয়, তারা শিক্ষা সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী—তিনিই এর পথিকৃৎ। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রধানত হিন্দু ধর্ম ও জাতি বিষয়ক এবং ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও তাঁদের হাতে বাংলা গদ্যরীতি একটা বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। তাঁদের সকলের মধ্যে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠতম। সুদক্ষ শিল্পীর মতো তিনি

৬৮. The Nabobes : Appendix D. p 197 (No. 20).

www.pathagar.com

বাংলা গদ্যের পরিচর্যা করে গেছেন এবং বিদ্যাসাগরী স্টাইল বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ভঙ্গি। তাঁর 'বর্ণ পরিচয়', 'নীতিবোধ', 'বোধোদয়' ও 'কথামালা' আমরাও প্রথমে পাঠ করে বাংলা ভাষায় অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেছি।

উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের দ্বারা এবং সর্বতোভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যানুসারী হলেও এবং তৎকালে কোনো মুসলমানের বাংলা সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিভোজনে অধিকার না থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বাংলা সাহিত্যর পবিত্র প্রাঙ্গণ তখনো সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলতায় কলুষিত হয় নি এবং এর কারণ ছিল দুটি : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব, তারাই নতুন সংস্কৃতির বা বাবু কালচারের পত্তন করে। এ পর্যন্ত অনুগ্রাহী ও অনুগৃহীতের আঁতাতে কোনো ফাটল ধরে নি এবং সম্বন্ধটাও ছিল অন্তরঙ্গ। অতএব ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান তথা বিদ্রোহের সুর না ওঠা পর্যন্ত স্বদেশ তথা স্বধর্মপ্রীতির জোয়ার ওঠে নি। আর এ দুটির জোয়ার না ডাকা পর্যন্ত মুসলমান সমাজ ভ্রুক্ষেপেরও যোগ্য বিবেচিত হয় নি, অতএব সাম্প্রদায়িক চিন্তাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাথা চাড়া দেয় নি। দ্বিতীয়ত, ১৮৭০ সালে যখন মুসলমানরা শিক্ষায়, চাকরি ক্ষেত্রে এমনকি সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশলাভের দুঃসাহসিকতা দেখাতে লাগল, তখনই স্বজাতি ও স্বধর্মের, একচ্ছত্র স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল হিন্দুদের মধ্যে, তখন থেকে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব হতে লাগল। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, বিদেশি প্রভুদের নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সুদূর অতীতের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা বর্তমানের ক্ষুদ্রতাকে ঢাকবার চেষ্টা করতে থাকে এবং একটা উগ্র ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত দম্ভ প্রকাশ করতে থাকে। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের একটা প্রমত্ত প্রচেষ্টা নানাভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। তারই অভিব্যক্তি হতে থাকে 'হিন্দুমেলা'-তে ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সাহিত্যে।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দুটি দিকপালের আবির্ভাব হয়। পদ্যে মাইকেল মধুসূদন ও গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁদের আর্বিভাব কাহিনীও কৌতুকপ্রদ। মধুসূদন তখন খ্রিষ্টান; চলনে বলনে, পোশাকে-আশাকে, দেহে-মনে খাঁটি ইংরেজের দেশি সংস্করণ।

> 'মাইকেল মধুসূদন কিশোর বয়স হইতেই বৈদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন, তাঁহার বিলাতগমনের অস্বাভাবিক আগ্রহের ফলে বিদেশ গমনের পূর্বেই বিদেশ যেন তাঁর গৃহ হইয়া গিয়াছিল; ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাষায় তাঁহাকে বিদেশি বলিলেই চলে'।[৬৯]

---

৬৯. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, ২য় খণ্ড, ১৩৮।

www.pathagar.com

সতেরো বছর বয়সেই তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখে তাঁর ইংল্যান্ডপ্রীতি প্রকাশ করেন, 'I sigh for Albion's distant shore', ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজে যেয়ে তিনি পরের বছরই Captive Ladie কাব্য প্রকাশ করেন। দেশবাসীর নিকট গৌরবের বিষয় হলেও ইংরেজি সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিতে Captive Ladie একটি তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ। তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুদের কোনো সন্দেহ ছিল না। এজন্য গৌরদাস বসাক তাঁকে বার বার বাংলা ভাষায় কাব্যসাহিত্যানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

> গৌরদাস দ্বারা উত্যক্ত হয়ে মধুসূদন একবার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেওছিলেন : I am not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ... It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit. পিতা-পিতামহের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার মহৎ কর্মের জন্য আমি তো নিজেকে প্রস্তুত করছিনে ... এটা তো জেলেদের ভাষা, অবশ্য তুমি যদি সংস্কৃত থেকে ব্যাপক গ্রহণ না কর।[৭০]

অথচ মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যে কাব্যকীর্তি রেখে গেছেন, 'গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

> 'বাংলা গদ্যে বঙ্কিম যাহা করিয়াছিলেন বাংলা কাব্যে মধুসূদন তাহার অপেক্ষা অধিক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, তিনি একেবারে Virgil ও Milton হইতে ভারতচন্দ্র ও কৃত্তিবাসে সেতু যোজনা করিয়াছিলেন'।[৭১]

একথা অনস্বীকার্য, মধুসূদন শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যশক্তির বিকাশে বাল্মীকি ও সংস্কৃত সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন শুধু কাব্যের উপজীব্য উপাখ্যানের জন্যে নয়, উপমা, অলঙ্কার, উৎপ্রেক্ষা, শব্দচয়ন ও শব্দরীতির জন্যও। এই জন্য সুধীন্দ্র দত্ত মধুসূদনের ভাষাকে বলেছেন বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরোধী। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর কাব্যধারায় অবগাহন করে মনের শুচিতা ও শুভ্রতাই বৃদ্ধি পায় কোনোখানেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাঠকের মনমেজাজ আহত বা পীড়িত হয় না এবং রস গ্রহণে কোথাও সংকুচিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এখানেই বঙ্কিমের ওপর মধুসূদনের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ১৮৫৮ সালে এবং উক্ত সনেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। মেদিনীপুরে যখন তিনি বাল্যকালে ইংরেজি স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই ইংরেজ পরিবারে তাঁর মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল।

> এই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে শিশু বঙ্কিমের মনে ইংরেজ চেতনা এবং ইংরেজের অনুকরণপ্রেরণা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর ইংরেজরাই এদেশের ভবিষ্যৎ, একথা সে যুগের আকাশে-বাতাসে ছড়ানো ছিল।[৭২]

---

৭০. To Gourdas Basak, 18 August 1849.
৭১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মোহিতলাল মজুমদার।
৭২. বঙ্কিম মানস: পৃ. ৪৪।

www.pathagar.com

এরূপ পরিবেশে লালিত বঙ্কিমের ইংরেজপ্রীতি এবং তদহেতু ইংরেজ নিগৃহীত মুসলমানের উপর বিদ্বেষ জাগ্রত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ইংরেজের প্রতি আত্মীয়তাবোধের চেতনা থেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে একান্ত আপন করে লওয়ার আগ্রহ উদ্যমও বঙ্কিমের প্রথম বয়সে পুরোমাত্রায় ছিল। ১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে 'A Popular Literature for Bengal'— শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন,

> আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতেও অভিলাষী নহেন ... যে তীব্রবুদ্ধি তেজস্বী বাঙালি যুবক ঠিক ইংরেজের মতোন ইংরেজি ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনা করা 'হীনবৃত্তি মাত্র'।[৭৩]

অতএব এরূপ হীনবৃত্তিতে চালিত না হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও নিজের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পাদে ইংরেজি উপন্যাস Rajmohon's Wife রচনায় ব্রতী হন এবং ১৮৬৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরও মধুসূদনের মতো সহসা মোহমুক্তি ঘটে যায় এবং বাংলাকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের চর্চার বাহন নির্বাচন করেন। প্রথমে তিনি Rajmohon's Wife-এরই বাংলা তর্জমা করতে থাকেন। কিন্তু মধ্যপথে তা পরিত্যাগ করে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন এবং তার প্রথম ফসল 'দুর্গেশনন্দিনী'।

অতঃপর নিষ্ঠার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৮ এপ্রিল ১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছেন। নানাভাবে ও ভঙ্গিতে তিনি বাংলা গদ্যের সেবা করেছেন এবং নির্মাতা হিসেবে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চে। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ধর্মতত্ত্ব, কৃষক সমাজের কথা, সাংবাদিকতা— সকলক্ষেত্রেই তাঁর দান অপরিমেয়। দুরূহ সরকারি কর্তব্য সম্পাদন করেও এরূপ সৃষ্টি সাধনার অবসর ও মনমেজাজ সন্ধান করা—বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবেচনায় বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ ক্ষেত্রে যখন মধ্যাহ্ন গগনে বিরাজমান, তখন বাংলার রাজনৈতিক গগনেও মোড় ফিরে গেছে। তখন ইংরেজের সঙ্গে হার্দিক সম্বন্ধে বিদারণ রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে, ইংরেজের অনুগ্রহের ষোলো আনা অংশটার আর এক পক্ষ প্রবল দাবি জানাচ্ছে, আত্মসচেতন হয়ে। শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং তার দরুন তাদের মনে নৈরাশ্যভাব দেখা দেওয়ায় তারা হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ-মানসের সন্তান। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-মনের প্রতিভূ হিসেবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি হিসেবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন এবং এভাবে

---

৭৩. সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সাল (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ)।

www.pathagar.com

তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়ে দিলেন লেখনী মুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির নেই। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও গভীর বিশ্লেষণশক্তি অধিকারী হয়েও সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আদর্শের উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক হয়ে তিনি মানবতার যে অকল্যাণ ও অসম্মান করে গেছেন, তারও পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা নেই। অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় কালের প্রলেপে সে ক্ষতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু লেখনীর মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই—যুগ থেকে যুগান্তরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আটটি উপন্যাসে ইতিহাসের রং আছে কিন্তু ইতিহাস নেই। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ'-কে বলা যায় বঙ্কিমের উৎকট সাম্প্রদায়িক মন-মানসের অতি জঘন্য অভিব্যক্তি। এই দুটিতে তিনি মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নি উদ্‌গিরণ করেছেন, সে বিষজ্বালায় এই বিরাট উপমহাদেশের দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান মিলে একজাতি গড়ে তোলার যে স্বপ্নটুকু নেতাদের মনে উঁকি দিত, নিশার স্বপ্নের মতোই তা বিলীন হয়ে গেছে। এ উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্বও বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করে তাদের বিতাড়িত করে সদাশয় ব্রিটিশ জাতির আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় তিনি বারবার মুখর হয়ে উঠেছেন।

অথচ সবচেয়ে হাস্যকর অসঙ্গতি এই যে, তিনিই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা ঘোষণায় বলেন, 'যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে। এমত গর্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাংলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না'। ঐক্য বৃক্ষের মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করে ঐক্যের মহাবাণী প্রচার করার এ হাস্যকর উক্তির সঙ্গে নির্লজ্জ কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের অতি প্রচলিত উপমাটিও তুচ্ছ হয়ে যায়। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণীর উক্তিকে জয়টিকা হিসেবে শিরোধার্য করে একশ্রেণীর মুসলমান লেখকদেরও উদ্বাহু নৃত্য করতে দেখা যায়।

অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বারা। তিনিই সর্বপ্রথম 'অঙ্গুরী বিনিময়' (১৮৫৭) রচনা করে 'শিবাজী রোসিনারার প্রণয় সঞ্চার, দিল্লিতে বন্দী অবস্থায় অবস্থানকালে শিবাজী কর্তৃক রোসিনারার নিকট বিবাহ প্রস্তাব' ইত্যাদি উদ্ভট ঐতিহাসিক কাহিনী রচনার পথপ্রদর্শন করেন। তাঁকে অনুসরণ করেই বঙ্কিমের এ শ্রেণীর উপন্যাস রচনার আসক্তি জন্মে বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু এই কলঙ্ককালিমালিপ্ত অধ্যায়ের ওপর বঙ্কিমের মৃত্যুর সঙ্গে যবনিকাপাত ঘটে নি। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে ও আমাদের জাতীয় জীবনে 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার যে কর্দম-পঙ্কিল-ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হলো, অতঃপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পণ্ডিত-অপণ্ডিত ও সাহিত্যিক-

www.pathagar.com

অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় সে আবর্তে পরমানন্দে অবগাহন করে আসছেন, লেখনী চালনা করে। *এবং দুঃখ এই যে, আজাদি উত্তর কালেও তার নিবৃত্তি নেই।*[৭৪] কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে এ বিষম বিষক্রিয়া চলেছে নির্মমভাবে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকেও যখন এ আবর্তে অবগাহন করতে দেখি, তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় স্বতই বেদনার্তকণ্ঠে মুসলমান বলে ওঠে জুলিয়াস সিজারের মতো : Et tu Brute! তোমাকে তো রবীন্দ্রনাথ এসবের উর্ধ্বে ভেবেছিলাম! এ সম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ও 'শিবাজি-উৎসব' কবিতা পাঠ করে দেখতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি। কবিতাটি সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, এখানে নতুন কিছু না বলে রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত কাজী আবদুল ওদুদের জবানীতেই দেখাতে চাই তার কি বিষক্রিয়া হয়েছিল :

> 'বাংলায়ও এই 'শিবাজী-উৎসবের' সাড়া জাগে, বিশেষ করে সুবিখ্যাত 'দেশের কথা'র লেখক সখারাম গনেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায়—প্রধানত তাঁরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত (!) 'শিবাজী' কবিতা রচনা করেন, পরে এই কবিতাটি তিনি প্রকারান্তরে বর্জন করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদ 'শিবাজী-উৎসব' আন্দোলনের দ্বারা যে আরো শক্তিমন্ত হয় তা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেসেরও সেই ছোঁয়া লাগে—সেখানে 'গরম' দলের আবির্ভাব হয়। 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলন বাংলার (হিন্দু) স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট আবেগ সঞ্চার করেছিল—অবশ্য সে আবেগ মুখ্যত হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবেগ'।[৭৫]

'দুরাশা' গল্পটি[৭৬] লেখা হয়েছিল বৈশাখ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দে, যখন হিন্দু জাতীয়তা উগ্ররূপ ধারণ করেছে এবং এ গল্পটি পাঠ করে কাজী ইমদাদুল হক—*'সেই দিনে তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত অনেকের ভালো লাগত'*[৭৭]—সে দিনেও ক্ষোভে দুঃখে রবীন্দ্রনাথের যে সমালোচনাটি করেছিলেন

> 'বঙ্গের প্রিয় কবির তো এই কীর্তি' বলে, সে সমালোচনাটি পড়তে পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাই।[৭৮]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বদ্রাওন কুমারী নবাবজাদী ব্রাহ্মণ সেনাপতি কেশরলালের প্রেমে অন্ধ হয়ে তাঁর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন এবং বাকি জীবনব্যাপী

---

৭৪. প্রবোধ সান্যালের 'হাসুবানু' স্মরণীয়। এ কথাও এখানে বলা যায়, ডক্টর শ্রীকুমার ব্যানার্জী তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-য় কোনো মুসলমানের নামোল্লেখ করে লেখনী কলুষিত করেন নি!

৭৫. বাংলার জাগরণ, পৃ. ১৭৬। শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাজী সাহেব একটি সত্যের বিপরীত উক্তি করেছেন, কবিতাটির নাম 'শিবাজী' নয়—'শিবাজী উৎসব' এবং এটি বর্জিত না হয়ে 'সঞ্চয়িতা' ও রবীন্দ্র রচনাবলীর পশ্চিম বাংলা সরকারি ও শান্তিনিকেতনী সংস্করণে মর্যাদার সঙ্গে ছাপা হয়েছে।

৭৬. রবীন্দ্র রচনাবলী—পশ্চিম বাংলা সরকার সংস্করণের ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।

৭৭. বাংলার জাগরণ, পৃ. ১৯৪।

৭৮. কাজী ইমদাদুল হক গ্রন্থাবলি (বা. উ. বোর্ড, সং) ১ম খণ্ড, ৪৪৩-৪৫।

www.pathagar.com

সাধনা করেছেন ব্রাহ্মণ হতে। অবশ্য তখন রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাহাত্ম্যে সমাহিত হয়েছেন।

'ব্রাহ্মণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ' প্রবন্ধই লিখলেন 'ব্রাহ্মণ', ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বজ্ঞান-সম্বলিত বিশদ আলোচনা করে।[৭৯]

'বঙ্গভঙ্গের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণে লিখিত 'গোরা' উপন্যাস (১৯০৯) খানিতে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতার অঞ্জন চোখে মাখিয়া হিন্দুধর্মের বিকারগুলোকেও রমণীয় করিয়া দেখাইয়াছেন। ... তাঁহার সমস্ত কবিকল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা সমস্ত পরিতাপ তীব্র আবেগ, হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবের লুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ—তাহার দিকে অনিবার্য বেগে ধাবিত হইয়াছে।'[৮০]

তাঁর কাঙ্ক্ষিত নবহিন্দুত্ব বা নব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্থাপিত হলো শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদের পুনরুদ্ধার মানসে এবং ত্রিপুরার মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখলেন :

আমি ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্র-দিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই ... বিদেশি ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।[৮১]

সেই স্বধর্মের একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথের একালীন মন-মানস কাজী আবদুল ওদুদের লেখনীতে এরূপে পরিস্ফুট হয়েছে :

হিন্দুর প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার দিকে নতুন করে এইকালে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ব্রাহ্মদের যে সমাজ-সংস্কার চেষ্টা, বিশেষ করে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, সেসব থেকে তিনি মুখ ফেরালেন। ... তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো, ব্রাহ্মরা হিন্দু ভিন্ন আর কিছু নয়; সমস্ত হিন্দু সমাজকে গণ্য করতে হবে দ্বিজ সমাজ বলে, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, সবাই দ্বিজ, কেবল সাঁওতাল কোলভিলরা দ্বিজ সমাজের বাইরে। আর এই দ্বিজ সমাজের শিরোভূষণ হবেন ব্রাহ্মণ তাঁর ত্যাগ চারিত্রিক শুচিতা ও অনির্বাণ জ্ঞান সাধনার জন্য।[৮২]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত কবি। ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বলতম রত্ন। জয়রাম, দর্পনারায়ণ ও দ্বারিকানাথ আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রথমভাগে ইংরেজদের আমিন ও দেওয়ানগিরি করে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং জমিদারি ক্রয় করে ও বিলেতি হৌসের অংশীদার হয়ে ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট নব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ি কলকাতার বাবু কালচারের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। রবীন্দ্রনাথ

৭৯. রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. সং) ১২শ খণ্ড, ১০৩৪ পৃ.। রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যাপূরণ' গল্পটিও পঠিতব্য।

৮০. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৫৮।

৮১. রবীন্দ্র জীবনী দ্রষ্টব্য—বাংলার জাগরণে উদ্ধৃত পৃ. ১৫৮।

৮২. বাংলার জাগরণ, পৃ. ১৭২-৭৩।

www.pathagar.com

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাবু কালচারের কৌস্তুভ মণি; বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-শিরোপা নোবেল প্রাইজ ১৯১৩ সালে অর্জন করে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের চোখে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। এজন্য বিশ্বসভায় তাঁকে নিয়ে আমরা করি গর্ব। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি স্মরণ করে তাঁর আলখেল্লা ও টুপি পরিহিত মূর্তিটাই আমাদের স্মৃতিপটে বেশি করে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই আলখেল্লা ও টুপির ভিতরে যে মানুষটি ছিলেন, তিনি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বে ও ব্রাহ্মণ্যের মাহাত্ম্যে যে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন, এটিও প্রতিষ্ঠিত সত্য, যেমন সত্য প্যান্ট-কোট-বুটধারী ইংরেজিয়ানায় চিরঅভ্যস্ত মধুসূদন ছিলেন খাঁটি বাঙালি।

রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের স্তন্যে লালিত এবং সে স্তন্যধারায় ছিল বৈষ্ণবদের কমনীয়তা ও মধু-মাধুর্যমিশ্রিত। এই দুটি ধারায় অবগাহন করে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দর্শনের সূক্ষ্ম ও উচ্চকোটির যে ভাবসম্পদের ফসল আহরণ করেছেন এবং যে পরিশীলিত শিল্পরুচির পরম বিকাশ দেখিয়েছেন কাব্যে উপন্যাসে-গল্পে-নাটকে-নৃত্যনাট্যে-মননশীল প্রবন্ধে তার তুলনা আধুনিককালে কোনো সাহিত্যে খুঁজে মেলা ভার। তার পরিমাণেরও তুলনা নেই এ যুগের কবিকর্মে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে ভারত পথিক, বিশ্বপথিক নন; বাবু কালচারের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই রবীন্দ্র সাহিত্যকর্মের বিকাশ এবং এই সীমিত মধ্যবিত্ত সমাজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা; বিরাট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর কবিকর্মের সংযোগ নেই, পরিচয় নেই। রবীন্দ্র-দীপ্তিতে যখন বাংলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত ছিল মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো, তখনই 'লোকশিক্ষক ও জননায়ক' হিসেবে তাঁর মূল্যায়নকালে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,

> রবীন্দ্রসাহিত্য সার্বজনীন নহে ... রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দনও শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই'।[৮৩]

> 'রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিক্ষিত মার্জিত সমাজের ভাষা। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষাকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন ... রবীন্দ্রনাথকে ঠিক জনগণের মানুষ বলা চলে না'।[৮৪]

তাঁর বিরাট কবি-কর্মের যে মূল্যায়ন করেছেন, তাঁরই শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যায়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, তাই এখানে তুলে দিচ্ছি :

> একজন শিল্পীকে জানার অর্থ হলো তিনি কি করতে চেয়েছিলেন তা জানা ... রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন না কেন, 'কল্পনার সূত্রে বোনাজালে' 'আভিজাতিক ছন্দের' দোলা তাঁর রক্তে ... আভিজাত্যের-উচ্চ মঞ্চ' হতে নেমে এসে উদার জনসমাজের 'অখ্যাত জনের' সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের, কাব্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিলম্বিত সৎপ্রয়াস ...

---

৮৩. মাসিক প্রবাসী, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ : পৃ. ১৯৯৫-২০৩।
৮৪. ভাষা ও সাহিত্য—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দেশ—১৫ আষাঢ় ১৩৭৫।

www.pathagar.com

জনগণের কবি হবার সাধ তাঁর মিটেছে ... বৃহত্তম জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্তত রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা সম্ভব হয় নি ... রবীন্দ্রনাথের বেলায় এক নব্য নাগরিক, কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু ও পরীক্ষামূরক রীতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোনো বড় রকমের 'হার্দ্য পরিবর্তন' ঘটেছিল বলে মনে হয় না ... হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার 'উচ্চমঞ্চে' তিনি যে খুব সোয়াস্তিতে বসে ছিলেন তা মনে হয় না; কিন্তু সাময়িক অনুকম্পা, অনুশোচনা বা প্রতিবাদের কথা বাদ দিলে, তাঁর স্বপ্নালু, ভাবমধুর আদর্শ কবিকল্পনা সামাজিক অসাম্যের দরুন যে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিল বলা চলে না ... রাবীন্দ্রিক মহামানব কবির স্বভাব ও স্বধর্মানুযায়ী গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই আদর্শের বা সম্ভবনার প্রয়োগ হয়েছে কতকটা গৌণভাবে, কিছুটা যেন দায়ে পড়ে। কখনো প্রার্থনার সুরে, কখনো ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ধ্বনিত হয়েছি সেই মহালগ্নের আগমনী, কিন্তু প্রজ্ঞাঘন দৃষ্টি যা হবে জীবনের সম্যক দর্শন, জীবনায়ন—ভবিষ্যতে, রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে যার আশা করতে পারি—সে বুঝি রয়ে গেল আভাসেই! ... 'ঐ মহামানব আসে' সাম্যবাদী ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুরোধে সভাসংগীত হিসেবে লেখা হয়েছিল এ-সংবাদে বিস্ময় বাড়ে। ... প্রধানত গীতিকবি হওয়া সত্ত্বেও—এবং জ্ঞান ও তপোধর্মী না হওয়া সত্ত্বেও—স্বভাবের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ আদি কবিদের জগতে প্রবেশ করেছেন ... তাঁর নিজের ভাষাতেই তিনি সেই আর্য পিতৃপুরুষদের পথের পথিক, ভারত পথিক। ... সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এই আত্মকেন্দ্রিক কাব্য ও নাটকের যোগ কোথায় ভাব জগতের এই প্রকাশ ও প্রয়োজনে আগামী কাল কি মর্যাদা দেবে বলা কঠিন। আধুনিক শিল্পের অন্যান্য বিভাবের মতো এই অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত 'জীবস্রোতের উপরতলা' হতে লেখা সর্বজনীন অভিজ্ঞতা, 'জীবনের ঘোলাস্রোত' হতে এত বিচ্ছিন্ন যে, তাদের দাবি করা তো দূরের কথা, পরম ঔদাসীন্যে সমাজ তাদের অগ্রাহ্য করে থাকে, অভিযোগ তোলে তাদের দুর্বোধ্যতা ও নিরর্থকতা নিয়ে ...।[৮৫]

কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে সমাজের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে বসে দ্বিজত্বের শ্রেষ্ঠত্বে ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে মাঝে মাঝে' গেলে 'ও পাড়ার' বিরাট জনগোষ্ঠীর ভিতরে প্রবেশের শক্তি হয় না, প্রবৃত্তি হয় না এবং তার দরুন 'আমার কবিতা, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' হতে পারে না, সমাজের বাধা, দূরের বাধা হয় অন্তরায়। কবির এ স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবু বাধ্য হয়েই বলতে হয়, বর্ণহিন্দুর সৃষ্ট বাবু কালচারের এই-ই অবশ্যম্ভাবী অবধারিত পরিণতি।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্যে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী কবির এ শিক্ষা 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ : আমরাও অন্তর দিয়ে গ্রহণ করি এবং গুরুদেবের অন্ধভক্তদেরও এ শিক্ষাও গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে উগ্র হিন্দু জাতীয়তা বনাম সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবীজ রোপিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কালক্রমে সেটি কী ভয়াবহ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষ দশক ও বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশকে হিন্দু সাহিত্যিক লিখিত উপন্যাস, নাটক ও কবিতাসমূহ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

---

৮৫. রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য—শিশিরকুমার ঘোষ : সাহিত্য পত্রিকা—বর্ষা ১৩৬; পৃ. ৩৭-৭৬।

www.pathagar.com

'ইহাতে আমাদিগের নতুন করিয়া আশ্চর্যান্বিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কিছু নাই, কেননা ইহা 'শিক্ষিত' হিন্দুর নিপুণ লক্ষ্য-অভ্যস্ত করক্ষিপ্ত একটি অন্যতম মুসলমান-কলঙ্ক-বিষগর্ভ-অধ্যবসায়-শানিত বঙ্গীয় হিন্দু-প্রশাংসা-কিরণ-প্রতিফলিত বিদ্যুৎজ্জ্বালা পুরিশোভিত তীব্র শর'।[৮৬]

এরূপ একখানি শরের উল্লেখ করা যেতে পারে দৃষ্টান্ত হিসেবে তৎকালীন অতি জনপ্রিয় নাটক মনোমোহন গোস্বামী রচিত 'শিবাজী বা সাজাদী রোশিনারা।' ঠাকুরমার গল্পের মতো রোশিনারা আওরঙ্গজেবের কন্যা (ইতিহাসের মাথায় কি নির্লজ্জ পদাঘাত) শাপভ্রষ্ট স্বর্গীয় অপ্সরী এবং শিবাজীর প্রেম পাগলিনী; কিন্তু 'যবনী হইয়া জন্মিয়াছিলেন' অতএব পদাঘাত, পতন ও মৃত্যু। গ্রন্থকার সমকালীন হিন্দুমানস এরূপ নির্লজ্জভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'এ গ্রন্থ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষ জ্বালাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে।' এরপর কিছু বলাই অবান্তর।

এই কলুষ আবহাওয়ায় একজন হিন্দু সাহিত্যিক নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন এসব রাজনীতিক বিভ্রাটে বা সাম্প্রদায়িকতায় বিভ্রান্ত না হয়ে। তিনি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। কথাশিল্পে তিনি বাংলা গদ্যকে যেরূপ বিকশিত করেছেন, সহজে তার অতিক্রম সম্ভব নয়। অবশ্য হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বাবু কালচারের গণ্ডিভুক্ত সমাজের জীবনই তাঁর কাহিনীর উপজীব্য; কিন্তু তিনি যে গভীর জীবনানুভূতি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। হিন্দু সমাজ জীবনের অনাচার ও কুসংস্কার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ধর্মে অন্তঃসারশূন্যতাও তাঁর কুশলী হস্তে প্রকাশিত হয়েছে দিবালোকের মতো নগ্নরূপে। তাঁর আরও একটি গুণ উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পর্শকাতর হৃদয়। এজন্যই তাঁকে সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণাবর্তে অবগাহন করতে দেখা যায় নি। তাঁর বিশাল কথাসাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখ প্রায় নগণ্য। তবুও 'পল্লীসমাজ' 'শ্রীকান্ত' ও 'মহেশ' গল্পে যা সামান্য উল্লেখ আছে, তা মুসলমান সমাজের প্রতি দরদে ও শ্রদ্ধায় ভাস্বর। হিন্দু জমিদারের অত্যাচার কত নির্মম ও মর্মান্তিক ছিল এবং বর্ণহিন্দুসমাজ মুসলমানকে কী ঘৃণা-অবজ্ঞার চোখে দেখত 'মহেশ' গল্পটি তার জ্বলন্ত চিত্র। গফুরের ললাটশীর্ষে এত লাঞ্ছনা-অপমানভার নেমে এসেছিল, সে মুসলমান বলেই। বস্তুত 'মহেশ' গল্পটি সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এক নগ্ন চিত্র।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাধনা : নজরুল

উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক একজন প্রতিভাবান মুসলমান সাহিত্যিক বর্তমান বাংলা গদ্যের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন শরৎচন্দ্রের মতোই রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে থেকে। তাঁর নাম মুশাররফ হোসেন। এখানে কোনোরকম প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখে একথা

---

৮৬. কাজী ইমদাদুল হক গ্রন্থাবলি (বা. উ. বোর্ড সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯।

www.pathagar.com

নির্দ্বিধায় বলা যায় : বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দুটি মাত্র মুসলমান জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছে—একটি গদ্যসাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, দ্বিতীয়টি পদ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

মীর সাহেবের জন্ম ১৮৪৭-৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৮৬৯ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয় একুশ বছর বয়সে এবং শেষ গ্রন্থ 'আমার জীবনী'-এর ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। চল্লিশ বছরেরও উপর তিনি সাহিত্য সাধনা করে গেছেন এবং উপন্যাস, জীবনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, নাটক রম্যরচনা, কবিতা ও গান লিখে গেছেন অজস্র ধারায়। বঙ্কিমের মতো উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি, উচ্চ সরকারি পদমর্যাদা তাঁর ছিল না, সামান্য গোমস্তাগিরিই ছিল তাঁর জীবনোপায়। ইংরেজদের সাহচর্য তিনি পান নি, পাশ্চাত্য শিক্ষার উচ্চ ভাবধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল না। তাঁর বয়ঃক্রম যখন দশ বছর তখন আজাদি সংগ্রামের মতো মহাবিপ্লবে এদেশ প্রকম্পিত হয়েছে, তাঁর চোখের উপরেই মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, বাংলা বিভাগ ঘটেছে আবার রদও হয়েছে। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ঢাকাতেই তাঁর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে। কিন্তু এসব রাজনীতিক ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, বিদ্রোহ-বিপ্লবের মধ্যেও তিনি আশ্চর্যভাবে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থেকে জাত শিল্পীর একাগ্রতা ও নিরলস নিঃসঙ্গতা নিয়ে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এইটিই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তাঁর মধ্যে সমাজ সচেতনতা ছিল না, এ অভিযোগের 'উত্তরে জমিদার দর্পণ', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' প্রভৃতির নাম করা যায়। তাঁর ইসলাম প্রীতির নিদর্শনে 'বিষাদ সিন্ধুই-ই' যথেষ্ট, তবু 'মৌলুদ শরীফ', 'মোস্লেম বীরত্ব', 'মদিনার গৌরব', 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়।

> বঙ্কিম চন্দ্রযখন সাহিত্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি শিল্পীসুলভ মনোভাব নিয়ে সে পথের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্রও না করে বরং মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছিলেন, গো-জবেহ বন্ধ করতে।[৮৭]

মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠতম রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'; এটি মুসলমান রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। ভাষায়, উপমায়, অলঙ্কারে, উৎপ্রেক্ষায় একেবারে মুসলমানি বিশেষত্ব বর্জিত, কেবল মুসলমানি নামসমূহ ব্যতীত আর একটিও মুসলমানি শব্দ নেই, মুসলমানি পরিবেশ নেই। এরূপ বিশুদ্ধ বাংলা রচনার জন্যে গ্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু 'বিষাদ সিন্ধু'-এর প্রধান চরিত্রগুলো ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেও, এতে ঐতিহাসিক সত্য অতি অল্পই আছে।

---

৮৭. মীর সাহেবের 'গো-জীবন' পুস্তিকার কড়া সমালোচনা করেন 'আখবারে ইসলামিয়ার সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। 'গো-জীবনের'-এর যুক্তি ও বক্তব্যের সঙ্গে আর্য সমাজের নেতা দয়ানন্দ সরস্বতীর 'গোরক্ষিণী সমিতির'-এর মিল থাকায় অনেকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেরও সন্দেহ করেন।

www.pathagar.com

এজন্য 'বিষাদ সিন্ধু'-কে ইতিহাস আশ্রিত এক জটিল বিপুল রোমান্টিক উপন্যাস বলেই গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়'।[৮৮]

মীর সাহেব বাবু-কালচারের অভেদ্য দুর্গ সংস্কৃত তনয়া বাংলা সাহিত্যে হানা দিয়ে গৌরবের আসন অধিকার করে বসলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান কবি সাহিত্যকরা বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে পঙ্‌ক্তিভোজনে যোগ দিলেন। কিন্তু প্রথমদিকে সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা এভাবে নিজেদের গা-ঢাকা দিয়ে অবতীর্ণ হতেন যাতে মুসলমান বলে চেনা না যায়। আমার একথার প্রতিধ্বনি মিলবে কায়কোবাদ লিখিত 'মহাশ্মশান' কাব্যের ওপর নবীনচন্দ্র সেনের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র থেকে, ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সংস্কৃত শব্দবহুল কবিতা বিশেষত স্তোত্রের অনুকরণে লিখিত 'নাআত' থেকে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা এ সংকোচ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হলেন এবং সংস্কৃতবহুল শব্দ ও পণ্ডিতি রীতিতে বাংলা কবিতা ও গদ্য রচনা করলেও মুসলমানের অতি প্রচলিত ইসলামি শব্দগুলোর ব্যবহারে ও ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহসী হয়ে উঠলেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায়ও পাল্টা জবাব হিসেবে শিরাজী সাহেব লিখলেন 'রায়নন্দিনী'। তাঁর 'অনল প্রবাহ-এর' নজরুলের 'অগ্নিবীণা-এ' পূর্বসুর ধ্বনিত; নজরুলও স্বীকার করেছেন নিজেকে তাঁর মানসপুত্র হিসেবে। এসময় মুন্সী মেহেরুল্লা, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আকরম খাঁ ও কিছু পরে ডক্টর শহীদুল্লাহ এসে যোগ দিলেন বাংলা সাহিত্য সাধনায় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে মুসলমান লেখকের ভিড় জমে গেল উল্লেখযোগ্যভাবে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁরা মুসলমানকে আত্মসচেতনতায় ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন।

এ সময়ে মুসলমানের রাজনৈতিক অধিকারের আদর্শ কী ছিল, প্রত্যয়ে কতখানি দৃঢ় ছিল এবং পূর্ণাঙ্গ আজাদির ধ্যানধারণা কোন স্তরের ছিল, শিরাজি সাহেবের দুটি উক্তি থেকে তা সুপরিস্ফুট হবে। মুসলমানের আজাদি সংগ্রাম ত্বরান্বিত ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন,

মুসলমানদিগকে স্বরাজ সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্যই স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা কর্তব্য ... আমাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা একান্ত আবশ্যক।[৮৯]

তিনি যে পূর্ণাঙ্গ আজাদির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে থাকবে মেহনতি মানুষের জীবন বিকাশের অবাধ সুযোগ—সেটা শুধু কায়েমী স্বার্থবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ভোগের প্রসারিত ক্ষেত্র হবে না :

---

৮৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মুহম্মদ আবদুল হাই), পৃ. ৭৭।
৮৯. ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩১ : শিরাজী রচনাবলী (বা. উ. বোর্ড সং), পৃ. ৪৩০।

www.pathagar.com

স্বরাজের ও স্বাধীনতার আমি ঘোর পক্ষপাতী ... কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও আমি স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছি যে, স্বরাজের জন্য আমাদের মুসলমান ভাইকে, আমার চাষি ভাইকে কিছুতেই জবাই করিতে পারিব না। স্বরাজের জন্যই আমাদের চাষি ভাইকে বাঁচাইতে হবে। চাষিই এদেশের জীবন ও যৌবন। চাষার রক্তশোষণ করিয়াই জমিদার মহাজন ও উকিল-মোক্তারদিগের বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি। চাষার টাকাতে তাঁহাদের দালান-কোঠা ও মটরগাড়ি। ... সুতরাং চাষাকে বাঁচানো এবং চাষাকে জাগানোই হইতেছে স্বরাজের প্রধানতম সাধনা।[৯০]

বলাবাহুল্য, সেদিনের শিরাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েরই মনের কথা। সেদিন তাঁরা অনাগত ভবিষ্যতে আজাদির স্বপ্নে সকল মানুষেরই স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের কথাটিকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন, কোনো শ্রেণীস্বার্থ তাঁদের পীড়িত বা উদ্বিগ্ন করে নি। রক্তের বা অর্থের কৌলীন্য যেমন বর্ণতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, তেমনি শিক্ষার কৌলীন্যও এযুগে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছে, শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিয়ে নিজেদেরই ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে এবং সেক্ষেত্রের ফসলে নিজেদেরই ভোগের পিয়ালা কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতে। উচ্চশিক্ষিত বর্ণহিন্দুরাই 'অ্যাজ এ ক্লাশ' দাবি করত নিজেদের দেশের সমাজের সেরা মানুষ বলে; এদেশে নতুন চিন্তা নতুন কালচার নতুন সভ্যতা গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার দাবিতে রাজনীতি করায় তাদেরই জন্মগত অধিকার, কারণ একমাত্র তাদেরই চেতনা আছে এবং 'ইকনমিক ফ্রিডম' আছে। তাদের অবশ্য সে 'ইকনমিক ফ্রিডম' বুদ্ধি বেচে বিদেশি ক্যাপিটালিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের মুনাফার অংশ হিসেবে ভিক্ষা পাওয়া। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র বলেছিলেন,

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই দেশের মগজ ও বিবেকের ধারক ও বাহক এবং তারাই অশিক্ষিত জনগণের পক্ষে কথা বলার প্রকৃত দাবিদার; জনস্বার্থের স্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক। প্রত্যেক যুগে এটাই সত্য যে, যারা বুদ্ধিজীবী তারাই শ্রমজীবীদের শাসন করবে।[৯১]

একথার প্রতিধ্বনি মেলে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি থেকে :

এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয় নি যে, চাষ করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যেসব কাজে শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, একথা সুস্পষ্ট ... আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই।[৯২]

ইসলামের কিন্তু এ শিক্ষা নয়। 'ডিগনিটি অব লেবার' বা শ্রমের মর্যাদা কথটি ইসলাম এভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে শ্রম করাও ইবাদাত বা উপাসনার শামিল ধরা

৯০. ছোলতান, ৬ চৈত্র ১৩৩০ : ঐ ঐ।
৯১. Advanced Hist. of India, p 869.
৯২. কালান্তর—শূদ্রধর্ম, পৃ. ১৮-২২১ পৃ.।

www.pathagar.com

হয়েছে। আর শূদ্রত্বে কারো অসন্তোষ নেই, এমন অদ্ভুত যুক্তি শুধু তারাই দিতে পারে যারা মানুষের আত্মাকে জন্মগত ছোট হিসেবে ভাবার পক্ষপাতী। জন্মগতভাবে কেউ ছোট বা বড় নয়, কর্মফলেই ছোট বা বড় হয়ে যায়, অতএব, বড়ত্ব ও মহত্ত্ব অর্জনের অধিকার দ্বিজ-চণ্ডালের সমান। এ শিক্ষা নজরুল ইসলামের কবিতায় আরও সোচ্চার :

ওকে চণ্ডাল চমকাও কেন, ও নহে ঘৃণ্য জীব,
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল কাল হতে পারে মহাযোগী সম্রাট,
তুমি কাল তারে অঘ্য দানিবে করিবে নান্দী পাঠ।
*   *   *
যত নবী ছিল মেষের রাখাল তারাই ধরিল হাল
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে রবে চিরকাল।

আর ইতিহাসের শিক্ষা থেকে জানা যায়, বুদ্ধিজীবী কখনো রাজদণ্ড ধরে নি, চিরকালই শক্তির বা অর্থের দাসত্বই করে এসেছে। এদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা গণশক্তিকে বঞ্চিত করে এতদিন নিজেদেরই স্বার্থভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে আসছিল এবং সে স্বার্থপীড়িত হলেই স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জিগির তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করত। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, বঙ্গভঙ্গের পর যখন 'স্বদেশী' বাবুরা পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আন্দোলন চালাতো, তখন।

'কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের মুখে শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গে বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহ ভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না, তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই'।[১৩]

এ থেকেই সুস্পষ্ট, হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বার্থবশে কতখানি নিচে নেমে গিয়েছিলেন এবং তার জন্যে জনসমষ্টির আস্থা হারিয়েছিলেন।

মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব দিতে এই সময়ে আবির্ভাব হলো কাজী নজরুল ইসলামের। তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করল। নজরুল ইসলাম আত্মপ্রত্যয়ের কবি। নজরুলের আগে বাংলা সাহিত্যের আসরে বহু কৃতবিদ্য মুসলমান সাহিত্যিক ও কবির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের সে সংকোচ—ভীরু পদক্ষেপ ছিল পরগৃহে অনাহূতভাবে অনধিকার প্রবেশের মতো। তার দরুন তাঁরা নিজেদের ভাষায়, উপমায়, অলঙ্কারে ও রচনারীতিতে মুসলমানি নিশানা এমনভাবে বাঁচিয়ে চলতেন, যেন সে আমলের 'সংস্কৃত তনয়া' বাংলা ভাষার ধারক ও বাহকগণ সামান্যতম আঘ্রাণেও তাঁদের

১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. স. সং) ১২শ খণ্ড ৯১০-৯১১ পৃ.; ৮২৮ পৃষ্ঠাও দেখুন। (১৩১৪ বঙ্গাব্দে লিখিত)।

www.pathagar.com

মুসলমান হিসেবে চিনতে না পারেন। নজরুল ইসলাম মুসলমান লেখকদের এই সংকোচ ও প্রথাদাসত্ব থেকে আজাদি দান করেছেন। তিনি এরকম অসংকোচে ও অবলীলাক্রমে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে আরবি শব্দের ব্যবহার করেছেন, যে তাঁর মুনশিয়ানায় অবাক হতে হয়। তার ফলে ভাষা যেমন পেয়েছে স্বচ্ছন্দ গতি, ছন্দ হয়েছে সাবলীল এবং সুরের সঙ্গতি রক্ষা পেয়েছে অতিমধুরভাবে। নজরুল ইসলাম আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে কেবল বাংলা ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্যই বাড়িয়ে তোলেন নি, মুসলমানদের যে বাংলা সাহিত্যে একটা নিজস্ব অধিকার আছে, আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের গৌরবোজ্জ্বল ক্ষেত্র আছে, সেই দাবিই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে নজরুল মুসলমান বাংলা সাহিত্যসেবী ও কবিদের মুক্তিদাতা ও পথপ্রদর্শক।

এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার, নজরুলের ভাগ্য হয় নি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার, সুযোগ হয় নি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে আধুনিক চিন্তা-ভাবনা, শিল্পকলা এবং মানবীয় জীবনযাত্রার ধারা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করার। নজরুল সাহিত্যে নেই পাণ্ডিত্যের গুরুভার বা কঠিনতা ও সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বকথার সমাবেশ, নেই পাশ্চাত্য জ্ঞান ও চিন্তার কারণিক প্রভাব। আরও নেই ভাষার কারুকাজ। যা আছে সত্য। সত্য আর সহানুভূতি আর অফুরন্ত প্রাণাবেগ। আরও আছে এসব প্রকাশের প্রচারের দুরন্ত সাহস। 'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি, ভাই করবো সেথায় বিদ্রোহ'—নজরুলের এই ছিল জীবনের মন্ত্র। যারা কেড়ে খায় অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস, তাদের সর্বনাশ সাধনে তিনি অগ্নিবীণায় ও বিষের বাঁশীতে দীপক রাগিনী তুলেছিলেন। তাঁর সত্যে ধানাইপানাই ছিল না, নেতা হওয়ার অবসর ছিল না তাঁর। 'রক্ত ঝরাতে পারি নাক একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লিখা।' সে রক্ত লিখায় লেখা হয়ে গেছে মহামানবের জীবন কাব্য, জীবনবেদের রক্তাক্ত অধ্যায়।

নজরুলের যুগ-প্রবর্তনকারী ভূমিকা ও কাব্য মূল্যায়নে বাংলার কবি সাহিত্যিকরা যেসব উক্তি করেছেন, সেসবের সারাংশ দিয়েই বাংলা সাহিত্য তাঁর স্থান নির্দেশিত করাই প্রশস্ত। রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতুর' সারথী নজরুলকে এ ভাষায় আশিস জানিয়েছিলেন :

> আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
> আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
> দুর্দিনের ঐ দুর্গশিরে
> উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
> অলক্ষণের তিলক-রেখা
> রাতের ভালে হোকনা লেখা,
> জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
> আছে যারা অর্ধ-চেতন।

www.pathagar.com

নজরুলের অন্তরের অনির্বাণ বহ্নি-জ্বালাই তাঁহার প্রধান, এমনকি সর্বগ্রাসী অনুভূতি। তাঁহার রক্তে, তাঁহার গভীরতম চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রিক্ত বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় একাত্মবোধ বজ্রাগ্নির মতো অসহনীয় উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূল কারণ। তিনি প্রথমে সৈনিক পরে কবি; তাঁহার চরম ও সর্বস্বপন দেশপ্রেম ও শোষণবিরোধিতার সহিত কবিত্বশক্তির সংযোগ বাংলা সাহিত্যের একটা আকস্মিক সৌভাগ্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্থূল প্রহরণের সহিত কাব্য প্রতিভার দিব্য অস্ত্র যুক্ত হইয়া রণোন্মাদকে আরও দীপ্ত ও বহুমুখী করিয়াছে। ... নজরুল যে যজ্ঞকুণ্ড-উত্থিত সহজাত কবচকুন্তলধারী দিব্য আবির্ভাব। আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা-উৎসারের ন্যায় তিনি তাঁহার অন্তঃসঞ্চিত জ্বালাকে যে ভাষা তাঁহার মুখে আসিয়াছে, যে ছন্দ তাঁহার উত্তপ্ত আবেগের স্বাভাবিক ধ্বনিচিত্র, কোনোরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তাহারই মাধ্যমে মুক্তি দিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দ যে সত্যই উচ্চাঙ্গের কবিতা হইয়াছে, ইহা কবির শিল্পবোধের জন্য নহে, নৈসর্গিক প্রতিভার জন্য। তাঁহার এই প্রতিভার উন্মেষ-রহস্য বিস্ময়কর ও ব্যাখ্যার অতীত। ... কাব্যে প্রথানিষ্ঠ সৌন্দর্যানুসৃতির যত প্রাদুর্ভাব হয়, জীবনের প্রত্যক্ষতা সেই পরিমাণে হ্রাস পায় এবং কাব্যসৌন্দর্যের সহিত জীবনাভূতির ব্যবধান বৃদ্ধির ফলে উহার আবেদন শক্তিও কমিয়া যায়। নজরুল কাব্যের স্থির ক্ষীণ জীবনস্পন্দিত, স্বপ্নময় সৌন্দর্যলোকে জীবনের আবিল স্রোতের দুর্বার গতি ও আকুতি প্রবাহিত করিয়া ইহার মধ্যে নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিলেন। মানুষের বাঁচিবার দুরন্ত ক্ষুধা, তাহার সহজ অসংস্কৃত প্রবৃত্তির অবারিত আত্ম-প্রসারণের অভিলাষ সর্বপ্রথম কাব্যের ছন্দসুন্দর ও শিল্প-শান্ত প্রতিবেশে অভিব্যক্তি লাভ করিল।

> কাব্যপ্রসাদের ঝাড়-লণ্ঠনের দ্যুতির মধ্যে কোষমুক্ত তরবারির প্রখর দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিয়া; উহার মৃদু আবেগ ও আত্মমগ্ন ছন্দ-গুঞ্জরণের মধ্যে জনতার দৃপ্ত দাবি, উচ্চকণ্ঠ অধিকার-ঘোষণা বজ্রনিনাদের ধ্বনিত হইল।[৯৪]
>
> এটি অবধারিত সত্য যে, কবি নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ না করলে অন্তত বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ তার আজকের জয়যাত্রার অগ্রগতি থেকে সম্ভবত এক শতাব্দী পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হতে।[৯৫]

নজরুল আমাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত। কেননা, আমরা আজ যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছি, তার মূলে কোনো সামরিক শক্তি ছিল না; তার মূলে ছিল আমাদের মধ্যেকার সামগ্রিক জাতীয় চেতনা এবং এই সামগ্রিক জাতীয় চেতনা সৃষ্টির মূলে ছিল প্রধানত নজরুল সাহিত্য। পাকিস্তান হাসিল একটি গণবিপ্লব। আর সব গণবিপ্লবের মতোই পাকিস্তান বিপ্লবের শক্তির উৎস ছিল গণমনের প্রস্তুতি। মুসলিম-বাংলার গণমনে এই প্রস্তুতি এনেছিল নজরুল ইসলামের

৯৪. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পৃ. ২০৮-২১০।
৯৫. মোহাম্মদ ওয়াজেদ

www.pathagar.com

গান ও কবিতা। এক কথায়, রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে টলস্টয় বা, ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে রুশো ও ভলটেয়ার বা, বাংলায় পাকিস্তান বিপ্লবের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামও ঠিক তাই। নজরুলের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের মুসলমান লেখকরা ছিল কোণঠাসা, অপাঙ্‌ক্তেয়, দুর্বল, অসন্তুষ্ট, প্রতিরুদ্ধ সংখ্যালঘু; নজরুলের আবির্ভাব একদিনে করে তুলল তাদের আত্মবিশ্বাসী, অভিজাত, আক্রমণকারী সংখ্যাগুরু। নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দরী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলাসাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম-বাংলার ভাঙা কিল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। একদিনে দূর করে দিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনম্মন্যতা। মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনে এ একটি বিপ্লব। *এ বিপ্লবের একমাত্র ইমাম নজরুল ইসলাম।*[৯৬]

জাতীয় জীবনের উদ্‌গাতারূপে নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরে গেল। নিত্যনতুন চিন্তায়, নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা সাহিত্য চল-চঞ্চল হয়ে উঠল। এমনটি সম্ভবপর হয় কেবল যুগ-প্রবর্তক কবিদের দ্বারা। তাই, মনে করি, নজরুল ইসলাম বাংলার একজন 'যুগ-প্রবর্তক কবি'। তিনি বাংলা-সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়ে শুধু নতুন যুগের সম্ভাবনা নিয়ে এলেন এমন নয়, রবীন্দ্রযুগের মধ্যেই নজরুলযুগের সম্প্রসারণ শুরু হলো।

> কার্যত দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর সাথে বেড়ে চলেছে কবি নজরুলের প্রভাব।[৯৭]

শুরু হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ ষাটের কোঠায়—রণভেরী বাজাবার বয়স তাঁর নয়। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও ভাবাদর্শ কখনো বিদ্রোহী যোদ্ধার ছিল না এবং যুগ-চিত্তের পুরোপুরি বাণীবাহক হওয়ার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাই এক অধীর উন্মুখ ও প্রতীক্ষাকাতর চিত্তে যুগে যেন তার চারণকবির প্রতীক্ষা করছিল। সেই প্রতীক্ষা ও চাহিদার ফল : নজরুল ইসলাম। মুহূর্তে তাঁর জন্য সমস্ত যুগ বাণীময় হয়ে উঠল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুসলিম দেশগুলোর নবজাগরণ, শোষিত শ্রেণীর জয়যাত্রা, মানবতার নবচেতনা ও বেঁচে থাকার লড়াই, এসবেরই তিনি বাণীমূর্তি। .. পরাধীনতার ও পরবশতার বিরুদ্ধে তাঁর মতো এদেশের আর কোনো কবিই সংগ্রাম করেন নি; এমন ব্যাপক বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেন নি কেউই। মুসলিম জগতের নব-জাগরণের কথাই বা তাঁর মতো করে আর কে লিখতে পেরেছেন? কার রচনায় ইসলামের অন্তর্নিহিত নির্দেশ এমন প্রদীপ্ত বাণীরূপ পেয়েছে?

---

৯৬. আবুল মনসুর আহমদ।

৯৭. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।

www.pathagar.com

সহস্র কণ্ঠে সহস্র মন্ত্রে সেই বাণীমূর্তি সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, বাঙালি মুসলমানের মনের আকাশে তা সঞ্চার করেছে আশা ও উৎসাহ, জাগিয়ে তুলেছে তার মনে আত্মপ্রত্যয়, আজাদির সোনালি স্বপ্নে তার মন হয়েছে বিভোর।[৯৮]

কৈশোর কাল থেকে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাই অন্যায় মনে হতো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারী আওয়াজের যাদু—তাও জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেল বাংলা কবিতার; অন্য কিছু চাইল না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলে ভাবতে পারল না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ-হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙল। ... *রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।*[৯৯]

তাঁর রচনায় যে বেদনার আগুন দেখতে পাই, তা তাঁর অন্তরের আগুনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কাব্য সত্যের প্রকাশ, ও কথার প্রকৃত অর্থ যদি হয় কবির আত্মপ্রকাশ, তাহলে নজরুল কাব্যে কবির আত্মপ্রকাশের যে সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, এমনটি বাংলার আর কোনো কবির কাব্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এই কারণেই আমরা নজরুল ইসলামকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক বস্তুতান্ত্রিক কবি বলে অভিনন্দিত করি। তিনি সর্বত্রই নিজের অন্তরের বাণীর অনুসরণ করে কাব্যজগতে তাঁর অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১০০]

বাংলা সাহিত্যে মানবতার ঐতিহ্য নতুন নয়। নজরুল ইসলামের আগেও বহু কবির রচনায় তার পরিচয় মেলে। কিন্তু মানবিক ধর্মের এমন বলিষ্ঠ জয়গান আর কোনো কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মানবিকতার জয়ধ্বনি আমরা শুনতে যে পাই না, তা নয়।

কিন্তু মাইকেলের মধ্যে যে সুর অস্পষ্ট ও রবীন্দ্রনাথে যে সুর আকাশচারী মানবিকতার; সে সুর নজরুল কাব্যে আত্মার আত্মীয়তায় ও জীবনের তপ্ততায় এক অপূর্ব ঐশ্বর্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। নজরুল ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণভাবে তার স্বধর্মে দেখতে চেয়েছিলেন।[১০১]

বাংলাকাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুলের কৃতিত্ব এই (অগ্নিবীণা) গ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কবিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'শাতিল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' সবই অগ্নিবীণার কবিতা। নজরুল-কাব্যে ইসলামি

৯৮. আবুল ফযল।
৯৯. বুদ্ধদেব বসু।
১০০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
১০১. মুজীবর রহমান খাঁ।

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি তৃতীয় ধারার সীমানা নির্দেশ করতে পারি, যার সবটাই সরাসরি ইসলাম-প্রীতিমূলক। যেমন 'কাব্যে আমপারা' 'মরু-ভাস্কর' এবং তাঁর মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রেরণায় বিকাশ লাভ করেছে। শিল্পমূল্য বিচারের কঠিন মানদণ্ড আরোপ করলে হয়তো এর সবটা চিরকালে জন্য উত্তীর্ণ হতে পারবে না। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মুসলিম গণমানসের উপর এগুলোর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং গভীর। বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ এগুলোকে আশ্রয় করেই আত্মসচেতন হয়েছে। যে রাজনৈতিক প্রয়াস পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করেছে, *নজরুলের গান যেন প্রথম থেকেই হৃদয়ে হৃদয়ে তা আবহ সংগীত রচনায় রত ছিল।*[১০২]

নজরুল ইসলামের প্রতিভার ছটা, তাঁর প্রাণের আগুন তরুণ বাংলার আকাশে-বাতাসে এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছিল যে তার প্রভাব হতে মুক্তি পাওয়া অনেকের পক্ষেই সুকঠিন ছিল। *সে প্রভাবের পরিচয় আমরা অন্তরে অন্তরে করে থাকি।*[১০৩] বাণীর বীণা তাঁর হাতে হলো 'অগ্নিবীণা', সুরের বাঁশী হলো 'বিষের বাঁশী', 'ফণি-মনসার' কাঁটাকুঞ্জে বসে তিনি গাইলেন 'ভাঙার গান'। সেদিনের বাংলা কবিতা ও গানে নজরুল এভাবে সঞ্চার করলেন প্রাণাবেগ; তাঁর যাদুকরী লেখনীর গুণে মধুশ্রাবী ভাষার ঝঙ্কারে ব্যক্ত হলো বজ্রের ব্যঞ্জনা। *সেদিন বাংলা ভাষায় এই ওজস ও পৌরুষ সঞ্চার নজরুলের অমর দান।*[১০৪] বাংলা ভাষায় অনেক কবিই একাধারে সুরস্রষ্টা ও সংগীতজ্ঞ। এটি হয়ত বাংলার মাটির গুণ। নজরুল বিবিধ বিষয়ে সংগীত রচনায় যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, আর তাতে সুর যোজনার যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জাতীয় সংগীত, ঠুংরি, হাসির গান, গজল, ধ্রুপদ, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, টপ্পা, খেয়াল, ইসলামি সংগীত, মর্সিয়া, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি যেদিকে হাত দিয়েছেন অপূর্ব সফলতা অর্জন করেছেন। একই ব্যক্তি কেমন করে কীর্তন আর ইসলামি সংগীতে সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারেন, তা স্মরণ, করে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

> এর কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই যে, তিনি কবিসুলভ সহানুভূতিতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জন-মনের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই তাদের অব্যক্ত মনোভাব পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।[১০৫]

অনেক ভালো কবির মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভালো কবি নয়, অনেক ভালো গায়কের মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভালো গায়ক নয়, অনেক ভালো সুরকারের মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভালো সুরকার নয়; বাংলা কাব্য-সাহিত্যে,

---

১০২. মুনীর চৌধুরী।
১০৩. ইবরাহিম খাঁ।
১০৪. আবদুল কাদির।
১০৫. কাজী মোতাহার হোসেন।

www.pathagar.com

বাংলার সংগীতে, বাংলার সুর-সৃজনলোকে নজরুলের নেই কোনো পিতৃপুরুষ। সে দাঁড়িয়ে আছে, স্বতন্ত্র, একক, একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি। ...

> যখন সে কবিতা লিখল, যখন সে নিজে গান রচনা করল, তার কবিতার একটি অক্ষরের মধ্যে, তার গানের একটি আন্দোলনের মধ্যে, তার সুরের একটি দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে, তার প্রকাশের ক্ষীণতম ভঙ্গির মধ্যে, এমনকি তার ভাষার রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেল না রবীন্দ্র প্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ।[১০৬]

বাংলা কাব্যের যে অধুনাতম ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যা-রূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ—ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। ... কাজী সাহেবের ছন্দ স্বত উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গি। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ... ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে।—কোনোখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। ... বিস্ময়, ভয়, ভক্তি-সাহস, অটল-বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ-গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারের মূর্তি যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব :

> আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর
> দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
> কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা
> দাঁড়ী-মুখে সারি গান 'লা-শরীক আল্লাহ!'

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গম্ভীর-ধ্বনি আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে—বিশেষ এ ছত্রের শেষ বাক্য—'লা-শরীক আল্লাহ' যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। *ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবি বাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।*[১০৭]

বিভিন্ন মতামতের মাধ্যমে নজরুল-প্রতিভার বিচিত্র ধারার পরিচয় পাওয়া গেল। তবু বলতে হয়, একটি মহৎ ধারার উপর যথেষ্ট আলোকপাত হয় নি। সেটি হচ্ছে, শিল্পীসুলভ উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার দরুন কবিকর্মের বিষয়বস্তুর অপক্ষপাত অবাধ নির্বাচন। দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা হয়েছে সকল স্তরের সবরকম মেজাজের মানুষের চিত্তচারী। 'ফাতিহা-ই-দোয়াজ দহমে'র পাশেই চলেছে 'আগমনী'র আবাহন; 'খালেদ' ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' হয়েছে শক্তিমন্ত্রের বোধন; 'খেয়াপারের তরণী'র সঙ্গে 'রক্তাম্বরধারিণী-মা'-র সুন্দর আসন। তাঁর গীতি কবিতার আসরে পদ্মার মাঝি ও কলকাতার উচ্চমঞ্চের লোক পেল আনন্দ রসের বিচিত্র ব্যঞ্জনা। পৈতে-টিকি-টুপি-টোপর তাঁর গানের মজলিসে

---

১০৬. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
১০৭. মোহিতলাল মজুমদার।

www.pathagar.com

একাকার। একই বীণায় বেজেছে গজল ও কীর্তনের সুর, ইসলামি সংগীত ও শ্যামাসংগীত, ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া-ঝুমুর-বাউল-আশাবরী-কাওয়ালি-মালকোষ প্রভৃতি সুরলহরীর বিচিত্র সমারোহ—এককণ্ঠে এত সুর কহনে না যায়। বাঁশের বাশরী ও রণতূর্য দু হাতে সমান সুরসংগত করেছে। কবিতা লিখতে বসে জাতি ও ধর্মের সামাজিক ও পদবি কৌলীন্যের পার্থক্য তাঁর মনকে পীড়িত করে নি। নজরুল প্রথম কবি, যাঁর হাতে কামার-কুমোর-কুলি-মজুর সাহিত্যের আসরে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে। নজরুল ইসলাম ছিলেন মাটির কাছাকাছি মানুষের ছেলে, অন্নের জ্বালায় তাঁকে বাল্য বয়সে রুটির দোকানে খেটে খেতে হয়েছে। এজন্য খেটে-খাওয়া মানুষের জনতার পরিচিত সরণিতে তাঁর আসন। এই আসনে তিনি যে কবিতা সৃষ্টি করেছেন, তা হয়েছে বাস্তবত সর্বত্রগামী। 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' স্থাপন করে মাটির কাছাকাছি মানুষের শরীক হতে পেরেছেন তিনি, তাই তাঁর বাণী সর্বলোক-নন্দিত। মওলবি তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে, হিন্দুরা তাঁর পাশি শব্দের তোড়ে নাসিকা কুঞ্চন করেছে, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'খুন' দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন; 'কবি-বন্ধুরা 'চিরকেলে বাণী' খুঁজে না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন। কিন্তু কবি চারণের বেশে প্রভাতের ভৈরবী গেয়ে ফিরেছেন, ঘুমন্ত জাতিকে নওবিলালের সুরে নব উষার আজান শুনিয়েছেন। নজরুলের এই সর্বমানবের চিত্তচারী ভাষায় সুরে ও ব্যঞ্জনায় ত্যাগ-ভূষিত ইসলামের সর্বধর্ম প্রেমশীলতার বাণীই উদ্‌গীত হয়েছে।

এমনি উদার দৃষ্টি নিয়ে কবিতার চর্চা করে গেছেন সমসাময়িক আর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর নাম ইকবাল। তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় কবি। বেদমন্ত্রের স্পর্শ লেগেছিল তার গায়, কোরানের আজান যেন চলেছে গীতাধ্যয়নেরই পর-প্রকোষ্ঠে, মন্দির, মসজিদ, শিখ, সুফি, দরবেশ, ব্রাহ্মণ ঠাঁই পেল তাঁর গীতিকবিতার সুন্দর আসনে।

> কবিতা লিখেছেন স্বামী রামতীর্থের উপরে, শিখগুরু নানক সম্বন্ধে; মুসলমান সন্ত-সাধাকের প্রসঙ্গ স্বভাবতই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে।'[১০৮]

এ যুগের শ্রেষ্ঠতম উর্দু ও ফারসি কবির এই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর।

অপ্রীতিকর হলেও নির্মম সত্য, রবীন্দ্রনাথ আমাদের এদিক দিয়ে নিরাশ করেছেন। *তাঁর খাস বাবুর্চি ফটিক শেখ*[১০৯] ও অসংখ্য দিনমজুর মুসলমান প্রজা থেকে মওলানা জিয়াউদ্দিন ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো মুসলিম মনীষীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ হয়েছে; ইসলাম ও মুসলমান সমাজের সদর-অন্দর সবকিছু ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল সাদী, রুমী, জামী, হাফিজের কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে; তিনি পারস্য দেশও সফর

---

১০৮. সাম্প্রতিক—অময় চক্রবর্তী, পৃ. ১২৯।

১০৯. রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৪৯ : পৃ. ৮২-৮৩।

www.pathagar.com

করেছিলেন এবং সে দেশের বিগত মুসলিম সাধক ও মনীষীদের সম্বন্ধে জ্ঞানও আহরণ করেছিলেন। তবুও ইসলামের কোনো মহৎ শিক্ষা, মুসলমান সমাজের কোনো মহৎ ব্যক্তিত্ব, কোনো চিত্র বা চরিত্র তাঁকে স্পর্শ করে নি, তাঁর কবি মানসকে উদ্বুদ্ধ করে নি কবিতার বাণীমূর্তিতে বিকশিত করতে। হিন্দু ও বৌদ্ধের কত অজ্ঞাত অশ্রুত পৌরাণিক কাহিনী, শিখ, মারাঠা, রাজপুতের কত উপকথা বাণীমূর্তি পেল তাঁর 'কথা ও কাহিনী', তাঁর বিপুলাকার কবিতা কর্মে, শুধু বেড়ায় পাশের মুসলমানই রয়ে গেল অপাঙ্‌ক্তেয় ও উপেক্ষিত, ইসলামই রয়ে গেল তাঁর কবিতার ভাষায় অনুচ্চারিত ও অবজ্ঞাত। 'শা-জাহান' কবিতাটি স্মরণে রেখেই বলছি, এটি সে জাতের ও সে সুরের কবিতা নয়; যা আমরা আশা করেছিলাম সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলিতে তার স্পর্শমাত্র নেই। রবীন্দ্রভাবের পটভূমিতে আছে বেদোপনিষদ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, শিখ, রাজপুত, মারাঠা, জৈন প্রভৃতি হিন্দু ভারতের মনঃক্ষেত্র; রাজপুতানার দুর্গমহিমা ও বীর্যকাহিনী প্রসঙ্গের কল্পনা আছে; তাঁর বাণীর মানসমণ্ডলে ইংরেজি সাহিত্যের বর্ণচ্ছটা মাধুরী-নৈবেদ্য এনেছে; শুধু ইংরেজি কেন, পশ্চিমি সাহিত্যের ফরাসি রুশসাহিত্য, স্কান্ডিনেভিয়ার সাহিত্যিক দানও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে; জার্মানদের গীতিকবি হাইনে, গ্যেটে এবং শিলারের রচনাও তাঁর কাব্যধারার সুষমা ও আলো জুগিয়েছে। তিনি খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টধর্মের উপরেও বহু প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন। অথচ নিকট প্রতিবেশী অতি পরিচিত মুসলমান 'কাব্যের উপেক্ষিতা' হয়ে রুদ্ধদ্বারে বারবার আঘাত করেও কবির ভাবরাজ্যে তরঙ্গ তুলতে ব্যর্থ হয়েছে।

এর কারণ নির্ণয় মোটেই দুরূহ নয়। তাঁর কবিপ্রতিভার অরুণপর্বে উগ্র হিন্দু জাতীয়তার বিকাশ তাঁকে প্রভাবিত করেছে; বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর নীতি শিরোধার্য করে তিনি লিখেছেন 'দুরাশা' গল্প, 'হোলিখেলা' 'বন্দিবীর' কবিতা; হিন্দু জাতীয়তার বোধনমন্ত্র গেয়েছেন 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায়।

> বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বছরের পর বছর তিনি হিন্দু রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন—যার পরিচয় মিলবে 'আত্মশক্তি ও সমূহ' শীর্ষক প্রবন্ধবলিতে।[১১০]

এতসব ভূমিকার অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তির পর আলখেল্লা ও টুপি পরে মানবতার মুক্তি সন্ধানে বিশ্বমানবিকতার বাণী প্রচারে বিশ্বময় সফর করে ফিরলেও তাঁর অপূর্ব মানব-মহিমা বোধ, উদার জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রীতি সব পাবণী ধারা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল অবচেতন মনের গহনে সঞ্জাত ইসলাম তথা মুসলিম বিমুখতায়। এটিই হচ্ছে এর প্রকৃত কারণ এবং এটিই হচ্ছে বাবু কালচারের অবধারিত গুণ। আর বাংলাদেশের তথা ভারতের মাটির গুণ; হিন্দুর ঘরে জন্ম নিলে তাকে মুসলমান-বিদ্বেষী মানসিকতায় ভুগতেই হয়, আর মুসলমান ঘরে জন্ম

---

১১০. রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. স. সং), ১২শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

নিলে এ বিষম বিষ-জ্বালা সইতেই হয়। এই নির্মম সত্যের প্রতিধ্বনি মেলে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই উক্তিতে :

হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞান বহু হিন্দু লেখকের চিত্তে বাসা বেঁধেছিল, যদিও স্বজ্ঞানের তাঁদের অনেকেরই কখনোই এর উপস্থিতি স্বীকার করবেন না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ—যাঁর পৃথিবীখ্যাত আন্তর্জাতিক মানবিকতাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কিছুতেই সুসঙ্গত করা যায় না। তবুও বাস্তব সত্য এই যে, তাঁর কবিতাসমূহ শুধুমাত্র শিখ, রাজপুত ও মারাঠাকুলের বীরবৃন্দের গৌরব ও মাহাত্ম্যেই অনুপ্রাণিত হয়েছে; কোনো মুসলিম বীরের মহিমা কীর্তনে তিনি কখনো একছত্রও লেখেন নি—যদিও তাঁদের অসংখ্যই ভারতে আবির্ভূত হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় উনিশ শতকী বাংলার জাতীয়তা জ্ঞানের উৎসমূল কোথায় ছিল![১১১]

নজরুল ইসলামের পর বাংলা সাহিত্যের ধারা কীভাবে মোড় নিয়েছে, তার চিত্রটি এনামুল হক এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে রাবীন্দ্রিক যুগের অবসান ঘোষণা করিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো যুগের অবসান একদিনে ঘটে না, কিছু দিন প্রাচীন যুগের জের চলিতে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে; 'নজরুল যুগে' হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এই সত্য স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১১২]

নজরুলের আবির্ভাবে নজরুল যুগের সূচনা হয়েছে সত্য, তবে রাবীন্দ্রিক যুগের অবসান হয়েছে, বলা চলে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের এ মতে আমরা আস্থাবান : একজন সাহিত্যিক আর একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁরা পাতার পরে আর একটা পাতা যুক্ত করে দেন। ...

একথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী—কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।[১১৩]

এ দুটি বলিষ্ঠ ধারায় বাংলা সাহিত্যের সাধক-মানস আবর্তিত বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি বিকাশে মুখর। এ সৃষ্টির ফসল মূল্যায়নের সময় আজও আসে নি। আর এটিও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (৭ আগস্ট, ১৯৪১) ও নজরুলের কবি মানসের নিষ্ক্রিয়তা (১০ আগস্ট, ১৯৪২) মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ঘটলেও আজ কোনো নতুন সূর্যের আবির্ভাব হয় নি বাংলা সাহিত্যের দুই দিগন্তে।

একথা এখানে অবশ্য স্বীকার্য, বাংলা কাব্যসাহিত্যের কিছু লেখক চমৎকার আধুনিক ও ইউরোপীয় হয়ে উঠেছেন এবং বিদেশি ভাবধারায় মেতে বাংলা সাহিত্যকেও সেই ধ্যানধারণায় পরিচ্ছদ পরিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। মিলার, কামু, কাফকা, সার্ত, জা জেঁনে, র‍্যাঁবো, বোদেলিয়র, কিংবা হাকসলি, জেমস জয়েস, ডি.এইচ.লরেন্স, ফ্লবেয়ার, নভোকভ, ইয়েটস, ইলিয়ট প্রমুখ

১১১. History of Bengal (1757-1905) C. U. p 203:
১১২. মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ৩৫১।
১১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড (বিশ্বভারতী সং) পৃ. ৪৯৮।

www.pathagar.com

বিদেশি কবি ঔপন্যাসিকেরা এঁদের জীবন্ত বিগ্রহ—আদর্শের প্রতিমূর্তি। বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন সাহিত্য জ্যোতিষ্করা যে নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেছেন বা করে চলেছেন, সেসব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বাধীন চর্চা করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্য তাঁদের সৃষ্টিকর্ম থেকে কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে কি? বাঙালি সাহিত্যিকদের এই স্বাধীন চর্চাটুকুর প্রশংসা করা যেতে পারে মাত্র। কিন্তু নতুনত্ব কই। স্বকীয়তা কোথায়? আমাদের আধুনিক সাহিত্য থেকে বিদেশিরা কি ও কতটুকু গ্রহণ করতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ—ইকবাল-নজরুল ব্যতীত কোনো কবি ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত? নিঃসন্দেহে এসব প্রশ্নেরও উত্তর শূন্য তথা নেতিবাচক। বলাবাহুল্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আজ এহেন দৈন্যদশায় অন্তর-মন ক্ষুব্ধ হয়েই উঠে। আঙ্গিকের চটক ও জৌলুস বৃদ্ধি, আর সেইসঙ্গে শাশ্বত যুগের প্রাণের সাথে হৃদয় নামক বস্তুটির দুস্তর ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। এঁদের নিকট সীমায়িত? আগামী দিনের তাৎপর্যময় আভাস যদি সাহিত্যে না থাকে, তবে তা যুগোত্তীর্ণ প্রশংসা দাবি করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ-ইকবাল-নজরুল কিংবা শেক্‌স্‌পিয়র-দান্তে-গ্যেটে-টলস্টয় যুগের গণ্ডিতে আটকে পড়েন নি বলেই দেশ-কালের উর্ধ্বে তাঁরা শত শতাব্দী পরেও আমাদের নিরন্তর চিন্তা ও গবেষণায় বিষয় হয়ে থাকবেন।

অতঃপর বলতে হয় এ যুগের দুটি মুসলমান সাহিত্যগোষ্ঠীর কথা। ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য সমাজ (মুসলিম সাহিত্য সমাজ)-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। *তার ১১ দিন পরে এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ।*[১১৪]

এই সাহিত্য সমাজের অন্যতম উদ্যোক্তা কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন,

> তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা' আর তাঁদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' Emancipation of the intellect. এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে—কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তফের লেখক রোঁমা রোঁলার কাছ থেকে পারসিক কবি সাদীর কাছ থেকে, আর হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে। এঁদের অন্যতম পরিচালক পরলোকগত অধ্যাপক আবুল হোসেন এক সময়ে বলেছিলেন, হজরত মুহাম্মদের একটি বিখ্যাত বাণী হচ্ছে 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ'—আল্লাহর গুণাবলিতে বিভূষিত হও; আল্লাহর গুণাবলিতে বিভূষিত হওয়ার অর্থ অনন্ত সদগুণে বিভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই—সে হজরত মুহাম্মদের চাইতেও বড় হতে পারে। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও চিন্তা চর্চার কেন্দ্র—সেক্ষেত্রে এঁরা খাঁটি হতে চেয়েছিলেন। এঁদের আর একজন লেখক মহাপুরুষের অনুবর্তিতা সম্বন্ধে

১১৪. শিখা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বার্ষিক বিবরণী। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের', 'পৌরোহিত্য' ও 'জাতক্রিয়ায়' কুলীন ব্রাহ্মণের ' পৌরোহিত্য'—ভাষার ব্যবহারে বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

> বলেছিলেন. বুদ্ধিবিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া ... তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায় এবং সেই অধিকারে প্রয়োজন হলে, তাঁকে অতিক্রম করায় ...।[১১৫]

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্বন্ধে কাজী সাহেবের উক্তিগুলোকে উদ্দেশ করে, 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থের সমালোচনায় হুমায়ুন কবির বলেছেন,

> কাজী সাহেব ঢাকার সাহিত্য সমাজের নামোল্লেখ করেছেন। 'শিখা' পত্রিকা এবং ঢাকার সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর ছিল বলে তাদের আলোচনা চিত্তাকর্ষক কিন্তু ঢাকার বাইরেও যে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন প্রেরণা এসেছিল, তার যথাযথ উল্লেখ আলোচ্যগ্রন্থে মিলবে না। কলকাতায় এ সময় যে মুসলমান সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, কাজী সাহেবের নিজস্ব মাপকাঠিতে বিচার করলেও তাঁদের দান বোধ হয় ঢাকার সাহিত্যগোষ্ঠীর তুলনায় কম হবে না। শিখা পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন, তাঁরা মুসলমান, এই কথার উপর জোর দিয়ে তাঁরা বুদ্ধির মুক্তি সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কলকাতায় যাঁরা এসময় লিখতে শুরু করেন, তাঁরা মুসলমান হিসেবে কোনো স্বীকৃতি দাবি করেন নি। মানবতার ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল তাঁদের লক্ষ্য, তবে সেই সঙ্গে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, যেহেতু মুসলমান সমাজে তাঁদের জন্ম এবং সেই সমাজে তাঁরা প্রতিপালিত, তাঁদের রচনায় শাশ্বত সত্যের প্রকাশে মুসলমান সমাজের ছায়া স্বভাবতই পড়বে।[১১৬]

'শিখার' অধুনালব্ধ সংখ্যাগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সাহিত্যচিন্তা বলতে প্রায় কিছু ছিল না, কিন্তু সমাজচিন্তা ছিল ষোলো আনা এবং এ চিন্তাটা ছিল, মুসলমান সমাজে জন্মলাভ করাটাই ভীষণ অপরাধ-বোধের মতো। দুঃস্থ অনগ্রসর সমাজের শোচনীয় অবস্থার কারণগুলো কি, সেসবের অনুসন্ধান এবং সেসব দূরীকরণ-মানসে বাস্তব কর্মপন্থা অনুশীলনের উদ্যম এ সমাজের কারো ছিল না, ছিল সমাজটাকেই দায়ী করে তার নির্মম সমালোচনাতেই মুখর হওয়ার প্রবণতা। এই সহানুভূতিহীন নির্মমতা ও মুসলমানের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের, এমনকি বিশ্বনবীরও বিরুদ্ধে অশোভন, অসংযত ও অশ্রদ্ধ উক্তি সমূহের জন্যই তৎকালীন ঢাকার মুসলমান সমাজ বিরূপ হয়ে উঠেছিল সাহিত্য সমাজের প্রতি। সাহিত্য সমাজের আদর্শ ছিল রোঁমা রোঁলার বহু বিঘোষিত উক্তি 'চিন্তা ও আত্মার স্বাধীনতা' (Independence of the Spirit) যার সমর্থন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং যে আন্দোলনের মুখ-পুস্তিকা ছিল Declaration of Indepenenee of Spirit. আদর্শ মহৎ এবং তার লক্ষ্যও মহৎ। কিন্তু মহৎ আদর্শের অনুশীলনে বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন না করে শুধু আদর্শ প্রচারের দম্ভটাই

---

১১৫. বাংলার জাগরণ, পৃ. ১৯৪-১৯৫।
১১৬. চতুরঙ্গ, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৯৪।

www.pathagar.com

বড় কথা নয়। সাহিত্য সমাজের এই দম্ভটাই ছিল অশোভন; এটিই হুমায়ূন কবীরের সমালোচনায় সুপরিস্ফুট। উল্লেখযোগ্য, প্রজ্ঞায় পাণ্ডিত্যে শানিত বুদ্ধিতে ও তীক্ষ্ণ মননশক্তিতে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ছিলেন সে আমলের মুসলমান যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন। কিন্তু তাঁর যেমন মুসলমান হওয়া সোচ্চার ঘোষণা ছিল না, তেমনি তাঁর চিন্তাধারায় ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোথাও অশ্রদ্ধ বা নির্মম উক্তি ছিল না। অনুমান হয়, শুধু এই কারণেই ডক্টর শহীদুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করলেও তার সঙ্গে সংস্রবহীন ছিলেন। দ্বিতীয়ত, কোনো একটি তকমাকে সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষণ হিসেবে সোচ্চার ঘোষণা জানালে, প্রচ্ছন্ন দুর্বলতার আশ্রয় নেওয়া যায়, যার আড়ালে থেকে শুষ্ক বড় বড় তত্ত্বকথা শোনানো সহজ হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,

> 'বিশেষ একটি চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো একটি চাপরাশের জোরে যে সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানাব তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়'।[১১৭]

এই দুর্বলতাটি কীসের ছিল এবং কোন দৈন্য দোষে এ 'সমাজের' সভ্যগণকে সমকালীন মুসলিম সমাজ অভিযুক্ত করেছিলেন, বলার অপেক্ষা করে না। মুসলিম সাহিত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কাজী সাহেবের রামমোহন-রবীন্দ্র-রোঁমা রোঁলা প্রীতি ও ভক্তির মাত্রা এত প্রবল যে তাঁর চিন্তাধারাকে এঁরাই আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, আর এজন্য সে আমলে সকলের মুখে মুখে তাঁর নামে অপবাদ শোনা যেত, *এ তিন ব্যক্তিই তাঁর 'থ্রি-আরস' বলে।*[১১৮] একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ সেইদিনে মুসলমানদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং তার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের সাহিত্যিক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

দ্বিতীয় সাহিত্য গোষ্ঠীটি 'আজাদ' পত্রিকা অফিসে কলকাতাবাসী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' নামাঙ্কিত হয়ে ১৯৪২ সালে। নাম থেকেই পরিচ্ছন্ন যে, এ গোষ্ঠীয় সকলেই ছিলেন পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁদের এ বিশ্বাস ছিল যে, সাহিত্য সৃষ্টির মৌল লক্ষ্য থাকবে মানবতার ভিত্তিমূলে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সংস্কৃতির সাধকরা বিশ্বমানবিকতার পথিক। কিন্তু এই বিশ্বাসেও তাঁরা সুদৃঢ় ছিলেন যে, তাঁদের জন্ম মুসলমান সমাজে এবং সেই সমাজের পরিবেশে তাঁরা প্রতিপালিত। অতএব তাঁদের সাহিত্য সাধনায় মুসলমান সমাজের চিন্তাভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকশিত ও প্রকাশিত হবে, তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সীমানা ও রূপরেখা নির্ধারিত ও রূপায়িত হবে। এবং তাঁদের সাহিত্য কর্মে শ্বাশ্বত সত্যের ও মানবিকতার যে-

১১৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩ খণ্ড (বিশ্বভারতী সং) পৃ. ৪৯৭।

১১৮. ইংরেজিতে 'The three R's : reading, writing and arithmatic.'

www.pathagar.com

প্রকাশ হবে তাতে স্বভাবতই পড়বে মুসলমান সমাজের ছায়া, তারই সংস্কৃতি প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হবে। তাঁদের আরও বিশ্বাস ছিল, বুদ্ধির বিকাশ হয় অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার মনোভাব সম্প্রসারণে ও তার পরিচর্যায়। মুসলমানরা যেদিন থেকেই প্রশ্ন করা ভুলে গেল, 'তকলিদ'-কে অকুণ্ঠভাবে বিনাবিচারে গ্রহণ করতে শুরু করল 'তনকিদ' কে বিসর্জন দিয়ে, সেদিন দেখে তাদের বিচারবুদ্ধিরই অবনতি ঘটে নি, মননসংকটও দেখা দিল। অতএব তাঁদের কর্তব্য হলো, সমাজ মানসকে জাগ্রত করে সমাজ জীবন উজ্জীবিত করা, সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলোকে খুঁচিয়ে ক্ষত সৃষ্টি না করে সেগুলোর নিরসন করে সমাজকে বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ও প্রগতিমুখী করে তোলা। এ ব্রতে তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা ও বুদ্ধির মুক্তিকে আকাশচারিতায় পর্যবসিত না করে স্বসমাজ ও স্বজাতির পুনরুজ্জীবন সাধনে প্রয়োগ করেছিলেন। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' ও 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় : পরধর্মো ভয়াবহ : '—যে মানস ও বুদ্ধি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছিলেন স্বজাতি ও স্বসমাজের পুনরুজ্জীবনে—তাঁদের চিন্তাধারায় তারই প্রতিধ্বনি ছিল। সমাজকে অস্বীকার করে ও তাকে রসাতলে নিক্ষেপ করে অন্য কোনোখানে আশ্রয় ও সান্ত্বনা না খুঁজে সমাজকে টেনে তুলে বাসযোগ্য ও আদর্শিকভাবে রূপায়িত করাই ছিল রেনেসাঁ সোসাইটির স্বপ্ন ও সাধনা।

এ আদর্শ নিবেদিত সাহিত্যিক গোষ্ঠী আজও অনির্বাণ রেখেছেন তাঁদের পুনরুজ্জীবন সাধন। ইসলামকে তাঁরা করেছেন এ সাধনার মৌলভিত্তি এবং তার রঙে রাঙিয়ে জগৎ ও জীবনকে করতে চেয়েছেন মহিমাময়। *মুক্তবুদ্ধির প্রতীক গ্যেটেরও শেষ শিক্ষা হয়েছিল : Only religious men can be creative, যাঁরা ধর্মনিষ্ঠ—সৃষ্টিধর্মী হতে পারেন তাঁরাই।*[১১৯] আর ইসলামের চেয়ে কোনো ধর্ম মানুষকে বেশি সৃষ্টিধর্মী করতে পারে?

বাবু কালচারের গতি-প্রকৃতি : সংস্কৃতির সংকট

ইংরেজ সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিক্রমা কালে আমরা এটিকে 'বাবু কালচার' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। সকলেই জানেন, ইউরোপের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল দক্ষিণ ভারতেই; কিন্তু ইংরেজরা বাংলাদেশে কেন ও কীভাবে হর্তাকর্তা হয়ে বসল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, সে-রহস্য পূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ যেভাবে মনেপ্রাণে ইউরোপকে গ্রহণ করেছিল, ইউরোপের ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নেবার চেষ্টা করেছিল, অন্যত্র তার পরিচয় মেলে নি। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও পশ্চিমে—মাদ্রাজে এবং বোম্বায়ে—ইউরোপের কার্যকরী দিকটাই বেশি প্রবল হয়েছে। মাদ্রাজে ইংরেজি

---

১১৯. এখানে ইকবালের উক্তিটি স্মরণীয় : হরকে উরা কুওতে আখলাক্ নিস্ত; পেশ্ মা জুয্ কাফের ও যিন্দীক নিস্ত : যে সৃষ্টিধর্মী নয় আমার দৃষ্টিতে সে কাফের ও যিন্দীক।

www.pathagar.com

ভাষাকে বেশি ঠাঁই দিয়েছে, কিন্তু মনে হয়, শুধু ভাষাকেই নিয়েছে, তার সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রাণধর্মকে গ্রহণ করে নি। বোম্বাই ইংরেজের ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা ভালোভাবে আয়ত্ব করে এদিকেই ঝুঁকেছে বেশি করে, কিন্তু সেখানে ইউরোপীয় দর্শন ও চিন্তাধারা গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। সমকালীন ভারতের সংস্কৃতির মূলধারা থেকে কিছুটা বিচ্যুত ছিল বলেই ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে বাঙালি বর্ণহিন্দুরা বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিল। এজন্য প্রতীচ্য ভাবধারার আলোড়ন এখানে জেগেছে প্রবল হয়ে—সংঘাত, সংগম ও সমন্বয় সাধানের বেশি সাধনা হয়েছে বাংলাদেশেই।

আমরা একে বাবু কালচার বলেছি এই হেতুতে যে, এ কালচার ছিল একান্তভাবে শহরকেন্দ্রিক—আরও সঠিক হবে বলা কলকাতাকেন্দ্রিক—কারণ নব্য শিক্ষিত বাবুশ্রেণী ব্যতীত এ কালচারের অন্যত্র গতি ও বিস্তৃতি ছিল না। বাংলাদেশের ইংরেজ শাসনে বুর্জোয়াতান্ত্রিক অপূর্ণ ও খণ্ডিত সমাজে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম, তাতে স্বাধিকারবোধের প্রশ্রয় থাকলেও সামাজিক সমর্থন ছিল না। আমরা আগেই বলেছি, উনিশ শতকী নবজাগরণ মুসলমান সমাজকে বাদ দিয়ে হয়েছিল; আর হিন্দু সমাজের অতি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সীমিত থাকায় হিন্দু সাধারণ সমাজও তার সমর্থক ছিল না। তার ফল, আজকের দিনেও মনে হয় সর্বদা ভালো হয় নি। শিক্ষিতদের অর্বাচীন সাংস্কৃতিক অন্বেষণে দেশজ মনোবৃত্তি এবং লোক চৈতন্যের সূত্রসমূহ স্বীকৃত হয় নি। অর্থাৎ শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণের সম্বন্ধ স্থাপনের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয় নি, সুস্থ মনোভাব গড়ে উঠে নি। এজন্য দেখা যায়, হিন্দু সাধারণ জন-জীবন তখনও আনন্দের সন্ধান করেছে যাত্রা, পাঁচালি ও কথকতার আসরে—পট পুতুল ও আলপনা শিল্পচর্চায়; ব্রতকথা, ছড়া, আর রূপকথার লৌকিক সাহিত্যকর্মে।

মধ্যযুগে লোক সংস্কৃতি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল নানারকম হস্তশিল্পে ও কুটিরশিল্পে। অংকন ও ভাস্কর্যেও তার দান কম ছিল না। কিন্তু বাবু কালচারে অভ্যস্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য পণ্যদ্রব্যের অবাধ আমদানিতে সেসবের দিকেই আকৃষ্ট হলো, বিলেতি কায়দায় দেহ রূপসজ্জা, গৃহসজ্জা এমনকি খানাপিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। দেশীয় সংস্কৃতির চিহ্নগুলো একে একে লুপ্ত হতে থাকল। এই পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রীতির আজও শেষ নেই। এজন্য শুধু প্রাচীনপন্থীদের মুখে শোনা যায় বিরক্তিকর গুঞ্জন; আর নব্যদের পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে দেখা যায় নিত্য নতুন ফ্যাশনের আবির্ভাব।

প্রায় তিন শ বছরের মুঘল বাদশাহি এ উপমহাদেশে শুধু একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করে নি, মোগলাই বনাম ফারসি সংস্কৃতির আবরণে সমগ্র দেশটাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। দরবারি ও সরকারি ভাষা ছিল ফারসি, কূটনৈতিক ভাষা ফারসি, শিক্ষিত ও মার্জিত সমাজের ভাষা ফারসি। কাব্য-সাহিত্য, শিল্পকলা, চারুকলা, সাধারণ আদব-কায়দা ছিল ফারসি ভাষা ও ইসলামি

www.pathagar.com

সংস্কৃতির অনুসারী। মুসলমানের ছেলে শিক্ষা করত আরবি ও ফারসি ভাষা, ইসলামি ধর্মশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ছেলেরা শিক্ষা করত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য। সাদীর বয়েত, হাফিজের গজল ও রুমীর মসনবি কথাবার্তায় উদ্ধৃত করতে না পারলে কোনো হিন্দু বা মুসলমান সন্তান শিক্ষিত হিসেবে গণ্য হতো না। এভাবে তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের ছিল একটি ভাষা, বৈদগ্ধ্যের একটি *চিহ্ন—ফারসি সাহিত্যে পারদর্শিতা। ফারসি জবান মুখে মুখে চলত সাধারণ্যে কাবুল থেকে মাদুরা পর্যন্ত—তা সে মুঘল অর্থাৎ মোগল বা হিন্দুর দরবারে হোক, মোগলে বিরুদ্ধশক্তি মারাঠার সেনাশিবিরেই হোক।*[১২০] মোগলাই ভাষা, মোগলাই খানা, মোগলাই পোশাক-আশাক, চাল-চলন, আদব-কায়দা সমানভাবে সর্বত্র প্রচলিত ছিল। হিন্দুর রসনাতৃপ্তিহীন খাবারের স্থান গ্রহণ করেছিল অভিজাত সমাজে ইরানি পোলাও, বিরিয়ানী ও নানাবিধ সুখাদ্য। হিন্দু অভিজাত সমাজের খানাপিনায় ইরানি ও মধ্য এশিয়ার আমীরদের অনুকরণ ছিল পুরামাত্রায়। ...

> আজও রাজপুত ও হিন্দু রাজারাজড়া টেবিলে যেসব খাদ্যসম্ভার সাজান, সেসব প্রধানত মোগলাই খাবার এবং আজও মুশহুর খানা হিসেবে শাহজাহানি পোলাও, জাহাঁগিরি কাবাব প্রভৃতির আদর অপরিসীম'।[১২১]

> 'আমাদের স্মরণ রাখা উচিত সেইদিনে উভয় সমাজেই ফারসি সংস্কৃতির প্রচলন ছিল, ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির ছিল একটা উচ্চ ও রাষ্ট্রিক মর্যাদা। মোগলাই সম্বন্ধ ছিন্ন করার অর্থ ছিল একটা মহৎ ও মূল্যবান সংস্কৃতির বন্ধন ছিন্ন করা'।[১২২]

আর এ বিষয়ে সব ঐতিহাসিকরাই একমত যে, সমকালীন পৃথিবীর বুকে মোগল বাদশাহি ছিল শক্তিতে ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে কীর্তিত।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যানুশীলনে বাঙালি হিন্দুরও উৎসাহ ও আগ্রহ কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর কথাবার্তায় অজস্রভাবে ফারসি বয়েত ও মসনবী আবৃত্তি করতেন। বর্তমানের পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন তাঁর যুক্তির ও তর্কের পোষকতায় পদে পদে ইংরেজ ও ইউরোপীয় (কন্টিনেন্টাল) জ্ঞানীদের উক্তির উদ্বৃতি দেন, এক শ-দেড় শ বছরের পূর্বে শিক্ষিতদেরও তেমনি অভ্যাস ছিল ফারসির উদ্বৃতি দেওয়া। ১৮৩৫ সালে যখন ফারসির বদলে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করার সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয় তখন তার প্রথম ধাক্কায় বিদগ্ধ হিন্দু মনেও কী প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, তার চিত্রটি এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ডি. এল. রায়ের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় :

---

১২০. বলাবাহুল্য, কাবুল ছিল মুঘল বাদশাহির অন্যতম সুবাহ : Cambridge Hist. of India, vol iv, p 323.
১২১. A Survey of Indian History. p 169.
১২২. The Nabobes, p xiv, xviii.

www.pathagar.com

বাঙালির পক্ষে পারস্য একরকম অকর্মণ্য হইল এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইল, অথচ উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রম পূর্বক যা কিছু শিখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা হইল এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরেজি পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যায় এককালে বিরত হইয়া ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।[১২৩]

দেওয়ানজীর দুঃখ বোঝা গেল এবং 'বিদ্বান' হওয়ার জন্যে তাঁর ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করার কারণও জানা গেল। অবশ্য 'বিদ্বান' হওয়ার এ মন-মানসে তখন সমগ্র হিন্দু সমাজ আবর্তিত হয়েছে এবং ইংরেজকে দেবতাজ্ঞানে তার 'দেবভাষা' শিক্ষার্থে হিন্দু সন্তান মাত্রেই লালায়িত হয়ে উঠেছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় এক পত্রে লিখেছিলেন : যেদিন ছোট এ. বি. লিখলুম, বাবার আনন্দ ধরে না, স্বর্গ যেন সামনে দেখতে পেলেন। পাড়ায় খবর দিয়ে আশীর্বাদ কুড়িয়ে ফিরলেন।

বললেন, 'সাহেবরা খুশি হলে আর চাই কি। দেনেওলা এরাই। দ্যাখ—সাহেব দেখলেই সেলাম করবি। ওরাই কলির দেবতা।'[১২৪]

এই কলির দেবতা ও দেবভাষার বোধনটা কোন স্বার্থজ্ঞান দ্বারা ষোড়শোপচারে হয়েছিল, বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুসলমান ঠিক এত সহজে তার মুখের ভাষা ও কালচারে পরিবর্তনটা গ্রহণ করতে পারে নি। এই না পারার কারণসমূহ পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকে যখন বলতে দেখি,

'ইংরেজ আমলের সূচনায় হিন্দু ও মুসলমান সম্বন্ধে ইতর বিশেষ করার প্রয়োজন ইংরেজদের মনে দেখা দিয়েছিল মনে হয় না' কিংবা 'মুসলমানের রাজত্ব যে গেল এ চেতনা মুসলমানের দেখা দেয় নি বললেই চলে।' ইতিহাসকে এরূপ বিকৃত ও অসঙ্গতরূপে বর্ণনা করার কায়দাটি কাজী সাহেবের বিশেষ গুণ এবং কোনো স্বার্থবশে এরূপ বেকায়দা অবস্থায় তাঁকে এমন অসত্য উক্তি করতে হয় তাও সকলের অজানা নয়।[১২৫]

কিন্তু সে যাহোক, মেকলেপন্থীরা যে উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে ইংরেজি শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করেছিলেন, সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নি, আমলাবাহিনী তার উৎপাদনের যন্ত্ররূপেই ইংরেজি শিক্ষার ব্যবহার হয়েছে; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার মর্মান্তিক ব্যর্থতা ঘটেছে। এই পরিণামটিকে লক্ষ করে একজন লিখেছেন :

---

১২৩. আত্মজীবনচরিত (ন. সং) পৃ. ৩৭-৩৮।

১২৪. বেণু পত্রিকা, ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যা।

১২৫. 'বাংলার জাগরণে' এরূপ বহু অসঙ্গত উক্তি আছে ও স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে পুস্তকখানির সমালোচনা করার ক্ষেত্র নয়, সেজন্য সেসবের উল্লেখ করা হলো না।

www.pathagar.com

তাদের উদ্দেশ্যই ছিল সরকারি আমলা, উকিল, ডাক্তার ও বাণিজ্যিক কেরানীবাহিনী সৃষ্টি করা এবং এখানেই উদ্দেশ্য আশ্চর্যরূপে সফল হয়েছে। কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হয়েছে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে।[১২৬]

এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান মোটেই শক্ত নয়। যে বাবু কালচারের সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সীমিত ক্ষেত্রে, বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গে তার সংযোগ না থাকায় দেশের মাটিতে তার শিকড় বসে নি, এজন্য এ সংস্কৃতির সংকট ঘটেছে বারে বারে।

বিষয়টি আরও বিশদ করা যাক। ব্রিটিশ বিজয়ের সূচনায় দেশের সমাজ অন্তর ভেদ করে কি প্রক্রিয়ায় ও কোনো স্বার্থবশে নতুন সমাজের আবির্ভাব হয়েছিল, সে ইতিহাসে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এই নবগঠিত সমাজের আর্থিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিন্যাসের সঙ্গে পুরাতন সমাজের কোনোরূপ সংযোগ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নতুন সমাজের ভূস্বামী শ্রেণীর সঙ্গে পুরানো সমাজের ভূস্বামী শ্রেণীর, এমনকি নতুন শিক্ষাগর্বী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পূর্বতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কোনো সাদৃশ্য বা যোগসূত্র ছিল না। দেশের রাষ্ট্রিক সংকটকালে ব্রিটিশ অধিকারের সহায়ক হিসেবে নতুন ভূস্বামী নতুন বণিক শ্রেণী ও নতুন বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব এবং ব্রিটিশের অনুগ্রহেই তাদের পরিপুষ্টি। স্মরণীয় যে, স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় পুরাতন সমাজের মধ্যে নতুন সমাজের আবির্ভাব ঘটে নি, এজন্য এ দুটি সমাজধারা পাশাপাশি অবস্থান করেছে জন্মগত বিরোধ নিয়ে এবং তার দরুন সংঘাত নিয়ে। নতুন ভাবাদর্শ ও শক্তির অভিঘাত সহ্য এবং উপেক্ষা করেও পুরানো সমাজ—কাঠামো বৃহৎ জন-জীবনকে অবলম্বন করে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে চলছিল; তার সঙ্গে নতুন সমাজের ব্যবধান ছিল বিস্তৃত। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট, অতএব নতুন সমাজ নিজেকে সাম্রাজিক শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভেবেছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ও পরিপুষ্টির তাগিদে। এসব কারণে নতুন সমাজের ব্যক্তিরা নিজেদের উৎকেন্দ্রিক অবস্থিতির জন্যে একদিকে ছিল বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অন্যদিকে ছিল সবরকমের সামাজিক দায়মুক্ত। আত্মসর্বস্বতাই ছিল তাদের জীবনাচরণের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে আত্মসর্বস্বনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাবু কালচারের এই লক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নতুন সমাজের সমস্যা ছিল দুটি, প্রতিষ্ঠালাভের মানসে দেশীয় বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, আবার বণিকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কটি অক্ষুণ্ন রাখা। এই দ্বিবিধ সমস্যার স্ববিরোধের তরঙ্গে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ-মানস বারে বারে উদ্বেলিত হয়েছে এবং সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

---

১২৬. The Education in India—Arthur Mayhew, p 149.

www.pathagar.com

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মসচেতন বিদগ্ধ মানস বরাবর বৃহত্তর গণজীবনকে দূরে রেখেছে; কেবল স্বার্থসংকট উপস্থিত হলেই দেশসংকট ও সংস্কৃতিসংকটের ধূয়া তুলেছে। কিন্তু সাময়িক আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপনের প্রয়াস পেলেও প্রাণের সুর বাজে নি, গভীর স্থিতিশীল সম্পর্কের প্রয়োজনবোধ করে নি।[১২৭]

১৮৭০ সালের পর থেকে নতুন সমাজ লক্ষ করল, ব্রিটিশের পিতৃস্নেহ উচ্চ পদাভিলাষী শিক্ষাগর্বী মধ্যবিত্তের ওপর আর ঠিক একই ধারায় বর্ষিত হচ্ছিল না, ইঙ্গ-ভারতীয় ও হিন্দু সম্পর্কটায় চিড় ধরেছিল।

রাজনারায়ণ বসু আক্ষেপ করেছেন, 'এখন সেকাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে তাঁহাদিগের পূর্বকার সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাত বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাহাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই ... মনে হয় ইংরেজি শিক্ষা না করাও ভালো ছিল'।[১২৮]

বাণিজ্যিকক্ষেত্রে ও চাকরি ক্ষেত্রে হতাশা জমতে লাগল; আর্থিকসংকট থেকে সাংস্কৃতিক সংকট রূপ নিল। নব্য শিক্ষিত সমাজ 'স্বদেশী' আন্দোলনে ও হিন্দু জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগল। এর প্রথম চরম রূপ দেখা দেয় ১৯০৫ সালে, বঙ্গ-বিভাগ কারণে। শিক্ষিত বর্ণহিন্দু জীবনোপায়ের ক্ষেত্রটা একেবারে ক্ষুদ্র ও সীমিত হয়ে যাচ্ছে দেখে দিশেহারা হয়ে উঠল, 'বঙ্গ-মাতার' অঙ্গচ্ছেদ হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন আরও জোরদার হলো। কিন্তু সেবার সংকটটা কেটে গেল ইংরেজের পুরাতন পিতৃস্নেহের ধারা পুনর্বার বর্ষিত হওয়ার ফলে। 'সম্রাটের বরদান' হিসেবে বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছিল।

কিন্তু নতুন সংকট উপস্থিত হয়েছে বর্তমান বিভাগোত্তর কালে। পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে কোন স্বার্থবশে হিন্দু শিক্ষিত সমাজ এবার বাংলা বিভাগ করেছে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে। সাপের খোলস পরিবর্তনের মতো স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে 'বঙ্গমাতার' অঙ্গচ্ছেদ রদের প্রয়োজন হয়েছিল ১৯১১ সালে, আবার 'বঙ্গমাতাকে' বিভক্ত করে আঙিনায় বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। গঙ্গাতীরবাসী বাবু কালচার পবিত্র আবহাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। পূর্ব বাংলায় এ বাবু কালচারের যারা অল্পসংখ্যক ধারক ও বাহক ছিল তারাও রাতারাতি সীমান্ত পারে চলে গেছে, বাবু কালচারকে শিরোধার্য করে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল, দেশবিভাগের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পার্থক্যটাও স্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হবে। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনীতির কোনো জায়গায় এ নীতি নেই যে রাষ্ট্র দুই হলেও সংস্কৃতি এক হবে; এমনকি একই ভাষা দুই রাষ্ট্রের ভাষা হলেও এক সংস্কৃতি হতে হবে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা দুটি স্বতন্ত্র পৃথক রাষ্ট্র, তাদের সংস্কৃতিও পৃথক; এমনকি একই ইংরেজি ভাষা দুটি রাষ্ট্রের মাতৃভাষা হলেও

১২৭. রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ৯১০-৯১১ পৃ. দ্রষ্টব্য।
১২৮. সেকাল আর একাল, পৃ. ৩-৪; ৭৯।

www.pathagar.com

'আমেরিকান—ইংলিশ' ও 'ইংলিশ-ইংলিশ' এক নয়, দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেছে তাদের মধ্যে। আমেরিকার ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংল্যান্ডের ভাষা ও সাহিত্য এরূপ পৃথক মোড় নিয়ে দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে যে, কোনোকালে দুটির জন্মসূত্র একই ছিল, আজকের দিনে আর সেটি ধরা যাবে না।

এবং এই বিভাগ ও ব্যবধান স্বাভাবিক। ভাষা ও সংস্কৃতি এক নয়, একার্থক নয়, সমার্থকও নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির আবর্তন ও পরিবর্তন, বিকীরণ ও উন্নয়ন একই ধারায় হয় না, একতালে হয় না ও একই সময়ে হয় না। তার একটি অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। মিশরের-হেজাজের-জর্দানের সংস্কৃতি এক নয়, ভাষাও ঠিক এক-আরবি নয়। সুতরাং ভাষা এক হলেই সংস্কৃতি এক হতে হবে, রাষ্ট্র বা সমাজবিজ্ঞানের কোনো সূত্রে এ নীতির সমর্থন মেলে না।

'বাবু কালচার' গঙ্গাতীরস্থ হয়েছে এবং তার নাভিশ্বাস উঠেছে অন্য কারণে। এবার বাংলা বিভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত, এর ব্যতিক্রম অচিন্তনীয়। এ বিভাগ চূড়ান্ত, অমোঘ, চিরন্তন। কিন্তু এ বিভাগের ফলে ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট বাবু শ্রেণীর ঘটেছে অস্তিত্বের সংকট। মানুষ সব সংকটের আক্রমণ সহ্য করে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু আর্থিক সংকট অসহ্য। সেই সংকটটাই প্রকট হয়ে উঠেছে বাবু শ্রেণী সমাজে এবং সংকটকালে একমাত্র আশার আলোক দেখতে পাচ্ছে, সাংস্কৃতিক সংকটের আন্দোলনের মধ্যে। মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করার যেসব প্রক্রিয়া আছে, ভাষার ও সংস্কৃতির প্রশ্ন সেগুলোর মধ্যে মোক্ষম। কিন্তু ভাষার প্রশ্নটা পূর্ব পাকিস্তানের নিশ্চিতরূপেই মীমাংসিত হয়ে গেছে। অতএব 'সংস্কৃতির সংকট' ধূয়া ছাড়া আর গতি নেই। সংস্কৃতির সমন্বয়, সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সংস্কৃতির সংশোধন ও সংরক্ষণের ধূয়া তুলে জনমনকে বিভ্রান্ত করা মোটেই শক্ত নয়। এজন্যই 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সংগীত ভেসে আসে!'

কিন্তু যে 'বাবু কালচার' গঙ্গাতীরস্থ হয়েছে, তার প্রতি মোহ কেন জেগে উঠে 'বাবু কালচার' ভক্ত-মহলে, তার কোনো নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিও দেখানো হয় না নির্মোহ হয়ে। যে 'বাবু কালচারে'র জন্ম হয়েছিল বর্ণসংকর ক্ষেত্রে এবং ইংরেজের দালাল-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের বদৌলতে এবং এদেশের নাড়ির সঙ্গে যার কোনো সংযোগ ছিল না, সেই গঙ্গাতীরস্থ 'বাবু কালচারের' অতঃপর গঙ্গাজলি হবে, কি পুনরুজ্জীবন হবে, সে চিন্তার ভার গঙ্গাতীরবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির সংশপ্তকের, কোনো পাকিস্তানির নয়। 'আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান'।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মুখে শোনা যায়, 'আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি পাকিস্তানি'। অনুমান হয়, তিনি নিজের নিখুঁত পরিচয় দেবার সদুদ্দেশ্যেই এরূপ বলে থাকেন। কিন্তু তবু বাকি থেকে যায়, তিনি কি পুরুষ না স্ত্রী, যুবক না বৃদ্ধ, সমর্থ বা বিকলাঙ্গ এসব তো বলছেন না। আমাদের জানা মতে কেউ নিজেকে

www.pathagar.com

'বাঙালি হিন্দু হিন্দুস্তানি' 'খ্রিষ্টান ফরাসি কানাডিয়ান' কিংবা 'ক্যাথলিক ডাল্লাস আমেরিকান' হিসেবে পরিচিত হতে চায় না, পাছে কেউ তার সুস্থ মস্তিষ্কের সন্দেহ করে। সোজা হিন্দুস্তানি, ইংরেজ, জার্মান, রুশ এই যখন পরিচয় দেওয়ার রীতি, সেখানে সোজা 'পাকিস্তানি' বলে নিজেকে পরিচিত করতে কুণ্ঠা কেন? আল্লাহ জানেন অন্তরের বিশ্বাস, কিন্তু কেউ নিজেকে মুসলমান বললে ধরেই নিতে হয়, সে মুসলমান।

বর্ণসংকর 'বাবু কালচারের' ভেল্কি এখনও শেষ হবে না তার শেষ পরিণতি মীমাংসিত হয়ে যাবার পরেও? সংস্কৃতির সংকট নয়, মনন সংকটের দরুনই এই কল্পিত বিভীষিকার আতঙ্ক।

মনন সংকট

আমাদের মননসংকটের চিন্তায় প্রথমেই ছেলেবেলায় বুড়ি দাদিমার নিকট শোনা গল্প স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ... তারপর রাজরানি হলো ঘুঁটেকুড়ুনি ...

চমকে উঠে বলতাম, দূর তা কী করে হবে? তাহলে আর রাজরানি বলছ কেন? ঘুঁটেকুড়ুনিই বলো না ...

হায়! আজ বিশ্বব্যাপী অন্ন সমস্যা তথা অর্থসমস্যায় চক্রপিষ্ট বুদ্ধিজীবী তথা শিক্ষিত বিদগ্ধসমাজও খোলাবাজারে চড়ামূল্যে যেভাবে মুদি-দোকানদারের মতো বিদ্যা ও সংস্কৃতির পারঙ্গমতার বেসাতি করতে নেমেছেন, তা দেখে পরিণত বয়সে তাদেরও এরকম সংজ্ঞায় ভূষিত করতে হবে, তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম!

বর্তমান দ্রুত ধাবমান প্রগতিশীল যুগে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সমস্যার অন্ত নেই। কিন্তু সব সমস্যার শিরোমণি মানুষের আদি সমস্যা অন্নচিন্তা বা জীবিকার সমস্যাটাই ক্রমাগত তীব্রতর হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। আর অন্যান্য সূক্ষ্মচিন্তার সঙ্গে বিদগ্ধ মনকেও করতে হয় অন্নচিন্তাটি, কারণ খেয়েপরে বাঁচতে হয় মানুষমাত্রকেই। প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবি-জ্ঞানী-গুণীরা এ বিষয়ে নিরাসক্ত ও নিশ্চিন্ত থাকতেন রাজা-বাদশাদের এবং জমিদার-আমিরদের বদান্যতাগুণে। তাছাড়া সে যুগে মানুষের অভাবও ছিল নামমাত্র। কোনো এক বিশ্বপণ্ডিতের তিন্তিড়ি বৃক্ষ থাকায় জীবনে কিছুই অনুপপত্তি ছিল না; আর মহাজ্ঞানী শেখ সাদী আলখেল্লার ঝোলায় জীবন ধারণের সব উপকরণ বহন করতে পারতেন। সেকালের কবির মাথায় বাড়ি পড়ো-পড়ো হলেও রাজকণ্ঠের মাল্যবন্ধনেই 'লক্ষ্মী-সরস্বতী' বাঁধা পড়ত। কিন্তু সে দিনকাল আর নেই। নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টিকালেই বুদ্ধিজীবীর এই ধ্যানগুম্ভীর গজদন্তমিনার চূর্ণ হয়ে গেল। প্রাত্যহিক জীবনের কদর্যতা তাঁকে স্পর্শ করল, অর্থচিন্তার মালিন্য বাঁচিয়ে শুধু উচ্চমার্গের ধানলোক বিহার করা আর সইল না। তার ওপর রাষ্ট্রজীবনে ও অর্থনীতিক্ষেত্রে গণরূপায়ণ যতই প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে লাগল, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তার প্রভাব

www.pathagar.com

প্রতিভাত হতে থাকল। তার ফলে যুগযুগ সঞ্জাত সব মানসিক কৌলীন্য ধূলিসাৎ হয়ে যেয়ে দ্বন্দ্ব-সংশয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তার মননশক্তিতেও তেল-কালি-ময়লা জমতে শুরু হলো।

শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে অর্থই হয়ে দাঁড়ালো কৌলীন্য, মানমর্যাদা ও কীর্তি-কৃতিত্বের একক মানদণ্ড। তার দরুন সাধনার উচ্চমার্গ থেকেও বুদ্ধিজীবীকে জীবনযুদ্ধের বন্ধুর পথে নামতে হলো, অন্য সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বিদ্যাবুদ্ধিকে মূলধন হিসেবে খাটিয়ে। অর্জিত পাণ্ডিত্য কিংবা চারুকলার কৃতিত্বকেও যেকোনো উৎপন্ন পণ্যের মতো আর্থিক বিনিময়মূল্যে কেনাবেচার হাটে নামানো হলো। এমনকি এও দেখা গেল, ধর্মনেতারা তাঁদের কোরান-হাদিসের অর্জিত বিদ্যাকে ধর্মশিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে সংকোচ বা শঙ্কাগ্রস্ত হলেন না। এই বিনিময় মূল্যটাকে মুনাফা বলাই সঙ্গত, কারণ খোলাবাজারে সর্বাধিক চড়ামূল্যে বিদ্যাবুদ্ধির বিনিময় করতে বিদগ্ধসমাজ কুণ্ঠিত হলেন না। অবশ্য এসব খোলাবাজারের ক্ষেত্র হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন কিংবা পুস্তকপ্রণয়ন। এই মনোবৃত্তিকে লক্ষ করেই আলফেড ভন মার্টিন বলেছেন, এই প্রচেষ্টাকে 'ব্লাকমেইল' ব্যতীত কিছু বলা যায় না। রেনেসাঁর যুগের সাহিত্যিক 'দুর্বৃত্ত ও দস্যু' কারণ তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের রচনা বিক্রয় করে এবং অন্যকে তা চড়ামূল্যে কিনতে বাধ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। এ প্রবণতাটা আধুনিক সাহিত্যিকরা পুরোমাত্রায় আয়ত্ত করেছেন। মার্টিনের উক্তিটি স্মরণীয় :

> তিনি ইতোমধ্যেই সাহিত্যিক দুস্যুতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর একমাত্র উচ্চাশা নিজের কলম-পেষা কর্মটা অন্যকে বিক্রয় করে এবং কিনতে বাধ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। কিন্তু এই রূঢ়ভাষী ব্যবসায়ী সাহিত্যিক 'ব্লাকমেইলার' হচ্ছেন বৈদগ্ধ্যের শেষ প্রতিনিধি যিনি এখন বিদ্যাবুদ্ধিকে বিনিয়োগ করছেন অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে; যিনি অর্থের দার্শনিক সেজেছেন ঐতিহ্যগত নৈতিকতা, সাহিত্যিক শালীনতা ও বিদ্বৎ সমাজের ঐক্যের সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে।[১২৯]

বস্তুত বিদ্যা ও বুদ্ধি এত বেশি পণ্যময় হয়ে উঠেছে যে, সিমেলের মতো বুদ্ধিমানরা টাকার সঙ্গে মেধার পারস্পরিক সম্বন্ধের কথাটা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। টাকার যেমন নিজস্ব চরিত্র নেই, আধুনিক মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিরও তেমনি কোনো চরিত্র ও নীতি নেই। ঠিক কারখানায় তৈরি পণ্যদ্রব্যের মতো বাজারে কেনাবেচার জন্যে লভ্য এবং অর্থনীতি শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী আমদানি ও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির অনুপাতে তার বিনিময়মূল্য নির্ধার্য।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবর্তন-বিবর্তন আছে, ক্রমোন্নতি আছে, আবার ক্রমাবনতিও ঘটে তার ছন্দে। এর কৌতুকপ্রদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেন, এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই হচ্ছে

১২৯. Sociology of Renaissance, by Martin, E, p 208.

www.pathagar.com

'ইন্টারনাল প্রলেটারিয়েট'। দুই সভ্যতার সংঘাতকালীন উদ্ভূত কলাকৌশল ও রীতিনীতিগুলো দ্রুত আয়ত্ত করে বুদ্ধিজীবীরা ভাবেন, তাঁরাই সংস্কৃতির দিশারী, ধারক ও বাহক, অতএব স্বদেশে ও বিদেশে তাঁরা অপরিত্যাজ্য। কিন্তু যত দিন যায়, তত দেখা যায় তাঁদেরও ঠাঁই নেই সমাজে। মানুষ যে সমাজে পণ্যতুল্য, সেখানে তার উৎপাদন ও চাহিদার সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব। আধুনিক বিদ্যাযন্ত্র বিদ্যালয়ের কারখানায় যখন পূর্ণবেগে বুদ্ধিজীবীর উৎপাদন বেড়ে চলেছে, তখন অল্পদিনে এ পণ্যের বাজারে মন্দা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। অথচ এই শিক্ষাযন্ত্রে মানুষ-পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। যুক্ত বাংলার সমাজে ইংরেজ আমলে এই উৎপাদনের নীতি ও রীতিটা যে প্রণালিতে ছিল, এখনও তাই আছে। ফলে প্রথম যুগের কয়েকশত ভাঙাবুলিসর্বস্ব 'বাঙালি বাবুর' ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে হাজার হাজার বি. এ., এম. এ. পাস ও ফেল বুদ্ধিজীবীর দলবৃদ্ধি হয়েছে। তাতে দেশের শিক্ষিতে সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ছে, কিন্তু সংস্কৃতি ও মননশক্তির ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি হয়েছে, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেছেন 'লিয়াজোঁ অফিসার শ্রেণী'। তাঁর উক্তিটা উদ্ধৃতির যোগ্য :

> বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে লিয়াজোঁ অফিসারশ্রেণী, যারা অনুপ্রবেশকারী সভ্যতার ব্যবসায়ী চালাকিটা ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। ... গায়ে কাঁথামোড়া বাবুশ্রেণীর জায়গায় ফেলকরা বি. এ.-রা ভিড় জমাচ্ছে এবং তাদেরই বিদ্যার তিক্ততাটা বাবুদের চেয়ে অনেকগুণে বেশি।[১৩০]

যাহোক, শিক্ষাযন্ত্রের উৎপাদন দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার দরুন শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু প্রতিভার বিকাশ তথা সংস্কৃতির এবং মননশক্তির ক্ষেত্রেও ক্রমোন্নতি সমানুপাতে ঘটেছে কি না, তাই বিবেচ্য। বলতে বেদনা হয়, ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিণতি ছিল কেরানি-কর্মচারী ও আমলাবাহিনী উৎপাদনে, আজও তার পরিবর্তন হয় নি এবং আরও বেদনার একথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার মর্মান্তিক ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর অর্থ উপার্জনের দিকে লক্ষ্যটাই একমাত্র ব্রত হয়ে থাকার দরুনই সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ফসল সংগ্রহ হচ্ছে, তাতে জীবনদায়িনী শস্যকণার একেবারে অভাব ঘটেছে। কৃতবিদ্য ডি. এস. সি. প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্য দীনিয়াত লিখে শ্রমপাত করছেন, দেশবরেণ্য সাহিত্যবিদ ব্যস্ত থাকছেন অঙ্কের বা ভূগোলের পাঠ্যবই লিখে সহজপন্থায় অর্থোপার্জন করতে। তাছাড়া তো দেখাই যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সন্তানরা সিভিল-সাপ্লাই বা উন্নয়ন বিভাগে বেশি মাইনের লোভে শিক্ষা বিভাগ থেকে সরে পড়েছেন। শিক্ষার শেষ লক্ষ্য যেখানে বেশি উপার্জন বা মোটা মাইনের চাকরি, সেখানে শিক্ষার পরিচর্যা করা কিংবা বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে আরও কৃতিত্ব প্রদর্শনের উদ্যমপ্রচেষ্টার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে

---

১৩০. The Study of History—Toynbee (Abridged), p 394, 395.

www.pathagar.com

এই হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি কৃতী সন্তানদের মধ্যে প্রকৃত চিন্তাশীল মনীষীর বিকাশ হচ্ছে না। মৌলিক চিন্তার শক্তি কমে যাচ্ছে, প্রতিভাবানদের সংখ্যাও দিন দিন কমছে। শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র থেকে অনুসন্ধিৎসা প্রায় অন্তর্ধান করেছে, গভীরে প্রবেশ করে জ্ঞানের পরিচর্যার স্পৃহা মোটেই লক্ষিত হচ্ছে না। শুধু ভাসাভাসা জ্ঞান। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট-আঁটা লেবেল মারা বিদ্যাঅর্জন করেই অর্থোপার্জনে ঝাঁপিয়ে পড়াই যেখানে সারব্রত, সেখানে কৌতূহলী ও সন্ধানী মনের সাক্ষাৎ মিলবে কী করে? আরও বলতে দ্বিধা নেই, যে অধ্যাপক অথবা শিক্ষকের নিজেরই অনুসন্ধিৎসা বা কৌতূহল লোপ পেয়ে গেছে, নিছক চাকরির স্বার্থে যিনি চর্বিত বিদ্যার চর্বণ করে দিনগত পাপক্ষয় করেন, যাঁর জ্ঞানার্জনের সমস্ত আগ্রহ স্বার্থবাদ ও সুবিধাবাদের অনলে ছাই হয়ে গেছে, তাঁর নিকট ছাত্ররা চিন্তাশীল কৌতূহলী বা অনুসন্ধানী হবার জন্যে কী পাঠ আশা করবে? কী অনুপ্রেরণা লাভ করবে?

জীবিকার চেয়ে জীবন বৃহত্তর এবং উদরের চেয়ে মগজের স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধি ও মননের প্রতি মানুষের অনুরাগ সহজাত ও স্বভাবদত্ত, এ বিশ্বাস এখনও রাখি এবং এই বিশ্বাসের জোরেই এখনও বুদ্ধিজীবীদের ওপর আস্থা রেখেই লক্ষ করি, একদল আত্মভোলা কবি-সাহিত্যিক মনন শক্তির বিকাশে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু এখানেও বেদনার ভার অপরিমেয়। আজাদি উত্তর যুগে বেশ কিছুসংখ্যক সৃষ্টিধর্মী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হায়! এখানেও প্রাত্যহিক জীবনের তেল-নুন-লাকড়ির সমস্যাটি এমন মর্মান্তিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে, এখানেও ভেজাল বা কৃত্রিমতার প্রভাব লক্ষ করে হতাশই হতে হয়। এখানেও প্রতিভাকে রজতচক্রের দাসত্ব দেখা যাচ্ছে, এখানেও 'খই'-এর ব্যবসা চলছে। মননশক্তির একনিষ্ঠ পরিচর্যা করে যে হৃদয়বিমোহন চিত্তচারী কুসুমচয়ন করা সম্ভব, সেদিকে মোটেই আকর্ষণ নেই। স্বকীয়তা ও স্বপ্রাধান্য অর্জন করে নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অর্জনের উদ্যম নেই, আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মর্যাদাসিক্ত হওয়ার সাধনা নেই। তার ফল এই হয়েছে যে, এসব মননশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে কোনো স্বকীয়তার ছাপ তো মেলেই না, কোনো নতুন স্বাদেও মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে না। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ যা কিছুই পাঠ করি, দেখি সবই একরকম তার, যেন সবই এক পাকের তৈরি। লেখকের নামটি কেটে দিয়ে যেকোনো নাম স্বচ্ছন্দে বসানো যায়। পাঠকের চোখে তা ধরা পড়বার উপায় নেই। এমনকি লেখক পূর্ব পাকিস্তানে বসে লিখছেন, নাকি পশ্চিম বাংলার নাগরিক তা লিখছেন, তাও ধরবার উপায় নেই।

আমি বিশ্বাস করি যে, সাহিত্য সৃষ্টির মৌল লক্ষ্য থাকবে মানবতার ভিত্তিমূলে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধকরা বিশ্বমানবিকতার পথিক। কিন্তু আমি এ বিশ্বাসেও দৃঢ় যে, আমার দেশের সাহিত্যিকরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনের ও সমাজের ছায়া স্বভাবতই পড়বে এবং

www.pathagar.com

এখানকার সংস্কৃতির নব রূপায়ণও ঘটবে। কিন্তু কই সে সাধনা, সে প্রচেষ্টা? পল্লবগ্রাহিতা ও অনুকৃতির মোহ আজও কাটছে না, আড়ষ্টতা আজও ভাঙছে না, স্বীয় জাতীয়তার মোহন রূপ নিয়ে স্বর্ণপ্রসব করছে না। কেন এ প্রাণধর্মে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না আজ?

১৮৩৫ সালে ইন্দো-পাকিস্তান থেকে ফারসি ভাষাকে বিতাড়ন করে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করা হয় সরকারি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং শিক্ষার বাহন হিসেবেও। তখন শিক্ষানীতি নিয়ে যে বাকযুদ্ধ চলছিল, তার মীমাংসা করে দিয়েছিলেন লর্ড মেকলে তদানীন্তন গভর্নর জেনেরাল বেন্টিংকে এই পরামর্শ দিয়ে : ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এদেশের শিক্ষিত লোকেরা জানবে মিলটনের কাব্য, লকের দর্শন ও নিউটনের প্রকৃতিবিদ্যা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপুল সম্পদের স্বাদ ও গন্ধ পেয়ে এদেশবাসীরাও ক্রমশ পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে উঠবে। বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে সমাজে, যাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ। কিন্তু তখন তাঁর এ উদ্দেশ্যও ছিল, এই জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে এদেশের ভাষা ও সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটবে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বলেছিলেন,

> *এদেশের লোক ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষিত হবার পর সেইসব লোকই চেষ্টা করবেন এদেশী ভাষাগুলোকে মার্জিত করতে; চেষ্টা করবেন পাশ্চাত্য শব্দসম্ভার থেকে বিজ্ঞানের পরিভাষাসমূহ চয়ন করে দেশি ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করতে। আর এভাবে সেগুলোকে বৃহৎ জনগণকে শিক্ষাদানের উপযুক্ত বাহন করে গড়ে তুলবেন।*

এখানেও মেকলের রোপিত বৃক্ষে আমড়াই ফলেছে। তাঁর উদ্দেশ্যটা আংশিক সফল হয়েছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা দোভাষী শ্রেণীর বিকাশের মধ্যে— যারা শুধু ইংরেজি ভাষাটাই দোভাষাগীরি করছে না, ইংরেজিয়ানার অনুকৃতিও করেছে পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে ও চিন্তা-ভাবনায়। পরাধীন উপনিবেশের ভাগ্যে যা ঘটবার, তাই ঘটেছে। মেকলের উদ্দেশ্যটার স্পষ্ট ভালো দিকটা ছিল— একদিকে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন ও কারিগরি শিক্ষার এদেশে প্রচার, অন্যদিকে এদেশি ভাষাগুলোকে ক্রমশ আধুনিক শিক্ষার বাহন হিসেবে যোগ্য করে তোলা। তার প্রথমটি কিছু সফল হয়েছে, দ্বিতীয়টি আজও সম্ভব হচ্ছে না। একশ পঁয়ত্রিশ বছর পরেও এদেশের ভাষাগুলো সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নি। আর এখনও এদেশে ইংরেজি শিক্ষার মোহ কমে নি: অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই মাতৃভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বজায় রেখে পুরোপুরি ইংরেজির মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানকে গর্বের কথা বিবেচনা করেন এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মত্ত থাকেন।

শুধু তাই নয়, অনেকে আবার ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার দুঃসাহসও দেখিয়ে থাকেন। আমাদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য ইংরেজি সাহিত্যবিদ আছেন অস্বীকার

www.pathagar.com

করি না। অনেকের ইংরেজির রচনার খ্যাতি আছে, অনেক পাকিস্তানিকে চতুর সাংবাদিকসুলভ ইংরেজির রপ্ত করতেও দেখা গেছে, কিন্তু তা নিয়ে কি সাহিত্য সৃষ্টিরও দুঃসাহস হবে? *এ সম্বন্ধে বিশ শতকী ইউরোপের কবিশ্রেষ্ঠ উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস—যিনি ১৯১২ সালে নর্ম্যান্ডির নির্জনবাসে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলির' ইংরেজিতে স্মরণীয় ভূমিকাটি রচনা করে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তির পথ সুগম করে দিয়েছিলেন*[১৩১]—রবীন্দ্রনাথেরই সমর্থনপুষ্ট এক ভারতীয় কবি শ্রীপুরোহিত স্বামীর ইংরেজি কবিতা দর্শনে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর এক বন্ধুকে যা লিখেছিলেন, সেসব কথা ইংরেজিভাষায় কাব্যসাহিত্য রচনালিপ্সুদের প্রতি স্মরণীয় সতর্কবাণী হওয়া উচিত :

> তোমার কথিত ভারতীয়টি সুন্দর ও ভাবপ্রবণ, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে ভাষায় লিখছেন, সে ভাষায় চিন্তা করেন না। তাঁকে বলুন, ভারতে ফিরে গিয়ে ইংরেজি ভাষা বয়কট করা শুরু করে দিতে। ইংরেজরা যখন ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেছিল তখন তারা ভারতের প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার করেছিল; একটা মহৎ জাতিকে 'ক্লাউন'-এর পরিণত করেছিল, তাদের আত্মার অমর্যাদা ঘটেছিল।[১৩২]

এ মর্মান্তিক গালিবর্ষণেও যাঁদের চক্ষুরুন্মীলন হয় না, তাঁদের স্মরণ করতে বলি বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ও 'লোলিটা'-এর লেখক নভোকভের স্বীকারোক্তিটি। রুশভাষা ছেড়ে 'আমেরিকান ইংলিশ' ভাষা গ্রহণ করে বিশ্ববিখ্যাত 'লোলিটা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রুশভাষা ছেড়ে তিনি দুঃখিত ও সীমাবদ্ধ, কারণ তিনি হারিয়েছেন 'আমার স্বাভাবিক বাগবৈদগ্ধ্য, আমার স্বচ্ছন্দ সমৃদ্ধ ও আশ্চর্য নমনীয় রুশভাষার রচনাশৈলী, একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজির বদলে'। *আর মাইকেল মধুসূদনের মতো ইংরেজি-গ্রিক-ল্যাটিন ভাষায় ধুরন্ধর তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি কাব্য Captive Ladie লিখে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তাও এখানে স্মরণীয়।*[১৩৩] মাতৃভাষায় যে স্বভাবত সহজাত রচনাশৈলী, ব্যঞ্জনা, হিউমার অলঙ্কার, উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত হয়, অন্য ভাষায় কখনো সে প্রসাদগুণ আনে না, আসতে পারে না। মননশক্তির দৈন্যদশা ধরলেই অন্য ভাষায় লিখে চমক জাগাবার দুঃসাহস জন্মে।

মননশীলতা কমে গেলে নৈতিক বলও কমে যায়, নির্বিকারচিত্তে নির্ভীক হয়ে সত্যানুসন্ধানের সাহস আর থাকে না। তখন অন্য বিবেচনায় অন্য স্বার্থবশে বিবেক ও বিচারবুদ্ধি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে জন্মে হীনম্মন্যতা ও পরানুকারিতার মোহ। এই মোহের আবেশে নিজের ঘরের দিকে তাকাবার মতো পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি আর

১৩১. বাংলা রূপনাট্যের উত্তরে আইরিশ প্রহসন : নরেশগুহ—চতুরঙ্গ ১৩৭০ বৈশাখ, পৃ. ৪৩।
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫, উদ্ধৃত।
১৩৩. মধুসূদন শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন : আমরা যখন বিশ্ববাসীর উদ্দেশে কিছু বলিব, তাহা যেন মাতৃভাষাতেই বলিতে পারি—'মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম।

www.pathagar.com

থাকে না; তখন পরের ঐশ্বর্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ও তার প্রলোভনে নিজের পরিবেশে শুধু সংকটের বিভীষিকা দেখতে থাকে। আমাদের সংস্কৃতি-সংকট ভীতিটা জন্মেছে এই দুর্বল মানসিকতা থেকেই।

মানুষ কখনো বসে নেই। তার চলারও বিরাম নেই এবং তার চলার গতিতে অহরহ শোনা যাচ্ছে নিত্যনতুন ছন্দ। সেই ছন্দের তালে তালে জন্ম নিচ্ছে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন নতুন রূপ। শেক্‌স্‌পিয়রের যুগ নেই ইংরেজি সাহিত্যে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমেরও যুগ নেই বাংলা সাহিত্যে। অতএব কোনো ব্যক্তির মায়াজালে কোনো দেশের সাহিত্য বা সংস্কৃতি চিরকাল বাঁধা থাকে না, থাকতে পারে না। এ সত্যটি আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অভিমানী বুদ্ধিজীবীরা যত শীঘ্রই উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল হবে দেশের এবং ততই নজর পড়বে নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের দিকে।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : সাংস্কৃতিক বিভেদ

মধ্যযুগের ইংরেজের ইতিহাসে ভূমি সংক্রান্ত দুটি অভিধা উল্লেখযোগ্য : 'ফিউডালিজম' ও 'সার্ফডম' (feudalism and serfdom.)। প্রথমটির উদ্দিষ্ট জমির মালিক, যিনি ভূমিস্বত্বের পরিবর্তে রাজার অনুগামী হতেন সেনাবাহিনী নিয়ে, আর দ্বিতীয়টির উদ্দিষ্ট ভূমিদাস, সে জমির সঙ্গে আজীবন বাঁধা থাকত পরিবারসহ জমির কৃষিকর্ম করত ও মালিককে উৎপাদনের সবটাই দিত তাঁর ভোগের জন্য। এদেশে মোগলাই মনসবদারি কতকটা ফিউডালিজমের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু সার্ফডমের কোনো প্রতিরূপের অস্তিত্ব ছিল না এদেশে।

পূর্বেই বিশদ হয়েছে, ইংরেজরা সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যে তিন শ্রেণীর সমবায়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মদান করে, তার অন্যতম ছিল ভূম্যাধিকারী শ্রেণী। আর এই নতুন ভূম্যাধিকারী শ্রেণী—যাদের জন্ম হয়েছিল কর্নওয়ালিসি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে—

> 'হচ্ছে সেসব হিন্দু গোমস্তারা যারা এ পর্যন্ত নগণ্য পদে নিযুক্ত থাকত, কিন্তু অতঃপর জমিদার বলেন গেল এবং জমির সর্বস্বত্বে মালিকানা লাভ করল'।[১৩৪]

নজরুল ইসলাম এদের লক্ষ করেই বলেছেন, মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাঁহারাই হন। এই ভূম্যাধিকারী শ্রেণীই ছিল মধ্যযুগের ইংরেজের 'ফিউডাল লর্ডাস'-দের আধুনিক সংস্করণ।

আর জমির চাষি শ্রেণী হলো প্রধানত মুসলমানরা। যারা কয়েক বছর আগে ছিল শাসক শ্রেণী, তারা হলো কৃষক শ্রেণী। *তাদের লক্ষ করেই নজরুল বলেছেন : সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।*[১৩৫] এই কৃষক সমাজই ছিল ইংরেজের সার্ফডমের আধুনিক সংস্করণ।

---

১৩৪. Hunter's Indian Musalmans, p 155.
১৩৫. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড—ফরিয়াদ, পৃ. ৩৯।

www.pathagar.com

ইংরেজদের নয়া ব্যবস্থায় হিন্দু জমিদার শ্রেণী হলো 'বাবু' ও 'ভদ্রলোক' এবং মুসলমানরা হলো 'চাষা'। বস্তুত এই সেদিনও ভদ্রলোক ও বাবু বলতে হিন্দুকে বোঝাত এবং চাষা বলতে মুসলমান। *রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ঠিক এই অর্থেই শব্দ দুটির ব্যবহার করেছেন।*[১৩৬] জমিদার নন্দন রবীন্দ্রনাথ মুসলমানকে জানতেন রায়ত হিসেবেই, তার কর্তব্য হিন্দু জমিদারকে দেওয়া করে তাঁর করুণা আকর্ষণ করা। শোষিত প্রজারা শোষক জমিদার-মহাজনকে পিতামাতা জ্ঞানে তাদেরই মঙ্গল কামনায় আল্লার দোয়া প্রার্থনা করবে—এই ছিল জমিদার-নন্দনের স্বাভাবিক জীবন দর্শন। তাঁর উক্তিটি লক্ষণীয় :

> যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ত তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু হৃদয় স্পর্শ করে না।[১৩৭]

ভূমি ব্যবস্থার এই পটভূমিকায় মনিবানার দাপটে হিন্দু জমিদার ছিল উদ্যত খড়্গ, আর গরিবানার সংকটে মুসলমান প্রজা ছিল সর্বহারা, সবার পিছে সবার নিচে। গোটা মুসলমান সমাজটাকে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় কী চোখে দেখত এবং সামাজিক স্তরে সম্বন্ধটা কী ছিল রবীন্দ্রনাথের জবানিতেই শোনা যাক :

> আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।
>
> আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা একভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখের মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত,যাহা ধর্মাবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।
>
> আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।[১৩৮]

কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।

> একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।[১৩৯]

---

১৩৬. রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. স. সা) ১২শ খণ্ড ৯১০, ৯১১ ইং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৩৭. রবীন্দ্র রচনাবলী (শান্তিনিকেতন সং), ২৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৫।
১৩৮. রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. স. সং) ১২শ খণ্ড, পৃ. ৯০৯ + ১০০১।
১৩৯. রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. স. সং) ১২শ খণ্ড, পৃ. ৯০৯ + ১০০১।

www.pathagar.com

অল্পকাল হলো, একটি আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নিচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমনকি সেই আহারে হিন্দু মুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা একথা বলতে কিছু মাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশি কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূল।[১৪০]

তখনকার কালে দুই বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে—পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য।[১৪১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি পরিচ্ছন্ন যে, মুসলমান এদেশে প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল পাশপাশি বাস করলেও হিন্দু বরাবরই তাকে বিদেশি ও অস্পৃশ্য ভেবেছে, এ উপমহাদেশের বৃহৎ গণজীবনের একাংশ হিসেবে ভাবতে পারে নি এবং কখন তা স্বীকার করে নি। ইংরেজ এদেশবাসীকে 'নেটিভ' বলে দূরে রাখত; তার 'ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস, নট অ্যালাউড' কথায় ছিল শাসকসুলভ দম্ভ।

ইউরোপের বাইরের সমাজকে তারা ঘরে বসে 'নেটিভ' বলার মতো ঔদ্ধত্য আর হতে পারে না; তার দ্বারা মানবতারই অসম্মান করা হয় তাদের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক শূন্যাবস্থাকে কটাক্ষ করে।[১৪২]

কিন্তু হিন্দুর ঘৃণাটা আরও মর্মান্তিক, সে মুসলমানের সান্নিধ্যকে বর্জন করেছে ধর্মের ও আত্মার পবিত্রতা রক্ষার্থে। মানুষকে এর চেয়ে বড় অসম্মান আর কিছুতেই দেখান সম্ভব নয়। অথচ মানবাত্মার সবচেয়ে বড় অবমাননা ও অসম্মান করেও হিন্দুরা আশা করেছিল মুসলমান তাদের অনুবর্তী হবে, 'বাবুদের', 'স্বদেশী' ডাকে সাড়া দিবে এবং সেটা হয় নি বলেই রবীন্দ্রনাথও পরিণত বয়সে ক্রোধে ফেটে পড়ে সব দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে দোষী করেছিলেন :

আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে—তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্ক ফল না কষে ভাগেরই অঙ্ক ফল কষছে। দেশে এরা আছে, অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসেবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর—তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা-তালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সবচেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।[১৪৩]

বিভেদটাকে ধর্মীয় অনুজ্ঞা হিসেবে শিরোধার্য করে যে হিন্দু-মুসলমানকে দূরে নিক্ষেপ করল এবং আঙিনায় বেড়া দিয়ে রইল মুখ ফিরিয়ে, যোগ-বিয়োগের সমস্যাটা যে সেই হিন্দুরই সৃষ্টি, এই রূঢ় সত্যটা মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথেরও সংস্কারে বেধেছিল।

---

১৪০. কালান্তর—বাতায়নিকের পত্র, পৃ. ১৪৪।
১৪১. প্রাগুক্ত—কালান্তর, পৃ. ২-৩।
১৪২. Stuy of History—Toynbee, p 788.
১৪৩. প্রাগুক্ত—পৃ. ৩।

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর চেয়েও প্রাঞ্জল ভাষায় এই বাস্তব অবস্থাটা বিশদ করে দোষটা ঘাড় পেতে নিতে সংকোচ অনুভব করেন নি, বর্তমানের এক বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেছেন,

> আজকাল হিন্দু-মুসলমান বিরোধের এই বিষম বিপদটা আমি যখন দেখি, তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হইনে, কারণ আমরাই ছেলেখেলার মতো নিজেদের হাতেই পরিশ্রম করে এই সর্পের বীজ বুনে দিয়েছি। বস্তুত এই বিরোধটা ছিল আমাদের ইতিহাসের অন্তর্গত এবং এড়ানো ছিল অসম্ভব। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন ভারতীয়দের সেই সাধারণ অসাধুতা থেকে, যাঁরা বলেন যে, এ বিরোধ ব্রিটিশেরই সৃষ্টি, যদিও এই বিদেশি শাসকরা এর দ্বারা প্রচুর লাভবান হয়েছিল। বাস্তবিক তারা দেবতা হিসেবে ক্ষমার্হ হতো, রাজনীতিক জীব মানুষ হিসেবে নয়, যদি তারা আমাদেরই বহু সাধনায় নির্মিত ও আমাদের দ্বারাই তাদের হাতে তুলে দেওয়া এ অস্ত্রটির সুযোগ গ্রহণ না করত।
>
> স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদের দিকে তাকাবার পূর্বেই অতি শৈশবে আমাদের মনমানস চারটি প্রত্যক্ষ দিকে ঐতিহ্যগতভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম, আমরা স্বভাবতই তাদের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতাম, কারণ তারা এক সময় হিন্দুদের ওপর প্রভুত্ব করেছিল। দ্বিতীয়, সমকালীন সমাজের অঙ্গ হিসেবে মুসলমানদের আমরা কখনো চিন্তা করি নি। তৃতীয়, আমাদের বন্ধুত্ব ছিল শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় সমশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে। চতুর্থ মুসলমান কৃষক সমাজের ওপর আমাদের দৃষ্টিটা ছিল মিশ্রিত এবং ঘৃণাব্যঞ্জক, কারণ তাদের আমরা শূদ্রশ্রেণীর হিন্দুর মতো কিংবা অন্য কথায় গরু-ছাগলের মতো বিবেচনা করতাম। এই চারটির মধ্যে আবার প্রথমটি ছিল প্রত্যক্ষ ও শিক্ষিত মনোবৃত্তিসঞ্জাত; বাকিগুলো স্বভাবগত।
>
> আমরা মুসলমানদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তার বিপরীত কিছু করা ছিল আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা পড়তে শেখার পূর্বেই আমাদের শেখানো হতো : মুসলমানরা একদা আমাদের শাসন করেছে ও অত্যাচার করেছে; তারা ভারতে এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম প্রচার করেছে; মুসলমান শাসকরা আমাদের নারী হরণ করেছে, আমাদের মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ অপবিত্র করেছে। আমরা যখন বড় হলাম, তখন পড়েছি রাজপুত মারাঠা ও শিখরা কত বীরবিক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে লড়েছে; শিখেছি আওরঙ্গজেব আমাদের উপর কী ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে! *উনিশ শতকী বাংলাসাহিত্যে মুসলমান চিত্রিত হয়েছে শুধু 'যখন'-রূপে*[১৪৪] *বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ও রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদের উপন্যাসসমূহে মুসলমানের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে গৌরবোজ্জ্বল হিসেবে চিত্রিত করেছেন*[১৪৫] এবং মুসলমানকে চিত্রিত করেছেন ঘৃণ্যভাবে। চ্যাটার্জি তো ছিলেন প্রত্যক্ষ ও হিংস্রভাবে মুসলিমবিদ্বেষী। আমরা গোগ্রাস সেসব উপন্যাস গলাধকরণ করেছি এবং তাঁদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি।

---

১৪৪. স্মরণীয় : চলেছি করিতে যবন নিধন যোগাতে যমের খাদ্য—রবীন্দ্রনাথ : বিচারক। এবং যবন করপঙ্ক-কুক্কুট মাংস-লোলুপ : অনধিকার প্রবেশ।

১৪৫. 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' লেখক স্যার রমেশ চন্দ্র দত্ত আই-সি-এস ও ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট।

www.pathagar.com

আমাদের চারপাশে যেসব মুসলমান দেখেছি তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব প্রভাবিত হয়েছে উনিশ শতকী হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ কিংবা নীরব সমর্থনের দ্বারা। তাঁদের নীতি ছিল ঐতিহাসিক মুসলমানের প্রতি ঘৃণাটা মুসলিম সমাজের ওপর প্রচারিত করা। এর ফল হয়েছে অতীতমুখী। সমসাময়িক মুসলমানদের আমরা গণনার মধ্যে আনি নি, হয় তাদের ভুলেছি নয় উপেক্ষা করেছি। ব্রিটিশ শাসন ইসলামি কালচারের চর্চা করা কিংবা হিন্দুদের সহানুভূতি মুসলমানের প্রতি আকর্ষণ করার বিরুদ্ধ ছিল; আর এই পরিস্থিতিতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আবিষ্কার কর্মটা জোরদার করা হয়েছিল। এই রেনেসাঁর প্রথম ফল হয়েছিল ভারতীয় হিন্দুকে একেবারেই অইসলামিকরণ ও হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন করণ। সারা উনিশ শতকব্যাপী সাধনা চলেছিল ভারতীয় হিন্দু কালচারকে প্রাচীন সংস্কৃতের মৌল ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করা। যে একটি মাত্র অহিন্দু প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো ও যার আত্তীকরণ করা হতো, তা হলো ইউরোপীয় মাত্র। আধুনিক ভারতের সব চিন্তানায়ক ও সংস্কারক—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন একটি মাত্র সমন্বয় সাধনের : আর সেই সমন্বয়টি হিন্দু ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার। ইসলামি ভাবধারা ও ট্রাডিশন তাঁদের চেতনাবৃত্তকে কখনো স্পর্শ করে নি।[১৪৬]

এভাবে উনিশ শতকী নব্যভারতীয় কালচার একটি সুপরিকল্পিত নিজস্ব সীমিত বৃত্ত রচনা করল এবং মুসলিম প্রভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবেই সে বৃত্তের বাইরে নিক্ষেপ করল। তার সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধটা দাঁড়ালো 'একসটার্নাল প্রোলেটারিয়েট-এর মতো বাইরে অবস্থান; মুসলমান যদি হিন্দুর এ জগতে প্রবেশের স্পর্ধা করত, তাহলে তাকে ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে আসতে হতো।

... যখন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল, তখন তাদের নেতারা ভদ্রভাবে কিন্তু দৃঢ়ভাবেই অসম্মতি জানিয়েছিলেন; তখন তাঁদের একজন বেশ রসালোভাবেই বলেছিলেন,

'মুসলমানরা জগন্নাথের রথচক্রের মতো হিন্দু সংখ্যাগুরুত্বের চাপে এভাবে পিষ্ট হবে যে 'জাতীয়তার' কোনো চিহ্নই তার অঙ্গে দেখা যাবে না'।[১৪৭]

সত্য বলতে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই-জাতিত্ব-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, আর এটা শুধু তত্ত্বকথা না, এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানত, এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম।[১৪৮]

---

১৪৬. নীরদ চৌধুরীর একটি মত উদ্ধৃতির যোগ্য : রামমোহনের পর এমন একটিও বাঙালি (হিন্দু) অধ্যাপক, ধর্মসংস্কারক বা রাষ্ট্রনেতার নাম জানি না যাঁর ইসলাম বা তার কোনো বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। মোগল শাসন শেষ হওয়ার পর হিন্দুসমাজ ইসলামের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে : Autobiography, p 196.

১৪৭. এ উক্তিটি আমীর আলীর : India and New Parliament : Nineteenth Century, 1906 August, p 257.

১৪৮. Autobiography of An Unknown Indian, pp 229-231.

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান সামাজিক ক্ষেত্রে মৌখিক সৌহার্দ কোনো কোনো অবস্থায় বজায় রাখলেও তার দ্বারা দুজনের মধ্যে কোনো হার্দিক সম্বন্ধ গঠিত হয় নি। হিন্দু তার বিজয়া দশমীতে, পালা-পার্বণে মুসলমানকে গ্রহণ করে নি, মুসলমানও কখনো এসবে যোগ দেয় নি। আর হিন্দু মুসলমানের পর্বোৎসবে যোগ দেওয়া দূরে থাক সক্রিয় বাধা দিয়েছে যাতে মুসলমান নিশ্চিন্তমনে আপন পর্বোপলক্ষে আনন্দ উপভোগ করতে না পারে। এ বিষয়ে হিন্দু ভূম্যাধিকারী শ্রেণী ছিল আরও নির্মম। নিজের এলাকায় গো-জবেহ ও গো-কোরবানি বন্ধ করে দেওয়া, মসজিদ ও কবরগাহ নির্মাণ করতে না দেওয়া, মহররমের সময় তাজিয়া নির্মাণ করতে না দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল এসব জমিদারের সাধারণ আচরণ। চাকরি ব্যপদেশে যুক্তবাংলার বহু জেলায় দেখেছি, বিচারকার্য কালে বহু পাট্টা ও কবুলতি উপস্থাপিত হয়েছে স্বত্বের মামলায় এবং সেসব দলিলে পরিষ্কার শর্ত থাকত উপর্যুক্ত কাজগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এরূপ কোনো একটি শর্ত খেলাপে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ারও কঠিন শর্ত আরোপিত হতো। শহর এলাকার বাসযোগ্য জমির সম্বন্ধেই এসব নিষেধাজ্ঞা বেশি মাত্রায় লক্ষিত হতো।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রথমে 'মুহম্মদী তরিকা'র আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম-বিরুদ্ধ আচরণসমূহ নির্মূল করতে তৎপর হন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে নব বলদৃপ্ত শিখ-শক্তি মুসলমানদের আজান দেওয়া, ঈদের জামাত করা, গো-জবেহ করার বিরুদ্ধতা করতে থাকে। বাংলাদেশেও হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তিতুমীর হিন্দু জমিদারের হাতে প্রবল বাধা পেয়েছেন মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার কর্মে।

> মুসলমান প্রজাকে হিন্দুর পূজা-পার্বণে নিয়মিত চাঁদা দিতে বাধ্য করা হতো, স্কুল-কলেজে সরস্বতীর পূজা করা হতো হিন্দুর ধর্মীয় উৎসব হিসেবে এবং মুসলমান ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা দিতে হতো; অথচ মুসলমান ছাত্ররা 'মিলাদুন্নবী' করতে চাইলে অনুমতি দিতো না।[১৪৯]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিষয়ক আইনানুসারে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হয়। প্রায় সাত শ বছর পর এই প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে হিন্দুরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং নিরীহ মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। ১৮৫৭ সালের পর ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের ঘন তমসাচ্ছন্ন কাল।

---

১৪৯. প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে একবেঞ্চে বসতেও ঘৃণা প্রকাশ করে কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেছিল, 'মহাশয়! আমরা মুসলমান ছাত্রদের নিকট বসিতে পারিব না; কারণ তাহাদের মুখ হইতে বড় পেঁজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।' বিষয়টির মীমাংসা করেন অধ্যাপক হরিশচন্দ্র কবিরত্ন মুসলমান ছাত্রদের বাম পাশে বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে (প্রবাসী : ১৩৩২ কার্তিক, পৃ. ৪৮)।

www.pathagar.com

দেশের যে বৃহৎ অংশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ক্ষমতা অধিকার করে, সেখানের কংগ্রেসী মন্ত্রিরা মনে করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ... কংগ্রেস শীঘ্রই মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহে ক্ষমতা লাভ করবে এবং সমগ্র দেশটা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট কয়েদখানায় রূপান্তরিত হবে।'[১৫০]

জওয়াহেরলাল তো এ বিষয়ে একরকম ধ্রুব নিশ্চিত হয়ে এই সময় সগর্বে বলেছিলেন, ভারতে মাত্র দুটি পক্ষ আছে—ব্রিটিশ ও কংগ্রেস।[১৫১]

ক্ষমতাসিক্ত হয়ে কংগ্রেস এরূপ নীতি গ্রহণ করে, যার দরুন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কটা আর তিক্ত হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের নানা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই সময়ে কংগ্রেস তথা হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি যে মর্মান্তিক অন্যায় উৎপীড়ন করেছে তার কিছুটা পরিচয় মেলে মুসলিম লীগের দ্বারা প্রকাশিত 'পীরপুর রিপোর্ট' ও 'শরীফ রিপোর্ট' দুটিতে। প্রথমখানিতে উন্মোচন করা হয়েছে যে, এই সময় প্রত্যেকটি সরকারি কর্মের উদ্বোধন করা হতো বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্মত আচার-অনুষ্ঠানে; মুসলমান ছেলেমেয়েদের বাধ্য করা হতো 'বন্দে মাতরম' গান করতে ও গান্ধীর ফটো পূজা করতে; মুসলমানদের ভয় প্রদর্শন করে বিরত রাখা হতো গো-জবেহ করা থেকে; তাদের সমস্ত স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল; উর্দুতে কথা বলা নিষধ করা হতো; সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পুলিশ ও সরকার কংগ্রেসের নির্দেশে হিন্দুদের সমর্থন করত।

'পীরপুর রিপোর্ট'-এ দেখান হয়েছে, কী ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু কংগ্রেস স্থানীয় নেতা, জমিদার এমনকি প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারিদের দ্বারা দুর্ভাগা মুসলমানদের জন্যে।[১৫২]

এই সময় এ. কে ফজলুল হকও 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুর্ভোগ' (Muslim Sufferings Under Congess Rule, 1939) শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করে কংগ্রেসী অত্যাচারের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করেন।

হিন্দুরা এভাবে শুধু নিপীড়ন ও নির্যাতন করে, ঘৃণা ও ঔদাসীন্য দেখিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে নি, বাবু সম্প্রদায় সৃষ্ট সাহিত্য ও কালচার থেকেও মুসলমানদের বিতাড়িত করেছিল একটি প্রচ্ছন্ন সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে। এ সম্বন্ধে ১৮৩৫ সালের 'সমাচার দর্পণে'-এ প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট :

---

১৫০. Modern Muslim India and the Birth of Pakistan—S. M. Ikram, p 258.

১৫১. I bid, p 255.

১৫২. উক্ত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য : The Making of Pakistan—R. Symonds, p 54-55. The Stuggle for Pakistan—I. H. Qureshi, p 102.

www.pathagar.com

> (সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রচলন হলে) প্রথমেই যবনদের ঔদ্ধত্য খর্ব হবে, তার দরুন আমাদেরই উপকার হবে। বাংলা ভাষা প্রবর্তিত হলে মুসলমানরাই বিতাড়িত হবে, কেননা তারা বাংলা ভাষা পড়তে পারে না লিখতে পারে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।[১৫৩]

আশ্চর্য এই যে, মুসলমান যদি তার ধর্মীয় জীবন উন্নত করতে চেয়েছে, অনুসরণ করতে চেয়েছে, তাকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায়তন থেকে সর্বক্ষেত্রে যখনই সে নিজেকে চিহ্নিত করতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে মুসলমান হিসেবে, তখনই তাকে বিজাতীয়, বিদেশি ও অস্পৃশ্য হিসেবে বর্জন করা হয়েছে। 'ভারতীয় মুসলমান' না হয়ে 'ভারতীয় হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত' হতে যখন মুসলমান আপত্তি জানিয়েছে, তখনই তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে 'যোগ বিয়োগের সমস্যা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর চেয়ে সত্য নিয়ে প্রতারণা ও ছেলেখেলা আর ইতিহাসে দেখা যায় নি।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা বিবেচনা করেন, 'মুসলমানরা আরবি-ফারসি সংস্কৃতিকে নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশকে বাতিল করে মগ্ন হলেন এক সংকর সংস্কৃতি গঠন করতে ... উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যবিত্ত মুসলিম সংস্কৃতি এইভাবে বেশ কিছুটা আচ্ছন্ন হলো মোগল যুগের উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের দ্বারা ... মুসলিম সংস্কৃতি আসলে ইরানি তুর্কিও নয়, ভারতীয় বঙ্গদেশীয় বা পাকিস্তানিও নয় এবং সর্বোপরি তত্ত্বগত ক্ষেত্রে ইসলামের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই।

> এ সংস্কৃতি যেন সদসর্বদাই ভেসে বেড়াচ্ছে কিন্তু না পারছে কোনো দেশের কূলে ভিড়তে, না পারছে নিজের দেশের মাটিতে বিস্তার করতে তার মূল'।[১৫৪]

দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ যুক্তিগুলোর মধ্যে সংগতি রক্ষিত হয় নি এবং এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে ঐতিহাসিক সত্যের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয় নি। মুসলমানরা উচ্চনীচ নির্বিশেষে কখনো ভারত তথা বাংলাদেশকে বাতিল করে নি; তাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুরা বরাবর বিদেশি ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং ঐক্য বা মিলনের কথা বলেছে বা গান গেয়েছে বিংশ শতকে রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই, বা যখন 'বাবুরা বিপদে ঠেকিয়াছে।' দিবালোকের মতো এ সত্যটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিক এবং রবীন্দ্রনাথের মতো পণ্ডিতকুলমান্য কবি–যা পূর্বে বিশদভাবেই দেখানো হয়েছে। মুসলিম সংস্কৃতির একটি বিশ্বময় রূপ আছে, তাই এ সংস্কৃতি কোথাও ভেসে বেড়ায় না, যেখানেই যায় গভীরে শিকড় চালনা করে সে দেশের ইসলামানুসারীদের জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়ে। যে মুসলিম-সংস্কৃতি পাঁচ শ বছরেরও

---

১৫৩. The Mind of Educated Middle Class in Nineteenth Century Bengal (New Values; vol, ix. No. 2)—A Razzaq. (quoted).

১৫৪. মুসলিম সংস্কৃতি—পূর্বমেঘ, ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা; পৃ. ২৮-২৯ ও ৩১

www.pathagar.com

অধিককাল এদেশে একচ্ছত্রভাবে কোটি কোটি মন-মানসকে আবর্তিত ও প্রভাবিত করেছে, তাকে সংকর বা ভাসমান সংস্কৃতি বলায় ইতিহাস-জ্ঞানের দৈন্যই প্রকাশ পায়। বলাবহুল্য, এ মন-মানস ছিল শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দুরও, এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের দ্বারাও।

মুসলমানের অপরাধ ছিল, তার মুখের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ছয় শ বছরেরও অধিককাল ব্যবহৃত ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজিকে এককালে বরণ করে নিতে পারে নি, পারে নি নিজের জাতীয় কালচারের পরিবর্তে ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট মুৎসুদ্দি-দালালদের সংস্কৃতি বা বাবু কালচারকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে। প্রথমটির কারণ ছিল, মুসলমান দেখেছে ইংরেজ তাকে শাসক থেকে শাসিতে পরিণত করে তার মুখের ভাষাও কেড়ে নিয়ে তাকে সব ক্ষেত্র থেকে স্থানচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। আর দ্বিতীয়টির কারণ ছিল, বাবু কালচার ও বাংলাসাহিত্য থেকে তাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে বর্জন করা হয়েছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় মুসলমানকে নব্য ভারতীয় কালচার থেকে 'এক্স্টার্নাল প্রলেটারিয়েটের' মতো দূরে রাখা হয়েছিল; তবু যদি মুসলমান হিন্দুর এ জগতে প্রবেশের স্পর্ধা করত তাহলে তাকে ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে আসতে হতো তৎকালীন মুসলমান তা পারে নি আত্মমর্যাদা ও আত্মসত্তা বিকিয়ে দিয়ে। অথচ তার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, আজকাল তাকে তারই বংশধরের হাতে ধিকৃত হয়ে হচ্ছে! পিতামাতামহ আজ ধিকৃত হচ্ছেন সংকর সংস্কৃতি গঠন ও অনুসরণ করার জন্য এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে 'হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পারিয়ার মতো পদলেহনশীল জীবে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য (?) থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য!

এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ সংকর ও অপরিপক্ব চিন্তার প্রবণতা জন্মে দুটি কারণে : প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে প্রত্যয়ী জ্ঞানের অভাব হলে অথবা অন্য স্বার্থবশে হীনম্মন্যতা জন্মালে ও প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করার মানসিকতার সৃষ্টি হলে। উভয় কারণই বেদনাদায়ক। সকল শ্রেণীর শুভবুদ্ধির ভিত্তিমূলেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত এবং কল্যাণ নিহিত। সকলেরই এ শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, এ আশাই করব।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি চেষ্টা চলেছিল মধ্যযুগে এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিরা পদাবলিও রচনা করেছিলেন, এটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্ম সমন্বয় ও ধর্মীয় ঐক্যের বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস প্রমুখ প্রচারকদের দ্বারা; কিন্তু এসব ধর্মীয় সমন্বয়ের আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছিল হিন্দু ধর্মেরই নিরাপত্তা রক্ষার ও হিন্দু সামাজিক সত্তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রেরণা থেকে, একথাও আজ তর্কের বিষয় নয়। ঠিক এভাবেই হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ করে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল রামমোহনের দ্বারা এবং *এ যুগে রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে*

www.pathagar.com

গান্ধীর 'রামধূন' সংগীতও শেষ প্রয়াস হিসেবে ধরা যায়। কিন্তু এসব প্রচারকরা ছিলেন মূলত হিন্দু এবং মতবাদে প্রগতিপন্থী হলেও ধর্মে ও জাতিতে তাঁরা হিন্দুত্বের বৃত্তেই বিচরণ করেছিলেন।[১৫৫]

সুতরাং তাঁদের প্রচার ফলে 'উত্তরকালে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ সুবিধাই হয়।'[১৫৬]

সমন্বয় কর্মের কোনো প্রত্যক্ষফল জন্মে নি। জোলা শ্রেণীর কবীর এবং ধুনকর শ্রেণীর দাদু ও রজ্জব মুসলমান হলেও পূর্বসংস্কারগত মায়াবাদের ও হিন্দুর ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবের প্রাবল্যহেতু এবং শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবহেতু তাঁদের আন্দোলন কেবলমাত্র হিন্দুর ভাবরসের আবেগ প্রবল ছিল এবং তার দরুন ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যেই সীমিত ছিল, বৃহৎ হিন্দু বা মুসলমান সমাজ মনে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগে নি। রবীন্দ্রনাথও এ সত্যটি স্বীকার করে বলেছেন, তখনকার কালের দুই বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে; তাদের মধ্যে কিছুই প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয়, তবে তা অতি সামান্য। আসলে অভাব ছিল আন্তরিকতার, সহৃদয়তার ও সহানুভূতির, অসম্ভব ছিল হাঁড়ির ও নাড়ির বন্ধন স্থাপিত হওয়া।

'সকলের চেয়ে আত্মীয়তার ধারা নাড়িতে বয়, মুখের কথায় না। যাঁরা নিজেদের এক সহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ির মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না ... তাদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়।'[১৫৭]

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানাভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে এবং সাহিত্য শিল্পে ও সংগীতে দেওয়া-নেওয়ার অজস্র চিহ্ন বিধৃত হয়ে আছে। কিন্তু তারও প্রভাব ছিল অতি ক্ষীণ এবং দুটি সম্প্রদায়কে একই সমতলে সমাসীন করার পক্ষে অপ্রচুর, সমন্বয় সাধনের কথা তো

---

১৫৫. গান্ধীর কথা : আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি। কারণ প্রথমত আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আস্থাবান; দ্বিতীয়ত, আমি বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করি; তৃতীয়ত, গোমাতার রক্ষণ আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলমন্ত্র এবং চতুর্থত, আমি মূর্তি পূজায় অবিশ্বাস করি নে। (Young India, 12 Oct. 1921). মরমীবাদী নানক হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেশ্বরবাদ বিশ্বাসী ও বর্ণাশ্রম প্রথাবিরোধী শিখ সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেও হিন্দুত্বের মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। এজন্য তিনিও আক্ষেপ করে হিন্দুদের সাবধান করেছেন :

তোমরা গোপনে হিন্দু ধর্ম পালন করো;
কিন্তু ভ্রাতৃগণ! মুসলমানের গ্রন্থই পড়ো,
আর মুসলমানী আচার-নীতি অনুসরণ করো!

১৫৬. মুসলিম কবির পদ সাহিত্য—আহমদ শরীফ : সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৭, পৃ. ১৪৩।

১৫৭. কালান্তর—সমস্যা, পৃ. ১৯২।

www.pathagar.com

চিন্তাই করা যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক আমলে অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চেষ্টায় হিন্দু মন-মানসকে করে দিল সনাতন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদমুখী, আর মুসলমানদের মধ্যেও ফরায়েজি হেদায়তি প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলনের মারফত মুসলমান মন-মানস হয়ে উঠল শরিয়তমুখী; ফলে সে ক্ষীণধারাটিও কোথায় বিলীন হয়ে গেল।

বাংলাভাষী অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদসাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কেউ করেছেন নেশার ঝোঁকে, আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে—ইসলামে শিথিল বিশ্বাসের কারণে নয়, কিংবা হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ ও ইসলাম বর্জনের উদ্দেশ্যেও নয়। রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে সূফীতত্ত্বে সহজভাবে প্রকট করে মুসলিম মানসকে সুফিতত্ত্বে শিক্ষিত ও আকৃষ্ট করার উৎসাহেতু তার ব্যবহার হয়ে ছিল অনুরাগবশে নয়।

> 'একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোনো বিধিবদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের আওতায় রচিত নহে'।[১৫৮]

আহমদ শরীফের মতে বৈষ্ণব সাহিত্য প্লাবিত দেশে যখন 'কানু ছাড়া গীত নাই' তখন কেবল হুজুগের বশেও কোনো কোনো মুসলিম কবি এ জাতীয় পদ রচনা করে থাকেন। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা উল্লেখযোগ্য :

> পূর্ব বাংলার খ্যাতনামা কবিয়াল শ্রীরমেশচন্দ্র শীল মাইজভাণ্ডারপন্থী মারফতি গান লিখে 'নূরের ঝংকার' নামে কয়েকখণ্ড পুস্তিকায় তা প্রকাশ করেছেন। এতে রটে গেল যে, রমেশ শীল মাইজভাণ্ডার দরবারে মুরিদ হয়েছেন। কথাটি আমার কানে এলে আমি শ্রীরমেশচন্দ্র শীলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'একবার উরুসের সময় মাইজভাণ্ডার গিয়েছিলাম। দেখলাম দিনরাত মাইজভাণ্ডারি গানের আসর চলছে। কিন্তু যাঁরা গান বেঁধেছে, তারা ভালো করে বাঁধতে পারেনি, ফলে সুরতাল ভালো উঠছে না। আমি ভাবলাম এরূপ গান লিখলে বেশ কাটতি হবে—আমার পয়সা হবে। তাই মাইজভাণ্ডারি গান লিখে ছাপিয়ে দিলাম।' এমনি পেশার লোভে না হোক, অন্তত জনপ্রিয়তা লোভে যে কোনো কোনো মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা ও শাক্তপদ রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।
>
> আবার নির্বোধের অন্ধ অনুকৃতিও যে ছিল না তা নয়; সম্ভোগ, বাৎসল্য, গৌরচন্দ্রিকা, শাক্তপদ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নবীলীলা বর্ণনার প্রয়াসের মধ্যে এর আভাস আছে।[১৫৯]

অতএব দেখা যাচ্ছে, অন্য স্বার্থবশে বা অন্য প্রবৃত্তির তাড়নায় এসব শ্রেণীর কবিতা সৃষ্টি হয়েছে। অন্তরের বিশ্বাস বা প্রেরণার প্রত্যয়ে এসব কবিতা জন্মলাভ করে নি। এজন্য সাধারণ মনেও তার ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য হয় নি, তার আবেদনও

১৫৮. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ৩২১।
১৫৯. মুসলিম কবির পদসাহিত্য, প্রাগুক্ত; ১৫৪-১৫৫।

www.pathagar.com

ফলপ্রসূ হয় নি। সাহিত্যের মূল্যায়নেও এ শ্রেণীর কবিতা উচ্চস্তরের হিসেবে বিবেচ্য হয় নি। এজন্য এসব কবিতার স্মৃতিও লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

ইংরেজ আমলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মন-মানস একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ আমলে মুসলমান সমাজটাই হিন্দুর দৃষ্টি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন হিন্দুর এক চক্ষু থেকেছে প্রাচীন হিন্দু কালচারকে আবিষ্কার করে সনাতন বৈদিক ভিত্তিমূলে তার প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন করায়। এবং অন্য চক্ষু নিবদ্ধ রয়েছে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি, আর এজন্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন একটিমাত্র সমন্বয় সাধনের–হিন্দু ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার। বরং এ যুগে আঙিনার পাশে অবস্থিতিটাই মুসলমানের অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং তার দরুন তার প্রতি হিন্দু বিরূপতা আরও কঠোর হয়েছে, বিতৃষ্ণা আর পুঞ্জীভূত হয়েছে। তখন খাস বাবুর্চি মানিক শেখের হাতের রন্ধন-বিলাসী রবীন্দ্রনাথের চোখেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে : *'বাংলাপার্শি শব্দ জমেছে বিস্তর তাছাড়া শহরে রাজধানীতে পারসিক আদব-কায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব*।[১৬০]

> আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে—তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা তালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সবচেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।'[১৬১]

কবির এই শোকাবহ খেদোক্তিতে মুসলমান সমাজ কবির ভাষাতেই জবাব দিতে পারে : সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি—... আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই, শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ!

যেখানে এত বিরূপতা, এত বিতৃষ্ণা; এত অবিশ্বাস ও সন্দেহ, সেখানে সমন্বয় তো দূরের কথা, অন্বয় ঘটিয়ে বেঁচে থাকাই দুষ্কর। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক কেটেছে দুটি জাতির মধ্যে গাঁটছাড়া বাঁধাবাঁধির আবেগ আর 'নব-প্যাক্টের আসনাই' অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সে মিলন কখনো প্রাণের মিলন হয় নি, কারণ প্রাণ যে তাদের একপ্রাণ নয়। তাই বারে বারে দেখা গেছে মিলনের সুর কোথায় মিলিয়ে গেছে আর 'শম্ভু ছুটেছে বম্বু লইয়া ছকু মিয়া নিল ছোররা'। বারে বারে এ উপমহাদেশের 'আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা—করুণ চন্দ্রবিন্দু'।

মিলন যেখানে হয় না, সমন্বয় যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে একটিমাত্র পথই খোলা থাকে। সে পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে শান্তিকামী মহামানুষ, দিয়ে গেছেন সকল বিরোধ স্তব্ধ করার শাশ্বত ঘোষণা :

> বলে দাও : হে অবিশ্বাসী সমাজ!
> তোমরা যার এবাদত করো, আমি তার এবাদত করিনে;
> এবং যাঁর এবাদত আমি করি, তাঁর এবাদত করতে তোমরা তৈরি নও;

---

১৬০. স্মরণীয় যে, 'প্রাদুর্ভাব' শব্দে (মন্দার্থে) ভীতিপ্রদ আধিক্য বুঝায়, যেমন রোগের বা মশার প্রাদুর্ভাব (সংসদ বাংলা অভিধান)।

১৬১. কালান্তর, ২-৩ পৃ.।

www.pathagar.com

আর যার এবাদত তোমরা করছো, তার এবাদত করতে আমি তৈরী নই;
আমি যাঁর এবাদত করছি তোমরা তাঁর এবাদত করতে তৈরি নও
তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্যে; আমার কর্মফল আমার জন্যে।[১৬২]

মানুষ বাস্তবধর্মী। সাময়িক আবেগ-উত্তেজনায় হয়তো ক্ষণিক চিত্তবিভ্রম ঘটাতে পারে, কিন্তু মানবমন কখনো তার সেবা; তার সাধনা করতে পারে না, যার মধ্যে প্রাণ বাঁচানোর অমৃতধারা মেলে না। এ সহজ-সরল সঠিক পথের সন্ধান এ দেশেরই এক হিন্দু বিদূষী মৈত্রেয়ী দিয়ে গেছেন আর অতীতকালে : যেনাহম নামৃতা স্যাম কিমহম-তেন কূর্যাম–যার মধ্যে অমৃত মিলছে না, তা নিয়ে আমি কী করব? শুষ্ক আদর্শ ও উপকরণ চান নি তিনি, তিনি চেয়েছিলেন অমৃত। জীবনধারণই প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে মানুষ চিরকালই অমোঘভাবে চূড়ান্ত পথই বেছে নেয়। এ মহাদেশের মুসলমানরা সাত শ বছরেরও অধিককাল এক আঙিনার তলে হিন্দুর সঙ্গে বাস করে এ ঐতিহাসিক সত্যটি উপলব্ধি করতে ভুল করে নি—তার জাতি, তার ধর্ম, তার সংস্কৃতি পৃথক, পৃথক সত্তা হিসেবেই এদেশের মাটিতে তার শিকড় বসে গেছে, পৃথকভাবে তার বিকাশ ও প্রকাশ হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে এবং এই পৃথক হয়ে যাওয়াতেই তার শাশ্বত কল্যাণ নিহিত।

এই অমৃতের সন্ধানে, এই কল্যাণের পথেই হয়েছে এ উপমহাদেশের মুসলমানের বলিষ্ঠ দৃপ্ত ও নির্ভুল পদক্ষেপ ১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট বৃহস্পতিবারে। সেদিন সে দরাজদিল হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে নবজীবনের শপথ নিয়েছে :

আমার গড়িব নতুন জগৎ
আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে নত এ ধরণী নেবে
অঞ্জলি পামি মোদের দান।

সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বৈচিত্র্য

বহু বৈচিত্র্যের লীলাভূমি এই ভারতীয় উপমহাদেশ। তার পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌত্রিশ শ মাইলব্যাপী সাগরবেষ্টিত ও উত্তরে ষোল শ মাইলব্যাপী উত্তুঙ্গ হিমালয়বেষ্টিত সীমানায় ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক কোনো নিদর্শনের অভাব নেই। তেমনই অভাব নেই মানবজাতির কোনো বর্ণের, স্তরের বা বৈশিষ্ট্যের। এজন্যই এদেশটাকে বলা হয় নৃকুলবিদ্যার জাদুঘর—এখানে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ও মানবসভ্যতার আশ্চর্য সমাবেশ। সৃষ্টির আদিস্তরের ও সর্বাধুনিক প্রগতিবাদের, নিকৃষ্টতম অসভ্য মানুষ থেকে সর্বোচ্চ সংস্কৃতি ও রুচিবান, একেবারে নিরক্ষর থেকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-দার্শনিকের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায় এখানে। কত ভাষা

১৬২. কোরান : সূরা ১০৯।

www.pathagar.com

ও বর্ণমালা, ধর্ম ও মতবাদ, আচার ও কালচারের অস্তিত্ব আছে এদেশে, আজও সেসবের সঠিক সংখ্যা নির্ণীত ও পরিচয় নির্দেশিত হয়েছে কি না সন্দেহ।

বহু বৈচিত্র্যের লীলাক্ষেত্র ভারতীয় উপমহাদেশের বহু সহস্র বর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্রিক একত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য অতি অল্পকালই বিরাজিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেগাস্থিনিস প্রায় ১১৮টি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন হিন্দু আমলে উপমহাদেশটি আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য নামে বিভক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্য কোনোকালেই আর্যাবর্তের ওপর রাষ্ট্রিক প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করলেও আধুনিককালের মহিশূরের উত্তর সীমানা অতিক্রম করে নি। অশোক তামিল রাজ্যগুলো জয় করেন নি, কুশান ও গুপ্ত সাম্রাজ্য আর্যাবর্তেই সীমিত ছিল। মুসলমান সুলতানরাই সর্বপ্রথমে দাক্ষিণাত্যে শাসন বিস্তারে উৎসাহী হন এবং সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দেবগিরি পর্যন্ত অধিকার করেন। সুলতান মুহম্মদ তুঘলক দ্বারা সমুদ্র পর্যন্ত জয় করে প্রায় সমগ্র উপমহাদেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দৌলতাবাদে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সাম্রাজ্য শাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। আকবরের বিজিগীষা অদমনীয় ছিল এবং দাক্ষিণাত্য অধিকার করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন কিন্তু তিনিও সফলকাম হন নি। তাঁর ঐতিহাসিকেরা দাক্ষিণাত্যের তামিল রাজ্যগুলোর বিশেষ উল্লেখ করেন নি এবং আহমদাবাদের দূরবর্তী তাঁর শাসন বিস্তারের কোনো বর্ণনা মেলে না। একমাত্র আওরঙ্গজেবই তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করে কাবুল থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে একচ্ছত্র সার্বভৌম শাসন কায়েম করেন। কিন্তু তার আয়ু ছিল স্বল্পকাল-স্থায়ী; পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সমগ্র উপমহাদেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ইংরেজ-আমলে পুনরায় ভারতীয় উপমহাদেশে একচ্ছত্র শাসনাধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস মারাঠাশক্তি বিধ্বস্ত করে দিয়ে প্রকাশ্যে সারা উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্বভৌম শাসনাধিকার ঘোষণা করেন; *১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন কোম্পানি শাসন বিলুপ্ত করে দিয়ে এবং ১৮৭৮ সালে তিনি ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন।*[১৬৩]

রাষ্ট্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, রাষ্ট্রিক বিবর্তনই যুগে যুগে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছে, ধারা ও প্রগতির পথে নিয়ন্ত্রণ এনেছে ও প্রভাব বিস্তার করেছে; তার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিহাসের ধারা বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে—এক ও অবিচ্ছিন্ন ধারা কোনোকালে থাকে নি।

---

১৬৩. Oxford Hist. of India, pp 1, 6-7.

www.pathagar.com

এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে চারটি প্রধান চক্রে ফেলা যায়। প্রথম চক্রে ফেলা যায় আদিবাসীদের সভ্যতা। বস্তুত, আদিমতম স্তরে এদেশের সভ্যতার রূপরেখা কী ছিল, তার পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণার মধ্যেই বিধৃত এবং মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য-লব্ধ নিদর্শনগুলোর আলোকসম্পাতের উপরেই সীমিত। কিন্তু এসব সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংশয়াচ্ছন্ন ও সন্দেহাকীর্ণ অনুমাননির্ভর হওয়ার দরুন এই আদিমতম চক্রের সভ্যতার রূপরেখা এখনও নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয় নি। তবে অনেকে অনুমান করেন, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক ও আদিমস্তরের সভ্যতার সঙ্গে সুমারিয়ান (Sumerian) সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

দ্বিতীয় চক্রে ফেলা যায় ইন্দো-আরিয়া বা হিন্দু সভ্যতাকে। বস্তুত আর্যরা কোন আদিকালে এদেশে আগমনপূর্বক স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে ও তাদের সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হয়, আজও তার সঠিক ইতিহাসকাল নির্ণীত হয় নি। *এ চক্রের আদিস্তর নির্ণীত না হলেও এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা প্রায় একমত যে, তিনটি প্রধান জাগতিক আদিম সভ্যতার একটিই ছিল হিন্দু সভ্যতা—অন্য ধারা দুটি ছিল গ্রিক ও রোমান এবং ইরানি সভ্যতা।*[১৬৪] গ্রিকরা যেমন উত্তরদিকের অসভ্য জাতিসমূহের (দস্যু) সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তেমনই পূর্বদিকের সব গোত্রীয় সভ্য জাতিগুলোর সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিল। এসব সংগ্রাম-সংঘাত পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক যুগে হয়েছে। আর্য হিন্দুদের যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা মেলে না—কেবলমাত্র মেলে 'সুর' ও 'অসুর' (অর্থাৎ ইরানি সমগোত্রীয়) যুদ্ধেরও 'দাস' 'নিষাদ' বা 'দস্যুদের' (অর্থাৎ আদিবাসীদের) সঙ্গে সংঘাতের পৌরাণিক বা স্মৃতিকাহিনীর ইঙ্গিত, আভাস। অবশ্য খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতক থেকে হিন্দু আর্যদের সঙ্গে পারস্য সাম্রাজের, গ্রিস রাজ্যগুলোর, এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের ও প্রভাব বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতীয় আর্যহিন্দুর রক্তও পরবর্তীকালে কুশান হুন শক, এমনকি পার্থিয়ানদের আগমনে মিশ্রিত ও বলিষ্ঠ হয়েছিল এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিও সামাজিক জীবনে উচ্চ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'ম্লেচ্ছ' অর্থৎ অস্পৃশ্য বিদেশি হিসেবে বর্ণিত হলেও কালক্রমে এসব বহিরাগত গোষ্ঠী হিন্দু সমাজদেহে লীন হয়ে গেছে এবং প্রধানত রাজপুত বংশাবলির স্রষ্টা হিসেবে তাদের পূর্বপুরুষরূপে ঐতিহাসিকেরা চিহ্নিত করে থাকেন। যাহোক, এই দ্বিতীয় চক্রের ঐতিহাসিক সূচনা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ধরা যেতে পারে। এ চক্রের সমাপ্তিকাল নির্ভুলভাবে ধরা যায় খ্রিষ্টীয় বারো শতকের শেষ পাদ থেকে।

১৬৪. উল্লেখযোগ্য যে, এখনও ইরানিরা 'আরিয়াগোষ্ঠীর' সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ দাবি করে। ইরানের প্রাক্তন শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলবী সম্প্রতি (১৯৬৭) সালে রাজ্যাভিষেককালে 'আরিয়া হেমের' (আর্যমিহির?) উপাধি গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় চক্রটি হলো ইসলাম তথা মুসলিম সভ্যতা। নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিজয়ীর বেশে মুসলমানরা এ চক্রের সূচনা করে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে, যখন মুহম্মদ ঘোরী তিরৌরীর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করেন; আর তার সমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে, যখন ক্লাইভের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটেছিল। এ যুগের ভারতীয় উপমহাদেশ ইতিহাস বিশদ ও পরিচ্ছন্ন। এ যুগে এদেশের কূপমণ্ডূকতা কেটে গেছে, বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে এবং একটা বীর্যবান জাতি, একটা মহৎ ধর্ম ও মহৎ সংস্কৃতির বাহনরূপে এদেশে মুসলমান স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। বস্তুত মুসলমানের আগমন ও বসতি স্থাপন এবং আর্যহিন্দুর আগমন ও বসতি স্থাপনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; এইমাত্র তফাৎ যে, হিন্দুর থেকে মুসলমান কয়েক শতক পরে এসেছে এবং হিন্দুর একচ্ছত্র অধিকারটা ধ্বংস করে নিজের অধিকার কায়েম করেছে। কিন্তু এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে বিশাল ইসলাম জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটপ্রাচ্য উত্তর আফ্রিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার একাংশ হয়ে গেছে। এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও সমগ্র ইসলাম জগতের অংশীভূত হয়ে আবর্তিত হয়েছে। মুসলমান সুলতান বাদশাহরা ইসলাম জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগসূত্র বজায় রেখে গেছেন। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশ হয়েছে দারুল ইসলাম—ঈমান ও আমান অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নামক মানুষের দুটি মৌলিক অধিকারের অভেদ্য দুর্গ। এজন্য লক্ষ করা যায়, এ যুগে মোঙ্গল-অভিযানের ফলে মধ্য এশিয়া ও পারস্যে মুসলমানদের ঈমান-আমান ও কালচার বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলমান জ্ঞানী সাধক ও শরিয়তপন্থীদের হিজরত-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সুলতান আশ্রয় বুলবনের দরবারে পনেরো জন পলাতক মোঙ্গল-বিতাড়িত মধ্য এশিয়ার আশ্রয় লাভ করেছিলেন সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের সুলতানদের এ কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য যে মোঙ্গল অভিযানের অভিশাপ থেকে তাঁরা এ উপমহাদেশটাকে রক্ষা করেছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, মোঙ্গল-অভিযানের ফলে ইসলাম-জগৎ চরম মার খেয়েছিল এবং বাগদাদী খেলাফত চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে; তারপর মুসলিম শক্তি ও মুসলিম সমাজ পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবে, তার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু ধূলিশয্যা থেকে মুসলমান পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াল এবং আশ্চর্যরূপে তিনটি রাষ্ট্রশক্তিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল—অটোম্যান, সাফাভী এবং চুঘতাই বা তাইমুরী বংশের জন্ম দিয়ে মুসলমান যেন অলৌকিকভাবে বলদৃপ্ত হয়ে জগতের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। তখন ইসলাম জগতে খলিফার সার্বভৌম কর্তৃত্বের চিন্তায় ফাটল ধরেছে এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যের মধ্যে বিশাল মহীরুহের মতো তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের রূপায়ণ হয়েছে—বাইজান্টাইন বা পূর্ব রোমান রাজ্যের স্থলে অটোম্যান সাম্রাজ্য, সাসানীয় সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

স্থলে সাফাভী সাম্রাজ্য এবং ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুর বিশাল মোগল সাম্রাজের আবির্ভাব ঘটেছে। এভাবে ইসলাম জগতের নবরূপায়ণ ঘটেছে। মাঝে মাঝে এ তিনটির মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে; সেলিম ও ইসমাইল পুরাকালীন হিরাক্লিয়াস ও খসরুর মতো দ্বন্দ্বে নেমেছেন, মোগল বাদশাহরাও বারেবারে সাফাভী রাজ্যে হানা দিয়েছেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে এই তিনটি রাষ্ট্রশক্তি ইসলামি কমনওয়েলথ সংগঠন করেছিল এবং আব্বাসী খেলাফতের পর দু শ বছরেরও অধিককাল ইসলাম জগতে রাষ্ট্রিক দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনয়ন করেছিল।

বাহির ইসলাম জগতের সঙ্গে মুসলিম-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের আরও একটি কারণ নির্দেশ করা যায়। ইসলাম বিস্তারের প্রথম যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ ইসলাম জগতের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ভারতে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে অনেক পরে। আরবে ও পারস্যে যে জোশ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভারতীয় উপমহাদেশে তা হয় নি। এজন্য এদেশের মুসলিম ধর্মীয় ও সমাজ-জীবনে এবং কালচারে আরবি ও ইরানি মিশ্রিত প্রভাব বেশি কার্যকর হয়েছে এবং তা হয়েছে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির অনুসারী মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর প্রসাদে। মোগল আমলে ফারসি ছিল রাষ্ট্রভাষা এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 'বিদ্বান' হিসেবে পরিচিত হওয়ার ভাষা। কাবুল থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ছিল ফারসি ভাষার ও ফারসি-আশ্রিত কালচারের অপ্রতিহত গতি এবং তার এ প্রভাব মুসলমান, রাজপুত, মারাঠা সকল শিবিরেই ও সকল সমাজেই অবিসংবাদী ছিল। অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে সে সবের বিকাশকালে স্বতন্ত্র রূপগ্রহণ করেছিল। তবুও তাদের বিকাশের পটভূমি সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

চতুর্থ ও শেষ চক্রে ইংরেজের আবির্ভাব এবং ইংরেজিয়ানা তথা ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য জগতের প্রভাব। এ চক্রের রাষ্ট্রিক পত্তন হয়েছিল ১৭৫৭ সালে এবং মাত্র এক শ নব্বই বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তার যবনিকাপাত হয়েছে। কিন্তু বাহ্যত ইংরেজ শাসন খতম হয়ে গেলেও ইংরেজিয়ানা তথা ইউরোপীয় জগতের প্রভাব এখনও আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছে অপ্রতিহত। পাকিস্তান এবং ভারত সর্ববিষয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও এ দুটির সরকারি ভাষা এখনও ইংরেজি; এখনও উচ্চশিক্ষা দানের মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজি; রাষ্ট্রিক কাঠামো এবং আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজিয়ানার প্রভাব অল্পমাত্রই ক্ষুণ্ন হয়েছে। অবশ্য আজাদিলাভের পর চলছে এ দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিবর্তন-সমন্বিত যুগ; কিন্তু কোন সময়ে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজিয়ানার প্রভাব একেবারে মুক্ত হবে, কিংবা কোনোকালেও হবে কি না, ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে।

এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ ইসলাম জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কলোনিতে। তখন ব্রিটিশ নন্দনরা হোমের প্রতি ও তার স্বার্থের প্রতিই ধ্রুব লক্ষ্য রেখে এদেশটা শাসন ও শোষণ করেছে।

www.pathagar.com

আর সেই সঙ্গে নিজ স্বার্থের পরিপন্থী না হলে ইংরেজি ভাষায় শিখিয়েছে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাবধারা, আমদানি করেছে ইংরেজিয়ানা তথা ইউরোপীয় সভ্যতা, সাহিত্যচিন্তা ও সংস্কৃতির উপাদনসমূহ। এভাবে এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশের কলোনি হলেও বৃহত্তর পাশ্চাত্যজগৎ ও ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যই ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়ে গেলেও পাশ্চাত্যজগতের প্রভাব থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি।

আলোচ্য প্রসঙ্গে চারটি সাংস্কৃতিক চক্রের উল্লেখ করলেও অতঃপর আলোচনা সীমিত হবে, শেষোক্ত তিন চক্র সম্বন্ধেই-অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম ও ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য চক্র বিষয়ে। প্রথম চক্রের এখন স্থান নির্দেশ হয় মৃতের স্তূপ হিসেবে; কারণ আমাদের বর্তমান জীবনধারায় তার কোনো চিহ্ন নেই।

এই তিনটি চক্রকে ঐতিহাসিক দিক থেকেও পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রচলিত পাঠ্যতালিকাভুক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ ইতিহাসকে তিনটি পৃথক আমলে বিভক্ত করা হয়–হিন্দু আমল, মুসলিম আমল ও ব্রিটিশ আমল। এ বিভাগটা নেহায়েত ভ্রান্ত নয়, কারণ তার ফলে সাংস্কৃতিকক্ষেত্রেও হিন্দু, মুসলিম ও ইউরোপীয় প্রাধান্য নির্দেশিত হয়ে থাকে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম আমল ইন্দো-আর্য, দ্বিতীয়টি ইন্দো-তুর্কি ও তৃতীয়টি ইন্দো-ইউরোপীয় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এভাবে চিহ্নিতকরণের আর একটি হেতু হলো ভাষার প্রাধান্য। প্রথম আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহৃত হতো সংস্কৃত, যদিও প্রাকৃত ভাষাগুলোর চলন ছিল; দ্বিতীয় আমলে ফারসির ছিল সর্বভারতীয় প্রচলন, যদিও দেশীয় ভাষাগুলো ব্যবহৃত হতো এবং তৃতীয় আমলে আধিপত্য ছিল ইংরেজির,যদিও আধুনিক দেশীয় ভাষাসমূহ ব্যবহৃত হতো। এভাবে বিভিন্ন যুগে বিদেশি ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাধান্য লাভ করেছে ও জনজীবন আবর্তিত ও প্রভাবিত করেছে। তার দরুন বহিরাগত সাংস্কৃতিক প্রভাব যুগে যুগে এদেশকে বৃহৎ জগতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত করেছে, স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে জাগতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করেছে, জগতের সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধে সহায়ক হয়েছে। তার ফল এই হয়েছে যে, কালক্রমে জগতের বৃহৎ সাংস্কৃতিক ধারাগুলো ভারতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে আলোড়ন এনেছে এবং ভারতীয় রূপ গ্রহণ করেছে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা, মধ্যযুগের ইসলাম সভ্যতা ও বর্তমান যুগের ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে নতুন রঙে-রূপে বিকশিত হয়েছে; বিদেশি প্রভাব সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বে ভারতীয় উপমহাদেশের রূপে পরিচয়টিও সহজ লক্ষণীয়।

বিশ্ব-ইতিহাসে ভারতীয় উপমহাদেশের স্থান লাভের সুযোগ হয়েছিল বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির প্রবেশের দরুন সংঘাতের ফলে এবং এই সম্বন্ধ স্থাপনকালে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হলো, প্রত্যেক চক্রেই ভারতীয় উপমহাদেশ বিদেশি শক্তির বলিষ্ঠ উপস্থিতিতে বলপূর্বক বিশ্ব-ইতিহাসের

www.pathagar.com

সমকালীন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। হিন্দু বা সাংস্কৃতিক আর্যদের আগমন ও বিস্তৃতির ফলে উপমহাদেশটি সমকালীন ইউরেশিয়াটিক জগতের মানবগোষ্ঠীর বলিষ্ঠতম জীবনধারার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। মুসলমান যখন এদেশে আসে, তখন ইসলামি বিধান ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও বলিষ্ঠতম পদ্ধতি। আর যখন ইংরেজ আসে, তখন বিশ্বশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউরোপই প্রাধান্য লাভ করছে এবং ক্রমাগত ইসলামি শক্তিকে কোণঠাসা করে ফেলছে।

দ্বিতীয়টি হলো, শক্তিতে ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে প্রত্যেক চক্রেই নবাগত বিদেশি জাতি ছিল অপরাজেয়। আর্যহিন্দুরা যখন এদেশে এসেছিল তখন তাদের ক্ষাত্র শক্তি ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য সহজেই এদেশের আদিবাসীদের পরাভূত ও অভিভূত করে 'দাস' শ্রেণীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই হিন্দুক্রমকে পরাভূত করে প্রাধান্য স্থাপন করা সম্ভব ছিল বিশ্বজয়ী ক্ষাত্রশক্তি, অত্যুচ্চ ধর্মজ্ঞান ও বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সমকালীন একমাত্র অধিকারী ইসলামের পক্ষেই। দৈহিক বীর্যে ও মানসিক ঐশ্বর্যে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সন্দীপন, উজ্জীবন ও উন্নয়ন করতে সমকালীন বিশ্বে ইসলামের সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ছিল না এবং হিন্দুর মোকাবিলায় অন্য কোনো জাগতিক শক্তিও ইসলামের চেয়ে পারঙ্গম ছিল না। চীনজগৎ তখন অথর্ব হয়ে বিশ্বজয়ের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। মধ্যযুগের ইউরোপ তো ছিল ইসলামের নিকট শক্তিতে পর্যুদস্ত, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইসলামের পদানত ছাত্র। এজন্য একমাত্র ইসলামই ছিল ব্রাহ্মণ্য তেজোদর্পিত হিন্দুত্বের মোকাবিলা করার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার যখন ইংরেজ তথা ইউরোপীয়ক্রম ইসলামকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসনচ্যুত করল, তখন আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের বদৌলতে ইউরোপ ইসলামকে সর্বত্রই কোণঠাসা করে ফেলেছে, ইসলামের বীর্যও নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

তৃতীয়টি হলো প্রত্যেক নতুন চক্র প্রবর্তনের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিচয়সীমা আরও বিস্তৃত হয়েছে, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়েছে এবং তার দরুন বিশ্ব ইতিহাসে ভারতীয় উপমহাদেশের পদক্ষেপ হয়েছে পূর্বের চেয়ে বিশালতর ক্ষেত্রে ও পরিবেশে। প্রত্যেক চক্রেই ভারতীয় উপমহাদেশ নতুনতর ক্ষেত্রলাভ করায় তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের নব নব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার দরুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এসেছে বিস্ময়কর আলোড়ন ও রূপান্তরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটি স্তরেই বিদেশি উপাদান, বিদেশি ভাবদর্শ ও বিজাতীয় সাধনার উপকরণ শুধু বিদ্যমানই থাকে নি, এদের কোনো সভ্যতারই জন্ম হয় নি, যার উৎপত্তি বিদেশি নয়। এজন্যই ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে পর্যায়ক্রমে ইন্দো-আর্য, ইন্দো-ইসলামি ও ইন্দো-ইউরোপীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

পুনরুক্তি হলেও পুনরায় উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেক চক্রেই একটি ভাষাকে ভিত্তি করে এ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা হিসেবে প্রথমযুগে কীর্তিত হতো এবং প্রাকৃত বা দেশজ ভাষাগুলো থেকে তার পার্থক্য নির্ণয় করে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হতো। এই সংস্কৃত ভাষা ছিল হিন্দু যুগের রাজভাষা, বিদগ্ধজনের ভাষা এবং এ ভাষাকে আশ্রয় করেই হিন্দু যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা হতো। প্রাকৃত ভাষাকে অস্পৃশ্য বা অসাধু ভাষাজ্ঞানের ধর্ম বা শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে রাখা হতো। সংস্কৃতই ছিল সাধু ভাষা এবং এ ভাষা ব্যতীত ধর্মালোচনা বা সংস্কৃতি-চর্চা নিষিদ্ধ ছিল! প্রসঙ্গত বলা যায়, মধ্যযুগে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে বাংলা ভাষায় হিন্দুর দুটি ধর্মীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতকে মুক্তিদান করায় তাঁদের পণ্ডিত-সমাজ অভিশাপ দিয়েছিলেন : 'কৃত্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুনঘেঁষে, এ তিন সর্বনেশে।' দ্বিতীয় চক্রে ইসলামি যুগে ফারসি ছিল রাষ্ট্রভাষা, সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিদ্বৎসমাজের ভাষা এবং সংস্কৃতকে উৎখাত করে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্ছেদ করে ইংরেজিয়ানা তথা ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

এখানে আর উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক চক্রের প্রবর্তনকালে দেশজ ভাষাগুলোর ওপর সমকালীন রাষ্ট্রভাষা অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বহু বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেশজ ভাষাটির পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সাধন করেছে। কেবল তৎসম শব্দ আমদানি করেই নয়, নুতন নতুন বিদেশি শব্দ সংযোজন করে, ক্রিয়ারূপে নতুন রীতি প্রবর্তন করে এবং বিদেশি শব্দের বিকৃত রূপদান করেও দেশজ ভাষাগুলোর সমৃদ্ধি সাধন করা হয়েছে। প্রাকৃত বাংলার যে আদিরূপ ছিল, সংস্কৃত শব্দের, আরবি ও ফারসি শব্দের এবং শেষে ইংরেজি ও নানা ইউরোপীয় ভাষার শব্দসম্ভার আমদানিতে তা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিচিত্ররূপে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে। আবার শুধু শব্দসম্ভার আমদানি করেই নয়, শব্দগঠন, প্রয়োগ এবং বর্ণনা ও রচনাশৈলীও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার বর্তমান অবয়ব সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রত্যেক চক্রেই দেশীয় ভাষাসমূহ আবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপসজ্জায় ভূষিত হয়েছে।

আর একটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। মুসলিম যুগে হিন্দি ভাষা আরবি ও ফারসি শব্দের সংযোজনে শুধু সমৃদ্ধই হয় নি, অনেক সময় দেবনাগরী লিপির পরিবর্তে ফারসির মতো আরবি লিপিতেও লিখিত হতো। মুসলমানদের আর একটি অবদান, দেশীয় ভাষায় পটভূমিতে উর্দু নামক একটি বলিষ্ঠ দেশীয় মিশ্র ভাষার সৃষ্টি। এ ভাষাটির প্রাধান্য শুধু উত্তর ভারতেই সীমিত ছিল না, মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র সাধারণ আলাপ-পরিচয় ও ভাববিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তার দরুন হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে উর্দু ভাষায় সাহিত্য

www.pathagar.com

সৃষ্টিরও এক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল। এই সেদিনও উত্তর ভারতের অভিজাত মহলে উর্দু ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে চর্চিত হতো। নেহরু-পরিবার, সপ্রু-পরিবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী উচ্চ হিন্দু পরিবারের মাতৃভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল উর্দু ভাষা। ফারসি ভাষাশ্রিত উর্দুই ছিল সেদিনের সর্বাধিক প্রচলিত দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্য চর্চার উৎকৃষ্ট বাহন। বাংলাদেশে ফারসি ভাষাভিত্তিক মিশ্র বাংলার উৎপত্তি ঠিক কোন সময় তার সঠিক কালনির্ণয় করা শক্ত; কিন্তু মিশ্র বাংলায় লিখিত পুঁথিসাহিত্যের প্রসারযুক্ত বাংলায় সর্বাধিক ছিল উনিশ শতকে।

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু ভাষাকে হিন্দুস্তানি ভাষারূপে জোরদার হয়েছিল উর্দুর বিকল্পরূপে। হিন্দুস্তানি ভাষায় ফারসি শব্দের স্থলে সংস্কৃত তৎসম শব্দ এবং ইংরেজি শব্দের আধিক্য ঘটাবার চেষ্টা হলেও তার কাঠামো, ক্রিয়ারূপ উর্দুর অনুরূপ ছিল এবং এখনও আছে। বর্তমানে আজাদি উত্তর যুগে হিন্দিকে পুরোপুরি সংস্কৃত রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। এমনকি বাংলা ভাষাতেও 'সমাবর্তন', 'স্নাতক', 'আচার্য', 'উপাচার্য', 'পরিবহন', 'করনিক' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের প্রচলন-চেষ্টা চলছে 'কনভোকেশন', 'গ্রাজুয়েট', 'চ্যান্সেলর', 'ভাইস-চ্যান্সেলরও, 'ট্রানস্পোর্ট' 'ক্লার্ক' প্রভৃতি শব্দের স্থলে। বিদেশি শব্দের বর্তমান পরিভাষা প্রণয়নে উৎকট সংস্কৃতায়ন-প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার সহজ সাবলীল গতি রুদ্ধ করা হয়েছে কি না, বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য।

> 'যে সময় রেশন কার্ড, কন্ট্রোল, সাইরেন, সিনেমা, ইঞ্জিনিয়ার, রেডিও হইতে আরম্ভ করিয়া এটম বোমা পর্যন্ত আমাদের ভাষায় স্থান লইতেছে, তখন বহুযুগের বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনের কঙ্কালের মতো শব্দসমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার গহন খনির পবিত্র তলদেশে অনুসন্ধান না করিলেই বোধকরি ভালো হইত'।[১৬৫]

বাংলা ভাষায় এত বেশি বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে, সে সম্বন্ধে বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেই সাধারণভাবে ওয়াকিবহাল, কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বাংলা গদ্যের রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যা ছিল, শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীতে এসে তার চেহারা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা গদ্যের রূপ সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজদের আমলেই এবং গদ্য সাহিত্যে উপান্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি রচনার কৌশল ও প্রেরণাও এসেছে এ আমলেই। কবিতার অবয়ব রীতিমতো বদলে গেছে। ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগের টেকনিকই শুধু বদলায় নি, ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিও নবতর রূপ নিয়েছে। মিলটন, শেক্‌সৃপিয়ারের রচনাশৈলী থেকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে মুখ ফেরালেন শেলি, সুইনবার্ন, টেনিসন প্রমুখের দিকে। অধুনা রাবীন্দ্রিক ধারাও পরিত্যক্ত হয়ে টি. এস. ইলিয়ট, এজরা পাউন্ড, অডেন ও 'কন্টিনেন্টাল' কবিদের অনুসরণে কবিতাকর্ম চলছে। তার ফলে পুরাতন ধারার

১৬৫. বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা : ডক্টর রমা চৌধুরী : প্রবাসী ১৩৫৩ আষাঢ়, পৃ. ৩০০।

www.pathagar.com

কবিতার সঙ্গে এযুগের কবির পরিচয় একেবারে নেই বললে চলে, তিনি প্রাচীন বাংলা কবিতার সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক রহিত।

কেবল ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, এদেশের চারুকলা, চিত্রকলা ও সংগীত প্রভৃতি বৈদগ্ধ্যসুলভ আর্ট ও কালচারের ক্ষেত্রে এমনকি নৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসেও যুগে যুগে পরিবর্তিত মূল্যবোধ জন্মেছে। চিত্রকলায় মঘুল চিত্রাঙ্কন নীতি, 'মিনিয়েচার' বা ক্ষুদ্র চিত্রলিপি, চীনা ও জাপানি অঙ্কন পদ্ধতি এবং শেষ ইউরোপীয় ইতালি ও ফরাসি পদ্ধতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কুটির শিল্পেও নতুন ইউরোপীয় রীতির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগীতের সুরসৃষ্টিতে অর্কেস্ট্রায় বাদ্যযন্ত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। এখন সংগীতের আসরে বিদেশি বাদ্যযন্ত্র প্রায় একাধিপত্য স্থান অধিকার করে বসেছে। এই প্রভাব এত উৎকট যে, হিন্দুর বীণাবাদিনী দেবী সরস্বতীর কল্পিত মূর্তির অবয়বে ও পোশাকে পাশ্চাত্য ফিল্মনটির চিত্রই শুধু গৃহীত হয় নি, বীণার স্থলে গিটারও উপস্থিত হয়েছে। রবিবাসরীয় উৎসব বা শোক অনুষ্ঠান, রবিবারে কর্মবিরতি, অফিস-আদালত-শিক্ষায়তন বন্ধ রাখা, শহীদ মিনার স্থাপন, মৃত স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের মাজারে বা সমাধি দাহঘাটে পুষ্পমাল্য অর্পণ, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে শোকসভা ও দুই মিনিট নীরবতা পালন জন্মদিন বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য রীতিনীতি হিন্দু ও মুসলমান সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়েই পালন করে থাকে। পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলিম যুগে সেলাই করা পোশাক ব্যবহার—যা হিন্দুর ধর্মবিরুদ্ধ—সালোয়ার ও কুর্তার প্রচলন এবং ইংরেজ আমলে ইউরোপীয় পোশাক ও দেহসজ্জা, বিলেতি আসবাবে গৃহসজ্জা, বিলেতি পাউরুটি, কেক-পেস্ট্রি প্রভৃতি খাবার এমনকি আসন পিঁড়ির স্থলে টেবিল চেয়ারে খানা খাওয়ায় রেওয়াজ অত্যন্ত চালু হয়ে গেছে। সালোয়ার ও কুর্তার প্রতি নারীর এবং বিলেতি স্যুটের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ কমা তো দূরের কথা, আজাদি উত্তর যুগেও পাকিস্তানে এবং ভারতে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর রূপসজ্জায় পাশ্চাত্যের আকর্ষণ এত বেশি যে, পাশ্চাত্যের দেহসজ্জার উপকরণ ব্যতীত তার চলে না এবং পাশ্চাত্য ঢঙে পোশাক ব্যবহারের ফ্যাশন অনুকরণ তার তপস্যা হয়ে উঠেছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে ও মূল্যবোধে এদেশের মানুষের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব এত বেশি উৎকট হয়ে উঠেছে যে, পাশ্চাত্যকরণই সংস্কৃতিবান, বিদগ্ধ ও প্রগতিবাদী হওয়ার একমাত্র নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রিক চিন্তায় বিভিন্ন মতবাদ প্রবল হয়েছে। হিন্দু যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজচক্রবর্তী হওয়ার উচ্চাশা এবং 'রামরাজ্য' স্থাপন করে নাগরিকত্বের স্বর্গসুখ লাভের কল্পনা ছিল। অবশ্য সে কল্পনা এখনও হিন্দুর মন-মানস আচ্ছন্ন করে আছে অনেকখানি। হিন্দু যুগে গো-ব্রাহ্মণ ছিল সমাজে ও রাষ্ট্রে সবার ঊর্ধ্বে, জনগণ ছিল সবার নিচে। এই দ্বিজ-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এযুগে রবীন্দ্রনাথকেও এতখনি আচ্ছন্ন করেছিল যে,

www.pathagar.com

"তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, সমস্ত হিন্দু সমাজকে গণ্য করতে হবে দ্বিজ-সমাজ বলে, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক সবাই দ্বিজ; কেবল সাঁওতাল, কোলভিলরা দ্বিজ-সমাজের বাইরে। আর এই দ্বিজ-সমাজের শিরোভূষণ হবে ব্রাহ্মণ।"১৬৬

মুসলমানি আমলে সুলতান বাদশাহ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসক, শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে তাঁর নিরঙ্কুশ স্থান, বাকিসব তাঁর আজ্ঞাবহ। এ যুগে মুসলিম শাস্ত্রবিদ মোল্লা-মওলবিদের প্রভাব কম ছিল না এবং এ প্রভাব শাসননীতিকেও অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করত। ইংরেজরা আমাদের প্রজার স্তরে নিক্ষেপ করেছিল, নাগরিকের অধিকার দেয় নি। ইংরেজ আমলে আমাদের রাষ্ট্রিক চিন্তা বেশি প্রভাবিত করেছিল রুশো, মিল, বেন্থাম, ম্যাটসিনি। কিন্তু শেষের দিকে কার্ল মার্কস সব প্রভাবকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন, বিশেষত ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গগনে।

অবশ্য রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে এরকম রুচির বিকার এক শ্রেণীর শান্তিপ্রিয় মানষের রুচিসম্মত নয়, কেবলমাত্র মণ্ড কতড়কায় অভ্যস্ত না হয়ে যা সুন্দর যা জীবনের উৎকর্ষ ও কল্যাণপ্রদ তাই অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে উপযুক্ত ভাবেন। বাস্তবপক্ষে পাশ্চাত্য কালচার ও চিন্তাধারার উত্তম দিকটা অনুশীলন করার চেয়ে সেসব ভারতীয় উপমহাদেশের অনুন্নত মনমানসের মনোহারী ও আকর্ষণীয় বিকৃতরূপে অনুকরণ করার দিকেই প্রবণতা বেশি এবং এ প্রবণতা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যেক স্তরেই অত্যন্ত প্রকট। এজন্য নকল ত্যাগ করে আসলের সমঝদার সংখ্যা প্রায় নগণ্য।

চিন্তাধারাও সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে এদেশবাসীর একটি বেদনাময় দৈন্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের মনীষীরা স্বদেশে প্রতিভার স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধালাভের ততদিন অধিকারী হন নি, যতদিন না পাশ্চাত্যজগৎ তাঁদের স্বীকৃতি দান করেছে। একথা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, স্যার সৈয়দ আহমদ, ইকবাল, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ, জয়নুল আবেদীন, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সত্য।

"ঠাকুর নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তির পূর্বে প্রায় অশিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রে ঠাকুরের একটি রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেটাকে 'বিশুদ্ধ ও সাধু বাংলায়' লেখার নির্দেশ ছিল এবং এটা ছিল ১৯১৪ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পরে।"১৬৭

উল্লেখযোগ্য যে, এ মনোবৃত্তির দরুন এদেশের সত্যিকার মনীষীরা অনেকটা অবজ্ঞাত নিঃসঙ্গ জীবনযাপান করতে বাধ্য হন।

সংস্কৃতির মতো এদেশের রাজনৈতিক চিন্তাও বিদেশজাত। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনও যেমন যুগে যুগে বিদেশাগত রাজশক্তির দ্বারা

১৬৬. বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ, পৃ. ১৭৩।
১৬৭. Autobiography of an Unknown Indian —Nirod C. Chaudhuri, p 489. রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু. পৃ. ৮০ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এদেশের রাষ্ট্রিক চিন্তাও তেমনই বিদেশজ; বিদেশিরাই এদেশে স্থায়ী ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করেছে এবং তাদের জীবন চিন্তা ও কালচার উদ্বুদ্ধ করেছে, জাগ্রত করেছে, প্রভাবিত করেছে। যখনই রাজশক্তি দুর্বল হয়েছে তখনই রাজনৈতিক গগনে যেমন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তেমনই সাংস্কৃতিক জীবনও ওলটপালট হয়ে গেছে। আর্যবিস্তার, ইসলাম বিস্তার ইউরোপীয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের জাতীয় জীবনে নতুন জোয়ার এসেছে, নতুন ভাষা, নতুন কালচার, নতুন সামাজিক বিন্যাস, নতুন রাষ্টীয় নীতি ও নতুন মূল্যবোধেরও জোয়ার বয়ে এনেছে। জনসমষ্টিতে নতুন রক্তের মিশ্রণের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব হয়েছে এবং এই নতুন আবির্ভাবের জোয়ারে নতুন সৃষ্টিশক্তিরও উন্মেষ লাভ হয়েছে। বিদেশাগত আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ যুগে যুগে এদেশের জীবনকে আবর্তিত ও পরিবর্তিত করেছে, একধারা এবং এক ও অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব এদেশে কোনো যুগে ছিল না।

বর্তমান যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও সমাজ-জীবনে শ্রেণীসচেনতা অত্যন্ত প্রখর এবং নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই প্রখর জ্ঞানটা যেন অন্ধ আবেগের রূপ নিয়েছে। এ জ্ঞানটা যেন নেতিবাচক অর্থেই সোচ্চার। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় সেই হিন্দু যে মুসলমান নয়, সেই মুসলমান যে হিন্দু নয়; সেই শিখ যে হিন্দু নয়, মুসলমান নয় ইত্যাদি। বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু অর্থে অমুসলিম, আর মুসলমান হলো অহিন্দু। যদি হিন্দুর এ বিশ্বাস থাকে যে সে মুসলমানির সর্ব-অর্থে শত্রু এবং তার থেকে একেবারে বিচ্ছিন, তাহলেই সে হিন্দুর পূর্ণ সন্তোষ; তার বেদ উপনিষদ শাস্ত্রগ্রন্থাদি এমনকি পৈতাগুচ্ছও চুলোয় যাক। মুসলমানেরও যদি এ বিশ্বাস থাকে যে সে হিন্দু গোত্রের নয়, তাহলে তার শরিয়ত নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই। আজাদি উত্তর যুগে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পিতৃপিতামহের বাসস্থান ত্যাগ করে ছিন্নমূল হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে ভারতে অর্থাৎ হিন্দুর পরিবেশে নিঃশ্বাস ফেলতে; তার একটি মাত্র কারণ পাকিস্তান হিন্দুর নয় ভেবে, হিন্দুধর্ম বা বেদ-উপনিষদ ধর্মশাস্ত্রাদির কথা ভেবে নয়, হিন্দুর জীবন মূল্যবোধ চিন্তা করেও নয়। লক্ষ লক্ষ তেমনই মুসলমান পাকিস্তানে এসেছে; ইবাদাত ঈমান শরিয়ত এসব চিন্তা করে নয়। রাষ্ট্রিক আমান অর্থাৎ নিরাপত্তার চিন্তা যত প্রবলভাবে কার্যকর হয়েছে, ধর্মীয় চিন্তা তত নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন ও তার বিবর্তন বিশ্লেষণকালে আর একটি মৌল লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটা চক্রের বিদেশাগত সংস্কৃতির পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে গাঙ্গের উপত্যকায়—আর্যহিন্দু জাতি, তুর্কি জাতি ও অ্যাংলো-স্যাকসন জাতির শক্তিকেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায়। এখান থেকেই প্রত্যেক জাতির রাজশক্তি বিস্তৃত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এবং এখানেই প্রত্যেক জাতি শক্তি ও সংস্কৃতি বিকাশের চরম শীর্ষে উঠেছে। আর্যহিন্দু সভ্যতা, ইসলামি সভ্যতা ও ব্রিটিশ তথা বাবু কালচারের পীঠস্থান ছিল গাঙ্গেয়

www.pathagar.com

উপত্যকা—এখানেই প্রত্যেকটি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে , রূপান্তরও ঘটেছে। আবার বলতে হয়, দুর্ভাগ্যজনক পরিণিতিও ঘটেছে এই গঙ্গাতীরেই। আর্যহিন্দু, তুর্কি, অ্যাংলো-স্যাকসন—কেউই এর সর্বনাশা শক্তির কবল থেকে রক্ষা পায় নি। এখানেই তার বীর্য নিষ্প্রভ হয়েছে, জীবনীশক্তি মরে গেছে, আদর্শ ও সৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। শেষ লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ যে, বিদেশাগত জাতির শাসন ও সংস্কৃতির রূপায়ণ সদানির্ভর ছিল জন্মদেশ থেকে ক্রমাগত নতুন শক্তির আমদানিতে ও নববলে বলীয়ান করার যোগান দেওয়াতে। যতদিন বিদেশাগত জাতিগুলো বা সভ্যতাসমূহ জন্মদেশে বীর্যবন্ত, প্রাণবন্ত ও সৃষ্টিক্ষম ছিল এবং এদেশে যোগান দেওয়াও সামর্থ্য ছিল, ততদিন শাসনশক্তি ও কালচারসমূহও এদেশে নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ও বেগবান ছিল। কিন্তু উৎসমূল দুর্বল বা নিঃশেষিত হয়ে গেলে এদেশেও এ দুটি শক্তিহীন হয়েছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। একটি সহজেই অন্যকে উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, কিন্তু শেষে নিজেও সমদশা লাভ করেছে।

আমার এ যুক্তির সমর্থনে প্রথমে হিন্দুচক্রের উত্থান-পতন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আর্যহিন্দু বিদেশ থেকে এসে ভারতীয় উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করেছিল অমিতবীর্যের অধিকারী হয়ে, একটা বলিষ্ঠ ক্ষাত্রশক্তি এবং উজ্জ্বল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে তারা গাঙ্গেয় উপত্যকার আদিবাসীদের উৎখাত করে ও দূর অঞ্চলে বিতাড়িত করে আর্যাবর্তের স্থায়ী রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল এবং উন্নত বিস্ময়কর সংস্কৃতি চর্চা করেছিল। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার গণ্ডিমধ্যেই তাদের ক্ষাত্রশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল; উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কিংবা দাক্ষিণাত্যে তাদের রাষ্ট্রশক্তির বিস্তার লাভ হয় নি, সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোকও বিকীর্ণ হয় নি। ইতিহাসের আলোক উদ্ভাসিত খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে দ্বাদশ খ্রিষ্টীয় শতক পর্যন্ত সময়ে আমরা লক্ষ্য করি, কোনো একচ্ছত্র রাষ্ট্রশক্তির সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে অস্তিত্ব নেই। তার বদলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও রাজবংশের জন্ম হচ্ছে, উঠছে, পরস্পর সংগ্রাম-সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে এবং শেষে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাদের কোনোটা হয়তো সাময়িকভাবে অন্যগুলোকে নির্জিত করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছে, কিন্তু পরিণামে কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। বিরাট হিন্দু সমাজের ছিন্নবিছিন্ন ধূলিকণার মতো ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম স্তরের বিদেশাগত বীর্যবান ক্ষত্রিয়দের স্থান লাভ করেছে লুণ্ঠনপ্রিয় ভাগ্যসন্ধানীরা। ক্ষত্রিয়শক্তি আর্যাবর্তে বসতি স্থাপন করেই হৃতবীর্য হয়ে গেল; তাদের স্থান অধিকার করল তিন শ্রেণীর নকল ক্ষত্রিয়রা : প্রথম, বিলুপ্তপ্রায় ক্ষত্রিয়দের অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা; দ্বিতীয়, আদিম অধিবাসীদের বলবন্ত ক্ষত্রিয় দাবিদাররা এবং তৃতীয়, বিদেশি বিভিন্ন নবাগত গোত্রগুলো যারা ক্ষাত্রশক্তির জোরে হিন্দু সমাজদেহে ক্ষত্রিয়ের আসন গ্রহণ করেছিল। সেগুলো সাময়িকভাবে প্রতিপত্তি

www.pathagar.com

স্থাপন করলেও কোনো স্থায়ী উচ্চ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে নি, কোনো মহৎ সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন জোয়ার আনতে সক্ষম হয় নি।

সমান অবস্থার পুনরাবৃত্তি দেখি ইসলাম জগতেও। খেলাফতের পতন হলে এমনি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের ও রাষ্ট্রের উত্থান হয়েছে। সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে, ভেঙেছে, পরস্পর সংগ্রাম-সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। এ অবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল আব্বাসী খেলাফতের প্রতিষ্ঠালগ্নেই স্পেনে নতুন উমাইয়া বংশের আবির্ভাবে; অবশ্য সাত শ বছর ধরে একটি শক্তিমান মুসলিম রাষ্ট্রের ও গৌরবোজ্জ্বল অনন্য সভ্যতার বিকাশও হয়েছিল সেখানে। উল্লেখযোগ্য, স্পেনের সারাসিনী উমাইয়া শাসকরাও খলিফা হিসেবে অভিহিত হতেন। আব্বাসী খেলাফতের মধ্যাহ্নকালেও মরক্কোতে ইদরিসিরা এবং আফ্রিকায় আগলাবিদরা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। খলিফা আল-মামুনের মৃত্যুর পর খোরাশানে তাহিরিয়া বংশ, সিজস্তানে সাফাভী বংশ, মিশর ও সিরিয়ায় তুলুনিদ বংশ এবং পারস্য ও অকসাস নদীর অপর তীরস্থ সমুদয় ভূ-ভাগে সামানিয়া বংশ রাজ্য স্থাপন করে। দশ শতকের শেষ পাদে ইসলাম জগতে আর একটিমাত্র শক্তিশালী সার্বভৌম খেলাফতের আধিপত্য নেই; অঞ্চলে অঞ্চলে অসংখ্য জাতি ও বংশ ক্ষাত্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। সমগ্র ইসলাম জগৎ রাষ্ট্রিক দিক দিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, নতুন নতুন জাতি স্থানীয়ভাবে শক্তি ও সভ্যতার নিয়ামক হয়ে উঠেছে। এই যুগে আর একটি লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে : ভাগ্যসন্ধানী রাজ্যশিকারি বীর সৈনিকের ঘন ঘন আবির্ভাব। তাঁদের দ্বারা অনেক স্থায়ী ও শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং ইতিহাসের পাতায় তাঁরা বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইয়াকুব ইবনুল লায়েস আল-সাফফার, মাহমুদ গজনী, মুইজউদ্দীন মুহম্মদ বিনসাদ ঘোরী, আমীর তাইমুর, বাবর ছিলেন এই শ্রেণীর বিশিষ্ট নাম। ইসলাম জগতে রকেটসম এসব আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালী এই শ্রেণীর শেষ প্রতিভূ। এদিক দিয়ে হিন্দু যুগের খ্রি. পূ. ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বেশ আশ্চর্য মিল দেখা যায়। এ যুগে কত পুষ্যমিত্র, শতকর্ণি, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা অনন্ত *'ভলহলায়'*[১৬৮] মাহমুদ, তাইমুর ও নাদিরের সঙ্গে পরস্পর যুক্ত হয়েছেন।

> এমন কি অশোকও ছিলেন প্রথম যৌবনে সমগোত্রের বীর; তিনিও প্রথমে যুদ্ধজয় করে এক লক্ষ নরহত্যা ও দেড়লক্ষ নরনারীকে নির্বাসিত করেন। উপযুক্ত সময়ে এই হিন্দুরাজা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত না হলে তিনিও অসুর-নাসির-পাল ও নেবুকাডনেজারের শ্রেণীভুক্ত হতেন।[১৬৯]

---

১৬৮. স্কান্ডিনেভিয়ার পুরাকাহিনী মতে এটি হচ্ছে মৃত বীরকুলের অনন্ত আবাদ-প্রাসাদ।

১৬৯. Autobiography of an Unknown Indian—Nirod C. Chaudhuri, p 491-2.

www.pathagar.com

হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির এই বিচিত্র উত্থান-পতনের ইতিহাস পরিক্রমাকালে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আদি উৎপত্তিভূমিতে বীর্য ও ক্ষাত্রশক্তির বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল অন্যদেশে—বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে—এ দুটি জাতির উত্থান ও পতন। প্রথম যুগের সর্ববাধাবিধ্বংসী অমিত ক্ষাত্রশক্তি ছিল ইসলাম অধিকারের বিস্তৃতির মূল কারণ; সে যুগে সভ্যতাও বিকশিত হয়েছে আশ্চর্য ফুলে-ফসলে। কিন্তু প্রায় দু শ বছরের মধ্যেই আরব ক্ষাত্রশক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল এবং তার দরুন লুণ্ঠনপরায়ণ ভাগ্যান্বেষী বীরের অভ্যুদয় ষোলো শতকের প্রথম দিকে পাক-ভারতে আশ্চর্য মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র দু শ বছরের মধ্যেই এই আশ্চর্য জাতি হীনবল ও লুপ্তবীর্য হয়ে পড়ল, প্রতিভার সৃষ্টিক্ষমতারও মৃত্যু ঘটল। তখন আর এক শক্তির অভ্যুদয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিরই মৃত্যু ঘটে নি, মুসলমানের সৃষ্ট আশ্চর্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

এখানে একটি ভ্রান্ত মতের নিরসন হওয়া উচিত। অনেকেই চিন্তা করেন, মুসলমান বাদশাহদের বিশেষত আওরঙ্গজেবের—অনুদার নীতির দরুনই হিন্দু রাজপুত ও মারাঠা জাতিরা বিদ্রোহী হতে বাধ্য হয়েছে এবং তার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের পতন ঘটেছে। এ ধরনের যুক্তিতে দুটি ভ্রমাত্মক অনুমানের সৃষ্টি হয়েছে : প্রথম, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির আসল উৎসের প্রতি দৃষ্টিপাত হয় নি; দ্বিতীয়, মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আসল মনোভাবটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে একথাটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, অনুদারতা কিংবা উদারতা ব্যতিরেকে হিন্দু কখনো মুসলমান শাসনকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ হিন্দু কোনো সময়েই বেড়ার পাশের প্রতিবেশী মুসলমানকে প্রীতির চক্ষে দেখে নি, আর তার দরুন আত্মীয়ের মতো, ভ্রাতার মতো, এমনকি বন্ধুর মতোও দুজনের মধ্যে হার্দিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক একথাটি পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

> হিন্দু ও মুসলিম এক গ্রামে, এক শহরে, এক জেলায় বাস করলেও বরাবর দুটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; বিশেষত ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইউরোপের দুটি জাতির চেয়ে আরও বিচ্ছিন্ন থেকেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ফরাসি ও জার্মানি জাতি ইউরোপবাসীদের চক্ষে দুটি কট্টর দুশমনের জাতি। তবুও একজন ফরাসি-যুবক জার্মানিতে ব্যবসায় বা শিক্ষাব্যাপদেশে যেয়ে যেকোনো জার্মান পরিবারে সহজে বাস করতে পারে। খানা খেতে পারে, একই উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু কোনো মুসলিম কোনো হিন্দুর পরিবারে এমন প্রবেশাধিকার পায় না।[১৭০]

তিনি একজন মুসলিম লেখকের বরাত দিয়ে আরও বলেছেন,

> আমরা যেকোনো ভারতীয় মুসলিম আফগানিস্তান, পারস্য, মধ্য এশীয়, চীনা মুসলিম, আরবি, তুর্কিদের দেশে সফরকালে সহজেই ঘরোয়া পরিবেশে মিশে যেতে

১৭০. Political India—S. T. Morison : p 103.

www.pathagar.com

পারি এবং কোথাও অসুবিধা বোধ করি নি। কিন্তু ভারতে সকল সামাজিক মেলা-মেশায় হিন্দুরা আমাদের বিদেশি শত্রু ভেবে দূরে ঠেলে রাখে।[১৭১]

হিন্দু মুসলিম শাসনকে কখনো অন্তর থেকে গ্রহণ করে নি, বরাবর অপরিত্যাজ্যা অপ্রতিরোধ্য পাপ হিসেবে দেখেছে। এজন্য যতদিন 'অস্পৃশ্য বিদেশি ম্লেচ্ছের' ক্ষাত্রশক্তি প্রবল ও নিরঙ্কুশ থেকেছে, ততদিন অবাঞ্ছিত পাপ হিসেবেই সহ্য করেছে। রাজপুতরা সুযোগমুহূর্তে বরাবরই মাথা চাড়া দিয়েছে। আকবরের মৃত্যু হলে জাহাঁগীরের রাজপুত-স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মানসিংহের ভাগিনেয় খসরুকে উসকানি দিয়ে পিতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। মারাঠা জাতি বারে-বারে মাথা তুলেছে, কিন্তু শক্তিশালী মুঘলের মুষ্ট্যাঘাতে মাথা নত করে সুযোগের প্রতীক্ষা করেছে। বাহাদুর শাহের পর প্রতীক্ষারত নেকড়ের মতো দুর্বল মোগল রাজশক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'হিন্দু-পাদ-পাতশাহি' প্রতিষ্ঠা কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠেছে। মারাঠার এ ভূমিকাকেই প্রশস্তি জানিয়ে এ যুগের বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় কবি 'একধর্ম রাজ্য-পাশে বেঁধে দিব' বলে নয়াভারতের কল্পনা করেছিলেন। এসব থেকেই মুসলমানের প্রতি হিন্দুর মনোভাব বিশদ হওয়া উচিত। বস্তুত, সার কথা হয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন আপন শক্তির জোরেই অপ্রতিহত ছিল, অন্যকিছু নির্ভর হয়ে নয়। সময়ে সময়ে সে শক্তি উজ্জীবিত হয়েছে, উৎসমূল থেকে নতুন শক্তির যোগান বলে। যখন উৎসমূল শুষ্ক হয়ে গেছে, তখনই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আর এক বিদেশি শক্তির শিকার হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রিক, এমনকি সাংস্কৃতিক জীবন বিবর্তনে দেশস্থ জনগণের কোনো যুগে কোনো ভূমিকা ছিল না, অংশও ছিল না। আর্য হিন্দুরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, স্থানীয় আদি-বাসিন্দা 'দস্যুদের' বনে-জঙ্গলে দূরে-দূরান্তে বিতাড়িত করে; হিন্দু-ধর্ম বা আর্যসভ্যতার বৃত্তের একেবারে বাইরে নিক্ষেপ করে। কালক্রমে 'দস্যুদের' পদপ্রান্তে স্থান দিয়েছে 'শূদ্র' হিসেবে সেবালাভের জন্যে; শাসনকর্মে, ধর্মে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অংশ মাত্র না দিয়ে। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বরাবরই শ্রবণের অধিকার ছিল না শূদ্রদের; শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত রাখা হতো। মুসলমান এদেশে অধিকার বিস্তার করেছে আপন শক্তির জোরেই কোনো সমকালীন হিন্দুর সাহায্য লাভ না করে। মুসলমান অকৃপণভাবে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতি দান করতে প্রয়াস পেয়েছে সমকালীন স্থানীয় অধিবাসীদের; কিন্তু আশ্চর্য অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে আর্যহিন্দু মুসলমানের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এ নীতির ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশে বরাবরই সমান্তরালভাবে দুটি পৃথক ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিত্ব অবস্থান করেছে। সময়ে সময়ে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলেছে, কিন্তু তার

১৭১. Ibid, p. 7.

www.pathagar.com

প্রভাব ছিল সর্বদাই ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর। হিন্দু ও মুসলমানকে উৎখাত করে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনকালে এদেশের ইন্টারনাল প্রলেটারিয়েট হিসেবে যাদের অস্তিত্ব ছিল তারা ইংরেজের সঙ্গে মিশেছিল সমকক্ষ হিসেবে নয়, প্রসাদলোভীর ভূমিকা নিয়ে। বলে রাখা ভালো, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে বর্তমানকালের মতো শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, ব্রিটিশ শাসন কাঠামোয় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যেসব উপাদানের সমবায়ে ইংরেজ এ শ্রেণীর জন্মদান করেছিল, সেসবের অস্তিত্ব ছিল মুসলমান শাসন আমলে এবং মুসলমানের অনুগ্রহভোজী হয়েই। ইংরেজ চুপে চুপে তুলাদণ্ডধারীর ভূমিকা বদলে ফেলে রাজশক্তিধর হয়েছিল। বস্তুত ইংরেজের মুসলমানকে স্থানচ্যুত করার প্রক্রিয়াটা ছিল বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মুসলমানের সঙ্গে রাষ্ট্রিক প্রশ্নে সংগ্রাম-সংঘাতের একটি অভিব্যক্তিমাত্র। এ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ইসলামের আবির্ভাবলগ্ন থেকেই। স্পেনে আরবরা রাজ্য স্থাপন করার পর রোমান সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ থেকে নবজাগ্রত খ্রিষ্টান ইউরোপের সঙ্গে ইসলামের ক্রুসেড শুরু হয়ে যায়। *তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ সংগ্রাম-সংঘাত বা ক্রুসেডের ফলে মুররা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়; মাল্টা, লেপান্টো ও ভিয়েনার অবরোধ ইত্যাদিতে সে-ক্রুজেড চলতে থাকে।*[১৭২] আঠারো শতকের মধ্যে খ্রিষ্টান ইউরোপ নিশ্চিতভাবেই অধিক প্রভাবশালী হয়ে ইসলামকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে।

> তখন রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া স্থলপথে ও পশ্চিমা ইউরোপের জাতিসমূহ জলপথে ইসলামকে বারংবার আঘাত করে ফাঁসির রজ্জুবদ্ধ প্রাণীর অবস্থায় এনে ফেলে এবং ইসলাম জগতের সীমানাও সংকুচিত করে দেয়।[১৭৩]

ইউরোপীয় জাতিসমূহের ইসলামের সঙ্গে এই বহু শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের ও ঔপনিবেশিক বিস্তারলাভের একটা বিশিষ্ট অংশ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠাকর্মে ইংরেজ 'ইন্টারনাল প্রলেটারিয়েট' হিন্দুর সাহায্য লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে হিন্দুর ভূমিকাটা ছিল পীড়িত সিংহকে গর্দভের লাথি দেওয়ার মতোই। এবং সে গর্দভ ছিল ব্রিটিশ সিংহের অনুগ্রহভোজী ভারবাহী পশুমাত্র।

ইংরেজ শাসন আমলে ইংরেজের সৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ বেনিয়ান-দালাল মুৎসুদ্দি-শ্রেণী কর্তৃক যেসংস্কৃতির আবির্ভাব হয় তাকে বাবু কালচার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'বাবু শ্রেণীর' মধ্যেই ছিল এ সংস্কৃতি সীমিত, দেশের বৃহৎ জনগণের তাতে কোনো অংশ ছিল না। এজন্য এ কালচার ছিল একান্তই শ্রেণীকেন্দ্রিক—নবসৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল তার ধারক ও বাহক।

---

১৭২. সে ক্রুসেডের জের এখনও মেটেনি। বর্তমান আরব-ইজরেল সংঘর্ষ এই অনন্ত ক্রুজেডের অভিব্যক্তি মাত্র।

১৭৩. Study of History (Abridged)—Toynbee pp. 725-27.

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ শাসনও শেষ হয়ে গেছে—অন্য কোনো নতুন দেশি বা বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে নয়, আপন শক্তিহীনতায় ও পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চাপে ব্রিটেন ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব মোটেই বিলীন হয় নি, বরং লক্ষ্য করা যায়, এ প্রভাব যেন দিনদিন বর্ধিত হয়ে চলেছে।

এর কারণ নির্ণয়ে শুধু একথাই বলা যায়, ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়, তার বাহন ইংরেজি ভাষা এবং বাহক ও ধারক ইংরেজ হলেও তা ছিল একান্তই ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য। বরং আর নির্ভুলভাবে এ সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করতে হয় ইউরোপীয় সংস্করণ বলে। কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য সভ্যতায় কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোগ করতে পরিনি, নিজেদের আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার গণ্ডিভুক্ত রাখার গরজেই অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণ দ্বারা তার পাক—ভারতীয় সংস্করণ করে নিয়েছি। একথাটিও অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রত্যেক চক্রেই আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করলেও আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ত্যাগ করি নি। আফ্রিকা-এশিয়ার অন্যান্য বহু দেশ ও রাষ্ট্রের মতো 'অনুন্নত' বিধায় আমরা যেমন আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য জগতের তথা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরশীল, তেমনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার জন্যে আমরা পাশ্চাত্য জগতের উপর এখনও নির্ভরশীল। আর এসব নির্ভরশীলতার আনুষঙ্গিক হিসেবে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতি আমাদের জীবনে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। একথাও অনস্বীকার্য, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে, জীবনকে সুখকর, স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় করতে এবং জীবনের মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যজগৎ আমাদের চেয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে আছে।

সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আমরা উদার নীতিই অবলম্বন করব এবং প্রতিক্রিয়ামুখী উন্নয়ন ব্যাহতকারী রক্ষণশীল মনোবৃত্তি পরিহার করে জীবনকে সুন্দর ও সৃষ্টিধর্মী করার মহৎ সংকল্প গ্রহণ করব। এ শুভসংকল্প গ্রহণকালে আমরা যেমন অতীতের ঐতিহ্য ও ট্রাডিশন দ্বারা কবলিত না হয়ে তা থেকে প্রেরণা ও শিক্ষালাভ করব, তেমনি বিদেশি ও অনাত্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ না করে সেসব নিজের প্রয়োজন ও প্রতিভানুসারী করব। আমরা যেমন উন্নয়নকল্পে আর্থিকক্ষেত্রে এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিঃশঙ্ক করতে পররাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিদেশে প্রভুর চেয়ে বন্ধুরই সন্ধান করব, তেমন শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে—তা সে যে সীমান্ত থেকেই হোক না—আমাদের জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার মতো হীনম্মন্যতাবোধ পরিহার করে

www.pathagar.com

সব বিদেশি ভাবধারা ও সংস্কৃতির সূত্রকে আমাদের প্রতিভা এবং আমাদের ঐতিহ্য, ট্রাডিশন ও মূল্যবোধের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যভাবে অনুসারী করব। রাষ্ট্রিক জীবনে একচ্ছত্র সার্বভৌমতা অর্জন না কররে যেমন পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সাংস্কৃতিক জীবনেও অন্যপক্ষে আত্মনির্ভরতা লাভ না করলে জাতীয় জীবন নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হয় না। প্রত্যেকটি সংস্কৃতির পিছনে একটা বিশেষ জাতির পরিচয়ের প্রশ্ন বিজড়িত। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ইতিহাস, আমাদের চিন্তাধারা ও আদর্শের ভিত্তিমূলে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে, যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের স্বকীয় সংস্কৃতি হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এ মহৎ সংকল্পের শুভবুদ্ধিরই জাগরণ অধিক কাম্য।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। নব জাতীয়তাজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি জাতি মুসলমান ও হিন্দু বিভাগপূর্বকালে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন করতে তৎপর হয়েছিল অতীতের আদর্শ অনুসারী হয়ে। হিন্দু চেয়েছিল ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের জীবনে ফিরে যেতে ও 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করতে; আর মুসলমান চেয়েছিল আদি ইসলামের জীবনে ফিরে যেতে ও 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' স্বর্ণযুগের পুনরাবৃত্তি করতে। *নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথও নব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্থাপিত করেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদের পুনরুদ্ধার মানসে।*[১৭৪] বিভাগোত্তরকালেও এমন কল্পনা এক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, অতীত অতীতই, তার পুনরাবৃত্তি হয় না এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সমকালীন যুগের সঙ্গে তাল রেখেই টিকে থাকতে হয়। অতীত থেকে আমরা প্রেরণা ও শিক্ষা পেতে পারি আমাদের চলার পথে, কিন্তু অতীতকালকে হুবহু অনুকরণ করতে বা তা পুনরাবৃত্তি করতে পারি না। এ সত্যটি এ উপমহাদেশের জনগণ যত শীঘ্র উপলব্ধি করবে, ততই তাদের জীবনের পথে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাববৃত্তে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার মতো পাকিস্তান ও ভারতও আকর্ষিত হচ্ছে। আমরা যদি এই আকর্ষণ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটা বিশ্লেষণ করি, তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে প্রক্রিয়ার গতিটাও লক্ষ করতে পারি।

আর্থিক ও শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পায়ননীতির প্রায় অনুসারী। বর্তমান উন্নয়নকামী দেশসমূহ এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের ছাত্রেরই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উন্নতিকামী জাতিসমূহ বিভিন্ন পন্থায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির অনুসারী এবং রাষ্ট্রিক কাঠামো গঠনে পাশ্চাত্য ছাঁচেরই কোনো একটার অনুকরণকারী। কালচারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসরণটা সর্বত্র সমান স্তরের নয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গোঁড়া খ্রিষ্টান

১৭৪. রবীন্দ্রজীবনী দ্রষ্টব্য : বাংলা জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ, পৃ. ১৭২-১৭৩।

www.pathagar.com

জাতিগুলো—গ্রিক সার্ব, রুমান ও বুলগার—দুবাহু বাড়িয়ে পুরাপুরিভাবে কালচার, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণ নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের এককালীন প্রভু তুর্করাও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেছে। এগুলোকে নিয়মের ব্যতিক্রম ধরা যায়। অন্যপক্ষে আরবরা, ইরানিরা, ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা, চীনারা—এমনকি জাপানিরাও পাশ্চাত্য কালচার গ্রহণ করেছে মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে আত্মসচেতনতা জাগ্রত রেখে। পাশ্চাত্য প্রতিবেশীদের—পোলিশ, সুইস, জার্মান বা মার্কিনহস্তে বাধ্যতামূলকভাবে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়াটা গ্রহণ না করে রুশ ও জাপান নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক রূপান্তরটা সম্পন্ন করেছে নিজেদের হস্তেই।

> আর তার দরুন এ দুটো জাতি পাশ্চাত্য সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের সমকক্ষ হয়েই, কোনো ঔপনিবেশিক অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়ে নয়, কিংবা গরিব আত্মীয়ের মতোও নয়।[১৭৫]

বর্তমান জগতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের বিষময় ফলটা অবিশ্য টয়েনবি অন্যত্র এভাবে চিত্রিত করেছেন : "গত চার-পাঁচশো বছর ধরে পৃথিবী ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলে আসছে, তাতে পৃথিবীরই ভাগ্যে অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা জন্মেছে, পাশ্চাত্যের নয়। এই সংঘর্ষকালে পাশ্চাত্য জগৎ পৃথিবীর দ্বারা আক্রান্ত হয় নি। পৃথিবীই পাশ্চাত্য জগতের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং কঠিনভাবেই হয়েছে।" অতঃপর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ফলাফল ইত্যাদির চমৎকার চিত্তাকর্ষক আলোচা করে টয়েনবি দেখিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আদর্শ ইউরোপ থেকে অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে কী অনর্থ ঘটিয়েছে। কারণ কোনো একটি অঞ্চলের রাষ্ট্রিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যদি অন্য অঞ্চলের অনুপযোগী পরিবেশে গিয়ে বাসা বাঁধে বা বাঁধার চেষ্টা করে, তবে নতুন অঞ্চলটির রাষ্ট্রিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে সামগ্রিকভাবেই গোল বাধবে। টয়েনবির নিজের ভাষাতেই : "গত দেড়শো বছর ধরে আমরা দেখেছি যে, আমাদের ভূতপূর্ব আধুনিক রাজনৈতিক সংস্থা 'জাতীয়তাবদী রাষ্ট্র' আপন জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপের গণ্ডি অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে পূর্ব-ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এ ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পশ্চাতে নিয়ে গেছে উৎপীড়ন, বহিষ্করণ ও হত্যাকাণ্ডের বহ্নিবন্যা—এসব অঞ্চলে 'জাতীয়তাবদী রাষ্ট্র' দেশীয় সমাজসত্তার কোনো অংশই ছিল না, পশ্চিম থেকে মতলববাজিতে এই বিদেশি সংস্থা এসব দেশে আমদানি করা হয়েছিল। তাও এসব অপাশ্চাত্য দেশের স্থানীয় পরিবেশে এটি উপযোগী কি না, এমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নয়; এটি কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছিল অপশ্চিমী লোকচক্ষে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শক্তির জোরে পশ্চিমী রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর

১৭৫. Study of History (Abridged)—Toynbee, p 266-69.

www.pathagar.com

একটা অসংগত ও অদম্য ইজ্জত বেড়ে গিয়েছিল বলেই। এভাবে এসব অঞ্চলে বিদেশি আমদানি করা জিনিসের মতো 'জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র' নামাঙ্কিত পশ্চিমী সংস্থার প্রচলনের ফলে যে সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল, তা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। কারণ এসব পশ্চিমী দেশে কোনো কৃত্রিম নতুন সৃষ্টি হিসেবে আমদানি করা জিনিস নয়, এটা ছিল তাদের সহজাত উৎপন্ন ফসলের মতো ...

আসল সত্য এই যে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন হচ্ছে একটি অখণ্ড অঙ্গ, যার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।"[১৭৬]

এ যুগের পৃথিবীটার চেহারাটা দিন দিন এমন পাল্টে যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্পায়ন-নীতি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে সর্বগ্রাসীর মতো। আর পৃথিবীর তাবৎ উন্নয়নকামী দেশগুলো, বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলো, পাশ্চাত্য জগতের সে প্রভাববৃত্তে জড়িয়ে পড়ছে; কারণ পাশ্চাত্য জগতের প্রভাবের বাইরে আত্মরক্ষা করে চলার যোগ্যতা আজ আর কোনো জাতির নেই। নেই টিকে থাকার সামর্থ্য। পৃথিবীর এ পরিবেশে আমাদেরও টিকে থাকতে হবে এবং তার দরুন অবশ্যম্ভাবী রূপে পাশ্চাত্য প্রভাবের মায়াজালে জড়িয়ে পড়তেও হবে। আমাদের যেন এ আত্মসচেতনাটকু সদাজাগ্রত থাকে যে, পররাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমরা যেমন প্রভুর চেয়ে বন্ধুর সন্ধান করব, তেমনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে নব-রূপায়ণ প্রচেষ্টায় আমাদের সতত এ প্রযত্ন থাকবে : আমরা কারো কোনো অধীনতা স্বীকার না করে এবং দরিদ্র আত্মীয়ের মতো ভিক্ষার প্রত্যাশী না হয়ে নিজেদের হস্তে নিজেদের প্রতিভানুযায়ী ও মূল্যবোধের অনুসারী আমাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাব। কারো পিছনে চলার, অনুকারী বা অনুসারী হওয়ার হীনম্মন্যতায় যেন আমরা কখনো পীড়িত না হই; সমকক্ষ সঙ্গী হওয়ার গর্ব নিয়ে আমরা যেন জীবনের মূল্যবোধ নির্ণয়ে সামর্থ্য অর্জন করি।

---

১৭৬. পৃথিবী ও পাশ্চাত্য জগৎ : টয়েনবি : অনুবাদ, আবদুল মওদুদ।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. বাংলা : পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

ইতিহাস : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা
চতুরঙ্গ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক—হুমায়ুন কবির, কলকাতা 'দেশ' পত্রিকা (সাপ্তাহিক), ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৫
পূর্বমেঘ, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
প্রবাসী, ১৩২১, ১৩৩২, ১৩৫৩, ১৩৫৬, ১৩৬৭
বার্ষিক শিশু সাথী, ১৩৪৯
বেণু পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৩৮
ভারত, দৈনিক সংবাদপত্র, ২১ চৈত্র, ১৩৫৩
ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড
মাসিক মোহাম্মদী,
শিখা, ১ম সংখ্যার বার্ষিক বিবরণী
সাহিত্য, জৈষ্ঠ্য, ১৩২০

২. লেখক ও রচিত গ্রন্থ

অমিয় চক্রবর্তী, সাম্প্রতিক

অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগ
অরবিন্দ পোদ্দার, উনবিংশ শতাব্দীর পথিক
অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য
আবুল কালাম আজাদ, মওলানা, আঠারোশো সাতান্ন (চতুরঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৬৪)
আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী
আবদুস সালাম, রিয়াজ-উস-সালাতীন (ইংরাজি অনুবাদ)
আবুল মনসুর আহমদ, পাক-বাংলার কালচার
আবদুল ওদুদ, কাজী বাংলার জাগরণ

www.pathagar.com

আবদুল ওদুদ, কাজী শাশ্বত বঙ্গ
আবদুল মওদুদ, মাসিক মোহাম্মদী (শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১)
আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা
আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
আহমদ শরীফ, ডক্টর, পুঁথির ফসল;
আহমদ শরীফ, ডক্টর, মুসলিম কবির পদ সাহিত্য
আহমদ শরীফ, ডক্টর, চট্টগ্রামের ইতিকথা
আর বিরুনী, ভারতবর্ষ (প্রথম খণ্ড)
আবদুল হাই, মোহম্মদ ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
ইন্দ্রমিত্র, করুণা সাগর বিদ্যাসাগর
ইমদাদুল হক, কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী,
১ম খণ্ড (কে. বা. উ. বো.)
উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারত-দর্শন সার
এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ, মুসলিম বাঙলা সাহিত্য
আবদুল মান্নান, কাজী, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে
মুসলিম সাধনা
কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, দেওয়ান, আত্মজীবনচরিত
কালী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা
কালী প্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা
কেশবচন্দ্র সেন, আত্মজীবনী
গুহ, এন. কে. বাংলায় বিপ্লববাদ
নগেন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি
নজরুল ইসলাম, কাজী নজরুল রচনাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড (কে. বা. উ. বো.)
নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সংকলন
নরেশ গুহ, বাংলা রূপনাট্যের উত্তরে আইরিশ প্রহসন
পাঁচকড়ি ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের অনুবাদ
প্যারীচাঁদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বাঙালি
প্রবোধ সান্যাল, হাসুবানু
প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড
বিনয় ঘোষ, বাঙলার নব জাগৃতি
বিনয় ঘোষ, বাঙালী বিদ্বৎ সমাজের সমস্যা
বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ
বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ধর্মতত্ত্ব (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)
বদর উদ্দিন ওমর, মুসলিম সংস্কৃতি
বুদ্ধদেব বসু, নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ
ভবতোষ দত্ত, কবি জীবনী (সম্পাদিত)
মোহিতলাল মজুমদার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোক সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, (বিশ্বভারতী সংস্করণ)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবর্ষ সংস্করণ)
রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)
রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙালির ইতিহাস (মধ্যযুগ)
রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল
লঙ সাহেব, (সংকলিত) ১৮১৫-১৮৫৫ সালের পুস্তকাদির ক্যাটালগ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত (২য় পর্ব)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেশ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পল্লীসমাজ
শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা
শিশির কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য
শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
শিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন, শিরাজী রচনাবলী, ১ম খণ্ড
(কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড)
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য
শশীভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ
সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ভাগ
সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ও ৫ম খণ্ড
সুকুমার সেন, মুসলমানি বাংলা সাহিত্য
সৈয়দ শামসুর রাহমান, আফ্রিকার আমন্ত্রণ
হবিবুল্লাহ, আ. ম. ভারতে ওহাবী আন্দোলন
হালদার, গোপাল সংস্কৃতির রূপান্তর
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাষা ও সাহিত্য
হুমায়ুন কবির, আঠারোশো সাতান্ন
হুমায়ুন কবির, মোসলেম রাজনীতি

www.pathagar.com

BIBLIOGRAPHY

2 (a) PERIODICALS, PAMPHLETS, REPORTS, DESPATCHES, ETC.

Asia (Monthly Magazine), Vol. XXVIII
Administrative, Report, 1890-91
Asiatic Journal, June, 1830
Asiatic Review, October, 1948
Amrit Bazar Patrika, January 4, 1874
Bengal Directory, 1854
Bengal Rev. Consul., December 20, 1776
British Achievements in India : A survey, Calcutta Review, 1845, 1870
Clive to Court, September 29, 1765
Despatches to Madras, Vol. 40
Despatches to Duke of Wellington, June 18, 1843
Government Records, No 22, 1855
Hamilton Collections, I. O.
I. O. Home (proc) November. 1898 Vol. 5414 2327-28
I. O. Lawrence paper, Vol. IV
I. O. Legis (proc) January, 1886
Indian Public Service Commission Report, 1887-89
Indian Sedition Commission Report, 1918
Indian Statutory Commission Report
Parliamentary papers, 1854
Parliamentary papers, 48 (20) of 1847-1848
Rev. Despatches, 31 Despatch, 1858
Report Committee, H. C. on petitions, 1781

www.pathagar.com

Report, Select Committee, H. C., 1831-32
Report of Royal Commission on Press, 1949
Selection from Despatches to India April 8, 1869
Statistical Abstract
Statistical Abstract for Relevant Years
Young India, Edited by Gandhi, October 12, 1921

2 (b) AUTHORS

Arnold, Dr., The Preaching of Islam
Aziz K. K. The Making of Pakistan
Aziz K. K. Britain and Muslim India
Ahmad, Q. U. Wahabism in India
Amir Ali, Syed, India and New Parliament
Amir Ali, Syed, History of the Saracens
Ali, Choudhury Rahmat, The Fatherland of the Pak Nation, Camb. 1947
Abul Kalam, India Wins Freedom
Barnier, Francis, Travels, in Mughal Empire
Baneswar Vidyalanker, History of Bengal (Vol.II)
Banerjee, W. C., An Introduction to Indian Polities.
Benoy Ghosh, History of Bengal, 1757-1905, C. U. (Contribution)
Bevcrley Nichols, Verdict on India,
Bolitho, Hector, Jinnah, The Creator of Pakistan
Brecher, Michael, Nehru : A political biography.
Brailford, H. N., The Rebel India
Brailford, H. N., Democracy for India
Bradly Burt, Romance of an Eastern Capital
Bright, John, Oxford History of India
Chirol, Valentine, Indian Unrest, 1910
Chirol, Valentine, India Old and New
Choudhuri, N. C., The Autobiography of an unknown Indian
Choudhuri, S. B., Civil Disturbances During British Rule in India, Calcutta.
Campbell-Jhonson, Allan, Mission with Mount batten
Coupland, Reginald, The Cripps Mission

www.pathagar.com

Dasgupta, J. N., The Indian Middle Classes : Bengal in the Sixteenth Century

Devendra Nath Tagore, Autobiography

Devaprashad Sarvadhikar!, V. C. Calcutta University 1915, Address.

Durant, Will, Our Oriental Heritage : The Story of a Civilization.

Dutt, Rajani Palme, India Today and Tomorrow

Fazle Rabbi, Dewan, Origin of the Musalmans of Bengal

Graham, Governor, Life & Works of Syed Ahmed Khan

Havell, Aryan Rule in India

Hardy, Kier, India : Impressions and Suggestions

Habibullah, Dr. A.B.M., History of Bengal Vol. II (contributed)

Huges, Ameres, Keir Hardi

Hunter, W.W. Indian Musalmans (1945 Ed)

Ikram, S.M., Modern Muslim India and the British of Pakistan

I.H. Qureshi, The Struggle for Pakistan

Ismay, Lord, The Memoirs of the General Lotd Ismay

Kailash Chandra, Tragedy of Jinnah

Khuda Buksh, S, Essays : Indian and Islamic

Khuda Buksh, S, Studies : Indian and Islam

Lilly, W,S, India and its Problems

Lorenz, The Round the World Travellor

Lovett, History of Indian Nationalist Movement

Ludwig, Bureaucracy

Majumdar, Dutta, Roy Choudury : An Advanced History of India

Marshal, John, An Advanced History of India

Marx, Karl, Articles on India

Mannchi Storia Do Mogor, Vol. II.

Misra, B.B. The India Middle Classes : Their growth

Manrich, Travels

Murray, H, Historical and Descriptive Account on the British India

Moreland, India at the Death of Akbar

www.pathagar.com

Moriland, From Akbar to Aurangzeb
Moriland, India.
Mullick A. R., British Policy and the Muslims of India, 1858
Mundia, Peter, The Travels of peter Mundy in Europe & Asia
Malcolm, Memoirs, Vol. II
Majumdar, B.B., History of Political Thought.
Majumdar, R. C., History of Freed0m Movement Vol. I, II, III.
Majumdar, S. K., Jinnah & Gandhi
Martim, Sociology of Renaissance
Menon, V.I, The Transfer of Power in India.
Mayhew, Arthur, Education in India
Monmotha Nath Ghosh, The Life of Giris Chandra Ghosh
Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zamindars. etc. (Vol. II)
Nehru, Jawaharlal, Discovery of India
Nevinson, H.W., New Spirit of India
Cliver, E, Accross the Border, 1890
Paine, Thomas, Age of Reason
Pattabhi Sitaramayya, History of the Congress 3 Vols.
Pannikar, K.M., A survey of Indian History
Pelsaerte, Barbaross, Jahingir's India.
Ram Gopal, Indian Muslim : A political History R.C. Dutt, The Economic History of India, 1930
Rahim, The Mjor Governments of Asia
Ratish Mohan Agarwala, The Hindu Muslim Riots
Razzq, A, The Mind of Educated Middleclass in Nineteenth Cetury Bengal.
Roy, M.N., India in Trnsition
Ronaldsa, Lord, The Life of Curzon
Sarkar, J.N., Studies in Mughal India
Sarkar, J.N., History of Bengal, Vol. II
Smith, C.W., Modern Islam in India
Spear, P., The Nabobs : A stndy of the social Life
of the English in Eighteenth Century
Singha, S.K., History of Bengal, 1757-1905 (Edited)

www.pathagar.com

Symands, R, The Making of Pakistan
Sen, S.N., Eighteen Fifty-Seven
Tarachand, Influence of Islam on the Islamic Culture
Tavernier, Travells
Terry, Edward, A Voyage to India
Trevelyan, Life And Letters of Lord Macaulay
Toynbee, A.J., The Study of History (Abridged Edu.)
Toynbee, A.J., World and West

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অ

অক্সফোর্ড ২১৯
অক্ষয় কুমার দত্ত ১০৩, ২৭৯
'অগ্নিবীণা' ২১৮. ৩০১, ৩৪০, ৩০৫
'অঙ্গুরী বিনিময়' (ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস) ২৯১
অটোম্যান সাম্রাজ্য ৩৯
অনার্য ১৭
'অবজারভার' (ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র) ২১৮, ২৩৪
অমুসলমান ২২
অমৃতবাজার পত্রিকা ২২৬

আ

আইজাক টিরিয়ান ৫১
আওরঙ্গজেব ৩২, ২৯৬, ৩৩৯
আকবর ৩২, ৩৬, ৪৪, ৪৫, ১৪৬, ৩৩৯
আগরমল ৪০
আকরম খাঁ মোহাম্মদ ২৯৮
আগা খাঁ ১৯০, ২২৮
আজমীর ৪০
'আজাদ' (দৈনিক) ২৮১, ৩১২
আতরাফ ৪৭
আনন্দ মঠ ২১৫, ২৯১
আনোয়ার (নজরুল) ৩০৪
আফগানিস্তান ৩৪, ৩৫২
আফগানি ১৮
আফ্রিকা ১৫৩, ২১০, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৫৮
আফ্রিদী ২২০
আবদুর রসুল ব্যারিস্টার ২২৬
আবদুর রহমান জামী ২৭৩
আবদুল আযীয শাহ ১১২, ২৫৯
আবদুল ওদুদ কাজী ১১০. ১৯২, ২৯৩, ৩১০, ৩১৬
আবদুল জব্বার (ফরায়েজি) ২৫৯
আবদুল লতিফ নওয়াব ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ২৬৩, ২৬৫
আবদুল হাই, মওলানা ২৫৫
আবদুল হাকিম ২৬৫
আবদুল হামিদ লাহোরী ৩৬
আবুল কালাম আজাদ ২০৫, ৩০৭
আবুল ফজল (আকবরের নবরত্নের অন্যতম) ৪৫
আবু রুশদ ৩২
আবু বকর (খলিফা) ৩০৬
আব্বাসী খেলাফত ৩৪২
আমীর খসরু ৪৬
আমীরুল ওমরাহ ৪৫
আমেরিকান ২০২, ৩২০
আরব ২০, ২১, ২৩, ২৭, ৩৪, ৪৬, ৫১, ৩৫৭
আরবি ১৮, ২৩, ৩০, ৮৪, ৮৫, ২৬৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ৩০১, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৫২
আর্কোডিয়ান ৩৪
আর্য ১৭, ১৯, ৩২
আয়মা ৪৪
আলতাফ হোসেন হালী ১৮৮
আল বিরুনী ২৮, ২০৭, ২০৮
আলাওল ২৭৫, ২৭৭
আলাউদ্দীন মওলানা ৪৫
আলিগড় ১২৮
আলীবর্দী নবাব ৪৯
আলেকজান্ডার ১৭, ৩৩
আল্লাহ ২৭, ৩২০
আশরাফ (অভিজাত) ৪৭
আসবাব-ই-বাগাওয়াৎ-ই-হিন্দ ১৮৪
আসাম ১৭, ১২২, ১৬০
আহমদ উল্লাহ মওলানা ১০৯
আহমদ শরীফ ডক্টর ২৭৪, ৩৩৬
আহমদাবাদ ৩৮, ৫৭, ১১৭, ১৬৪, ৩৩৯

www.pathagar.com

ই

ইউরোপ ১৮, ৩৪, ৪০, ৫৫
ইউরোপীয়ান ৬৫, ৮৯
ইংল্যান্ড ৩৯, ৪৬, ৫৫, ৫৯, ৬১, ৬৭, ৭১, ৭২, ১১৬, ১৩০, ১৩৮, ১৬৬, ২০২, ২১৭, ২১৮, ২২১
ইংলিশম্যান (পত্রিকা বিঃ) ২২৬
ইকনমিক ফ্রিডম ২৯৯
'ইকনমিস্ট' (ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক) ২১৮, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫
ইকবাল আল্লামা ১৮০
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৪৫
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ৬৯
ইন্টারন্যাল প্রলেটটারিয়েত ৩২২, ৩৫৪
ইবনে বতুতা ৩৫, ৪৭
ইমদাদুল হক কাজী ২৫, ২৯২
ইমাম বখশ (কোম্পানি আমলের জনৈক সোরা গোমস্তা) ৬৩
ইমাম হামবল ১০৮
ইয়ং বেঙ্গল ১৪৩, ১৮১, ২৪৯, ২৭৯
ইয়েটস উইলিয়াম বাটলার ৩২৫
ইয়েহ-চি ১৭
ইরানি ১৭, ১৮, ৪৬, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৭
ইলিয়ট (প্রখ্যাত ইংলিশ কবি) ৩০৯
ইলিয়ড ১৮১
ইসমাইল শাহ মোহাম্মদ ১০৬
ইসমাইল হোসেন শিরাজি ২৯৮
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৩৮, ৭০, ৮৩
ইহুদি ১৮

ঈ

ঈমান ৩৪৯
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৪৬

উ

উইলিয়ম কেরী ৮৫
উইলিয়াম ক্যাকসটন ২৬৮
উগান্ডা ১৫৪
উডফোর্ড টমাস ৭০
উড়িষ্যা ৭৮, ১৩৫, ১৫৯, ১৬০
উমিচাঁদ ৬৩
উর্দু ১৮, ৮৪, ৮৮, ২৬৩, ২৭৬, ২৮০, ২৯১, ৩০৭, ৩৪৬
উসমান (খলিফা) ৩০৩

এ

একলব্য (হিন্দু প্রচারক বিশেষ) ৩২, ৩৩৪
একসটার্নাল প্রলেতারিয়েত ৩৩০, ৩৩৪
একেশ্বরবাদ ২৭
এডওয়ার্ড থম্পসন ২৩১
এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ ২৩
এম্পায়ার রিভিউ (পত্রিকা) ২১৮
এলাহাবাদ ১২৯, ১৪৪
এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৩৭
এশিয়াটিক রিভিউ (পত্রিকা) ২১৮

ও

ওবায়দুল্লাহ মওলবি ১৭০, ১৭১
ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ১৮৬
ওয়ারেন হেস্টিংস ৬১, ৬২
ওয়ালীউল্লাহ শাহ ১১১, ১১২, ২৫৪
ওয়েলেসলি ১০১
ওলন্দাজ ৪০
ওলা বিবি ২৫৬

ক

কন্টেম্পরারি রিভিউ ২১৮
কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি ২৩০
কবীর ৩৩৪, ৩৩৫
কর্নওয়ালিস লর্ড ৪৯, ৮১, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১৩১, ১৩৫, ২০১, ২৪২, ২৪৩, ২৮৫
কলমী পুঁথি ২৮১
কলকাতা ৫৭, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮১, ৮৯, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১১৯, ১২৫, ১২৮, ১২৯, ১৩৬, ১৪১, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬৬, ১৭০
কলকাতা এসোসিয়েশন ১৮১, ১৮৮, ২০১, ২০৪, ২১৪, ২২৬, ২২৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৫২, ২৫৩, ২৬১, ২৬২, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৭, ২৯৩, ৩০৬, ৩১১, ৩১২
কলেমা ২৬

www.pathagar.com

কাথিয়ার ২০
কানপুর ৫৭, ১৫৭, ১৬৪
কাবুল ৩৪২
কামরূপ ২৩
কামাল পাশা (কবিতা) ৩০৪
কামাল আতার্তুক ৩১০
কার্ল মার্কস ৩৬
কালিকট ৩৮, ৫১
কালী কিংকর ডক্টর ২৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৪১, ২৪৪, ২৬৮
কাশীরাম দাস ২৭২, ৩৪৫
কুচবিহার ১০৪
কুশান ১৭, ১৮, ৩১
কুষ্টিয়া ৮০
কৃত্তিবাস (হিন্দু কবি) ৩৪৫
কৃষ্ণ মোহন ঘোষ ১৮১
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ২১৯
কেরামত আলী মাওলানা ১৭৯, ১৮০, ২৫৫, ২৫৯
কোরান ২২, ১১১, ১১২, ১৮৯
কোরবানী (নজরুলের কবিতা) ৩০৪
কোহিনূর ৩৩
ক্লাইভ রবার্ট ২১, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ২৮৫, ৩৪১

খ

খাকসার পার্টি ২০৫
খানকা ২৫, ৪৪
খাসিয়া (আসামের পাহাড়) ১৭
খেয়াপারের তরণী (নজরুলের কবিতা) ৩০৪, ৩০৬
খ্রিষ্টীয় ১৭, ১৮, ২৩, ৩৪০, ৩৫০

গ

গঙ্গারাম ৩৭, ৪২
গাজী মিয়ার বস্তানী ২৯৭
গান্ধী ৩৩, ১৯৬, ২১৫, ২২৯, ২৩০, ২৩৭, ২৫০
গুজরাট ৩৬, ৩৯
গুজরাটি ১৮, ৭৮, ১২০
গুর্খা ১৭
গিয়াস উদ্দীন সুলতান ২৭২, ২৭৩
গীতা ১৬৬
গীতাঞ্জলি ৩২৫
গ্যেটে (জার্মান কবি) ৩১০
গোপীমোহন ঠাকুর ২৪৪
গোপীমোহন দেব ২৪৪
গোলকুণ্ডা ৩৮
গৌড়ীয় ৪৪
গৌরদাস বসাক ২৮৯
গ্রান্ট চালর্স ৯০
গ্রিক ১৭, ৩১, ৮৫, ৩৪০, ৩৫৭
গ্রেট ব্রিটেন ৩৪, ৪১

চ

চট্টগ্রাম ২৩, ৩৬, ১৬০, ২২৫, ২৬৩, ২৬৪
চব্বিশ পরগণা ৮০
চাকলাদার ৪৯
চাটগাঁও ২৩
চিত্তরঞ্জন দাস দেশবন্ধু ১৯২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৫৭, ৮২, ১২৩, ১৩১, ১৩৫, ১৪৮, ১৫০, ১৭২, ১৭৬, ২০১
চীন ৩৪, ১৫৩, ১৫৪, ৩৪৪
চৈতন্যভাগবৎ ২৮

ছ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৬৯

জ

জহরলাল নেহেরু ৬০, ৮৩, ৩৩২
জগৎশেঠ ৩৮, ৬৩, ১২৪
জনাব আলী (মধ্যযুগের কবি) ২৮২
জয়কৃষ্ণ সিংহ ২৪৪
জর্দান ৩১৯
জাঁ ক্রিস্তফ (রোমাঁ রোলাঁর উপন্যাসের নায়ক) ৩১০
জাঠ ১৮
জান্নাত উল বিলাদ ৩৪
জাপান ৩৪, ৪০
জামশেদপুর ৫৭, ১৬৪
জার্মান ৩০৮, ৩২০, ৩৫২, ৩৫৭
জাহাঙ্গীর বাদশাহ ৩৪, ৪৫

www.pathagar.com

জেটল্যান্ড লর্ড ২৩৩
জেহাদি আন্দোলন ১০৮, ১০৯, ১৭০
জৈন ১৯, ২৪৮
জৈনধর্ম ৩০
জোড়াসাঁকো

ট

টলস্টয় ৩০৩, ৩১০
টয়েনবি (প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দার্শনিক) ৫৬, ৩৫৭
টাটা কোম্পানি ৭৭, ১২০, ১২৯, ১৫২

ড

ডালহৌসি লর্ড ২৮৫
ডিগনিটি অব লেবার ২৯৯
ডিরোজিও ২৪৬
ডেইলি হেরাল্ড (ইংল্যান্ডের পত্রিকা বিঃ) ২১৮
ডেভিড ইয়ুল ৬৯
ডেভিড হেয়ার ৮৫
ডোমিনিয়ন স্টেটাস ২৩২, ২৩৩

ঢ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৬৪

ত

তখত-ই-তাউস ৩৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২৭৯, ২৮৭
তফহিমাতে ইলাহিয়া ২৫৪
তরফদার ৪৯
তরাইন ২১
তাজমহল ৬১
তামিল ১৭, ১৮
তারগিব-ই-মুহম্মদীয়া আন্দোলন ২৫৫
তাসাউউফ ২৫৪
তাহকীক-ই-হিন্দু ২০৭
তিতুমীর ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৭৮, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯, ৩৩১
তিব্বত ৩৪
তুরস্ক ৩৫, ১৮৭, ১৯১
তুরান ২৫, ৩২
তুর্কি ১৮, ২২, ২৩, ২৪, ৪৬, ৩৪৯, ৩৫২
তেলেগু ১৭, ১৮

দ

দয়ানন্দ, সরস্বতী ২৪৭
দাক্ষিণাত্য ৩৬
দাদু (প্রচারক) ৩২, ৩৩৪, ৩৩৫
দান্তে (কবি) ৩১০
দারুল ইসলাম ২৫৯
দাহির ২০
দিঘাপাতিয়া ৪৯
দিনাজপুর ৩৫, ৮০
দিনেমার ১৮
দিল্লি ২১, ২২, ৪৩, ৯১, ১১১, ১৫৯, ১৭০, ১৭৮, ১৭৯, ২২৮, ২৩৭, ২৫৩, ২৯১
দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো ১৮, ২১১
দীনবন্ধু মিত্র ৬৫, ১৪১
দুদু মিয়া (ফরায়েজী নেতা) ১০৫, ১০৭
দূতীবিলাস (ঊনবিংশ শতকের বাংলা গ্রন্থ বি :) ২৭৯
দেওয়ান-ই-খাস ৬২
দৌলত কাজী ২৭৫
দ্রাবিড় ১৭
দ্বারিকানাথ (ঠাকুর) ২৯, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮৫, ১৪১, ১৪৭, ২১৪, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৯৩
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮৭
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২৪৫

ধ

ধূমকেতু (অর্ধ সাপ্তাহিক) ৩০১

ন

নজরুল ইসলাম ২৯৭, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩২৬, ৩৪৮
নদীয়া ৮০, ২৫৫, ২৫৮
নবীউল্লাহ, সৈয়দ ১৯১
নবীবংশ ২৭৫

www.pathagar.com

নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি (ইংল্যান্ডের পত্রিকা বি :) ২১৮
নানক ৩২, ৩৩৪
নারিকেলবেড়িয়া ১০৬
নাসির উদ্দীন নুসরত শাহ ২৭১
নিউইয়র্ক ২২৩
নিউ লাইট ১৮৭
নিউ লাইটের কৈফিয়ত (পুস্তক বি :) ১৮৭
নিউ স্টেটসম্যান ২১৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪
নিওলিথিক ১৭
নীলদর্পণ ৬৫, ১৪১
নেহরু রিপোর্ট ১৯২, ১৯৩
নোবেল প্রাইজ ২৯৪, ৩০৮, ৩২৫, ৩৪৮, ৩৫৬
নোয়াখালী ২৫৭, ২৫৮

প

পরগনা ৪৯, ২৫৫
পর্তুগিজ ১৮, ৩৬, ৩৮, ৫১, ২৬৮
পলাশী ২১, ৫০, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭৮, ১০৭, ২৮৫, ৩৪১
পল্লী সমাজ ২৯৬
পশ্চিম বাংলা ৩৭
পাকিস্তান ১৯, ৫৭
পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ২৮১
পাটনা ৪০, ৪২, ৯২, ১০৫, ১০৬, ২৬৩
পাঠান ২৪, ২২০
পাঞ্জাব ১৭, ৪৯, ১২৯, ১৪৪, ১৬৮, ১৯২, ১৯৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৭
পাবনা ২৫৭
পারস্য ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৩৫২
পিয়ারী মোহন ঘোষ ১৪৮
পীরপুর রিপোর্ট ৩৩২
পুনা ১২৮
পুলিন বিহারী দাস ১৬৮
পেশোয়ার ১০০
প্যারীদাস মিত্র ২৬৮
প্রজাস্বত্ব আইন
প্রতাপাদিত্য ২৮৭
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডক্টর স্যার ১৬৮
প্রমথ চৌধুরী ৩৪৬
প্রশান্ত মহাসাগর ৩৪
প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ১৪৬, ২১৪

ফ

ফজলুল হক, এ. কে. ২০৬, ৩৩২
ফযলে হক খয়রাবাদী ১০৯, ১১২
ফরাসি ১৮, ৩৯, ৫২, ৫৫, ৬৬, ৭৫, ১২০, ১৩৭, ২১৬, ২৬৩, ৩৩৪, ৩৪৭, ৩৫২
ফরাসি বিপ্লব ৩০৩
ফারসি ১৮, ৩০, ৪৯, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯৪, ১১১, ১৭৭, ১৭৮, ২০০, ২৪৫, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ২৯১, ৩০১, ৩০৭, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৪, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬
ফরিদপুর ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮
ফিরিঙ্গি ৩৬
ফিলিপ ফ্রান্সিস ৭৯
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ২৬৮
ফোর্ট নাইটলি রিভিউ (ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ পত্রিকা) ২১৮, ২২৯
ফ্রান্স ৪৬, ২২১
ফ্রেডারিক জন শোর ১০৯

ব

বখতিয়ার খিলজী ২১
বঙ্কিমচন্দ্র ২৯, ১২৫, ১৪২, ১৪৮, ১৫৭, ২১৫, ২৫০, ২৬৮, ২৭০, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৬, ৩৪৬
বঙ্গভঙ্গ ১৬২, ১৬৩, ১৭০, ১৭৪, ১৯৭, ২২৩, ২২৭, ২৬৪, ২৯৩, ৩০০
বঙ্গোপসাগর ২৩, ১৬৩
বন্দে মাতরম ২১৫, ২২৬
বরিশাল ৪৯, ২৫৮, ২৫৯
বর্গী ৪৪
বর্ধমান ৩৭
বাইবেল ১০৪
বোরহানপুর ৩৮
ব্রাহ্মণ্যধর্ম ২৪, ৩২, ২০৮

www.pathagar.com

ভ

ভগবদগীতা ১৬৫
ভল্টেয়ার ১০৩, ৩০৩
ভাগলপুর ২৬৬
ভাগীরথী ৩৭
ভারততত্ত্ব ভাস্কর রমেশচন্দ্র মজুমদার ২২
ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৪৬
ভাস্কো-ডি-গামা ৫১, ১৯৯
ভুটান ৩৪
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২৯১

ম

মক্কাশরীফ ১৭৯
মতিলাল নেহেরু
মদিনার গৌরব ২৯৭
মধুমালতী ২৭৪, ২৮২, ২৮৪
মধুসূদন মাইকেল ৯১, ১০২, ১৮১, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ৩০৪, ৩২৫
মধ্যএশিয়া ৩৪
মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার ১৯১
ময়মনসিংহ ২৫৭, ২৫৮
মহাজনী আইন ৫৮
মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ২৬৩
মহাশ্মশান কাব্য ২৯৮
মহীশুর ৭৪, ১১৮, ৩৩৯
মহেশ চন্দ্র ঘোষ ১৮১
মাউন্টব্যাটেন ১৭৪, ২৩৬, ২৩৭
মা-বরকত ২৫৬
মারাঠা ১৯, ৩৭, ১০০, ২১৫, ২২১, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৫২
মার্শাল, স্যার জন ২৯
মালদহ ১০৬
মালদ্বীপ ৩৪
মালব ২০
মালয় দ্বীপপুঞ্জ ৩৪
মালয়ালাম ১৭
মাসালিক-উল-আবসার ৩৪
মাহমুদ হাসান, মাওলানা ১৭০
মিফতাহুল জান্নাত (মাওলানা কেরামত আলী সাহেব রচিত পুস্তক) ২৫৯
মিলটন (জগদ্বিখ্যাত কবি) ৩৪৬
মিল (চিন্তাশীল লেখক) ৩৪৮
বেন্থাম ৩৪৮
মীর কাসিম ৫৯, ৬৩, ৭৮
মীরজাফর ৫৯, ৬৪
মুমিনশাহী ৪৯
মুর্শিদ কুলি খাঁ ৪৮, ৪৯
মুসলিম লীগ ১৭২, ১৭৩
মুহম্মদ (হযরত) ২০, ১০৮, ১৮৭
মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৩৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২০৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৩০
মুহম্মদ ঘোরী ৩৪১
মুহম্মদ মহসিন
মুহম্মদ-বিন-কাসিম ২০, ২৬, ২০৮
মুহম্মদ দানিশ ২৮২
মুহসিন-উল-মুলক ১৮৭
মেকলে ৫৬, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৩, ২১৪, ২৫১, ৩২৪
মেদিনীপুর ২৮৯
মেহেরুল্লাহ, মুনশি ২৬০, ২৯৮
মোজাম্বিক ৩৪
মশাররফ হোসেন, মীর ২৬৮, ২৮০, ২৯৭
মোহনলাল ৪৮
ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫
ম্যানুয়েল-দ্য-আসসুপসাম ২৬৮

য

যদুনাথ সরকার ২৭
যশোর ২৫৫
যোধপুর ৪০
ইউসুফ-ওয়া-জুলায়খা ২৭৩

র

রংপুর ৩৫, ১০৬, ২৫৯
রমেশ চন্দ্র মজুমদার ২৯, ৪৮, ২০৩, ২১৪, ২১৬, ৩০৯, ৩৩৩
রবীন্দ্রনাথ ৩১, ৮১, ১০৩, ১১১, ১৩৯, ১৪৯, ১৬৭, ১৯০, ১৯৭, ২০৮, ২১২, ২১৪, ২৩৭, ২৫১, ২৬৮, ২৭৮, ২৮৩, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৯, ৩০১,

www.pathagar.com

৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫৬
রহমত আলী, চৌধুরী ১৯৪
রাউন্ড টেব্‌ল্ (পত্রিকা) ২১৮, ২৩৪, ২৩৫
রাজনারায়ণ ২৮৭, ৩১৮
রাজশাহী ৪৯, ৮০, ২৬৩
'রাজসিংহ' (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস) ২৯১
রাধাকৃষ্ণ ৩৩৬
রামগোপাল ঘোষ ৭১
রামদুলাল দে ৬৮, ৭০, ২০১, ২৪৫
রামমোহন রায়, রাজা ২৯, ৩১, ৬৮, ৭০, ৭৪, ৮১, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১২১, ১৪০, ১৯৮, ২০১, ২১৪, ২৪৪, ২৪৫, ২৬৮, ২৭৯, ২৮৬, ২৮৭, ৩১০, ৩১২, ৩৩০, ৩৩৭, ৩৪৬, ৩৪৮
রামানন্দ ৩২, ৩৩৪

ব

বাঙালি ২২
বাদশাহ ২১, ২২
বালগঙ্গাধর তিলক ১৬৪
বালাজুরি ২০
বাল্মিকী ২৮৯
বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র) ১১০, ২৭৯, ৩২৬
বিষাদ সিন্ধু ২৯৭
বিষের বাঁশি ৩০১
বিশ্বনাথ মান্দালিক, রাওসাহেব ১৪৮
বিহার ৭৮, ৮১, ১৩৫, ১৫৯, ১৬৮, ১৭৮, ২৬১
বীরবল ২৮৩, ২৮৬
বুকানন ৩৫
ব্রিটিশ ২১, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৯, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৫, ১৯১, ১৯৯, ২০৩, ২০৬, ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৬১, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২২, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৫৫
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০
বেঙ্গল প্যাক্ট ১৯২
বেনারস ৬০, ৯৭
বেন্টিংক, লর্ড ৭৪, ৮৬, ৯১, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০১, ২৪৬, ৩২৪
বেলগাছিয়া ১১০
বৈদ্য ৪৯
বোম্বাই ২০, ৪০, ৫৭, ৬৭, ৬৮, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮৪, ১০৪, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৯, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৩, ১৫২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৫, ২০৪, ২২৬, ২৬১

র

রায়নন্দিনী (শিরাজি রচিত উপন্যাস) ২৯৮
রাশিয়া ১৬৯, ৩৫৪
রিচার্ডসন ২৪৬
রিয়াজ উদ্দীন আহমদ, মুনশি ২৮০
রিয়াজ-উস-সালাতীন ৪৮
রুশ বিপ্লব ৩০৩
রুশো ৩০৩, ৩৪৮
রেনেসাঁ ৫৫, ৩২১
রেলওয়ে আইন ৭৪
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ২৬৬
রোমাঁ রোলাঁ ৩১২

ল

লক্ষ্মণ সেন ২১
লক্ষ্মৌ ১২৮, ১৭৯, ১৯৪
লন্ডন ১১৭, ২১৯, ২২৩, ২২৪, ২২৭
লা ইকরাহা ফিদদীন ২২
লাহোর অধিবেশন ১৫১, ২৬৬
লিটন ১৪৩
লিয়াজোঁ অফিসার শ্রেণী ৩২২

www.pathagar.com

শ

শওকত আলী, মওলানা ১৯২
শক ১৭, ১৮, ৩১
শঙ্করাচার্য ৩২
শরৎচন্দ্র (কথাশিল্পী) ২১১, ২৬৮, ৩৪৬
শরীয়তুল্লাহ, হাজি ১০৫, ১০৬, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯, ৩৩১
শহীদুল্লাহ, ডক্টর ২৯৮
শান্তিনিকেতন ৩৫৬
শাফেয়ী মজহাব ২৫৭
শামসুদ্দীন তালিস ৩৬
শায়েস্তা খান, নওয়াব ৩৫, ৩৬
শাহ নওয়াজ ১৫৪
শাহু রাজা ৩৭
শিবলী, আল্লামা ১৮৮
শিবাজী ৩৭, ৩৮
শিবাজি-উৎসব ৩৭, ১৬৬, ১৬৭, ২১৫, ২১৬, ২৯২
শিলাইদহ ৮০
শেক্‌স্‌পিয়র ৩১০, ৩২৬, ৩৪৬
শ্রীকান্ত (উপন্যাস)
শ্রীচৈতন্য ৩২
শ্রীমজুমদার ৫০
শ্রীরামপুর ৯৮, ১০০, ২৮৬

স

সজনীকান্ত দাস ২৭০
সত্যনারায়ণ (পাঁচালি বিঃ) ২৮২
সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ১৬৭
সমাচার দর্পণ ৩৩২
সংবাদ-রসরাজ (উনবিংশ শতকের পত্রিকা বিঃ)
সরফ রাজ খান, নওয়াব ৩৫
সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ২৬৬
সানডে টাইমস ২১৮
সায়েন্টিফিক সোসাইটি ১৮৩
সালাহউদ্দীন খুদা বখশ, অধ্যাপক ১৮৩
সিংহল ৩৪
সিমলা ডেপুটেশন ১৯০
সিরাজউদদৌলা ২১, ৪৮, ৩৪১
সিরাজগঞ্জ ২২৬
সিরাতুল মুস্তাকীম ২৫৫
সিরিয়া ২৫
সিলেট ১৮, ১০৬
সিজার, জুলিয়াস ২৯২
সুধীন্দ্র দত্ত ২৮৯
সুন্দরবন ১২২
সুপ্রিম কোর্ট ৯৪, ১৩৫, ১৩৬
সুরাট অধিবেশন ১৯৭
সুরাষ্ট্র ২০
সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, স্যার ১৫২
সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪
সুলতান মাহমুদ ২২, ৩৩, ২০৮
সুলতান মুহম্মদ খান ১০৭
সুলতান মুহম্মদ ঘোরী ২১
সুলতানি আমল ৪৩
সূর্যাস্ত আইন ৮১
সৈয়দ আহমদ, ব্রেলভী ১০৬, ১০৮, ১১১, ১১২, ১৮৪, ৩৩১
সৈয়দ আহমদ, স্যার ১৮০, ১৮৩, ৩৪৬
সৈয়দ হামজা ২৮২, ২৮৪
সোমনাথ ২২
সোহরাওয়ার্দী, শহীদ ২০৬
স্পিরিট অব ইসলাম ১৮৮

www.pathagar.com

ISBN 984 70156 0190 4